ইউরোপ পুনর্দর্শন

তপন রায়চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য এবং শিল্পের মতো ইতিহাসও যে জীবনের বিচিত্র সম্ভাবনার স্বাদ আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে—এই কথাটাই নতুন করে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন সুখ্যাত ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী। সমাজশাস্ত্রভিত্তিক এবং অন্য ধরনের বিশ্লেষণী আলোচনার বাইরেও মানুষের জীবনে ইতিহাসের যে একটা মূল্য রয়েছে—এই ধারণাতে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি শুরু করেন আধুনিক বাঙালীর মনোজ্ঞগতের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা। তারই আংশিক ফসল এই অনবদ্য আলোচনা-গ্রন্থ।

উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর চোখে ইউরোপের চেহারাটা কেমন ছিল—তারই সন্ধান এই গ্রন্থে। উনিশ শতকের যে-তিনজন মনীষীর ইউরোপ-চিন্তাকে আবর্তিত করে এই চেহারাটার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় এখানে, তাঁরা হলেন যথাক্রমে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী বিবেকানন্দ।

পাশ্চাত্য সম্বন্ধে ভারতীয়দের ধারণা বিষয়ে এতকাল প্রায় কিছুই লেখা হয়নি, সেই অভাব মেটাবে এই বই, যেখানে উনিশ শতকে ভারতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জটিল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ মূল্যায়নের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে এই মনীষীত্রয়ীর চিন্তাধারার ব্যাপক পরিচয়। তদুপরি, মূল্যায়নের বৈচিত্র্যের উৎস যে ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতায় এবং জীবনের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে—তার প্রতিও পাঠকের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন লেখক। দেখিয়েছেন, সময়ের দিক থেকে সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসের দ্রুতগতির কারণে মানসিকতায় কীভাবে প্রজন্মের ব্যবধান ঘটে গিয়েছিল এই চিন্তানায়কদের মধ্যে। বহু দুর্লভ ও মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ। সংকলিত তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একইসঙ্গে যেমন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল এই আলোচনাগ্রন্থ তেমনই প্রশংসনীয় আলোচকের নৈর্ব্যক্তিকতা।

বছর সাতেক আগে ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থাকারে বেরুনো এই বইটিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বাংলা সংস্করণের জন্য লেখক নিজেই যুক্ত করেছেন নতুন একটি ভূমিকা।

ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করল তপন রায়চৌধুরীর এই আলোচনাগ্রন্থটি।

২০০.০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ISBN 81-7215-369-4

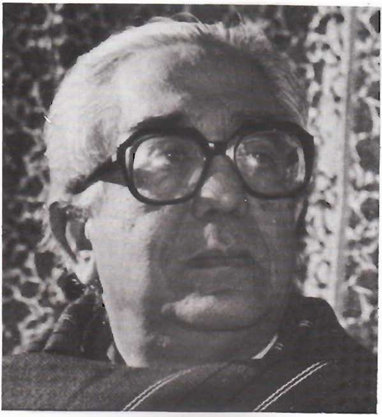

অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী (জ. ১৯২৬) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার অধ্যাপক এবং সেন্ট এন্টনী'স্ কলেজের ফেলো। প্রথম জীবনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। পরবর্তী জীবনে জাতীয় অভিলেখালয়ে সহকারী অধ্যক্ষ, দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিকসের অধ্যক্ষ ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের অধ্যাপক এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক পদে ছিলেন। এ ছাড়া হার্ভার্ড, পেনসিলভেনিয়া ও কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, ফ্রান্স প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ভিজিটিং প্রফেসর পদে পড়িয়েছেন। তপনবাবু ভারতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রথম সারির পণ্ডিতদের একজন। তাঁর লেখা সামাজিক ইতিহাস Bengal under Akbar and Jahangir, বাণিজ্যের ইতিহাস Jan Company in Coromandal, Europe Reconsidered এবং অধ্যাপক হাবিবের সহযোগিতায় সম্পাদিত Cambridge Economic History of India ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে সুপরিচিত। Europe Reconsidered ১৯৮৭ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পায়। 'রোমন্থন' ওঁর বাংলায় লেখা প্রথম বই। তপনবাবুর শিক্ষা বরিশাল জেলা স্কুল, স্কটিশ চার্চ কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজে। সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. ডিগ্রী পেয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচ্ছদ □ সুব্রত চৌধুরী

ইউরোপ পুনর্দর্শন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউরোপ পুনর্দর্শন

তপন রায়চৌধুরী

আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদ গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৫
চতুর্থ মুদ্রণ জুলাই ২০১৩

© তপন রায়চৌধুরী

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7215-369-4

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

EUROPE PUNARDARSHAN
[Essay]
by
Tapan Roy Chowdhury

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

পশ্চাৎপট ... ১৭
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ... ৩৮
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৯৮
স্বামী বিবেকানন্দ ... ১৮৫
উপসংহার ... ২৭১

টীকা ... ২৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই লেখকের অন্যান্য বই

রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা
বাঙালনামা
প্রবন্ধ সংগ্রহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

১৯৮৭ সনে দিল্লি থেকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস আমার ইংরাজি ভাষায় লেখা বই *Europe Reconsidered-Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal* প্রকাশ করেন। উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালির মনোজগতে—চিন্তা, চেতনা, অনুভূমির ক্ষেত্রে—আলোড়ন এবং গভীর পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ সাহিত্যকর্ম এবং সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায়। সে প্রচেষ্টাকে সংস্কৃতির পুনর্জন্ম বলা চলে কি না ('চলে না' এই সিদ্ধান্তই এখন বুদ্ধিজীবী মহলে বলবৎ), শিক্ষিত বাঙালির চিন্তা চেতনা প্রভুস্থানীয় সাদা মানুষের ভৃত্যসুলভ অনুকৃতি এবং সেই কারণে অশ্রদ্ধেয় কি না, বঞ্চিত মানুষের সঙ্গে ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের শোষিত-শোষক সম্পর্ক, জাতীয়তাবাদের 'আসল চেহারা', যুক্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে পুঁজিবাদী শোষণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—এই জাতীয় বিভিন্ন এবং বিচিত্র আলোচনায় উনিশ শতকের বাঙালির ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা এখন সমৃদ্ধ। আমার উল্লিখিত বইটি উনিশ শতকের চিন্তার ইতিহাস বিষয়ে হলেও বিশ শতকের নতুন গবেষণার সঙ্গে তার সম্পর্ক কম। সমাজশাস্ত্রভিত্তিক এবং অন্য ধরনের বিশ্লেষণী আলোচনার বাইরেও মানুষের জীবনে ইতিহাসের একটা মূল্য আছে,—এই ধারণার ভিত্তিতেই বেশ কয়েক বছর আগে আধুনিক বাঙালির মনোজগতের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা শুরু করি। সাহিত্য এবং শিল্পের মত ইতিহাসও জীবনের বিচিত্র সম্ভাবনার স্বাদ আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে—সে কথা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছি মনে হয়। উনিশ শতকের বাঙালির মনোরাজ্যের ইতিহাস তা সে যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন, নানাভাবে অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময়কর উপাদানে সমৃদ্ধ। যদি তার অন্য মূল্য সম্পূর্ণ অস্বীকারও করি, তার রস ঐশ্বর্য অসাধারণ এ কথা স্বেচ্ছান্ধ না হলে চোখে পড়বেই। যে ভাবে শিল্প-সাহিত্য মানুষের চেতনাকে নাড়া দেয় এই ইতিহাসও সম্ভবত সেভাবেই মনকে নাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

আমাদের ইতিহাসের এই অন্যতর সম্ভাবনা পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার দুরাশা নিয়ে কাজ সুরু করি। ইংরাজি বইটির মুখবন্ধে লিখেছি যে বাঙালির মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে একটা কথা বিশেষ করে চোখে পড়ে। পশ্চিম জগত উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালির চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সেই পৃথিবী আর তার সভ্যতার স্বরূপ কি, তা ভাল কি মন্দ (বিশেষত আমাদের তুলনায়), তার ক্ষমতার উৎস কি, সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভ্যতা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে এই প্রশ্নে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর প্রায় সমস্ত জিজ্ঞাসাই প্রকট। এই প্রসঙ্গে বারে বারে একই প্রশ্নগুলি ফিরে আসে। কিন্তু তার উত্তর বিভিন্ন এবং বিচিত্র। সেই বৈচিত্র্যরই কিছুটা আভাস দেওয়ার উদ্দেশ্যে বইটি লেখা।

ইংরাজি ভাষায় লেখা বই শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের হাতে পৌঁছায় সন্দেহ নেই। পাঠযোগ্য মনে করলে তাঁরা তা পড়েনও। তবু ইচ্ছা ছিল যে বইটির বক্তব্য বাংলায় আলোচনা করি। কিন্তু অন্য ভাষায় নিজের লেখা বই মাতৃভাষায় অনুবাদ করা কঠিন। করবার চেষ্টা যাঁরা করেছেন তাঁরাই এ সম্বন্ধে সচেতন। ডক্টর গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসাহী হয়ে বইটি অনুবাদ করার প্রস্তাব করেন। কিছুটা সসঙ্কোচেই তাঁর প্রস্তাবে আমি রাজী হই। সঙ্কোচের কারণ—যে পরিশ্রমে একটা বই অনুবাদ করতে হয়, সেই পরিশ্রমে নিজে একটা বই লেখা যায়। তবু তিনি যখন নিরস্ত হলেন না, তখন খুশি হয়েই সম্মতি দিই। নানা অসুবিধার মধ্যে তিনি কাজটা শেষ করেছেন। অন্যতর অসুবিধা,—আমার আলসেমি এবং ভবঘুরে বৃত্তি। কারণ অনুবাদটি আমি আদ্যোপান্ত পড়ি, ওঁর এটা ইচ্ছা ছিল। সে ইচ্ছা পালন করতে আমি কিছুটা অতিরিক্ত সময় নিয়েছি, এজন্যে তাঁর কাছে আমি অপরাধী। এই ভূমিকাটিও অনুবাদকের অনুরোধেই লেখা। আমার কাছে এর প্রয়োজন একটাই,—গীতশ্রীকে ধন্যবাদ জানানো। ওঁর পরিশ্রম ও উৎসাহের জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

অক্সফোর্ড
২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

তপন রায়চৌধুরী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখবন্ধ

স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও এই গ্রন্থটি উনবিংশ শতকের বাংলার পরিবর্তনশীল পর্যবেক্ষণ-প্রক্রিয়া, অনুভূতি ও মানসিকতার ইতিহাস বিষয়ে একটি ব্যাপক আলোচনার অংশ। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যোগাযোগের বিষয় লিখিত সাম্প্রতিক রচনায় একটি বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সে কথাটা এই যে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যাদের মানসিক জগৎ পশ্চিমের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই সংখ্যার হিসাবে প্রথম উল্লেখযোগ্য। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সমাজ-নেতারাই এশিয়ায় প্রথম পশ্চিমী উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ততদিনে ব্যবসা ও ঔপনিবেশিক শাসনের ভিতর দিয়ে বাঙালিদের সঙ্গে একটি ইউরোপীয় জাতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছয় দশক অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাদের মানসিক জগতের পরিবর্তনের প্রাসঙ্গিকতা তাই বহুল-প্রসারী। "আধুনিকীকরণ" ও "পাশ্চাত্যায়ন"—এই দুটি ভ্রান্ত কথা দিয়ে যে জটিল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মানসিক পরিবর্তনের ইতিহাস তারই অংশ বিশেষ। এই দুটি কথা কেন ভুল সে আলোচনায় না গিয়েও বলা যায় যে, সমগ্র এশিয়ার নতুন 'এলিট' গোষ্ঠির মধ্যে জগৎ-সমীক্ষা এবং জীবন বিষয় প্রত্যাশার যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল, বিগত শতাব্দীর ঘটনাবলীর অনেকটাই তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। এশিয়ার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক জগতের সমস্ত মৌল পরিবর্তন ওই রূপান্তরের ফলেই সম্ভব হয়েছে। একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে ভারতের জাতীয়তাবাদ, জাপানের শিল্পায়ন অথবা চীনের সাম্যবাদ-এর কোনোটিই এই রূপান্তর ব্যতিরেকে ঘটতে পারত না। উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার ছেদ বা মৌলিক পরিবর্তন অবশ্য সমাজের একটি ছোট অংশেই সীমিত ছিল। কিন্তু তার প্রভাবের গণ্ডি ততটা সীমিত ছিল না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্নিহিত নীতিগুলি সমাজের এক অতি ক্ষুদ্রাংশের মূল্যবোধেরই প্রতীক। কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাতি যখন তা গ্রহণ করল তখন লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করার মত শক্তির সঞ্চার হল। সুতরাং, উনবিংশ শতকের বাঙালি প্রজ্ঞা একটি আন্তর্জাতিক সংঘটনেরই অংশ। কালগত বিচারে এশিয়ার এলিট-গোষ্ঠীর মানস-পট-পরিবর্তনের সর্বপ্রথম প্রকাশ সম্ভবত বাংলাতেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঔপনিবেশিক শাসন ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ধারায় সংশ্লিষ্ট হওয়ার বিশেষ প্রেক্ষিত তো ছিলই, কিন্তু প্রমাণসাপেক্ষে বলা চলে যে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ঐতিহ্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগই এই পরিবর্তনের মূল কারণ, যার একটি আবার সে যুগের প্রধান ধারা বলে বিবেচিত হত। পশ্চিমী জীবনযাত্রা ও বিশ্বাসের কাঠামো থেকে তুলে নেওয়া কিছু কিছু সাংস্কৃতিক উপাদান গ্রহণের ভিতর যে সহজ ও প্রত্যক্ষ 'প্রভাব' পরিলক্ষিত হয়, শুধুমাত্র সেগুলির সাহায্যেই ওই পরিবর্তন ঘটেনি (যদিও সেরকম তুলে নেওয়ার ঘটনার অভাব নেই)। পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলির মূল ছিল অনেক গভীরে। সাংস্কৃতিক সংযোগ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মত কাজ করেছিল। ব্যক্তি এবং সমাজ, উভয়ক্ষেত্রে এই সংযোগের ফলে ঐতিহ্যগত চিন্তাধারা এবং আচরণের অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটেছিল, এমনকি জীবনের অতি অন্তরঙ্গ ক্ষেত্রগুলিতেও প্রচলিত চিন্তা ও ব্যবহার থেকে বিচ্যুতির উপলক্ষ হয়েছিল। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এক হিসাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ছিল ঔপনিবেশিক শাসনে জীবিকার্জনের হাতিয়ার মাত্র। আবার অন্যদিকে এই শিক্ষা পারিবারিক সম্পর্কের চিরায়ত আদর্শ ও মানসিকতার ভিত্তি দুর্বল করে দিয়েছিল। বিস্তৃত আত্মীয় গোষ্ঠীর, বিশেষত পিতামাতা, ভ্রাতৃবর্গ এবং তাদের সন্তান-সন্ততির প্রতি কর্তব্যবোধ এবং গুরুজনদের সঙ্গে সন্তানদের এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখার রীতি—বাঙালি পারিবারিক জীবনের এই দুইটি প্রধান ভিত্তি একেবারেই ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী* উপযুক্ত যুক্তি সহকারে দেখিয়েছেন যে পাশ্চাত্য রোম্যান্টিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাঙালি জীবনে নরনারী সম্পর্কের ধারণাই পালটিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য জীবনের এইসব ক্ষেত্রে অন্যান্য সংস্কারের মতই পরিবর্তনশীলতাও সমাজের সর্বত্র একই অনুপাতে ছড়িয়ে পড়েনি। প্রায় শতাধিক মানুষ নিয়ে বিরাট যৌথ পরিবার খুব সাম্প্রতিক কালেও দেখা গেছে। শহর ও গ্রামের অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারে শ্রদ্ধা-সমীহ ও গুরুজনের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলার প্রচলিত রীতিও অক্ষুণ্ণ থেকেছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া ও আচরণের নতুন ধারা খুবই অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমিত থাকলেও তার ঢেউ দূরদূরান্তরে আলোড়ন তুলেছে। উদাহরণ স্বরূপ উগ্র জাতীয়তাবাদের কথা বলে চলে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংযোগের এই অপ্রত্যাশিত পরিণামটি হয়ত অল্প কয়েকজন যুবক-যুবতীর জীবনেই কেন্দ্রবিন্দু ছিল, অথচ গ্রাম্যচারণকবির গানেও তার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। পরবর্তীকালের সাংগঠনিক রাজনীতিকগণও অতীতের সেই আত্মত্যাগের আবেগগত অনুষঙ্গগুলির সুযোগ নিতে ছাড়েননি। সুতরাং এলিট গোষ্ঠীর মানসিকতার পরিবর্তন বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরং সুদূরপ্রসারী ঘটনাবলীর গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্তা। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাঙালির নবচেতনার একটা বিশেষ স্থান আছে, কারণ যে সব ভাব এবং প্রভাবে আধুনিক ভারতের জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছে, তার অন্তত কিছুটা বাঙালিদের মাধ্যমেই পাওয়া। শুধুমাত্র "প্রাক্-জাতীয়তাবাদী" চেতনা এবং উদার-মানবতাবাদী মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য নয়, কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালিরাই প্রথম সরকারি কর্মচারী, কেরানি, আইনজীবী, শিক্ষক এবং চিকিৎসকরূপে

*'বাঙালি জীবনে রমণী' দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবিকার সন্ধানে দেশের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

পাশ্চাত্যধারায় শিক্ষিত বাঙালিদের নতুন চিন্তাধারা এবং মানসিকতাকে জন্ম দিয়েছিল ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ—যেমন, ঔপনিবেশিক শাসনের কার্যধারায় তাদের পরিবর্তিত ঐহিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক পরাধীনতা বিষয়ে পরিবর্তনশীল মনোভাব, একই সঙ্গে আকর্ষণ-বিকর্ষণ দুয়েরই কারণ এমন এক বিদেশী সংস্কৃতির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান পরিচিতি, এবং নতুন নতুন সব আন্দোলন, যার মধ্যে সামাজিক রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যগত বিশ্বাস ভাঙবার সচেতন প্রয়াস ছিল। এই পরিবর্তন সচেতন প্রয়াসের ফলেই হোক বা নৈর্ব্যক্তিক প্রভাবেই হোক, তাদের সামাজিক এবং জ্ঞানের জগতে এক ধরনের সর্বব্যাপী উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। সেই উদ্যোগ কখনও কখনও প্রায় বাতিকের পর্যায়ে পৌঁছেছিল—যথা : ব্যাপকতম অর্থে ইউরোপীয় সংস্কৃতির মূল্যায়ন করে তাকে গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয় বলে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেই হোক আর আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনের প্রসঙ্গেই হোক, সর্বক্ষেত্রেই পশ্চিমের উদাহরণ ব্যবহৃত হয়েছে। কখনও মনে হয়েছে যে পশ্চিমী সভ্যতা যেন মানব সংস্কৃতির চরমোৎকর্ষের সুদুর্লভ আদর্শ, এক হীনমান পরাধীন জাতির পক্ষে যেখানে পৌঁছানো কখনই সম্ভব নয়। আবার কখনও আত্মগৌরব ঘোষণার আবেগে ইউরোপীয় রীতিনীতিকে নিতান্তই নিকৃষ্ট বলা হয়েছে, সুমহান হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে যার কোনো তুলনাই চলে না। কখনও আবার সুচিন্তিত বিচারের ভিত্তিতে ভারতীয় জীবনধারার প্রেক্ষিতে যা গ্রহণযোগ্য সেটুকুই গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এইসব মূল্যায়নে কিছুটা বিদেশী বিদ্বেষের ছাপ রয়েছে। তার মূলে ছিল বিদেশী শাসনের প্রতি বিদ্বেষ, ভারতবাসী ইংরাজের ঔদ্ধত্যে যা তীব্র হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য সভ্যতা নিয়ে এই নিরবচ্ছিন্ন আলাপ-আলোচনার প্রধান ফল এ সম্পর্কে সাধারণের মনে কতগুলি পরস্পরবিরোধী মামুলি ধারণা। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হিসাবে তাদের মূল্য যাই হোক, বাঙালির সমাজ চিন্তা এবং রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে এই ধারণাগুলির প্রভাব বহুপ্রসারী।

এইসব ছাঁচে-ফেলা ধারণাগুলি উন্নতমানের যুক্তিভিত্তিক বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণের ধারার পাশেই বিরাজমান ছিল। দুয়ের পারস্পরিক প্রভাবও গভীর। পরবর্তী ধারাটির উৎস পাওয়া যায় আধুনিক ভারতীয় চিন্তাধারার জন্মলগ্নে—রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর সমসাময়িকদের যুগে। শুধু জ্ঞানের আগ্রহেই নয়, বরং গুরুতর সামাজিক উদ্দেশ্যেই এই ধারার সূচনা হয়েছিল। এই চিন্তাধারার লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্যের কাছ থেকে ভারত কী কী নিতে পারে তার সন্ধান। পাশ্চাত্য জীবনধারার কোন কোন অংশ সর্বতো পরিত্যাজ্য তার আলোচনাও সমান গুরুত্ব দিয়ে করা হত। বলা বাহুল্য, এই প্রচেষ্টা সরাসরি আদর্শ-নিরপেক্ষ কেতাবী বিশ্লেষণ নয়। লেখকের নিজস্ব আদর্শবাদের যুক্তিতেই যেমন তাঁর সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হত, তেমনি হত তাঁর মূল্যায়নের বিষয়-বিশেষ নির্বাচন। গভীর পাণ্ডিত্য এবং প্রখর বুদ্ধিমত্তা সহকারে নৈর্ব্যক্তিক সত্য সন্ধান প্রচেষ্টার অবশ্য ত্রুটি ছিল না।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনা কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং নির্দিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে তা প্রকাশ পাচ্ছিল। ভারতের অতীত, বিশেষত মহান হিন্দু ঐতিহ্যে গৌরববোধ এই বিকাশমান চেতনার এক বিশিষ্ট অঙ্গ। হিন্দু অতীতে নবসৃষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌরববোধকে ভিত্তি করে সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা মাঝে মাঝে অদ্ভুত আকার নিত। বাঙালি হিন্দু এলিট গোষ্ঠী শাসক জাতির তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার যে মানসিক প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন তারই চূড়ান্ত প্রকাশ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলন। ঊনবিংশ শতকের বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে, সঠিক অর্থে "পুনরভ্যুত্থান আন্দোলন" কথাটি মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী পরিচালিত একটি বিশেষ প্রচেষ্টার প্রতি প্রযোজ্য। তাঁদের গতানুগতিকতার প্রতি ভক্তি সহজাত না অনেকাংশে কৃত্রিম, বর্তমান গ্রন্থের মূল অংশে এই বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও এই আন্দোলন বেশিদিন টেকেনি। সমসাময়িক কৃষ্টি-নেতারা এই আন্দোলনের হাস্যকর দিকগুলি থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিলেন, যদিও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত অনেকেই এই আন্দোলনের কয়েকজন নেতার প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু হিন্দু অতীত নিয়ে গৌরববোধ এবং সেই গর্ব-সঞ্জাত শক্তিশালী জাতীয় চেতনা সে যুগের চিন্তাজীবনে এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। সমসাময়িক কোনো বাঙালি-হিন্দু নেতা, লেখক অথবা প্রবক্তাই এই হিন্দুত্বের গর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারেননি।

বর্তমান গ্রন্থে যে তিনজন মনীষীর ইউরোপ চিন্তা আলোচনা করা হল, তাঁরা সকলেই সে যুগের এই দুই পরস্পর সম্পৃক্ত ভাবধারায় গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদী আদর্শের বিকাশেও তাঁদের অবদান স্মরণীয়। তিনজনেই অন্যান্য আলোচনার মধ্যে হিন্দু জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা এবং উপস্থাপনার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, যদিও আমি তাঁদের কাউকেই "পুনরভ্যুত্থানবাদী" বলে বর্ণনা করতে রাজি নই।

AMARBOI.COM

আমার এই তিনজন চিন্তাবিদকে বেছে নেওয়ার অনেক কারণ আছে। প্রথমত, পাশ্চাত্য সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্যে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগের ফলে এমন পরিপূর্ণতা, গভীরতা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখা যায়, যেমনটি ঐ শতকের অন্য কোনো এশিয়াবাসীর রচনায় আমি পাইনি। অবশ্য এই মূল্যায়ন সম্পূর্ণ ভুলও হতে পারে কারণ আমার পঠন তো অন্যের লেখা এবং অনূদিত গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু তুলনা যদি ভুলও হয়, এই গ্রন্থে আলোচিত রচনাসমূহের বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। অন্য যে বাঙালি লেখক সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারতাম, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিংশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত ইউরোপ সম্বন্ধে তার ভাবনা-চিন্তার বিবর্তন ও বিকাশ হয়েছিল। এই গ্রন্থের সময়কাল ঊনবিংশ শতকে সীমাবদ্ধ রেখেছি বলে আমি শেষ পর্যন্ত অতৃপ্তি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ-কৃত পাশ্চাত্যের মূল্যায়ন বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার বাছাইয়ের দ্বিতীয় কারণ হল বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে এই লেখক-ত্রয়ীর প্রভাব। ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের প্রধান প্রবক্তারূপে ভূদেব, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এবং চিন্তাবিদরূপে বঙ্কিম, এবং "দেশপ্রেমী-সন্ন্যাসী" বিবেকানন্দ, যাঁর আবেগাপ্লুত উপদেশাবলী বহু প্রজন্মের আদর্শবাদী যুবকদলকে অনুপ্রাণিত করেছে—ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে সাংস্কৃতিক নেতারূপে এঁরা ছিলেন সকলের শ্রদ্ধেয়। তাঁদের লেখার একটা বিশেষ মূল্য ছিল। ইউরোপকে তাঁরা যেমন বুঝেছিলেন, সেই উপলব্ধি বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হয়ে গিয়েছিল, এমনকি একঘেয়ে মামুলী জনপ্রিয় রচনাগুলিকেও প্রভাবান্বিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল। বিশেষ করে এই তিনজনকে বেছে নেওয়ার তৃতীয় কারণ হল, একদিক থেকে দেখলে তাঁরা তিনজনই একই সামাজিক পটভূমি থেকে এসেছিলেন। তাঁরা সবাই উচ্চবর্ণের হিন্দু, নবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার সৃষ্টি। বই পড়ে তাঁরা ইউরোপকে জেনেছিলেন এবং প্রায় একই ধরনের রচনা তাঁরা সবাই পড়েছেন। তাঁদের আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গিতেও একটা মৌলিক মিল ছিল। দুই ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির যোগাযোগ এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে শক্তিশালী সংস্কৃতির প্রতি ইতিবাচক-নেতিবাচক দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া—এই একই ঐতিহাসিক ঘটনা-সন্নিবেশে তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগে উঠেছিল। ফলত, একেবারে এক না হলেও তাঁদের প্রশ্নগুলি ছিল একই ধরনের। তবে সেই সব প্রশ্নের উত্তর তাঁরা একভাবে দেননি। সামাজিক পটভূমি এবং ইতিহাসের দৃষ্টিতে তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা একরকম হলেও এই তিনজন অতি প্রতিভাবান পুরুষ ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে নিজের নিজের বিশিষ্ট এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করেছেন।

এই পুস্তকের একটি উদ্দেশ্য হল—উনবিংশ শতকের ভারতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যে সব জটিল এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ মূল্যায়ন হয়েছিল, তারই উদাহরণরূপে এঁদের চিন্তাধারার উপস্থাপনা। এশিয়া সম্বন্ধে ইউরোপে চিন্তা ও বিশ্লেষণ, এমনকি চীন, জাপান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আরব জগতে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিষয়ে ধারণা নিয়ে যে বিশাল পরিমাণ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, সেই তুলনায় পাশ্চাত্য সম্বন্ধে ভারতীয়দের ধারণা বিষয়ে প্রায় কিছুই লেখা হয়নি। আমার আশা এই বইখানি সেই শূন্যস্থান কিছুটা পূর্ণ করবে।

আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, মূল্যায়নে বৈচিত্র্যের উৎস যে ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতা এবং জীবনের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির যোগাযোগ এবং ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। স্পষ্টতই, সংস্কৃতি অথবা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত কোনটিই এক অভিন্ন ধারা সৃষ্টি করতে পারে না। উচ্চবর্ণ বাঙালি হিন্দু ঐতিহ্যের আপাত-সীমিত গণ্ডির মধ্যেও উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা থাকে। নিখুঁতভাবে আচার পালন করেন এমন একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে শাক্ত কিন্তু আবার মোগলাই খানার ভক্ত উচ্চপদে আসীন ব্যক্তির জীবনের অভিজ্ঞতায় যে পার্থক্য সে যেন দুই জগতের তফাত। ঔপনিবেশিক শাসনের কাঠামোর মধ্যেই নানা বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা। যে মাঝারি পদের আমলার সঙ্গে ইউরোপীয় প্রভুদের নিয়তই খটমটি, ব্রিটিশজাতির সম্বন্ধে তাঁর যে মনোভাব, তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতমণ্ডলী ও বিত্তশালিনী মহিলাদের শ্রদ্ধাভিষিক্ত খ্যাতনামা সন্ন্যাসীর মনোভাবের পার্থক্য থাকবেই। তাছাড়া, অসম্পূর্ণ হলেও ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে আধুনিকতার যে উপকরণ ছিল তাতে ব্যক্তি-মানসের ব্যাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। ভূদেব, বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দর মধ্যে ব্যক্তি হিসাবে যে পারস্পরিক প্রভেদ তার তুলনা অল্পই চোখে পড়ে। শেষ কথা, সময়ানুক্রমে তাঁরা সবাই সমসাময়িক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সে সময় ইতিহাসের গতি ছিল দ্রুত, এবং বঙ্কিম ভূদেবের থেকে মাত্র বারো বছরের ছোট হলেও মানসিকতায় তাঁরা ছিলেন দুই প্রজন্মের। যখন ইংল্যান্ডের রানী তথা পার্লামেন্ট ভারত শাসনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন ভূদেব অভিজ্ঞ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এবং বঙ্কিম উনিশ বছরের অকালপক্ক যুবক। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় ভূদেব কোম্পানির শাসনকে অনেক বিষয়ে রাজ-শাসনের তুলনায় শ্রেয় মনে করতেন। অন্যান্য বহু ঘটনার মধ্যে নীল-বিদ্রোহ এবং ইঙ্গ-ভারতীয়দের ইলবার্ট বিল বিরোধী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিদ্বিষ্ট প্রতিক্রিয়া গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ ভূদেবের মতই ভারতে ব্রিটিশ জাতির উপস্থিতির মধ্যে তিনি একটা পরোক্ষ মঙ্গলের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনকে পুরোপুরি বর্জন করার ক্রমবর্ধমান মানসিকতার প্রকাশ বিবেকানন্দর মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর মার্কিন শ্রোতৃমণ্ডলী বুঝেছিল যে শুধুমাত্র একটি প্রসঙ্গেই তিনি তাঁর স্বাভাবিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতেন, সেটি হল ভারতে ব্রিটিশ শাসন। এই গ্রন্থের প্রধান তিনটি অধ্যায়ের দুটি করে অংশ আছে। প্রথম অংশে ইউরোপের মূল্যায়নে চিন্তানায়কদের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের সূত্র তাঁদের ব্যক্তি জীবনের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশের মধ্যে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাঁদের চিন্তার বিশেষ বিশেষ অংশের সূত্র কোনও বিশেষ অভিজ্ঞতার ভিতর পাওয়ার চেষ্টা করিনি। উপাদানের প্রকৃতি অনুযায়ী আমি তাঁদের চিন্তাধারা আলোচনা করেছি। 'সামাজিক প্রবন্ধে' ভূদেব দৃঢ়সম্নিবিষ্ট যুক্তি সহকারে পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনা করেছেন। এই প্রধান রচনাটিতে তাঁর ভাবের বিন্যাস অনুসরণ করে, অন্যান্য রচনা থেকে উপাদান এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে তার পরিপূরণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছি। উপন্যাস, হালকা নিবন্ধ, তাত্ত্বিক প্রবন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের রচনায় বঙ্কিমের বক্তব্য ছড়িয়ে আছে। তাঁর ক্ষেত্রে এবং বিবেকানন্দর ক্ষেত্রেও, উপাদানের চরিত্র এক ধরনের হলেও এক একটা বিষয়বস্তু ধরে আলোচনাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। বিবেকানন্দর বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্তটি ছাড়াও, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনা নিয়েই তাঁর অন্যতম রচনা। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা ছড়িয়ে আছে ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা সযত্নরক্ষিত তাঁর কথোপকথন এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের ভিতর। শুধুমাত্র আধুনিক ভারত অথবা বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের কথা ভেবেই এই বই লেখা হয়নি, কারণ এর বিষয়বস্তুতে অন্যান্য বিষয়ে অনুসন্ধানী পাঠকরাও আগ্রহ বোধ করতে পারেন। সেই কারণেই, ভারতবর্ষের বা বাংলার ইতিহাস বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে তুচ্ছ মনে হতে পারে এমন অনেক তথ্য বিষয়টা বুঝতে সাহায্য করতে পারে ভেবে উল্লেখ করেছি। অবশ্য এই বিষয়ের ছাত্রদের কাছে সুপরিজ্ঞাত তথ্য সম্পর্কে আমি কোনো প্রমাণ-পঞ্জী নির্দেশ করিনি। সেকারণে 'পশ্চাদপট' শীর্ষক অধ্যায়টিতে পাদটীকার সংখ্যা খুবই কম।

বাঙালি রীতি অনুসারে এই বইতে আলোচিত লেখকদের ক্ষেত্রে আমি তাঁদের প্রথম নাম ব্যবহার করেছি। যেখানে মুখার্জী, চ্যাটার্জী আর দত্ত'র ছড়াছড়ি, সেখানে এই রীতিই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং নরেন্দ্রনাথের জায়গায় আদ্যাংশ বঙ্কিম এবং নরেন ব্যবহার করেছি। এই সংক্ষেপকরণ শিষ্টাচারবিরোধী হবে না বলেই মনে করেছি। একই লেখকের বিভিন্ন রচনার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছি, কারণ সব রচনার একই সংস্করণ যোগাড় করা সম্ভব হয়নি।

একটি হাস্যকর ব্যাপার উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিয়ে বিভিন্ন দেশে বক্তৃতা দেবার সময় আমি এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছি। যে সব লেখকের মতবাদ আমি আলোচনা করেছি, সেগুলি যেন আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজস্ব মতবাদ, এমনভাবে আমাকে সেগুলির যাথার্থ্য প্রমাণ করতে আহ্বান করেছেন শ্রোতৃমণ্ডলী। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার উচ্চশিক্ষিত। কলকাতার একটি কাগজ আমার এক বক্তৃতায় উল্লিখিত বাঙালিদের সম্বন্ধে বঙ্কিমের একটি কটূক্তি উদ্ধার করে তা আমার বলে চালিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার এক শহরে জনৈক শ্রোতা খ্রিস্টধর্মের সমালোচনায় বিবেকানন্দ অবিচার করেছেন বলে আমার প্রতি গালিবর্ষণ করেন। মধ্যযুগে ইউরোপীয়দের ভূদেব-বর্ণিত উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসঙ্গে, আমার এক বন্ধু পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পড়ে তার বোম্বেটে পূর্বপুরুষদের কথা বারবার সশ্লেষে উল্লেখ করেন। এইসব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা প্রয়োজন যে, এই বইতে উদ্ধৃত ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের সম্বন্ধে যাবতীয় মন্তব্য সম্পর্কে আমার কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। আমার আলোচ্য লেখকদের হয়ে ওকালতি করতে বসিনি আমি। আর তাছাড়া তাঁরা তো সবাই লোকান্তরে গেছেন প্রায় একশ বছর আগে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১
পশ্চাৎপট

এই গ্রন্থের নাম—ইউরোপ পুনর্দর্শন—গ্রন্থে আলোচিত রচনাগুলির পূর্বগামী মূল্যায়নের প্রতি ইঙ্গিতময়। পূর্বযুগের মূল্যায়নগুলি যে ভূদেব, বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দর মতবাদের তুলনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রশংসামূলক ছিল সে কথাও এই নামের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই, যেমন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিংবা, ভারতীয়দের মধ্যে সে যুগে ইংল্যান্ডে যিনি সবচেয়ে খ্যাতিমান সেই ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী প্রতাপ মজুমদার প্রমুখ অনেকেই ইউরোপীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে একরকম অবিমিশ্র শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন। অবশ্য পূর্বকালীন সব মূল্যায়নই যে সর্বাংশে অনুকূল, এমন কথা বলা চলে না। যে সব বক্তব্য এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু, সেগুলি অবশ্য ইউরোপ সম্বন্ধে সমকালীন বা পূর্বযুগীয় সব ভারতীয় মতবাদের থেকে নানাভাবে আলাদা। প্রথমত বস্তুনিষ্ঠ হোক বা নাই হোক, এইসব সুচিন্তিত, যুক্তিগ্রাহী মন্তব্য পঠন এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আহৃত বিপুল উপাদানে সমৃদ্ধ। এই মতামতগুলি টুকরো টুকরো মন্তব্যের সমষ্টি নয়, সুচিন্তিত তত্ত্বসন্ধানের অভিব্যক্তি। এর মধ্যে দিয়ে ইউরোপ প্রসঙ্গে একটা জ্ঞানদীপ্ত আত্মপ্রত্যয়ের প্রকাশ। বেশ কয়েক দশকের সম্পর্কের ফলে গড়ে ওঠা বিদেশী ও স্বদেশী অভিজ্ঞতা এই আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষয়ে জ্ঞান আর তখন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের একচেটিয়া সম্পত্তি না, বিভিন্ন স্তরে সমকালীন বাঙালির উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতির অংশ। দ্বিতীয়ত, ভারতের ইংরাজিভিত্তিক শিক্ষার সমর্থকরা বা সংস্কারবাদী বিদ্যাসাগর ভারতীয় দর্শন এবং সংস্কৃত-ভিত্তিক কৃষ্টির বেশিরভাগই নিরর্থক বলে বর্জন করে প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে পাশ্চাত্যের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছিলেন। আমাদের আলোচ্য চিন্তাবিদরা সেই শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রথমোক্তদের মতে, 'কার্যকরী জ্ঞান' শুধু ইউরোপ থেকেই পাওয়া সম্ভব ছিল। এই ধারণার বিরুদ্ধে সর্বকালেই প্রশ্ন উঠেছে, কিন্তু যুক্তি দিয়ে তা পুরোপুরি খণ্ডন করার কথা শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, যে সব রচনার কথা এই বইতে আলোচিত হয়েছে, সেখানেই ব্যক্ত করা হয়েছে। সর্বশেষে, ইউরোপ সম্বন্ধে এই তিনজন চিন্তাবিদ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেছেন বটে, কিন্তু যে সব প্রশ্ন তাঁরা তুলেছেন এবং তার উত্তর যে ভাবে দিয়েছেন, তার মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবাদী মানসিকতার পরিবেশ প্রতিফলিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয়তাবাদী চেতনা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছিল এবং তার ছাপ তাঁদের যাবতীয় রচনায়। এই নতুন চেতনার বিবর্তন এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান পরিচয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে একটা মানসিক উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল। ইতিমধ্যে ঔপনিবেশিক বাংলার নবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তার 'বেনিয়ানে'র খোলস থেকে বেরিয়ে আমলা, বৃত্তিজীবী, জমিস্বত্বভোগী প্রভৃতি বিদেশী শাসনের সহযোগিতার বিচিত্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারাই আবার পাশ্চাত্য জ্ঞানের, বিশেষত মানবিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানের উৎসাহী শিষ্য হয়েছিল। নতুন ধরনের ইস্কুল-কলেজের[1] প্রথম যুগের ছাত্ররা অপরিজ্ঞাত জ্ঞানলাভের সুযোগ পেয়ে সেই জ্ঞান এবং বলা বাহুল্য, তার মূলে যে সভ্যতা তার প্রতি প্রায় অবিমিশ্র শ্রদ্ধা বোধ করত। 'সমাজে'র উন্নতির চিন্তায় এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যে সদ্য বিকশিত গৌরব বোধে বিশ এবং ত্রিশের দশকের যে উদীয়মান জাতীয়তাবোধের প্রকাশ, ঔপনিবেশিক শাসন সামগ্রিকভাবে মেনে নিতে তার কোনো আপত্তি হয়নি। রাজপুরুষদের যথেচ্ছ এবং অন্যায় ব্যবহারের সমালোচনা অবশ্য ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছিল। মাতৃভূমির পরাধীনতা নিয়ে ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্ররা কখনও কখনও রোম্যান্টিক উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তবে যুগের প্রধান ধারা সাগ্রহ আনুগত্যের তুলনায় এ সব অশান্তির চিহ্ন তুচ্ছ ব্যতিক্রম মাত্র।

বিদেশী শাসককুল এবং তাদের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার কয়েকটি সামাজিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধক ছিল। সতীদাহ প্রথা নিবারণের মত সামাজিক রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ করে বিদেশী সরকারের আইনপ্রণয়ন সবাই সুনজরে দেখেনি। এই ধরনের সংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণার মনোভাব, তাকে বর্বরতা আখ্যাদানের ইঙ্গিত আপত্তিজনক মনে হয়েছিল। এবং এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আত্মসমর্থনের চেষ্টা। তাছাড়া, উদার মানবতাবাদী মতবাদ এবং তার ফলে যুক্তিবিরোধী সামাজিক রীতিনীতি এবং সংস্কার পরিহারের প্রবণতা দীর্ঘদিনের প্রচলিত ঐতিহ্য ও আচার ব্যবহারকে বিশেষ নড়াতে পারেনি। পাশ্চাত্যপ্রথায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশের মধ্যে প্রচলিত প্রথাসমূহ বর্জন করার চেয়ে মেনে চলার প্রবণতাই বেশি জোরদার ছিল। ফলত, বিতর্কিত প্রথাগুলির যৌক্তিকতা দেখিয়ে আত্মসমর্থনের প্রচেষ্টা বেড়ে উঠেছিল। খ্রিস্টিয় ধর্মযাজকরা হিন্দুদের সবকিছুরই সমালোচনা করতেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা 'অমার্জিত এবং অজ্ঞানতা-প্রসূত'[2] হওয়ায় খ্রিস্টধর্ম-বিরোধী এক মনোভাব দেখা দিয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই তা ছিল প্রচ্ছন্ন ইউরোপ-বিদ্বেষ। যখন থেকে আত্মগৌরববোধ এবং সমাজ-সংস্কারের প্রয়াস দেখা দিয়েছে, প্রায় তখন থেকেই জাতীয়তাবাদের নেতিবাচক দিক বা বিদেশ-বিদ্বেষের সূচনা হয়েছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে পারে, এই সম্ভাবনা কেউই সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি।[3] দীর্ঘদিন-অবহেলিত হিন্দুসমাজকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার অনেক ব্যস্ত-সমস্ত প্রচেষ্টারই জন্ম ব্রিটিশ শাসনের আওতায় খ্রিস্টধর্মপ্রচারের ভীতি থেকে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে, হিন্দু অতীত এবং ঐতিহ্যে গৌরববোধ উদীয়মান জাতীয়তাবোধের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিল। তবুও, উনবিংশ শতকের সত্তরের দশকেও, ভারত যে এক জগৎজোড়া গৌরবোজ্জ্বল সাম্রাজ্যের অংশ তা নিয়ে গর্ব এবং বৃটেনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহান নির্দেশনায় ক্রমিক উন্নতির আশা জাতীয়তাবাদীদের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। হিন্দুত্বের গর্ব এবং হিন্দু সংস্কৃতির জঘন্যতম সমালোচকদের সঙ্গে যারা অভিন্ন, তাদের শাসনব্যবস্থায় আস্থা—এই দুই মনোভাবের অসঙ্গতি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রথম দিকে স্পষ্ট বোধ হয়নি। তাছাড়া সব দেশপ্রেমীই হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি নির্বিচারে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন না। নতুন জ্ঞানের ধারক সংশয়বাদী, ব্রাহ্ম এবং হিন্দু সংস্কারবাদী, এবং সত্তরের দশকে কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদী শিষ্যগণ প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির অনেক কিছুই বর্জনীয় বলে মনে করেছিলেন। তা সত্ত্বেও আবার রাজনারায়ণ বসুর মত একনিষ্ঠ ব্রাহ্ম সর্বসমক্ষে সব ধর্মের উপর হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে লজ্জাবোধ করেননি।[৪] এমনকি হিন্দু কলেজের আদিযুগ থেকে যার শুরু (যদি না আরও পিছনে গিয়ে নব্যন্যায়ের যুগের কথা বলা যায়) বাঙালি মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির সেই ধর্মনিরপেক্ষ-অজ্ঞেয়বাদী প্রবণতাকেও হিন্দু ঐতিহ্য এবং তার সমাজ-বিন্যাসকে ঘিরে সৃষ্ট অস্পষ্ট জাতীয় চেতনা গ্রাস করে নিয়েছিল।

সুতরাং জাতীয় চেতনার সাংস্কৃতিক পটভূমির সাধারণ লক্ষণ ছিল হিন্দু ঐতিহ্যের কয়েকটি বিশেষ অঙ্গ ও আঙ্গিকের প্রতি শ্রদ্ধা। শাসকজাতির ঐতিহ্যের কয়েকটি বিশিষ্ট উপাদানের প্রতি একই রকম শ্রদ্ধা খুব স্বাভাবিকভাবে না হলেও হিন্দুত্বে গৌরববোধের সঙ্গে সহাবস্থান করত। নবজাত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কতটুকু অংশ পাশ্চাত্য ঐতিহ্যকে অনন্য বলে মনে করত এবং সজ্ঞানে বা পরোক্ষে মেনে নিয়েছিল যে তুলনীয় উন্নতি ভারতের পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হবে না, তা হিসাব করার মত যথেষ্ট উপকরণ পাওয়া যায়নি। তবে সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে বলা যায় যে এই মনোভাব প্রায় সর্বব্যাপী ছিল। রাজনৈতিক প্রভুত্বই পশ্চিমের শ্রেষ্ঠত্বের যথেষ্ট প্রমাণ। সেই ক্ষমতা তাদের ভৌতিক এবং বুদ্ধিগত উৎকর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হত। ইউরোপের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন এবং সে তুলনায় স্বল্প-পরিচিত বিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান নিয়ে যে উত্তেজনা জন্মলাভ করেছিল তা ছিল গভীর এবং সর্বব্যাপী। যদিও মুষ্টিমেয় যে কজন উচ্চশিক্ষার গণ্ডিতে প্রবেশ করতে পারত শুধুমাত্র তাদেরই পাশ্চাত্য জ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হত। উচ্চবর্ণের মুষ্টিমেয় মানুষের মাধ্যমে শিক্ষা সমাজের বৃহত্তর পরিধিতে ছড়িয়ে পড়বে—মেকলের এই তত্ত্ব কার্যকরী হয়নি। কিন্তু স্বল্পসংখ্যকের আয়ত্ত জ্ঞান বহুজনের শ্রদ্ধার উপলক্ষ হয়েছিল। বাঙালি ঐতিহ্যে পাণ্ডিত্যকে চিরকালই সম্মান দেওয়া হয়েছে। তাই নতুন জ্ঞানের অধিকারী পণ্ডিত সম্প্রদায়ও সম্ভ্রমের পাত্র হয়েছিলেন। এই নতুন জ্ঞান এবং তার উৎস ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার পশ্চিম সম্পর্কে বহুল-প্রচলিত মামুলী ধারণাগুলিকে প্রভাবিত করেছিল।

ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি এবং তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে রাজনৈতিক প্রভুত্ব এবং উপনিবেশের বুদ্ধিজীবীদের পারবশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধার ব্যাখ্যা করার প্রবণতা দেখা যায়। দেশীয় সমাজে এই শ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকা অসম্পূর্ণ ছিল। তারা সর্বশ্রেণীর সম্মতিসাপেক্ষ একটা রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় সমাজের মৌল পরিবর্তনেরও প্রচেষ্টা দেখায়নি, সেই ব্যর্থতা তাদের হীনম্মন্যতার কারণ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে ইউরোপের আফ্রো-এশিয় উপনিবেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের যে সব দুর্বলতা ছিল,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষত জাগরণের প্রাথমিক পর্বে, এই ব্যাখ্যায় সেগুলির উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। অন্য এক দল তাত্ত্বিকের মতে আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবাদের ধারণাই এসেছিল উনবিংশ শতকের ইউরোপ থেকে। সেই আদর্শ বর্তমান-সভ্যতার স্রষ্টাদের তুলনায় নিজেদের অসারতাবোধের ফলও বলা যায়।[৫] এই সব আলোচনায় ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের অংশগুলিকে বুঝে বা না বুঝে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ভাল দিকগুলিকে নিয়ে একটা কল্পিত চেহারা সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং এ বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য নয়। আফ্রো-এশিয় জাতীয়তাবাদের স্বজাত এবং ইতিবাচক উপাদানগুলি—তারা যে সব নতুন আদর্শ এবং মানুষের প্রগতির নতুন মাপকাঠি রচনা করতে চেয়েছিল—এই তত্ত্বের অংশ নয়। তৃতীয় জগতের জাতীয়তাবাদের এই নেতিবাচক বিশ্লেষণ কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল নয়। এর কেন্দ্রে যে আংশিক সত্য আছে তাকে অস্বীকার করা চলে না।

দুর্বল এবং পরবশ বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী স্বতঃই প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তবে বিজেতার ঐতিহ্যের প্রতি সানুরাগ শ্রদ্ধা শুধু পরাধীনতারই ফল নয়। এই প্রতিক্রিয়া সর্বকালেই সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ইতিহাসে চোখে পড়ে। শুধুমাত্র ক্ষমতার বৈষম্যের ফলেই এই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। এক সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা মানুষ অন্য সভ্যতার কোন অংশটিকে পছন্দ করবে তা শুধু মূল্যবোধের বিবর্তন এবং বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিই নির্ধারণ করতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পাশ্চাত্যধারায় শিক্ষিত বাঙালিদের প্রথম প্রজন্ম ইউরোপে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং জ্ঞানদীপ্তির উত্তরকালীন যুক্তিবাদের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যদিও উনবিংশ শতকের ইউরোপের সংস্কৃতির উপাদান শুধু ঐগুলিই নয়। আবার দেখি, তাঁদের আদর্শ ছিলেন ম্যাৎসিনি এবং গ্যারিবল্ডি, বিসমার্ক নয়। হিন্দু ধর্মের মত প্রতীক-ধর্মী আচার-অনুষ্ঠানময় রোমান ক্যাথলিক মতবাদ নয়, যুক্তি ও সংশয়বাদী দর্শনই বহু মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। অপর পক্ষে, ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের বিশিষ্ট অঙ্গ—আগ্রাসী যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্য বিস্তারকে উনবিংশ শতকের বাঙালিরা সকলেই ঘৃণার চোখে দেখত। এক দিকে এই প্রত্যাখ্যানের মনোভাব, তার পাশেই সম্পূর্ণ অসমঞ্জসভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে সপ্রশংস বিস্ময়ের অনুভূতি, যদিও সেই সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল অনেক নির্মম এবং আগ্রাসী যুদ্ধের ফলে।

এমনও অনেক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র ছিল যেখানে ক্ষমতার কোনো সম্পর্কই নেই। বঙ্কিম যে কালিদাসের তুলনায় শেক্সপীয়রকে পছন্দ করতেন নিঃসন্দেহে তার সূত্র আছে তাঁর শিক্ষা এবং তার মাধ্যমে গড়ে ওঠা রুচির মধ্যে। কিন্তু এক্ষেত্রে শাসককুলের সঙ্গে সম্পর্কে হীনম্মন্যতার প্রশ্নই উঠছে না। তিনি এবং বিবেকানন্দ, উভয়েই যে নান্দনিক বিচারে ভারতীয় ভাস্কর্যের দৈন্যের কথা বলেছেন এবং গ্রীক শিল্পরীতির প্রশংসা করেছেন, সেক্ষেত্রেও ঐ মন্তব্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ বিদেশী সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ অঙ্গের প্রতি আকর্ষণ যে কেবলমাত্র প্রভুত্বের কারণে, তা নয়, যদিও রাজনৈতিক প্রভুত্বের ফলে তা জোরদার হতে পারে। কিন্তু প্রভুত্বের ফলে প্রত্যাখ্যান এবং বিদ্বেষের স্পৃহাও দেখা দিতে পারে। এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের সহাবস্থান অনেক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেন দ্বৈত মানসিকতার প্রকাশ বলে। বোধহয় পূর্বোক্ত অন্যরকম ব্যাখ্যাই বেশি যুক্তিগ্রাহী। একটি সভ্যতা অন্য একটি সভ্যতার থেকে কী গ্রহণ করবে, কী-ই বা প্রত্যাখ্যান করবে, তা নির্ধারিত হয় সময় এবং পরিস্থিতির যোগসাজসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাজিত জাতির জীবনে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে যে হীনম্মন্যতা জন্মায় তা সম্ভব অসম্ভব অনেক ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্কিমের দৃষ্টিতে সর্বস্তরে ব্রিটিশ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং বাঙালির অপদার্থতা এই সর্বব্যাপী হীনম্মন্যতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কিন্তু ঐ উন্নততর ঐতিহ্যের মূল্যায়ন কোনোসময়েই এক সুরে বাঁধা ছিল না। এ বিষয়ে মত বৈচিত্র্যের সীমা নেহাত ছোট নয়। পিতৃপুরুষের ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্ক এবং বিদেশী ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়ের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা মিলিয়ে ব্যক্তিচেতনায় ঐ সভ্যতা বিচারের কাঠামো তৈরি হয়। এই গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য হল, ইউরোপ সম্বন্ধে ভারতীয়দের মনোভাবের বৈচিত্র্যের প্রবণতাগুলিকে খুঁজে বার করে ব্যাখ্যা করা। বিদেশী শাসিত দেশে দুই ঐতিহ্যের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় এক পক্ষের ক্ষমতার একাধিপত্য আর অন্যপক্ষের ক্ষমতাহীনতার পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায়। এতে বিচার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও, ভাবের আদান-প্রদান যখন অনুঘটকের কাজ করে তখন প্রায়শই তা স্বয়ংক্রিয় শক্তিরূপে। পাশ্চাত্য সম্বন্ধে বিজিত ভারতীয়র সব প্রতিক্রিয়াকে হয় ক্রীতদাসসুলভ প্রশংসাপরায়ণতা, না হয় বিদেশ-বিদ্বেষী প্রত্যাখ্যান—এই দুই মেরুমণ্ডলে ভাগ করা যায় না। যুক্তি এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ মূল্যায়ন অনেক পাওয়া যায়। সেগুলি কোনোভাবেই কোনো উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়।

যে কোন পরিবেশে ব্যক্তিগত মতামত গড়ে ওঠার পেছনে দুটি শক্তি কাজ করে। একদিকে দীর্ঘস্থায়ী এবং কতকটা অনমনীয় সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো এবং অন্যদিকে অবিন্যস্ত, পরিবর্তনশীল পরিবেশের ধোঁয়াটে প্রভাবে। ঔপনিবেশিক কাঠামো সব বুদ্ধিজীবীদের জীবনেই প্রায় একই রকমের প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন পদগুলি থেকে বঞ্চিত থাকা, সীমাবদ্ধ সুযোগে আইন ব্যবস্থার অঙ্গীভূত জাতিবৈষম্য এবং ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী অর্থনীতি—এগুলি তাঁদের সবারই অভিজ্ঞতার অঙ্গ। কাঠামোগত বিরূপ অভিজ্ঞতার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সমালোচনা এবং প্রতিবাদ। অবশ্য সেক্ষেত্রেও অন্যদের তুলনায় ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। তাছাড়া একই ধরনের দুর্ভাগ্যের প্রতিক্রিয়া একজন স্থিতধী এবং একজন রগচটা ব্যক্তির পক্ষে এক হয় না।

পরিবেশের প্রভাবের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য ছিল আরও ব্যাপক। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়া এক ধারায় গড়ে তো ওঠেইনি, বরং তার মধ্যেই বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশের সম্ভাবনা ছিল। যে ভারতীয় কর্মচারী সরকারি কাজ করত, কর্মক্ষেত্রে তার ইউরোপীয় সহকর্মীরা বন্ধুভাবাপন্নও হতে পারত, বিদ্বিষ্টও হতে পারত। চাকুরি তার কাছে সন্তোষজনক হতেও পারত, নাও হতে পারত। এইভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় বেড়ে ওঠা দুই ঐতিহ্যের সংযোগ নানাধরনের প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা রচনা করেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত এই যোগাযোগের মাধ্যম হয়েছিল শিক্ষালয়, সভাসমিতি প্রভৃতি, কিন্তু এই সব প্রতিষ্ঠানের গঠন রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মত অনমনীয় ছিল না। ফলে এদের আওতায় পরিবেশবৈচিত্র্য এবং অভিজ্ঞতার হেরফেরের সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। শিক্ষিত বাঙালি যুবক প্রধানত বইয়ের ভিতর দিয়েই ইউরোপকে জেনেছিল। সে যুগে জ্ঞানের জগতের বিশিষ্ট ধারা অনুযায়ী পাশ্চাত্য দর্শনের কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রেই বাঙালির আগ্রহ সৃষ্ট হয়েছিল। তা দিয়ে অবশ্য একজন ব্যক্তি কী ধরনের বই পড়বে, বা কি গ্রহণ করবে, তা নির্ধারিত হত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংস্কৃতিক পরিবেশ এইভাবে একটি সুবিস্তৃত নির্বাচনের ক্ষেত্র রচনা করেছিল। উপনিবেশের কাঠামোর অনিবার্যতার মধ্যে থেকে যে সব প্রশ্ন উঠত, তাদের চরিত্র এক হলেও, একজন ঔপন্যাসিক ও একজন সন্ন্যাসীর মানসিকতায় তাদের প্রতিক্রিয়া হত সম্পূর্ণ আলাদা। এই কারণেই এই গ্রন্থে আলোচিত তিন মনীষীর পাশ্চাত্য সম্পর্কিত বিশ্লেষণও আলাদা আলাদা, সিদ্ধান্তও ভিন্নধর্মী। যদিও, যে ক্ষুদ্র বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী কোনও না কোনও প্রকারে হিন্দু জীবনধারার প্রবক্তা ছিলেন, তাঁরা সকলেই সেই একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিবেকানন্দ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ক্যাথলিক গির্জায় পূজা দিয়েছিলেন। আবার ভূদেব ও বঙ্কিম উভয়ের মতেই খ্রিস্টধর্মীদের দেবতার ধারণা অত্যন্ত বিশ্রী।

দুই ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির যোগাযোগ ঔপনিবেশিক সংগঠনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, তাই দিয়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার বিকাশের প্রধান ধারাগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমলা, বৃত্তিজীবী এবং রাজস্ব আদায়কারী জমি স্বত্বভোগীর একটি ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশ শাসনে উপকৃত এবং নতুন-সৃষ্ট অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অংশ লাভে কৃতার্থ বোধ করছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের জাতীয় চেতনার ভ্রূণে ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচনার লেশমাত্র ছিল না। তাঁদের জগৎ-দর্শনে যে বিদেশ-বিদ্বেষের ধারাটুকু ছিল, তা ছিল নিজেদের ঐতিহ্যগত সংস্কার এবং বিশ্বাসের উপর খ্রিস্টিয় ধর্মযাজকদের আক্রমণের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া। বিদেশীদের সমালোচনার ফলে নিজেদের হিন্দুত্ব সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হয়ে ওঠেন এবং দেশী-বিদেশী সব রকমের সমালোচনার বিরুদ্ধে আত্মসমর্থনের প্রয়োজনও উপলব্ধি করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা এই উদ্বেগেরই বহিঃপ্রকাশ। নবোন্মিষ সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় চেতনার সেই আদি যুগেও আত্মসমর্থনের ধারাটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। ত্রিশের দশকে এই মনোভাবই সতীপ্রথা নিবারণ এবং প্রাচ্যবিদ্যার পরিবর্তে পাশ্চাত্যশিক্ষায় রাষ্ট্রীয় অনুদান বৃদ্ধি সংক্রান্ত নতুন শিক্ষানীতির প্রতিবাদের রূপ নিয়েছিল। ত্রিশের দশকেই প্রথম শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হতে এবং রেভারেন্ড ডাফের ধর্মপ্রচারের ব্যাপক অভিযান দেখা যায়।

যে উদীয়মান জাতীয়তাবাদে হিন্দুত্বের উপর জোর দেওয়া হচ্ছিল, আত্মরক্ষার মনোভাবকে কিন্তু তার একমাত্র তো নয়ই এমনকি প্রধান উপাদানও বলা চলে না। এর প্রধান উপকরণ ছিল গৌরবময় অতীত সম্বন্ধে গর্ববোধ, যার কিছুটা নিশ্চয়ই আদর্শায়িত। কিন্তু অনেকাংশে তা আবার ইউরোপীয় এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণালব্ধ। যুক্তিবাদী অক্ষয় দত্ত কর্তৃক ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' বৈদগ্ধ্য ও শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্যগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য যে নবসৃষ্ট উদারনৈতিক মতবাদের প্রভাবে পঞ্চাশের দশকে বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ করা অথবা বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার আন্দোলনে স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশগুলি উল্লেখ করা হয়েছিল। আরও আগে, পথিকৃৎ রামমোহনও সংস্কার প্রচেষ্টায় শাস্ত্রীয় অনুমোদন দেখিয়েছিলেন। এবং সর্বধর্মসম্মত একেশ্বরবাদী বিশ্বাস নিয়ে তিনি হিন্দু দর্শনের একটি বিশেষ শাখার নতুন ধরনের ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর দ্বিভাষিক পত্রিকার ইংরাজী সংস্করণের নাম ছিল *Brahmanical Magazine*। যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতি-প্রগতিবাদী যুব সম্প্রদায় ত্রিশের দশকে 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং *Enquirer* পত্রিকার মাধ্যমে হিন্দুধর্মের সমালোচনা করছিল, কেবলমাত্র তারাই ব্যতিক্রম। তবে তাদের প্রভাবের গণ্ডি ছিল খুবই ছোট এবং অচিরেই তা আরও সীমিত হয়ে যায়। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে "হিন্দুদের মধ্যে জাতীয় ভাব জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে" নবগোপাল মিত্র যে হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা করেন, ষাট-এর দশকের সচেতন জাতীয়তাবাদ অনেকাংশে তারই সৃষ্টি। নবগোপালেরই ন্যাশনাল পেপার এবং ন্যাশনাল সোসাইটিতে ঐ আত্মসচেতন জাতীয়তাবাদ পরিস্ফুট হয়েছে। ঐ সময়কার সাহিত্য জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় পরিপূর্ণ, তবে সেইসব কাহিনীর বেশিরভাগই লেখা হয়েছিল তুর্কীশাসনের বিরুদ্ধে মধ্যযুগীয় বীরদের প্রতিরোধকে উপলক্ষ করে। হয়ত সমকালীন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, এগুলি সেই বিদ্রোহী মনোভাবের প্রতিফলন। পাশ্চাত্যের প্রেরণালব্ধ প্রাচ্যবিদ্যা সত্তর-এর দশকে আরও বিস্তৃত হয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার ধারা প্রতিষ্ঠা করেছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনবদ্য পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা সেই ধারারই বিশিষ্ট পরিণতি।

পরাধীন জাতির অবশ্যম্ভাবী হীনম্মন্যতা ভারতীয় জীবনধারার অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল। দেশের সংস্কৃতিতে দৃঢ় আস্থা না থাকায় হিন্দু ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিদগ্ধ ইউরোপীয়দের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রচেষ্টা সে যুগের চিন্তার প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ম্যাক্সমূলার কর্তৃক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে সমস্ত আর্যভাষী জাতির উৎপত্তির এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ তত্ত্ব প্রকাশিত হলে অবিশ্বাস্য রকম উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। শ্বেতকায় শাসক জাতি যে অশ্বেতকায় শাসিতের জ্ঞাতি, এই বিশ্বাস পরাধীন এলিট গোষ্ঠীর আহত আত্মাভিমানের উপর বহু-প্রত্যাশিত প্রলেপের কাজ করেছিল। আর্যত্বের ছড়াছড়ি পড়ে গিয়েছিল। পত্রপত্রিকা থেকে শুরু করে রাস্তার ধারের দোকান পর্যন্ত সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সমস্ত কিছুতে আর্য নামের ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে যুগের বিচক্ষণ লেখকরাও এই রোগের হাত থেকে অব্যাহতি পাননি। ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ অবশ্য আর্যত্বের বাড়াবাড়ি নিয়ে ঠাট্টা করেছিলেন, কিন্তু একে তো তাঁরা ছিলেন সংখ্যালঘু, তার ওপর তাঁদের ঠাট্টা কজন উপভোগ করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

হিন্দু রীতিনীতির বিদ্বিষ্ট সমালোচনা অপ্রতিহত গতিতে চলছিল বলেই পাশ্চাত্যের প্রশংসাবাণীকে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল। এই গ্রন্থে আলোচিত রেভারেন্ড হেস্টি এবং বঙ্কিমের তর্কযুদ্ধে দেখা যায় যে হিন্দু এবং হিন্দুধর্মকে নিন্দা করতে গিয়ে হেস্টির মত একজন উচ্চশিক্ষিত ইংরেজও কতদূর ইতর ভাষা ব্যবহার করতেন। এইরকম কদর্য সমালোচনা যখন দেশবাসীর মুখনিঃসৃত হত, তখন তা আরও অপমানকর হয়ে উঠত। প্রচলিত আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ব্রাহ্মদের ঘৃণা প্রদর্শনের ফলে যে ব্রাহ্ম-বিদ্বেষ দেখা দিয়েছিল তার প্রকাশ হত নানাভাবে। অন্যতম উদাহরণ যোগীন্দ্রচন্দ্র বসুর অতি-জনপ্রিয়, স্থূল-কটূক্তি-পরিপূর্ণ 'মডেল-ভগিনী'*। পাশ্চাত্যায়িত বাঙালিদের জীবনযাপন নিয়ে ব্যঙ্গ কৌতুক এ যুগের জনপ্রিয় সাহিত্যে বিস্তর পরিমাণে পাওয়া যায়; তাদের জীবন রীতি "অসংস্কৃত হিন্দুত্বে"র প্রতি কটাক্ষপাত বলে মনে করা

*ব্রাহ্ম-সমাজের মহিলাদের 'ভগিনী' বলে উল্লেখ করা ব্রাহ্মসমাজের রেওয়াজ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হত। ইউরোপীয়রা এবং তাদের ভারতীয় অনুকরণকারীরা যে ভারতের নিজস্ব রীতির সমালোচনা করত, তারই প্রত্যুত্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার দুর্বলতাগুলি খুঁজে বার করবার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। নিজস্ব সামাজিক রীতিতে অভ্যস্ত গোঁড়া হিন্দুর কাছে পাশ্চাত্যের গোমাংস-ভক্ষণ এবং শৌচাভ্যাস থেকে শুরু করে স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কের স্বাধীনতা পর্যন্ত সবকিছুই সত্যসত্যই অসহ্য মনে হত। যে আন্দোলনকে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদ বলে কিছুটা বেঠিক নাম দেওয়া হয়েছে, তার উৎপত্তির কারণ যৌথভাবে আহত আত্মাভিমান এবং শাসক জাতির জীবনচর্যায় বিতৃষ্ণা।

দুটি সম্পূর্ণ আলাদা কারণে উপরোক্ত ব্যাখ্যা বেঠিক। প্রথমত, যে সব লেখক এবং প্রবক্তা হিন্দু অতীতকে জীবনের আদর্শ বলে তুলে ধরেছেন অথবা পিতৃপিতামহের বিশ্বাস এবং রীতিনীতির পক্ষ সমর্থন করেছেন, তাদের সবাইকেই কোনও কোনও সময়ে পুনরভ্যুত্থানবাদী বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে আলোচিত তিন জন চিন্তানায়ককেও অনেক সময়েই ঐ দলে ফেলা হয়। কেন যে তা যথাযথ হয়নি, প্রাসঙ্গিক অধ্যায়গুলির আলোচনায় আমি তার কারণ দেখিয়েছি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভূদেব বিস্মৃত রীতিনীতির 'পুনঃপ্রচলন' চাননি। তিনি শুধু ঐতিহ্যের সংরক্ষণের ওপরই জোর দিয়েছিলেন, না হলে, তিনি ভেবেছিলেন, জাতির স্বকীয়তা হারিয়ে যেতে পারে। নিঃসন্দেহে কোনো জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগে বঙ্কিম প্রাচীন ঐতিহ্যের কয়েকটি উপাদানকে জাতীয় পুনর্জাগরণের প্রাণশক্তির আধার বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমি দেখিয়েছি যে বঙ্কিম যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, মহাভারতে বর্ণিত প্রাচীন ধর্ম অথবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে জাতীয়তাবাদ এবং ইউরোপীয় দর্শনের কয়েকটি বিশেষ ধারার ক্ষেত্রেই তা বেশি প্রাসঙ্গিক। পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচার করতে গিয়ে বিবেকানন্দর চিন্তার একমাত্র বিষয় ছিল দেশে জাতির উন্নয়ন, বিশেষত জনগণের উন্নতিসাধন, যাকে ঠিক হিন্দু অতীতের সঙ্গে সম্পর্কিত বলা যায় না। তাঁর গুরুদেব অবশ্য একটি প্রাচীন সংস্কারকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন—সমন্বয়বাদ বা সর্বধর্মের মৌলিক অভিন্নতায় বিশ্বাস, যা গোঁড়া হিন্দুত্বের মধ্যে পড়ে না।

'পুনরভ্যুত্থানবাদ' শব্দটি যথাযথ নয় কেন, তার দ্বিতীয় কারণ এই যে, যা লুপ্ত হয়ে যায়নি, তার 'পুনরভ্যুত্থান'ও সম্ভব নয়। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের সামান্য কয়েকজন ছাড়া সকলের উপরই প্রচলিত হিন্দু রীতিনীতির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা ভাল যে হিন্দুর গোঁড়ামি বিশ্বাসের চেয়ে বেশি নিয়ম পালনের উপর। শহুরে বাঙালিরা হয়ত কঠোরভাবে আচার-বিচার মানতেন না, কিন্তু তাদের পরিবারের মহিলাদের সম্বন্ধে এ কথা মোটেই বলা চলে না। ব্রাহ্মরা ছাড়া প্রায় কেউই জীবনযাত্রার ধারা, দৈনন্দিন ক্রিয়া-কলাপ, এমনকি বাল্য-বিবাহের রীতিটিও পরিত্যাগ করেননি। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে পারিবারিক দেবতার প্রতি ভক্তি তখনও অটল ছিল। ব্রাহ্মদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে খ্রিস্টিয়প্রচারকগণ বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত করার জন্য বিদ্যাসাগরের প্রবল প্রচেষ্টার ফল হয়েছিল মাত্র একটি নতুন আইন সংযোজন, বাঙালি উচ্চবর্ণের হিন্দুর কাছে সে আইন এখনও স্বীকৃতি পায়নি। হিন্দুত্বের তত্ত্ব নিয়ে শশধর তর্কচূড়ামণি এবং কৃষ্ণবিহারী সেন প্রণোদিত কৌতূহলোদ্দীপক আন্দোলনকে বোধহয় পুনরভ্যুত্থানবাদ না বলে অন্য কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগ্যতর নাম দেওয়া উচিত। "অন্ধ আগ্রাসী দেশ-প্রেমিকতা" বোধহয় তার সমীচীন নাম। এখানে আলোচিত তিন ব্যক্তির কেউ, কোনোপ্রকারে ঐ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বরং হিন্দু ঐতিহ্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপস্থাপন এবং পণ্ডিত শশধরের উদ্ভট প্রচারের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি বাল্য বিবাহ এবং সতীপ্রথা থেকে শুরু করে হাঁচি-টিকটিকির সাধারণ বিশ্বাস পর্যন্ত হিন্দু রীতির সবকিছুকেই যথার্থ বলে ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর মতে সমস্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সারবস্তু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে প্রোথিত আছে। নতুন দ্রষ্টারা তাদের গূঢ়ার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছে, এতদিন পর্যন্ত যা কারও বোধগম্য হয়নি। ইউরোপীয় সভ্যতাকে তাঁরা নিম্নমানের বলে মনে করতেন, কারণ, ভারতের আর্যঋষিরা যখন অসীম রহস্য উদ্ভাসিত বৈদিক মন্ত্রগুলি রচনা করছেন, ইউরোপীয় সভ্যতার পূর্বপুরুষ তখন পশুপ্রায় বর্বর। এই তত্ত্ব প্রমাণ করবার জন্য তাঁরা ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করতেন। হিন্দুর আত্মমর্যাদা বাড়াবার জন্য এইসব আর্ত প্রচেষ্টার কিন্তু যথেষ্ট আবেদন ছিল। কলকাতায় কিম্বা যে কোনও মফঃস্বল শহরে শশধর বা কৃষ্ণবিহারীর বক্তৃতায় সভাগৃহ উপচে পড়ত[৬]। এই নতুন ভক্তিবাদে অপেক্ষাকৃত কম বিচক্ষণ মধ্যবিত্ত হিন্দুর আহত আত্মাভিমান সান্ত্বনা লাভের হালকা হাওয়ায় সুখে ভেসে বেড়াত।

এর পর যখন তিনজন খ্যাতনামা শ্বেতকায়—শ্রীমতী বেশান্ত, কর্নেল অলকট এবং মাদাম ব্লাভাৎস্কি—ভারতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করলেন, তখন তাঁদের উত্তেজনা উন্মাদনায় পরিণত হল। হিন্দুধর্ম যে অবর্ণনীয় জ্ঞানের উৎস এবং মুমুক্ষু পাশ্চাত্যদেশীয়দের ভারতের পদতলে বসে শিক্ষা নিতে হবে, এমন সব কথা প্রচারিত হতে থাকল। পশ্চিমের বিখ্যাত ব্যক্তিরা ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কাছে মাথা নোয়াচ্ছে—এই কল্পনা এমনকি বড় বড় পণ্ডিত এবং বুদ্ধিজীবীদেরও অভিভূত করে ফেলেছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদীরা যে নিজেদের দৈন্য পরিপূরণের জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন, থিওসফি আন্দোলনের সাফল্যের মধ্যে তার সুস্পষ্ট উদাহরণ। তিব্বতবাসী মহাত্মারা, যাঁরা মাঝে মাঝে কেবল মাদাম ব্লাভাৎস্কিকে দেখা দিতেন, তাদের দেওয়া গোপন জ্ঞানের সন্ধান পেতেন থিওসফিপন্থীরা। আশ্চর্য যে উদ্ধত-প্রকৃতি সংশয়বাদী কৃষ্ণ মেননও যৌবনে এই মতবাদের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ভূদেব, বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দ তিনজনেই থিওসফিকে ঘৃণার চোখে দেখতেন—এই ঘটনা থেকেই হিন্দু 'পুনরভ্যুত্থানবাদে'র সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কটি পরিষ্কার হয়ে যায়। থিওসফি এবং থিওসফিপন্থীদের তীব্র সমালোচনা করার ফলে স্বামীজী অনেকের অপ্রিয় হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, পাশ্চাত্যে তাঁর সাফল্যে দেশে যে উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গে থিওসফি-প্রীতি, ম্যাক্সমূলারের জাতিতত্ত্ব এবং পণ্ডিত শশধরের হাস্যকর দাবির জনপ্রিয়তা হীনম্মন্যতার একসূত্রে বাঁধা। স্বামীজী প্রথমবার বিদেশ থেকে ফেরার পর মাদ্রাজ এবং কলকাতায় উত্তেজিত যুবকদল তাঁর গাড়ি নিজেরা টানতে চেয়েছিল—বিদেশে একজন স্বদেশবাসীর সাফল্যে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। ঊনবিংশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হিন্দু গৌরব নিয়ে এই বাড়াবাড়িকে সামাজিক স্নায়ুদৌর্বল্য বলা যেতে পারে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এই কানাগলিতে প্রত্যক্ষবাদী এবং উপযোগবাদী বহু যুবক অজ্ঞেয়বাদ এবং পাশ্চাত্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনধারা পরিত্যাগ করে হিন্দু আচার এবং গুরুভক্তির আবেগে মাতোয়ারা হয়েছিলেন। সমাজের নেতৃস্থানীয় একজন বিখ্যাত ব্যক্তি যৌবনে এক বিধবা মহারাণীকে অপহরণ ও পরে তাঁকে বিবাহ করায় কুখ্যাত হয়েছিলেন : তিনি মধ্যবয়সে সুবিন্যস্ত স্যুট-এর সঙ্গে গোঁড়ামির প্রতীক টিকি ঝুলিয়ে বেড়াতেন।[৭]

এই আন্দোলনের শক্তিকে হেয়জ্ঞান করা চলবে না। এর একটি মুখপত্র 'বঙ্গবাসী'র গ্রাহকসংখ্যা ছিল ৫০,০০০, তখনকার দিনে যা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই পত্রিকার সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ বসু এবং তাঁর বন্ধু অত্যন্ত প্রতিভাবান প্রহসন-রচয়িতা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রায়শ অশালীন রচনার মাধ্যমে ব্রাহ্মদের ব্যঙ্গের পাত্র করে তুলেছিলেন। সে সময়কার লেখকরা কেউ এইসব সংঘটনকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। এর উদ্ভট এবং অনেক সময়ই অরুচিকর প্রকাশ অচিরে প্রবক্তাদের মনে একটা গাম্ভীর্যের প্রলেপ এনে দিয়েছিল। সে যুগের প্রধান চিন্তাবিদ এবং সমাজ-নেতারা সবাই নিজেকে এর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, ভূদেব এবং বঙ্কিম সহ অনেকেই শশধরের সঙ্গে স্বল্পস্থায়ী ক্ষীণ সম্পর্ক রেখেছিলেন। বিবেকানন্দ পণ্ডিত শশধরের ফাঁকা আওয়াজ একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর অসীম সহিষ্ণু গুরুদেব পণ্ডিতের বক্তব্য শোনার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের জীবনীগ্রন্থে শশধরের সঙ্গে বিবেকানন্দর সুসম্পর্কের একটা ভুল ধারণা দেওয়া হলেও বাস্তবিক তাঁদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু অতীতের মিথ্যা গৌরবকে পরিহাস করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দুটি বিখ্যাত উপন্যাস 'চতুরঙ্গ' এবং 'গোরা'তে যে তিনি হিন্দু-স্বাজাত্যাভিমানী ব্যক্তি-চরিত্র এঁকেছেন, আন্তরিকতার স্পর্শেই সেগুলি অতুলনীয় হয়েছে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার পরিবেশের বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বেগ ও মানসিক প্রচেষ্টা। এরই প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে ইউরোপীয় সভ্যতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ মূল্যায়নে।

AMARBOI.COM

এই উদ্ধত হিন্দুত্বের পরিবেশের মধ্যে মুসলিম শাসনকালকে কলুষিত করার একটা বিপজ্জনক সম্ভাবনা ছিল। দেশের ইতিহাসে যার অস্তিত্বই ছিল না সেই দেশপ্রেমের ধারা খুঁজতে গিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজপুত এবং মারাঠা প্রতিরোধকেই আঁকড়ে ধরতে হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা নিরাপদ নয়—এই উপলব্ধি থেকে ব্রিটিশ প্রভুর বিরক্তি উৎপাদন না করে নিরাপত্তা বজায় রাখার মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে ব্যাখ্যা করা যায়। অবশ্য সঠিক বিচারে, সত্তরের দশকের বাঙালি সাংবাদিকতা ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনার ফলাফল নিয়ে খুব বেশি উদ্বেগ দেখায়নি।[৮] ভূদেব যেমন বলেছেন, ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস সম্পর্কে ব্রিটিশ লেখকদের রচনা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মানসিকতা আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। মুসলিমদের প্রসঙ্গে ক্রমাগত 'যবন', এই ঘৃণাবাচক শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে এই নতুন বিদেশী-বিদ্বেষ লক্ষ করা যায়। আমাদের তিনজন লেখকের মধ্যে, জাতীয় ভাবাবেগপূর্ণ রচনায় বঙ্কিম যখনই হিন্দুত্বের প্রসঙ্গ তুলেছেন, তখনই মুসলিমদের সম্বন্ধে কিছু না কিছু কটূক্তি না করে ছাড়েননি। ইসলাম এবং ভারতে মুসলিম শাসনকাল সম্পর্কে ভূদেব এবং বিবেকানন্দর ধারণা খুবই ভাল ছিল। কিন্তু তাঁরাও কখনও সখনও মুসলিম অত্যাচারিতার কথা বলেছেন। ভারতের ইতিহাসে ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কে এই নেতিবাচক মনোভাব ব্রিটিশ শাসনের সব মূল্যায়নের উপরই ছাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলেছে।

উনবিংশ শতকের বাংলার জাতীয়তাবাদের হিন্দুত্বের অংশটি নিয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি কারণ এই গ্রন্থে আলোচিত ভাবধারাগুলি ঐ তত্ত্বে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। যে তিনজন লেখকের মনোভাব এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু, তাঁরা সকলেই যেমন জাতীয় আদর্শ ব্যাখ্যায় নিজেদের অবদান রেখেছেন, তেমনই নিজেদের হিন্দুত্ব ঘোষণা করেছেন। একজন তো মুসলিম-বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতেও সাহায্য করেছেন। তবুও, ষাট এবং সত্তরের দশকে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় নতুন নতুন আদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটায় তা একটি সঙ্কীর্ণ ধর্মমতের আওতা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে "বাংলার শিক্ষিত অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ জাগরিত করার জন্য"[৯] রাজনারায়ণ বসু একটি সংস্থা গঠন করেছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ-বিরোধী ইউরোপীয় জীবনধারা পরিত্যাগ করে ভারতীয় রীতিনীতিতে আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। এতে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের রীতিনীতির কথা বলা হয়নি। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে নিজের আস্থা ঘোষণার জন্য তিনি সনাতন ধর্মের রক্ষাকর্তা বলে প্রশংসা পেয়েছিলেন : তা সত্ত্বেও শেষ বয়সে লেখা 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামক পুস্তিকায় তিনি "মুসলিম ভাইদের" সঙ্গে সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছেন।[১০] হিন্দু ছাড়াও অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে নিয়েই যে ভারতীয় জাতি গঠন করতে হবে এই চেতনা রাজনৈতিক সংগঠনের স্রষ্টাদের মনে ছিল সেই ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে যখন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন থেকে। ভারতের সব ধর্মসম্প্রদায় এবং নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে নিয়ে একটি সার্বজনীন রাজনৈতিক কর্মপন্থা গ্রহণ করা ঐ সংস্থার উদ্দেশ্য বলে জানানো হয়েছিল। মাদ্রাজে একটি শাখা এবং ভারতের সব অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টাকে ঐ আদর্শের কার্যকরী রূপায়ণ বলা যায়। এক 'অখণ্ড ভারতে'র স্বপ্ন সম্ভব করার উদ্দেশ্যে "সর্বভারতীয় আন্দোলনের কেন্দ্ররূপে" ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। "একটি সাধারণ রাজনৈতিক আশা ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ভারতের সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করা" এবং "হিন্দু এবং মুসলমানের সম্প্রীতি বর্দ্ধন করা" এই সঙ্ঘের এই দুটি উদ্দেশ্য ছিল। যে আইনে ভারতীয়দের আই সি এস-এ ঢোকার পথে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছিল, সুরেন্দ্রনাথ এই সঙ্ঘের মাধ্যমে সেই আইনের বিরুদ্ধে প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন শুরু করেন। সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল একটা প্রতীকমাত্র, কারণ ঐ ঈশ্বরপ্রেরিত চাকুরিতে কজনই বা ঢুকতে পারতেন। সুরেন্দ্রনাথের আশা ছিল যে এর ফলে ভারতীয়দের মধ্যে একটা ঐক্য এবং সংহতির ধারণা সৃষ্ট হবে, এবং সে আশা মিথ্যাও নয়। ভারতের বড় বড় শহরে তাঁর বক্তৃতায় হাজার হাজার লোক সমাগম হত এবং এই আন্দোলন বিজয় মিছিলের রূপ নিয়েছিল।[১১]

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশন এবং দু' বছর পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাও আঞ্চলিকতার গণ্ডি উত্তীর্ণ হবার সচেতন রাজনৈতিক প্রয়াস।

ভূদেব এবং রাজনারায়ণ বসুর রচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে একদিকে হিন্দুত্ব এবং অন্যদিকে সর্বভারতীয় আদর্শবাদ, এই দুইয়ের মধ্যে একটা মানসিক চাপ সৃষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল। হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলিমভাইদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করবে—এই মনোভাব নিয়ে যে তাঁরা দুই আদর্শবাদের মধ্যে সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন নিজেদের রচনায়, জনসাধারণের মনে অনুরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল কিনা, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বাঙালি হিন্দু এবং মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসম বিকাশ, এবং যেভাবে বাংলার উর্দুভাষী মুসলিমরা জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন, তাতে বাংলার জাতীয়তাবাদে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের অঙ্গীভূত করে নেওয়ায় ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়। কবি কায়কোবাদ এবং প্রথম দিকে নিরপেক্ষ মীর মোশারফ হোসেনের পরের দিকের রচনাগুলি হিন্দু দেশপ্রেমীদের রচনায় মুসলিম-বিদ্বেষের আলঙ্কারিক প্রয়োগ এবং মঞ্চস্থ নাটকের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। এই গ্রন্থে আলোচিত ইউরোপের মূল্যায়নের জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষাপট প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কালিমায় বিশেষভাবে কলুষিত হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য তিনজন লেখক ইউরোপকে যেমন বুঝেছিলেন, তার মধ্যে বাংলার এবং কিছুটা বৃহত্তর ভারতের অংশ বিশেষের জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিবর্তনশীলতা প্রতিফলিত হয়েছে এবং তার দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার আদর্শ প্রথম আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেছিলেন 'নব্য বঙ্গ', সে-শিক্ষা তাঁরা পেয়েছিলেন বিখ্যাত গুরু ডিরোজিওর কাছে। ১৮৩০-এ, ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে "জনৈক ভারতীয়র" লেখা একটি ইংরাজি কবিতার বিষয়বস্তুরূপে প্রথম স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রকাশিত হয়। প্রধানত শ্লথগতি হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজে ডিরোজিওর শিষ্যদের প্রভাব খুব সামান্য ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনায় তাদের অবদান সেরকম নয়। ১৮২৮ থেকে ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হিন্দু কলেজের পত্রিকাগুলি যেভাবে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং যেরকম অত্যাধুনিক আদর্শবাদ তারা তুলে ধরেছিল, তা অনেক পরের যুগে রাজনৈতিক চিন্তাধারার পূর্বসূরী। ১৮৩৮ সালের হিন্দু পায়োনিয়র পত্রিকার এই উদ্ধৃতিটি থেকে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায় : "মুসলিমরা সর্বক্ষেত্রে গুণমানের মর্য্যাদা দিয়েছে, প্রাচীন হিন্দুদের মত ইংরেজদের কিন্তু জনসাধারণকে শাসন করবার ক্ষমতা একটি মাত্র শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত। যে ভয়ানক হিংসাত্মক পদ্ধতিতে বিদেশী কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে এবং যেভাবে শুধু সরকারই নয়, ক্ষমতা এবং প্রভাবের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে দেশবাসীকে বিতাড়িত করা হয়েছে, কোনরকম বাণিজ্যিক বা রাজনৈতিক লাভের যুক্তি দিয়েই তা মেনে নেওয়া যায় না।"[১২] ডিরোজিওর আর এক শিষ্য, দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী (১৮১৪-৭৮), চল্লিশের দশকে প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার মাধ্যমে সাম্যের নীতিতে নিজের আস্থা ঘোষণা করেছিলেন। কয়েক বছর পরে, ১৮৫৪ সালে, অক্ষয়কুমার দত্ত, সে সময়কার বুদ্ধিজীবী মানসিকতার উপর বিশেষ প্রভাবশালী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক, রাজনৈতিক পরাধীনতাকে নরকবাসের চেয়েও ঘৃণ্য বলে মন্তব্য করেন।[১৩] ষাট-এর দশকে জাতীয় স্বাধীনতার বিষয়টি বুদ্ধিজীবীদের আলোচনার বিশেষ ক্ষেত্র দখল করেছিল। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 'মাসিক আর্য্যদর্শন' পত্রিকায় ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি এবং ওয়ালেসের জীবনী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় ম্যাৎসিনির জীবন ভারতীয় যুবকদের আদর্শ হওয়া উচিত বলে ঘোষণা করেন। সত্তরের দশকে আরও দুটি প্রভাবশালী পত্রিকা—বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের 'ভারতী'তে বিশেষ পাণ্ডিত্য সহকারে জাতীয় স্বার্থের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত করা হয়। ১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল : "স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী"।

ভারতের, বিশেষত বাংলার জাতীয় চেতনাকে ইউরোপের রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবির প্রতিচ্ছবি বলা যায় না। কিছুটা স্থানীয় ঘটনাবলীর প্রভাবেই হয়ত বাংলার জাতীয়তাবাদে একটা স্বকীয়তা ছিল। ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা তো ছিলই, তাদের মধ্যেও আবার ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যও ছিল। এইসব ব্যক্তিগত চিন্তাধারাকে কেবলমাত্র "রক্ষণশীল" বা "উদার" আখ্যা দিয়ে সেই জটিলতাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাছাড়া, ইউরোপে প্রচলিত রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক তত্ত্ব ভারতের সমস্যায় প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এমনকি অনেকেই সম্পূর্ণ নতুন নিজস্ব তত্ত্বের উপস্থাপনা করেছেন।

বাংলার ভূমিস্বত্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার এবং মুখ্যত কৃষক-রায়তদের স্বার্থের সংঘাতের প্রশ্নটি ভাবনা-চিন্তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়েছিল। ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সহ অনেক প্রতিষ্ঠানই জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় উদ্বিগ্ন ছিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জী নীল বিদ্রোহের সময় কৃষকদের স্বার্থ তুলে ধরেছিলেন, তিনিই আবার জমিদারদের সমাজের সম্পদ বলে মনে করতেন—তাঁরা সমাজের অনেক অভাব পূরণ করতেন, সুতরাং তাঁদের অধিকারকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া উচিত বলে মনে করতেন। অনেকে আবার জনশিক্ষার ব্যয় নির্বাহার্থে জমিদারদের উপর শিক্ষাকর বসানোর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। 'ন্যাশনাল' নবগোপাল জনশিক্ষা-নীতিরই বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ তার ফলে, তাঁর মতে, কৃষকদের মধ্যে কৃষি কাজে অবহেলা জন্মাবে, সুতরাং উচ্চশিক্ষার বিনিময়ে তা কখনই গ্রহণ করা যায় না। তাঁর কাছে জমিদারদের চেয়ে বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থই প্রাধান্য পেয়েছিল, কিন্তু সামাজিক পরিস্থিতিতে এই দুই শ্রেণী প্রায় একই পর্যায়ভুক্ত ছিল। তাঁরই পর্যায়ভুক্ত অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা অবশ্য জমিদারদের উপর কর বসিয়ে জনশিক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছিলেন। কৃষকদের ভয়াবহ দুর্দশা সম্বন্ধে তাত্ত্বিক অথবা সক্রিয় প্রতিক্রিয়ার চরিত্র শুধুমাত্র শ্রেণীভিত্তিক নয়। রায়তদের সম্বন্ধে রাজা রামমোহনের যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল, অথচ জমিদারদের স্বার্থ বিসর্জন দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বহুকাল আগে, ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে, একজন খ্যাতনামা ডিরোজিওপন্থী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, "দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি চূড়ান্ত অবহেলার" কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করেছিলেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমের পূর্বসূরীরূপে কিশোরীচাঁদ মিত্র বাক্‌লের তত্ত্ব দিয়ে ভারতীয় কৃষকদের অধোগতির কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন। একজন বড় জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং যে বিশেষ প্রভাবশালী 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাতে সর্বদাই রায়তদের অধিকারগুলি রক্ষার পক্ষে লেখা হত। হিন্দু জাত্যাভিমানী চন্দ্রনাথ বসু জনশিক্ষার মাধ্যমে কৃষকদের দাবিগুলি পূরণের কথা বলেছিলেন।

সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নের ক্ষেত্রেও কৃষকদের অধিকার নিয়ে মতের বিভিন্নতা ছিল। যেমন, ভূদেব নবগোপাল দুজনেই গণতান্ত্রিকতা বিরোধী ছিলেন, এবং বঙ্কিমের মত 'সাধারণী পত্রিকা'র সম্পাদকও জাতীয় পুনর্জাগরণের ক্ষেত্র হিসাবে রাষ্ট্র অপেক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজকেই যোগ্যতর মনে করেছিলেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত সব রকম ব্যবহারের ক্ষেত্রেই ভূদেব এবং বঙ্কিম যে ধর্মকে প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত শিক্ষক বলেছেন, সেই তত্ত্ব অন্য অনেক লেখকের লেখাতে—বিশেষত প্রত্যক্ষবাদী যোগেশচন্দ্র ঘোষের লেখাতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কিছুটা ভারতের নিজস্বতার মধ্যে একটা রাজনৈতিক আদর্শ খুঁজে বার করার চেষ্টা, আর কিছুটা ঔপনিবেশিক শাসনের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যে কোন রাজনৈতিক পন্থার ব্যর্থতার বোধ থেকে তাঁরা ঐ বিষয়ে জোর দিচ্ছিলেন। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সাম্য এবং আন্দোলনের মত অমার্জিত প্রক্রিয়ার প্রতি তাঁদের অপছন্দের মনোভাবও এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।[১৪]

ভারতের জাতীয়তাবাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার অর্থনৈতিক সমস্যা তথা দারিদ্র্য সমস্যার ব্যাখ্যা। নওরোজীর *Poverty and Un-British Rule in India* গ্রন্থটি অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের শাশ্বত প্রকাশ ঠিকই, কিন্তু এর অনেক বক্তব্যই ১৮৭৩-৭৪-এ *Mukherji's Magazine*-এ বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদন বিষয়ক প্রবন্ধ-সমূহে ভোলানাথ চন্দ্র উত্থাপন করেছিলেন। স্বদেশীর আদর্শও এখানেই প্রথম প্রচারিত হয়েছিল। এই সব প্রবন্ধেই প্রথম ভারতের সম্পদ নিষ্কাশন তত্ত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদের চাপেই যে দেশীয় শিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এই সব জাতীয়তাবাদী বক্তব্যের উপস্থাপনা হয়েছিল। চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ অনেকেই *laissez faire* নীতির উপযোগিতার প্রশ্ন তুলে ভারতের শিল্পায়নে সরকারি হস্তক্ষেপের দাবি জানান। মজার ব্যাপার হল যে শিল্পায়নের মাধ্যমে তিনি "আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংঘে একটি মর্যাদার আসন লাভ করার"[১৫] নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। ওই সাম্মানিক আসন লাভের পরোক্ষ ফল ইংল্যান্ডের সঙ্গে সমান মর্যাদায় মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে বলেও তিনি আশা করেছিলেন। অবশ্য *Laissez faire* তত্ত্ব গণতন্ত্রের মত বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়নি। তবে পরে দেখিয়েছি যে নিষ্কাশন তত্ত্ব এবং হস্তশিল্পের ধ্বংস সম্বন্ধে ভূদেব এবং বঙ্কিম সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করতেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নটি নিয়েই বাংলার জাতীয়তাবাদীরা বিশেষ সমস্যায় পড়েছিলেন। পরাধীন এবং মূলত সন্তুষ্ট উচ্চবর্গীয় বুদ্ধিজীবী বাঙালি বহুকাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনকে সাদরে গ্রহণ করেছে কারণ ওই ব্যবস্থায় পছন্দসই জীবিকার সঙ্গে সমাজের ওপরে ওঠার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। আরও মনে হয়েছিল, যদিও তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়, যে, পাশ্চাত্যের জ্ঞান এবং জ্ঞানদীপ্তি ঐ পথেই ভারতে এসে পৌঁছেছে। ব্রিটিশ শাসন যে এ দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছে, ব্রিটিশদের এই বিশ্বাস মধ্যবিত্ত বাঙালি পুরোপুরি মেনে নিয়েছিল বলেই মনে হয়। ডিরোজিওপন্থী দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার যদিও বিদেশী শাসন ক্ষতিকর বলেই বিশ্বাস করতেন, তবুও ব্রিটিশ শাসনের প্রতি যে তার শত্রুতা নেই,[১৬] প্রাণপণে তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত রামগোপাল ঘোষ[১৭] ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকুরি করতে অস্বীকার করেছিলেন, অথচ ব্রিটিশ শাসনের চিরস্থায়িত্ব কামনা করেছিলেন।[১৮] আনুগত্যের এইসব প্রকাশের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। ঐ একই শাসনের বিরুদ্ধে যত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল, তাতে আনুগত্যের প্রকাশকে বরং দ্ব্যর্থক বলা যেতে পারে—ব্রিটেনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বিষয়মুখী চরিত্রে"র গুণগ্রাহিতা সরকারি নীতি এবং কাজে অন্যায়ের বোধ দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিল। তাছাড়া ঐ সব উক্তির মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চারিত্রিক সাবধানী মনোভাবও ধরা পড়ে, যদিও ষাটের দশক থেকেই সরকারের সমালোচনায় একটা দুঃসাহসিকতার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের যে অবিচল আস্থা, অনেকের মধ্যেই সেই মনোভাব ছিল এবং তাতে সন্দেহ করবারও কিছু নেই। ভূদেব এবং বঙ্কিমের মত আরও অনেকেই আন্দোলনের রাজনীতিতে অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। রক্ষণশীল প্রহসন-রচয়িতা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশপ্রেমিকতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিজের মন্তব্য 'ভারত-উদ্ধার কাব্যে' লেখেন, "আর ভাবনা নাই, দেশ স্বাধীন হলেই যথেচ্ছ লুঠপাট করা যাবে।"[১৯]

যাই হোক, ব্রিটিশ শাসনের গুণগ্রাহিতার ধারা আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসছিল। ১৮৫৪ থেকে ১৮৮২-র মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের স্নাতক সংখ্যা ছিল ১১,৫৮৯। অসমাপ্ত অথবা অনুত্তীর্ণদের সংখ্যা এখানে ধরা হয়নি। ১৮৭০-১ থেকে ১৮৮১-২র মধ্যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৯১,১৪৫ থেকে বর্ধিত হয়ে ১,৩৯,১৯৮ হয়েছিল। কলেজের সংখ্যা ১৮৫৫-তে সাতটি থেকে ১৯০২-তে ৪৬ হয়েছিল। এদের মধ্যে ২৬টি ছিল কলকাতার বাইরে। ১৮৭০-এ স্কুলের সংখ্যা ছিল ১,৭৮৩ এবং মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৮৭০-১৩২ থেকে ১৯০১-২-তে ৫৩৫-এ পৌঁছেছিল।[২০] ১৮৭৪-এ *Mukherji's Magazine*-এর একটি প্রবন্ধের নাম ছিল, *"Where shall the Baboo go?"* (এ সব বাবুরা কী করবেন!)। সামান্য ইংরাজি জানা লোকের সংখ্যা সম্ভাব্য চাকুরির সংখ্যাকে অনেকটাই ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনার ফলে বাঙালিরা সরকারি চাকুরি লাভের যোগ্যতা হারাচ্ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি কেরানির পদের জন্য বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছিল : "বাঙালী বাবুরা আবেদন করবেন না।"...[২১] ছোটলাট স্যার এন্টনী ইডেন একটি গোপন চিঠিতে আমলাতন্ত্রের সর্বস্তরে বাঙালি বিদ্বেষের কথা তাঁর উত্তরাধিকারীকে জানান।[২২] অর্থাৎ ইংরেজ-বাঙালির সেই মধুর সম্পর্কের দিন ফুরিয়ে গিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক শাসনকে যাঁরা স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁরাও প্রথম থেকেই এর খারাপ দিকগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। একজন ব্রিটিশকে যথোচিত সম্মান না দেখানোয় স্বয়ং রামমোহনকে একজন ব্রিটিশ কর্মচারীর কাছে অপমানিত হতে হয়েছিল। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু তিনজন মনীষী সহ অনেক বিখ্যাত বাঙালির জীবনীতেই এই ধরনের অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত আছে। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ভারতীয় কর্মচারীদের কাছে প্রায়শই ব্রিটিশ প্রভুর ব্যবহার দুর্বিষহ মনে হত।[২৩] এমনকি ১৮৩০ সালে শাসন ব্যবস্থার কয়েকটি বিষয়ের তীব্র সমালোচনা করা হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র এক পত্রলেখক গরিব মানুষের সঙ্গে সামান্য পুলিশ এবং রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের ব্যবহারকে চোরের সঙ্গে ব্যবহারের থেকেও খারাপ বলেছেন।[২৪] রসিককৃষ্ণ মল্লিকের মতে "ন্যায়বিচারের উৎসটিই" কলুষিত এবং ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কোনো ক্ষমতা নেই গরীবের।[২৫] এই মনোভাবই পরে বাঙলার কৃষকদের সম্বন্ধে বঙ্কিমের দীর্ঘ প্রবন্ধে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। গ্রামের দরিদ্রদের দুরবস্থার কারণ যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রিটিশের যথেচ্ছাচার এবং শোষণ এই মতবাদও ঐ সময়ে সৃষ্ট।[২৬] 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'[২৭] গ্রন্থে অক্ষয়কুমার দত্ত নিঃসংশয়ে লিখেছেন যে ব্রিটিশ শাসনের ফলে জনসাধারণের ভৌতিক ও নৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রেই অবনতি হয়েছে।

১৮৪৯-এ বেসরকারি ইউরোপীয়দের মফঃস্বল আদালতের এক্তিয়ারে আনার জন্য আনীত বিলের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ভারতীয়দের প্রতিবাদের ফলে বাঙালি মধ্যবিত্তের মনোভাব আরও তিক্ত হয়ে ওঠে। ইঙ্গ-ভারতীয়রা যেমন শুধুমাত্র সুপ্রীম কোর্টের বিচারাধীন ছিল সেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য তাঁরা তথাকথিত 'কালা কানুনে'র বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। ফৌজদারী মামলায় তাদের ভারতীয় বিচারকের অধীনে আনার চেষ্টা ত্যাগ করতে হয়। ১৮৫৬-৫৭ এবং ১৮৮৩-তে আইনের চক্ষে সমতা আনার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচেষ্টারও একই পরিণতি হয়। এইসব বিলের, বিশেষত ১৮৮৩-র তথাকথিত ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জঘন্য ভাষার ব্যবহারে তীব্র জাতিবিদ্বেষের নগ্নরূপ প্রকটিত হয়। এই ধরনের ভাষা কয়েকটি ইঙ্গ-ভারতীয় পত্রিকা আগে থেকেই ব্যবহার করছিল। সেই ইতর ভাষার একটি কদর্য উদাহরণ দিচ্ছি ইংলিশম্যান পত্রিকা থেকে, যেখানে বাঙালিদের প্রথম পদাঘাত করে তারপর কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয় ইউরোপীয়দের। গালিগালাজের ইতিহাস দীর্ঘ। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনীকার জানিয়েছেন যে দেশবাসীর উপর 'জন বুলে'র বর্বরোচিত, অনৈতিক আক্রমণের উপযুক্ত উত্তর দেবার জন্যই তিনি 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকার অংশীদার হয়েছিলেন।[২৮] 'হিন্দু পেট্রিয়ট' যখন নীলচাষীদের পক্ষ নিল এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে'র ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করার জন্য এক বিখ্যাত মামলায় রেভারেন্ড লঙ-কে যখন শাস্তি প্রদান করা হল, তখন 'জন বুলে'র যথেচ্ছাচারিতার আর এক রূপ দেখতে পেল বাংলার বুদ্ধিজীবীরা। লর্ড লিটনের জনবিরোধী শাসনকালে পরপর আর্মস অ্যাক্ট এবং ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট প্রবর্তন, এবং বেঙ্গলী পত্রিকাকে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করে সুরেন্দ্রনাথকে কারাগারে নিক্ষেপ করার ফলে (১৮৮৩) উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতা তীব্র আকার ধারণ করে।

AMARBOI.COM

এতৎসত্ত্বেও রাজভক্তির প্রকাশ অব্যাহত ছিল। ভারতসম্রাজ্ঞীর উদ্দেশ্যে ব্যক্ত আনুগত্যের বাণীগুলি যথার্থ বলেই মনে হয়। কিন্তু ষাটের দশক থেকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার আগে থেকেই, জাতীয়তাবাদী প্রচারে একটা জাতি-বিদ্বেষের সুর নজরে পড়ে। ১৮৩৬-এ রাজভক্ত দ্বারকানাথ লিখেছিলেন: "দেশবাসীর যা ছিল, সবই ওরা কেড়ে নিয়েছে।"[২৯] প্রায় তিন দশক পরে, ১৮৬৪-তে, বাংলা মাসিক 'শিক্ষাদর্পণ' ও 'সংবাদ-সার' পত্রিকায় সম্পাদক ভূদেব 'জাতি-বৈরিতা' শব্দটি ব্যবহার করেন।[৩০] এই কুফল বিদেশী শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলে তাঁর মনে হয়েছিল। 'জাতি-বৈরি' প্রবন্ধে বঙ্কিম এই বিদ্বিষ্ট মনোভাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, কারণ ব্যাপারটি মন্দ হলেও পশ্চাদপদ জাতির উন্নতির জন্য তার প্রয়োজন ছিল।[৩১] বাংলা পত্রপত্রিকায় ঐ বিদ্বিষ্ট মনোভাবের প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়। সেটাই দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র নিরোধ আইন (Vernacular Press Act) প্রবর্তনের সবচেয়ে বড় কারণ। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' জোর দিয়ে বলে যে জাতিবিদ্বেষ একটি বাস্তব রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঘটনা: "আমরা আমরাই, এবং তারাও তারাই।" ১৮৬৮-র ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ যেন এক ইস্তাহার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতে বলা হয়েছিল, “ইংরাজদের অত্যাচার বন্ধ করতে বাঙালীরা বদ্ধপরিকর এবং সহস্র সহস্র বাঙালী এই উদ্দেশ্যে জীবন দান করতেও প্রস্তুত।”[৩২] এই বক্তব্য যেন একটু বেশি এগিয়ে গিয়ে বলা হয়েছিল, তবুও, সেই যুগের পত্র-পত্রিকা এবং সাহিত্য দেশের জন্য আত্মত্যাগের মহিমা প্রচার করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। “সুরেন্দ্র বিনোদিনী” নাটক যদিও বিশেষ সুরুচির পরিচায়ক নয়, এই নাটকের নায়ক শেষ দৃশ্যে এক অত্যাচারী জেলা শাসককে গুলিবিদ্ধ করে। বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানের পর ১৮৭৭-এর আগস্ট মাসে নাটকের ম্যানেজার এবং নায়ক অশ্লীলতার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন, কিন্তু দুজন উদারচেতা বিচারক তাঁদের মুক্তি দেন।[৩৩] ১৮৭৯-৮০-তে মারাঠী ব্রাহ্মণ বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র বিদ্রোহের আদর্শ প্রচার করেন। ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’ তাঁর জীবন এবং কার্যকলাপের প্রশস্তি প্রকাশ করে। অনেকে মনে করেন যে বঙ্কিমের বিখ্যাত উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’ রচনার পিছনে যে সব প্রভাব ছিল, ফাদকের বিদ্রোহ তাদের অন্যতম।[৩৪] নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সত্তরের দশকে, বাংলার জাতীয়তাবাদের একটি বিশিষ্ট ধারা হয়েছিল জঙ্গী, বিদ্রোহী মনোভাব। বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দ উভয়েই এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং বিপ্লবী রাজনীতির বিকাশে দুজনেরই যথেষ্ট প্রভাব ছিল। হয়ত জাতির পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টায় তাঁরা এ ধরনের ফল আশা করেননি। তবে তা কি সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত ছিল? এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।

যে জটিল প্রক্রিয়ায় ইউরোপ সম্বন্ধে বাঙালিদের মনোভাব গড়ে উঠেছিল, খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও জাতীয়তাবাদ তার উপলক্ষ মাত্র। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা পাশ্চাত্যকে জেনেছিলেন লিখিত সাহিত্যের মাধ্যমে। তাঁরা যা পড়েছিলেন এবং ইউরোপীয় চিন্তাধারার যে সব বক্তব্য তাঁদের বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল, তাই দিয়ে তাঁদের ইউরোপ সম্বন্ধে ধারণার আর একটি প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল। সমকালীন ইংল্যান্ডের প্রচলিত পাঠ্যতালিকা এবং ভাবধারা শিক্ষক-ছাত্র পরম্পরায় এদেশে প্রবাহিত ছিল। সেই ভাবধারাকে অনুসরণ করে বাঙালি বুদ্ধিজীবী এবং সৃজনশীল লেখকদের সাহিত্যরুচির কিছুটা কারণ পাওয়া যায়। অবশ্য ব্যক্তিগত পছন্দের প্রশ্ন তো আছেই। শেক্সপীয়র এবং বায়রণ সকলেরই প্রিয় ছিলেন মনে হয়, কিন্তু ভূদেব গ্যেটেকে যেমন পছন্দ করতেন, বঙ্কিমের ক্ষেত্রে সেরকম কিছু জানা যায় না। বঙ্কিমের ওয়াল্টার স্কট সম্বন্ধে অত্যুচ্চ ধারণা, জেন অস্টেনের প্রতি অশ্রদ্ধা, নিজের উপন্যাসে অধ্যায়গুলির শুরুতে ক্যাম্বেল এবং সাদি থেকে উদ্ধৃতি, জোলা সম্বন্ধে অপছন্দ এবং ডিকেন্স সম্বন্ধে অখণ্ড নীরবতার মাধ্যমে যে বিশেষ ধরনের পছন্দের আভাস পাওয়া যায়, তাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি সেই ধারণার বিরোধী। শেলী বিবেকানন্দর খুবই প্রিয় ছিলেন, ‘পিকুইক পেপারস’ থেকে তিনি পাতার পর পাতা মুখস্থ বলতে পারতেন, আবার দেখি যে গিরীশ ঘোষের লেখা অতি নিম্নমানের একটি নাটকে যে আনন্দ পেতেন, শেক্সপীয়রের কোনও রচনায় তেমনটি পেতেন না। বিদেশী সংস্কৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিক যে সব আলোচনা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে এইসব বিশিষ্টতার কোনো ব্যাখ্যা নেই।

ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডারের অন্যান্য যে সব ক্ষেত্র তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন তার সঙ্গে ঊনবিংশ শতকের বাঙালির অভিজ্ঞতার যোগসূত্রটি সহজেই চেনা যায়। প্রকৃতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর পাশ্চাত্যের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতনতা তাঁদের সেই অভিজ্ঞতার প্রধান চিন্তার বিষয় হয়েছিল। প্রকৃতি বিজয়ই পাশ্চাত্যের প্রভুত্বশক্তির উৎস বলে তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন। তাছাড়া উদার মানবিক মূল্যবোধকে মেনে নেওয়া এবং ঐ মূল্যবোধের ভিত্তিতে নবগঠিত সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিন্যাসই মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ উন্নতির একমাত্র পথ বলে বিশ্বাস করার প্রবণতাও দেখা দিয়েছিল। পৃথিবীর নতুন ইতিহাসে আরও অনেক অন্যায়ের সঙ্গে পরাধীনতারও অবসান ঘটবে। আগেই দেখেছি যে বহুদিন থেকেই তাঁরা পরাধীনতাকে জাতির অধঃপতন মনে করতেন, তার কারণ যে বিদেশী শক্তি ক্ষমতার সবকটি চাবিকাঠি কুক্ষিগত করে রেখেছিল পরাধীনতা মানে তাদেরই প্রতি অবমাননাকর আনুগত্য। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসঙ্ঘে পরাধীন জাতির স্থান সবসময়েই নীচে। অপমানের গ্লানি তাঁদের নিয়তই সইতে হত। তাই পরাধীন জাতির অসম্মান সম্বন্ধে যেমন তাঁরা সদা-সচেতন ছিলেন, তেমনি আবার পৃথিবীর সর্বত্র স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যে সব কিছুর বিনিময়ে স্বাধীনতার সম্মান লাভে প্রয়াসী, সে বিষয়েও সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। একই সঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতার আশা অথচ সেই আশা পূরণের পথে বিঘ্ন, এই দুই পরস্পর বিরোধী উপলব্ধির ফলে যে মানসিক চাপ জমেছিল, তার উৎস বোধহয় শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের অগ্রণী সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার বাসনা নয়! এ প্রসঙ্গে তুলনীয় *Economic Backwardness in Historical Perspective* নামক মৌলিক প্রবন্ধে অধ্যাপক গার্সেনক্রনের শিল্পায়ন সম্বন্ধীয় উক্তি। নতুন সম্ভাবনার আলোকে সামাজিক মূল্যবোধের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হয়েছিল। এই সম্ভাবনার উপলব্ধি প্রথম পাশ্চাত্যে হয়েছিল বলেই যে তৃতীয় বিশ্বে জাতীয়তাবাদের ধারণা সেখান থেকে এসেছে এই দাবির কোনও যুক্তি নেই। তাহলে তো দুই সভ্যতার মধ্যে ধর্মমত সহ যে কোনো ভাবের আদানপ্রদানকেই না-বুঝে অন্যের বিকৃত অনুকরণ বলতে হয়। গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সার্বভৌমত্বের পাশ্চাত্য আদর্শ তৃতীয় বিশ্বে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কাজ করেছিল। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কীভাবে ইউরোপের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির জন্ম হয়েছিল, তা জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ইউরোপের আগ্রাসী ভূমিকার উৎসটিও তাঁরা খুঁজে বার করতে চাইছিলেন। স্বাধীন জাতিগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতি যেভাবে সমাজবিজ্ঞানের মাধ্যমে মুছে ফেলার এবং যেসব নতুন নিয়মকানুন চালাবার চেষ্টা হচ্ছিল, বাঙালি বুদ্ধিজীবীর কাছে তার আকর্ষণ কম ছিল না। তার কারণ নতুন আদর্শের দিকে পা বাড়াবার আগে সুবিন্যস্ত চিন্তাধারা গড়ে তোলার দরকার ছিল।

ঐ সব নতুন নতুন ভাবধারার প্রতি আবেগ পরিচালিত না হয়ে তাঁরা যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে সেগুলিকে বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন। ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির উত্তরকালীন যুক্তিবাদের ধারাটির সঙ্গেই বাঙালি বুদ্ধিজীবীর পরিচয় হয়েছিল। এই যুক্তিবাদ তাঁদের পরিচিত সংস্কারের প্রতি আস্থা টলিয়ে দিয়েছিল। আবার সেই সংস্কারের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টাতেও দেখি যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা, নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা নয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিই ছিল যুক্তি। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য সমাজ এমনকি ব্যক্তির জীবনের আদর্শ নিরূপণ করা। মানুষের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ক জর্জ কুম্বের বইয়ের অভিযোজনে অক্ষয় কুমার দত্ত লিখেছিলেন: "অবিমিশ্র যুক্তিবাদই আমাদের শিক্ষক।"[৩৫] ১৮৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত The Society

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

for the Acquisition of General knowledge-এর আদর্শ ছিল যুক্তিবাদী অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে "প্রয়োজনীয় জ্ঞানের" চর্চা করা। এই সংস্থার পূর্বসূরী ডিরোজিও-পন্থীদের অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে (১৮২৮-এ প্রতিষ্ঠিত) ইচ্ছার স্বাধীনতা, হিউম, রীড, ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট প্রমুখের দ্বারা আলোচিত আস্তিক্যবাদের পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিপ্রদর্শন, প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হত। ১৮৩০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত 'দি পার্থেনন' নামক পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ঘোষণা করা হয় যে যারা "জন্মসূত্রে হিন্দু কিন্তু শিক্ষায় ইউরোপীয়" এই কাগজ তাদেরই মুখপত্র।[৩৬] তারাচাঁদ চক্রবর্তী নামে এইরকম একজন হিন্দু নৈতিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে বেন্থামের পরাবিদ্যা-ব্যতিরেকী উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন : "যা কিছু মানুষের করণীয় তা তার স্বার্থ ছাড়া কিছুই নয়।"[৩৭] তাঁর গুরু রাজা রামমোহনও বেন্থামের আদর্শের বড় ভক্ত ছিলেন। উপযোগিতাবাদের প্রভাবে পড়া থেকেই বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা অবশ্য এর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সমাজের জৈবিক গঠন তত্ত্ব এই সমালোচনার ভিত্তি ছিল ঠিকই,[৩৮] কিন্তু তার মূল বোধহয় ছিল আরও গভীরে, হিন্দুসমাজের একান্নবর্তী পরিবারের মূল্যবোধের মধ্যে। স্বার্থপরতার প্রতিষেধকরূপে পরার্থপরতার উপর জোর দিতে গিয়ে অক্ষয় দত্ত উপনিষদের উপদেশ স্মরণ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা দরকার যে তিনি বা রামমোহন বা তাঁদের সমকালীন কোনও ব্যক্তিই পাশ্চাত্যে প্রাচ্য-বিদ্যার মাধ্যমে সংস্কৃত জ্ঞান লাভ করেননি। অতীত ইতিহাস সম্পর্কে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর জ্ঞানের স্বোপার্জিত উৎস ছিল পিতৃ-পিতামহক্রমে প্রাপ্ত অবিচ্ছিন্ন সংস্কৃত জ্ঞানের ধারা। উপযোগবাদী দার্শনিকদের মধ্যে বেন্থামের থেকেও মিলেরই আবেদন বেশি ছিল বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কাছে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপযোগিতাবাদের চেয়ে তাঁর উদার নীতিবোধেই তাঁরা বেশি আকৃষ্ট হতেন। যেমন, বেথুন সোসাইটিতে পঠিত একটি প্রবন্ধে "জাতীয় চরিত্রে স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য প্রতিফলিত হয়"—এই তত্ত্ব যে মিল খণ্ডন করেছিলেন সে কথা উল্লেখ করা হয়। উদার মতবাদ যে সবসময়ে তাঁরা দর্শন পাঠে লাভ করেছিলেন, তা নয়। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ইউরোপের ইতিহাস পড়ে ঐ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। অন্যেরাও জাতীয় পুনর্জাগরণ এবং ভারতের উন্নততর শাসনব্যবস্থার ভিত্তির সন্ধানে গভীর আগ্রহ সহকারে ফরাসী ও ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র ছাড়াও ইউরোপের ইতিহাস পড়তেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় প্রথম পড়ানো শুরু হলেও সত্তরের দশকে স্থায়িত্ব এবং প্রগতিতে বিশ্বাসী রক্ষণশীল মতাবলম্বীরা কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদী দর্শন পড়তে শুরু করেছিলেন।[৩৯] বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন'এর নিয়মিত লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাংলায় প্রত্যক্ষবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। ভূদেব, বঙ্কিম প্রমুখেরা এই তত্ত্বের সামাজিক আদর্শ—যেখানে পুরোহিত শ্রেণীর গৌরব বিঘোষিত হয়েছে, তা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এর অজ্ঞেয়বাদী ধর্মমত গ্রহণ করতে পারেননি। আমাদের তিনজন চিন্তাবিদের পঠিত লেখক এবং বিষয় সমূহ আমি প্রাসঙ্গিক অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এই তিনজনেরই পঠন ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, কিন্তু ইউরোপীয় দর্শনে তাঁদের আগ্রহের বিষয়বস্তু এক ধরনের ছিল না।

দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ইউরোপ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা অনেকটা যুগধর্মী ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে যাঁরা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এঁরা সেইরকমই তিনজন। সেই সময়কার প্রধান সব পত্র-পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় এ বিষয়ে কিছু না কিছু উল্লেখ থাকত। এইসব মূল্যায়নের কোনোটিকেই পুরোপুরি অথবা প্রধানত একটি বিদেশী সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বলা যাবে না। তবে তাদের সবারই একটি সাধারণ আলোচ্য বিষয় ছিল—ভারতীয় অথবা পরিচিত পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণে যাকে প্রাচ্য সংস্কৃতি নাম দেওয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে ইউরোপের তুলনা এবং ইউরোপ থেকে কী কী নেওয়া যেতে পারে অথবা পারেনা, তার বিশ্লেষণ। মনের গহনে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের দুটি উপাদান—দেশের এবং বিদেশের—নতুন করে বিচার করছিল। প্রেরণা এসেছিল বিদেশী শাসন সম্বন্ধে গড়ে ওঠা মনোভাব থেকে, এবং যে নৈরাশ্যজনক পরাধীনতায় আত্মাভিমান এবং উন্নতির পথ, দুইই রুদ্ধ হয়েছিল, সে সম্বন্ধে একটা কিছু করার আগ্রহ থেকে। আবার বলি, জাতীয় চেতনার বিন্যাসই ছিল প্রধান উপলক্ষ—দেশের অতীত রাজনৈতিক ইতিহাসে যাই ঘটে থাক, তখনকার সুস্পষ্ট চিন্তা ছিল যে জাতিগঠন আবশ্যিক এবং তা অসম্ভবও নয়। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে—রাশিয়া থেকে জাপানে—সচেতন জাতীয়তাবাদ এবং আধুনিক শিল্পের ভিত্তিতে পার্থিব সম্পদের উন্নতির পথে যারা নতুন পথিক, তারা সকলেই প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী ইউরোপের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের সংস্কৃতির একটা তুলনামূলক বিচার করতে শুরু করেছিলেন। এই বিচারে উত্থিত বিতর্কের বিষয়গুলি আশ্চর্যজনকভাবে রাশিয়া, চীন, জাপান এবং ভারতে একই রকমের ছিল।

এই অধ্যায়ের পূর্বভাগে আলোচিত ক্ষমতাসীন সংস্কৃতির প্রতি পরাধীন এলিট গোষ্ঠীর মনোভাবের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর ইউরোপীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধে কৌতূহল এবং বিমিশ্র শ্রদ্ধার অনুভূতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দুর্বল এবং পরাধীন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী শাসকশ্রেণীকে নিজেদের আদর্শবাদ এবং মনোমত চিন্তাধারার বাহক মনে করে তাদেরই অনুকরণ করত। কালক্রমে উপনিবেশের নবসৃষ্ট জাতীয়তাবাদী মানসিকতা বিদেশী শাসন বর্জন করতে চাইল। শাসক জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠল। তখনও পর্যন্ত তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধা অব্যাহত ছিল।

আগেই দেখিয়েছি, বিদেশী সংস্কৃতির বিশেষ কয়েকটি দিকের প্রতি দৃঢ় সদর্থক প্রতিক্রিয়া যে সবসময়ে আধিপত্যজনিত তা নয়, যদিও হয়ত পরাধীনতার ফলে তা জোরদার হয়েছিল। কিন্তু পরাধীনতার চেতনা আবার বর্জন এবং বিদ্বেষী মনোভাবেরও সৃষ্টি করতে পারে। বর্জনের মানসিকতাকে সচেতন তাত্ত্বিকরা তাঁদের মানসিক দ্বন্দ্বের লক্ষণ বলেছেন। কিন্তু এই সব তাত্ত্বিক আলোচনায় একটি প্রতিক্রিয়ার দিকের প্রতি নজর দেওয়া হয়নি, তা হল, একটি সংস্কৃতির প্রতি অবিচল আস্থা থেকে অন্য একটি সংস্কৃতির বিভিন্ন অভিব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার ক্ষেত্র ছিল উভয়ত—প্রভুত্বের গণ্ডির ভিতরেও যেমন ছিল তেমনই ছিল তার বাইরে। মধ্য এশিয়ার তুর্কীরা যে ফার্সী ভাষা এবং সাহিত্য শিখেছিল, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির যে চিত্ররূপ গ্রহণ করেছিল অথবা রোমানরা যে হেলেনিক সভ্যতা গ্রহণ করেছিল—এর কোনোটিই আর্থ-রাজনৈতিক প্রভুত্বের সঙ্গে জড়িত নয়। তাছাড়াও প্রেক্ষিত যেরকমই হোক, শ্রদ্ধার ধরন এবং গ্রহণের ভঙ্গি একই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে, এমনকি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছিল এবং পছন্দের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়গুলিও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ইউরোপীয় সভ্যতার যে বিষয়গুলিতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা মোহিত হয়েছিলেন, ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পরও তার ধারা অব্যাহত আছে : সেগুলির মূল বোধহয় হিন্দুদের সাহিত্য প্রীতির ধারায়, কিন্তু এর কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার মত যথেষ্ট জ্ঞান নেই আমাদের। সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে ইংরাজি কাব্যের তুলনামূলক বিচারে সময় কাটানোর ইচ্ছা দেখে একটা ব্যাখ্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একটা বহুল-প্রচলিত মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মতবাদ হল, উপ-মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদেশীদের সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তাই যদি হয়ে থাকে, তবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সময়ের পার্থক্য এবং ঘটনাপ্রবাহ, অথবা বুদ্ধিজীবীদের অনস্বীকার্য সীমাবদ্ধতা দিয়ে তা একেবারেই ব্যাখ্যা করা যাবে না। ঐতিহাসিক বিচারে পার্থক্যের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি হয়ত কিছুটা ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু এখানে 'ইতিহাস' বলতে বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর, হয়ত বা ব্যক্তির অভিজ্ঞতা বুঝতে হবে।

প্রথম নিবিড় পরিচয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার বিশেষ বিশেষ দিকে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা প্রশংসা অর্জন করেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পছন্দের ক্ষেত্র আরও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে মূল্যায়নের ক্ষেত্রও ব্যাপকতর হয়েছিল। দৃঢ় জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার নবলব্ধ ধারায় সব মূল্যায়নেই সমালোচনার প্রচেষ্টা বেড়ে গিয়েছিল। সমালোচকদের বক্তব্য এক ছিল না, কিন্তু সকলেই পূর্বতন এমনকি স্বকৃত মূল্যায়নেরও পুনর্বিবেচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭*—১৮৯৪)

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ভারতের ঐতিহ্যানুগামী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রতিক্রিয়া জানা যায় না। ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্যায়নের মধ্যে এই শ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার একটা ধারণা পাওয়া যায়। জন্ম, শিক্ষা এবং মানসিকতায় ভূদেব বঙ্গের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন। হৃদয় দিয়ে এবং যুক্তি দিয়ে তিনি ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধকেই আঁকড়ে ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের মধ্যে কর্মজীবনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল, নিজের মনে তিনি একথা মানতেই পারেননি। হিন্দু কলেজের অভিজ্ঞতা, সমকালীন ভারতীয়দের পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুকরণ, এমনকি তাঁদের সমাজ সংস্কারের উদ্যোগের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাবের জন্যই তিনি শেষ পর্যন্ত ইউরোপ সম্বন্ধে লেখায় আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে অন্ধ অনুকরণ থেকে নিবৃত্ত করা এবং ভারতীয় রীতিনীতির পরিপ্রেক্ষিতে আত্মমর্যাদা সহকারে পাশ্চাত্য সভ্যতার যথার্থ মূল্যায়ন করা। এই উদ্দেশ্য সদ্যজাগ্রত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে, এবং খুব সীমিতভাবে হলেও, হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ছিল। বিদ্রোহোত্তর বঙ্গে তাঁর মতামত সমাজ সংস্কারের ধারাকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে। প্রধানত দুটি উপকরণের উপর নির্ভর করে তিনি ইউরোপ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, প্রথমত, নিজের গভীর এবং বিস্তৃত পড়াশোনা, এবং দ্বিতীয়ত শৈশব থেকে নানাধরনের বিদেশীদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়। বিদেশী রাজশক্তির অধীনে কর্মজীবনের বহু অপমান এবং হতাশা অবশ্য পরিচিতদের যথার্থ মূল্যায়নে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করেছিল।

"তুমি আমার জন্মদাতা এবং শিক্ষাগুরু। আমি তোমার স্থানে যত শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছি, অপর কাহারও স্থানে শুনিয়া অথবা গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার শতাংশ লাভ করিতে পারি নাই"[১]—পরলোকগত পিতাকে বই উৎসর্গ করার ভাষায় তাঁর উপলব্ধি এবং চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এই উক্তির আক্ষরিক সত্যতায় সন্দেহের অবকাশ আছে। সংস্কৃতচর্চা সত্ত্বেও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ভারত

*পুত্রের লেখা জীবনীগ্রন্থে ভূদেবের জন্মতারিখ দেখানো হয়েছে ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮২৫ (ভূদেব চরিত, ১, ২০)। কিন্তু তাঁরা কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া কোষ্ঠীতে ঐ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮২৭, এবং এটিই নির্ভুল বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। (দ্রষ্টব্য) : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', ৬)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপেক্ষা ইউরোপের কাছেই বেশি ঋণী ছিলেন ; এবং পিতা বিশ্বনাথ সংস্কৃতে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু পুত্রের মত পাশ্চাত্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না, তা সত্ত্বেও ভূদেব সর্বত্র এই কথা বলেছেন যে তিনি যা কিছু শিখেছেন পিতার কাছে, পাশ্চাত্য জ্ঞান থেকে নয়।[২] সর্বসাধারণের জন্য লেখার যে দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন, সেই ভূমিকায় মৌলিক মূল্যবোধের বিচারে এই উক্তি যথার্থ। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যে ধারাটির প্রতিভূ ছিলেন তাঁর পিতা, ভূদেব তাকেই সত্য বলে মেনেছিলেন এবং সেই বিচারবোধ দিয়েই তাঁর চিন্তাধারা প্রভাবিত হয়েছিল।

ভূদেবের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এই পুরুষটি সম্বন্ধে জানা গেছে তাঁরই রচনাবলী এবং তাঁর তৃতীয়পুত্র রচিত জীবনীগ্রন্থ থেকে। চিত্রটি এক আদর্শ পুরুষের কিন্তু অবিশ্বাস্য নয়। এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হল যে এই চিত্রায়ণের মধ্যে ভূদেবের অনুভূতির আদর্শ পুরুষটিকে পাওয়া যায়, যে আদর্শ তাঁর নিজের জীবনের অনুপ্রেরণা হয়েছিল। এই বর্ণনা অনুযায়ী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রাচীন সংস্কৃতির এক জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ। সুপণ্ডিত, দৃঢ়চেতা এবং আপন আদর্শে অটল বিশ্বনাথ এক বিদেশী প্রতিষ্ঠানে সাময়িকভাবে কর্মরত ছিলেন। তাদের ইচ্ছানুযায়ী নিজের সমাজের নিন্দাবাদ করতে অস্বীকার করে তিনি দারিদ্র্য বরণ করেন।[৩] তাঁর আদর্শনিষ্ঠা শুধু জাগতিক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ ছিল না। নিষ্কাম কর্মে আস্থাবান বিশ্বনাথ ঈশ্বরের কাছেও পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করেননি : প্রার্থনার সুফলে বিশ্বাসী এই মানুষটি এমনকি নিজের একমাত্র পুত্রের গুরুতর অসুস্থতার সময়েও ভগবানের কাছে তার নিরাময় ভিক্ষা করেননি, কারণ যা চিকিৎসকের কর্তব্য, তা নিয়ে তিনি বিশ্বনিয়ন্তাকে বিড়ম্বিত করতে নারাজ ছিলেন।[৪]

এই অনন্যসাধারণ পিতার প্রতি গভীর অনুরাগই ভূদেবকে ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি ও মূল্যবোধে দীক্ষিত করে। শিক্ষা বিষয়ক ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে পিতাপুত্রের মধ্যে সম্যক ভালবাসার অভাবকে তিনি ভারতীয় সমাজের অন্যতম দুর্বলতা বলে সক্ষোভ মন্তব্য করেছেন।[৫] এই অভাব বিষয়ে চেতনা কিন্তু তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। তৎকালীন ধর্মবিশ্বাসী হিন্দুদের কাছে জনক-জননী পার্থিব দেবতারূপে গণ্য হতেন। ভূদেবের জীবনে মাতাপিতা শুধু পূজনীয় নন, গভীর ভালবাসারও পাত্র ছিলেন। ষোলো বছর বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয় তারপর তাঁর কৈশোর জীবনের সমস্ত শ্রদ্ধা-ভালবাসার আবেগের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন পিতা।[৬]

পিতা অশেষ যত্নে পুত্রকে হিন্দু রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান করে তোলেন। অসাধারণ ধৈর্য ও নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি একাজ করেছিলেন। বারো বছর বয়সে ভূদেব হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। খাদ্য ও পানীয় বিষয়ে হিন্দু আচারের প্রকাশ্য বিরোধিতা করা সে যুগের হিন্দু কলেজের পুরোধা ছাত্ররা এক প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন।[৭] সভ্য বলে গণ্য হতে হলে গোমাংস ভক্ষণ এবং মদ্যপান অপরিহার্য কর্তব্য ছিল। তাঁর পুত্রও হয়ত নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করবে—বিশ্বনাথ এই উদ্বেগ প্রকাশ করায় ভূদেব প্রতিজ্ঞা করেন যে পিতার সামনে গ্রহণ করতে পারবেন না, এমন কোনো খাদ্য তিনি কোনোদিন স্পর্শ করবেন না। এই প্রতিজ্ঞা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।[৮] তাঁর কঠোর নিষ্ঠা ও আত্মসংযমের কথা সমকালীন বন্ধুরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন।[৯] খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের প্রভাবে পৌত্তলিকতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনাস্থা প্রকাশ করে ভূদেব গৃহে নিত্যপূজায় অংশগ্রহণ করতে আপত্তি জানানোয় এক পারিবারিক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। পিতা বললেন যে অবিশ্বাস নিয়ে পূজা করলে ধর্মের অবমাননা হয়, তবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে পুত্রের মনোভাব যথাকালে পরিবর্তিত হবে। এর পরে তিনি প্রতীক পূজা তত্ত্ব বিষয়ে পুত্রের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা করেন এবং পুত্রকে গীতা এবং সংস্কৃত কাব্য পাঠে উৎসাহী করে তোলেন। দিনের পর দিন কলেজে ভূদেব কী শিখেছেন তা শুনতে চাইতেন এবং তারপর তিনি অনুরূপ ভাব ও ভাষা সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত করে শোনাতেন। হিউম, টম পেইন এবং গিবন পড়ার ফলে খ্রিস্টধর্মের প্রতি ভূদেবের দুর্বল আকর্ষণে ইতিমধ্যেই ফাটল ধরেছিল, তার উপর বিশ্বনাথের সূক্ষ্ম প্রচেষ্টার ফলে পিতৃপুরুষের ধর্মে তাঁর আস্থা ফিরে আসে। নিজ বংশে প্রচলিত তন্ত্রমত অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক দীক্ষা গ্রহণ করায় ঐ আস্থা দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল।[১০]

ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর যে গভীর শ্রদ্ধা—যার জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রায় কিছুই তিনি গ্রহণ করতে চাননি—তার অনেকটাই ছিল তাঁর পারিবারিক জীবনের আনন্দময় অভিজ্ঞতাপ্রসূত। হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারকে তিনি কৃষিভিত্তিক সমাজের সবচেয়ে স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতবর্ষের শাশ্বত মূল্যবোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এ তত্ত্বও তাঁর কাছে নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সপ্রমাণ হয়। ভূদেবের পিতামহ তাঁর পিতার মতই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। 'পারিবারিক প্রবন্ধে' তিনি পিতামহের স্মৃতিচারণ করে তাঁকে "গৃহপতি"র *(Pater Familias)* ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছেন। নাতি-নাতনিদের কাছে পিতামহ একাধারে ক্রীড়াসঙ্গী এবং শিক্ষাগুরু, তাঁর নিষ্কলুষ স্নেহ পিতামাতার স্বাভাবিক উদ্বেগ বা বাস্তব আশা প্রত্যাশায় মলিন নয়। বাল্যবিবাহ ভূদেবের চোখে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অনিন্দনীয়, কারণ তাঁর পরিবারে তিনপুরুষের জীবনে বাল্যবিবাহের পরিণতি গভীর দাম্পত্যপ্রেম—এ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তাঁর পিতা এবং পিতামহ উভয়েই মধ্য বয়সের শুরুতে বিপত্নীক হয়েছিলেন। জীবনের শেষে পরলোকে পত্নীর সঙ্গে মিলিত হবার নিশ্চিন্ত ভরসায় তাঁরা বাকি জীবন কাটিয়েছেন।[১৩] তাঁর নিজের বালিকাবধূও আদর্শ গৃহিণী এবং প্রিয়সহচরীরূপে বিকশিত হয়েছিলেন। পারিবারিক প্রবন্ধের আবেগময় উৎসর্গপত্র পত্নীর মৃত্যুতে ভূদেবের হৃদয়বিদারণের সাক্ষ্য। পরিবারে তিনপুরুষের কেউই পুনর্বিবাহের কথা ভাবতে পারেননি। সুতরাং সমাজ-সংস্কারকদের বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করার প্রচেষ্টার প্রতি তাঁর বিরূপতায় আশ্চর্য
পরিবারে তিনপুরুষের কেউই পুনর্বিবাহের কথা ভাবতে পারেননি। সুতরাং সমাজ-সংস্কারকদের বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করার প্রচেষ্টার প্রতি তাঁর বিরূপতায় আশ্চর্য
হবার কিছু নেই।[১৪] তাঁদের একান্নবর্তী পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন তাঁর মা। তাঁর মহিমময়ী রূপ দেখে ভূদেবের কালাপাহাড়ী মেজাজের বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্ত চমৎকৃত হয়েছিলেন। তাঁর গৃহিণীপনায় তাঁদের পরিবার একান্নবর্তী পরিবারের সহজাত সমস্যাবলী থেকে মুক্ত ছিল বলে শোনা যায়, যদিও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তাঁর দেবররা কেউ রোজগারী ছিলেন না। তান্ত্রিক মতে দীক্ষা নেবার সময়ে ভূদেব তাঁর মাকে গুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন।[১৫] সংক্ষেপে বলা যায় যে কিশোর বয়সে ধর্মীয় জীবনে ক্ষণস্থায়ী টানাপোড়েনের কাহিনী বাদ দিলে পরিবারের প্রচলিত ধারা সম্বন্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর গভীর নিষ্ঠা ও ভালবাসা তৎকালীন বাঙালি সমাজের অস্থিরতা কোনও ভাবে ব্যাহত করে নি।

সে যুগে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তানকে এক কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে মানুষ হতে হত। নিজ পরিবারের প্রতি আনুগত্যের অর্থ ছিল খাদ্য, পানীয়, বলতে কি জীবনযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। পরিণত বয়সে ভূদেব বারম্বার বলেছেন যে তাঁর নিজের জীবন ও আদর্শে যা কিছু শ্রেয় সবই তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে পাওয়া। তাঁর ব্রাহ্মণ্য গর্ব ছিল প্রবল। তাঁর মূল্যবোধে দরিদ্র শিক্ষকের পদ থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের স্বচ্ছন্দ জীবনে উত্তরণ অধঃপতনের সামিল ছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সভ্যতার বিবর্তনে চরমস্তর—এ বিষয় তিনি নিঃসংশয় ছিলেন, সন্দেহ নেই। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলি আপাতদৃষ্টিতে কুসংস্কার মনে হলেও 'আচার প্রবন্ধে' তিনি সেগুলিকে নিষ্ঠাভরে পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর্য ঋষিদের প্রজ্ঞায় তাঁর গভীর আস্থা ছিল। সুতরাং এই বিধিনিষেধগুলি আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিবিরুদ্ধ হলেও এর অধিকাংশই মানবজীবনের পক্ষে কল্যাণকর বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদ সর্ববিষয়ে আর্য ঋষিদের অতিক্রম করে গেছে এ কথা তিনি মানতে পারেননি। তাছাড়া, কোনো ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলে তার খুঁটিনাটি নিয়ে বিতণ্ডা বুদ্ধির কাজ নয়। সভ্যসমাজে অনুসৃত মার্জিত আচরণবিধির মতই ধর্মীয় আচরণ বিধিরও সবসময়ে যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না, প্রশ্নাতীতভাবেই তাকে গ্রহণ করতে হয়। বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে সমাজের উপযোগী ঐতিহ্য গড়ে ওঠে, সেই যুক্তিতে তার সবখানিই গ্রহণ করতে হয়, এবং সেইভাবে গ্রহণের ফলে সমাজবন্ধন দৃঢ় হয়। স্বতন্ত্র পরিচয়টুকু ছাড়া হিন্দুরা যখন সবই হারিয়েছে, তখন তাদের পিতৃপুরুষের ঐতিহ্যটি ত্যাগ করা সম্ভব নয়। তাঁর আচরণের গোঁড়ামি বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ভূদেব বলতেন, "আমাদের আর কিই বা আছে?" হিন্দুত্বে তিনি অহঙ্কার বোধ করতেন, কারণ কঠোর শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে তিনি হিন্দুত্বের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধটি অনুধাবন করেছিলেন। অধিকন্তু, পিতামহ, পিতামাতা এবং পত্নীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এর প্রকাশকে তিনি ভালবেসেছিলেন। তুলনামূলকভাবে আর সব ঐতিহ্যই তাঁর খেলো মনে হয়েছিল। পড়াশোনা করে এবং ইউরোপীয়দের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মাধ্যমে তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁর পূর্বপুরুষদের জীবনের উচ্চ আদর্শগুলির স্থান নেবার মত কিছুই ইউরোপীয় ঐতিহ্যে নেই। কিছুটা বিড়ম্বিত হলেও এই মূল্যবোধই ভারতীয় ঐতিহ্যের মেরুদণ্ড বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

সে যুগের সমস্ত পারিপার্শ্বিক তাঁর অতিপ্রিয় এই আদর্শগুলির পরিপন্থী ছিল। প্রতিকূলতার উৎস অবশ্য একটাই—তা হল পাশ্চাত্য সভ্যতা, কিংবা আরও স্পষ্ট করে বললে, অনুকরণপ্রিয় ভারতীয়দের মধ্যে তার প্রতিফলন। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে তাঁর পিতার অনুসৃত আদর্শের জোরটা ছিল নিবৃত্তিমার্গে, যার অর্থ—বৈরাগ্য এবং মুক্তি। উনবিংশ শতকের ভোগবাদ, বিশেষত ভারতীয়দের পাশ্চাত্য জীবনধারার অনুকরণপ্রিয়তা তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। হিন্দু কলেজের বন্ধুবান্ধবদের পাশ্চাত্য আদবকায়দায় তিনি বিরক্ত বোধ করতেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মানুষ ভূদেব উচ্চবর্ণের হিন্দু সন্তানকে হুইস্কির সঙ্গে মুসলমানের দোকানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোমাংসের কাবাব খেতে দেখে স্বভাবতই জুগুপ্সা বোধ করতেন। "পূজার বাজারে ইয়র্কশায়ারের শূকর মাংস বিক্রয় হচ্ছে"—ভূদেবের বন্ধু রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক উদ্ধৃত এই বিজ্ঞাপন থেকে ধারণা করা যায় যে দেশের প্রচলিত ধারা থেকে সরে গিয়ে মানুষ কি বিচিত্র বকচ্ছপ রূপ ধারণ করতে পারে। সমবয়সী বন্ধুদের আচরণের প্রতি ভূদেবের বিতৃষ্ণার কারণ শুধুমাত্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। শাসকশ্রেণীর অনুকরণ তাঁর আত্মসম্মান এবং মর্যাদাবোধের পরিপন্থী, অপমানজনক বলে বোধ হত। সমবয়সীদের মধ্যে যাকে তিনি সবচেয়ে ভালবাসতেন, যে প্রিয়বন্ধুর মধ্যে তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর দেখেছিলেন, সেই মধুসূদন যখন উৎকটরকম অনুকরণপ্রিয়তা বেছে নিলেন, তখন তিনি যার-পর-নাই দুঃখিত হয়েছিলেন। বারবার তিনি "মধুর হীন অনুকরণ প্রবৃত্তি"র কথা উল্লেখ করেছেন। ইংলন্ড ভ্রমণের সুযোগ লাভের আশায় মধুসূদন যখন স্বধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন, সেই ঘটনায় ভূদেব আপন ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হবার মর্মান্তিক পরিণতি উপলব্ধি করলেন। কবির ঝটিকাবিধ্বস্ত জীবন এবং বারংবার ভাগ্যবিড়ম্বনায় তাঁর ধারণা আরও বদ্ধমূল হল। সেই যুগের সবচেয়ে প্রতিভাধর ব্যক্তির জীবনে যদি এই বিপর্যয় ঘটতে পারে, তবে পাশ্চাত্যের অনুকরণের প্লাবন থেকে সমাজকে বাঁচানো একান্তই প্রয়োজন।

কলেজে সমসাময়িকদের সঙ্গে ভূদেবের আদর্শগত বিরোধ তাঁর বাইরের আচরণ এবং স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধায় সীমাবদ্ধ ছিল না : তাঁর চারপাশে সকলেই ধর্ম সম্বন্ধে হয় নিরাসক্ত, না হয় সংশয়বাদী ছিলেন।[১৬] সে তুলনায় তিনি ছিলেন গভীর ধর্মবিশ্বাসী, বিশেষত তান্ত্রিকমতে দীক্ষা নেওয়ার পর।[১৭] যৌবনের প্রারম্ভেই পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবকে তিনি ভয় পেতে শুরু করেছিলেন, এবং যে হিন্দু ঐতিহ্যের সবটুকুই তিনি নিজে গ্রহণ করেছিলেন তার থেকে অন্যদের বিচ্যুত হবার মূল কারণ ঐ সর্বনাশা প্রভাব—এই ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল।

পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব সম্পর্কে তাঁর সন্ত্রস্ত মনোভাবের ভাগীদার সেই সময়ে অনেকেই ছিলেন। বস্তুতপক্ষে, ঊনবিংশ শতকের বাঙালি সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব যতখানি, তার সম্বন্ধে উদ্বেগও ততখানি। এর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে শতাব্দীর প্রথমার্ধের ঘটনাবলীতে—ডিরোজিও গোষ্ঠীর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এবং কয়েকজন উচ্চবর্ণের হিন্দু যুবকের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ, খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অপপ্রচার, রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ, সতীদাহপ্রথার বিলোপসাধন—প্রভৃতি ঘটনা অনেকেই মেনে নিতে পারেননি, বরং ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় রীতিনীতির উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বলে মনে করেছিলেন। এতজ্জনিত ভীতি শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি। পূর্বযুগের বিতর্কিত বিষয়গুলির মধ্যে কয়েকটি ভূদেবের যৌবনকালেও বিদ্যমান ছিল। তাঁর বয়স যখন আঠারো, সেইসময়ে ঠাকুর পরিবারাশ্রিত এক ব্যক্তি সস্ত্রীক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সহিষ্ণু এবং যুক্তিবাদী বলে পরিচিত অক্ষয়কুমার দত্তের মতো ব্যক্তিও এই ঘটনায় বিচলিত হয়ে বলেছিলেন যে খ্রিস্টধর্ম ভারতের জনজীবনে বিষবৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খ্রিস্টধর্মের সম্ভাব্য আকর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসাবে হিন্দু বালকদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন মহর্ষি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবেন্দ্রনাথ ; ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় কিছুকাল যাবৎ খ্রিস্টধর্ম বিরোধী মনোভাব প্রচার করা হয়েছিল।[১৮] পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে মেকলের ঘৃণ্য উক্তি মেনে নেওয়ার হীন প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার অন্যতম উদ্দেশ্য নিয়ে এর কিছুদিন আগেই তত্ত্ববোধিনী সভা এবং পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১৯] হিন্দু কলেজে ডি এল রিচার্ডসনের ছাত্ররা (ভূদেব তাঁদের অন্যতম) যে শুধুমাত্র তাঁর সেক্সপীয়রের উপর বক্তৃতা শুনে পুলকিত হতেন তাই নয়, ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের অন্তঃসারশূন্যতা বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন।[২০]

সে যুগের বাংলা সাহিত্যে—এ গ্রন্থে যেগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, তাতেও, যে বিষয়টি বারংবার আলোচিত হয়েছে তা হল পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল। ভূদেবের সমসাময়িক ব্রাহ্মসমাজের নেতা রাজনারায়ণ বসু তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় পুস্তিকা 'সেকাল আর একালে' এই বিষয়ে সেই সময়ে প্রচলিত মতটি ব্যক্ত করেছেন। "এখন ইংলন্ডই আমাদের স্বর্গ"—এই ব্যঙ্গাত্মক উক্তির মধ্যেই তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম নিহিত আছে। শিক্ষিত বাঙালি নিজের ঐতিহ্যের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিল। ভারতের ক্ষেত্রে উপযোগিতা বিচার না করেই তারা ইউরোপের সবকিছু অন্ধভাবে অনুকরণ করত। ভারতের আবহাওয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান পাশ্চাত্য পোশাকের ব্যবহার নব্য আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণীর স্বধর্মবিমুখতার অন্যতম উদাহরণ। অজস্র ইংরাজি শব্দ মিশ্রিত এক কদর্য ভাষায় তাঁরা কথা বলতেন।[২১] যে কোনো বক্তৃতার ভাষা ছিল ইংরাজি, এমনকি বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনকে চিঠি লিখতেও ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করা হত। রাজনারায়ণ বসু ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির আশায় বিত্তবান শ্রেণী সম্ভব হলে ভোজসভার লুচিগুলি সাহেবদের দিয়ে ভাজিয়ে নিতেন। ইংলন্ড-প্রত্যাগত ব্যক্তি নকল ইংরাজ হয়ে দেশে ফিরতেন। রাজনারায়ণের নিজের জামাই স্বধর্ম-বিমুখতার এক দুর্ভাগ্যজনক নিদর্শন হয়েছিলেন।[২২] পাশ্চাত্য জীবনধারার অনুকরণ মানে পাশ্চাত্য বিলাসিতার প্রতি আকর্ষণ ; কিন্তু দেশে ঐ সব বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ফলত ভৌতিক এবং নৈতিক, উভয়তই ব্রিটিশ জাতির উপর নির্ভর করাটাই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। সমাজ সংস্কারের একান্ত গোপনীয় বিষয়গুলিও বিচারের জন্য প্রিভি কাউন্সিলে পাঠাতে তাঁরা বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করতেন না। প্রথম দিকে মদ্যপান সভ্যতার প্রতীক বলে মনে করা হত, ক্রমশ তা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যাওয়ায় পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল হয়েছিল ভগ্নস্বাস্থ্য মানুষের দল।[২৩]

সদ্যজাগ্রত জাতীয়তাবোধে কোনোরকম সাংস্কৃতিক পরাশ্রয়িতার স্থান ছিল না। জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত বাঙালিদের এ বিষয়ে স্পর্শকাতর হওয়ার যথেষ্ট কারণও ছিল। অন্যতম কারণ হল নিজেদের জাতিত্বের অহঙ্কার। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচনা যত তীব্র হচ্ছিল, দুর্মর ইঙ্গ-ভারতীয়দের গালিগালাজের মাত্রাও তত বাড়ছিল। বিচারের মানদণ্ডে সাদা-কালো সব অপরাধীকে সমান করবার চেষ্টায় প্রস্তাবিত ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় প্রবল আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের প্রথমে সভায় জে এইচ এ ব্র্যানসনের ভাষণ বোধহয় জাতি বৈষম্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব উদাহরণকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নরিস নামক কলকাতা হাইকোর্টের জনৈক বিচারক এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অযথা হিন্দুদের প্রতি কটূক্তি করায় সুরেন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করেন ; সঙ্গে সঙ্গে আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথকে একমাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[২৪] এইসব ঘটনা জনমানসে গভীর দাগ কেটেছিল। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অবিরাম অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় দেশের সব কিছুই শ্রেষ্ঠ এবং পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের তুলনায় উচ্চমানের, দেশবাসীর মনে এই বিশ্বাস জন্ম নিচ্ছিল।[২৫] ইতিমধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ব্রাহ্ম আন্দোলনের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ায় ঐতিহ্যধর্মী নব্য আন্দোলনের এক প্রবল প্রতিপক্ষ অপসারিত হয়েছিল। প্রথমোক্ত আন্দোলন তখন শূন্যগর্ভ আস্ফালন বলে প্রতিপন্ন হত, এবং কোনো কোনো নেতার আচরণে প্রায়শই সামাজিক শিষ্টাচার ক্ষুণ্ণ হত।[২৬]

নব্য মতাদর্শের আত্মসচেতন বলিষ্ঠ প্রকাশ দেখা গিয়েছিল দুটি পত্রিকার মাধ্যমে। ‘আর্যদর্শন’ এবং ‘সাধারণী’—দুটি পত্রিকাই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। এর দু বছর পরে নতুন অনুপ্রেরণার জোয়ার আসে। ১৮৭৫-এ কর্নেল অলকট এবং মাদাম ব্লাভাৎস্কি থিওসফিকাল সোসাইটির পত্তন করেন। ভিক্টোরিয় যুগের অলৌকিকত্বে বিশ্বাস এবং তিব্বতে বসবাসকারী বলে কথিত সাধুসন্তদের উপর আস্থার সংমিশ্রণে গঠিত ছিল অদ্ভুত এই সংস্থা। আগেই উল্লেখ করেছি যে এর প্রতিষ্ঠাতারা হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের বাণী প্রচার করতেন, এবং কোনো নাম-না-জানা হিন্দু ধর্মশাস্ত্র থেকে তাঁদের অলৌকিকত্বে বিশ্বাস জন্মেছে, এরকম দাবি করতেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে কর্নেল অলকট কলকাতায় এলে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়। ঐ বছরই শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তের যোগদানের ফলে এ দেশে ঐ আন্দোলন আরও জোরদার হয়। তিনিই প্রথম সব সভ্যতার উপরে, বিশেষত পাশ্চাত্য হিতবাদের তুলনায় আর্য (হিন্দু) সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন।[২৭] সমকালীন বাদামী চামড়ার আর্যদের হিতবাদী মনোভাব পরিত্যাগ করে তিনি তাদের মহান আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে বলেন। মনু স্মৃতি এবং বর্ণাশ্রম প্রথারও তিনি প্রশংসা করেন। এই প্রচারের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে এক বৈদ্যুতিক উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। শিক্ষিত ভারতীয়রা এ যাবৎ পশ্চিমীদের কাছ থেকে নিজেদের ঐতিহ্যের নিন্দাবাদ ছাড়া আর কিছুই আশা করতে পারত না। পশ্চিমে সেই ঐতিহ্যের সুচিন্তিত এবং সংবেদ্য মূল্যায়নের যে কারণ তা সোচ্চারে ধ্বনিত না হওয়ায় সাধারণের কাছে সুপরিচিত ছিল না। এখন পাশ্চাত্য জগতের কিছু বিখ্যাত ব্যক্তিই তাঁদের সভ্যতার তুলনায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করছেন। যে উচ্চবর্গের মানুষগুলি এতদিন নিজেদের সম্বন্ধে ঔপনিবেশিক প্রভুদের ঘৃণাপূর্ণ মনোভাবের অংশীদার ছিলেন, তাঁদেরও আহত আত্মাভিমান এই নতুন মতবাদের প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণ বোধ করেছিল। সম্ভ্রান্ত, বিদগ্ধ বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই থিওসফির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী, সিভিলিয়ান আশুতোষ চৌধুরী এবং ইয়েটস্-এর বন্ধু মোহিনী চ্যাটার্জী। বিংশ শতকে বাংলার বাইরে এই আন্দোলনের একজন উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা ছিলেন কৃষ্ণ মেনন। শোনা যায় নেহরুও যৌবনে এই মতবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।[২৮]

পশ্চিম থেকে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের লেখনী ভারতীয়দের আত্মগৌরব আরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িয়ে তুলেছিল। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় তিনি প্রমাণ করেন যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী এবং আর্যসম্ভূত জাতিগুলির উৎপত্তিস্থল এক। তাঁর এই তত্ত্বে ব্রিটিশ প্রভু এবং পদানত ভারতীয়রা যে একই পিতৃপুরুষের বংশধর, সাধারণের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয়। ফলে আর্যত্ব প্রচারের ধূম পড়ে যায়। পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সভা-সংগঠন, সর্বত্র আর্যত্বের গর্ব প্রকাশ করা হয়। ঠাকুর পরিবারের দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ এই মনোভাবকে উপহাস করেছিলেন এবং কিপলিং শ্বেতকায়দের এই বাদামী আর্যজাতিকে ঘাঁটাতে নিষেধ করে ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন।* কিন্তু যাঁরা এই অলীক গৌরবের ফাঁদে পড়েছিলেন তাঁরা এসবে কর্ণপাত করেননি।

আর্যত্ব এবং হিন্দু প্রতিক্রিয়ার প্রবক্তারূপে কয়েকজন আবির্ভূত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের প্রভাব স্থায়ী হয়নি। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে চরমপন্থী ছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণি এবং কৃষ্ণবিহারী সেন এবং অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী প্রবক্তা ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু। সাহিত্যের জগতে যাঁরা সিংহবিক্রমে এই মত প্রচার করেছিলেন, তাঁরা হলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগীন্দ্রনাথ বসু। আন্দোলনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়টি অতি প্রাঞ্জল, তা হল হিন্দু ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্ব, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয়দের পক্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ যুক্তিহীন। ভারতীয় হিন্দুরাই শ্রেষ্ঠ আর্য, শুধু তাই নয়—তারাই প্রকৃত আর্য রক্তের অধিকারী ; প্রচলিত হিন্দু রীতিনীতিগুলি যুক্তিসঙ্গত তো বটেই, তাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার আবিষ্কারগুলি বহুকাল পূর্বেই আর্য ঋষিগণ অনুমান করেছিলেন। বঙ্কিমের মত যাঁরা পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের আলোকে হিন্দুধর্মের বিচার করতে গিয়েছিলেন, তাঁরাও, সর্বধর্মের মৌলিক ঐক্য যাঁদের প্রতিপাদ্য ছিল, সেই সর্বধর্ম সমন্বয়কারীদের মতই অলীক চিন্তার শিকার হয়েছিলেন।[২৯] সামাজিক সংস্কার—বিশেষত ব্রাহ্ম রীতিতে নারীজাতির মুক্তিসাধন সমাজকে দুর্নীতি এবং অবক্ষয়ের পথে নিয়ে যাবে[৩০]—"একমাত্র ভারতীয় ঐতিহ্যেই মানুষ সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে",[৩১] সুতরাং আর্যগৌরব পুনরুদ্ধার করাতেই মানুষের মুক্তি নিহিত আছে বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন।[৩২] আধুনিক পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্বের অপব্যাখ্যা দিয়ে এইসব মতবাদ উপস্থাপন করা হত। বিদ্যুচ্চুম্বক তত্ত্ব (ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিজিম) বিশেষ রকম জনপ্রিয় হয়েছিল। নিজেদের মতকে যুক্তিগ্রাহ্য করবার জন্য সংস্কৃত সাহিত্যেরও যথেচ্ছ অপব্যবহার করা হত। খ্রিস্টধর্মের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করবার জন্য অশালীন শ্লেষালঙ্কার ব্যবহার করা হত। অত্যন্ত সাময়িকভাবে হলেও পরাধীন জাতির হীনম্মন্য বুদ্ধিজীবীদের কাছে এর একটা আবেদন ছিল। অনেক শিক্ষিত যুবক উপবাস, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ প্রভৃতি আচার পালনের মাধ্যমে পুরাতন সংস্কারগুলির পুনঃপ্রচারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বইয়ের নাম থেকে শুরু করে ওষুধের দোকানের নাম পর্যন্ত সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় 'আর্য' শব্দটি ব্যবহার করা হত। ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উপরেও এই প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু ধর্মের গভীর প্রভাব পড়েছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্রাহ্ম থেকেও রাজনারায়ণ বসু হিন্দু ধর্মের

* "It is not good for the Christian white
To Hustle the Aryan brown."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন এবং আশা প্রকাশ করতেন যে শুধুমাত্র হিন্দুদের নিয়ে এক মহান হিন্দুসভা গঠিত হবে এবং সেই সভার প্রতিনিধিরা জাতীয় কংগ্রেসে মুসলিমদের নিয়ে একসঙ্গে কাজ করবে।[৩৩] সাময়িকভাবে এবং নিতান্ত পরোক্ষভাবে হলেও এই গ্রন্থে আলোচিত তিনজন মনীষীই এই প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি বোধ করেছিলেন।

তর্কচূড়ামণি এবং কৃষ্ণবিহারী সেনের উগ্র মতবাদের সঙ্গে ভূদেবের যুক্তিসিদ্ধ বক্তব্যের কোন মিলই ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁদের মতাদর্শের প্রতি তিনি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। জনৈক গবেষক মন্তব্য করেছেন যে শশধরের পরামর্শ নিয়ে এবং অন্যান্যদের সহায়তায় ভূদেব "ভারত ধর্ম মহামণ্ডলী" স্থাপন করেছিলেন।[৩৪] কিন্তু পুত্রের লেখা নির্ভরযোগ্য জীবনচরিতে মণ্ডলীর সহস্থাপয়িতারূপেও ভূদেবের নাম করা হয়নি। মণ্ডলীর প্রচারকের সঙ্গে পরিচিত হবার পর ভূদেব তাঁর প্রশংসা করে দ্বিতীয় পুত্রকে লিখেছিলেন: "শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রকৃত ভাল লোক। ...তিনি অত্যন্ত লোকপ্রিয় এবং ভাল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ; কিন্তু তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেওয়া হয় নাই।"[৩৫] উক্ত জীবনীকার হিন্দু প্রতিক্রিয়ার আর এক প্রবক্তা চন্দ্রনাথ বসুর নাম উল্লেখ করে "পিতৃদেবের পরমভক্ত" বলে মন্তব্য করেছেন।[৩৬]

পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও তাঁদের মতামত অভিন্ন ছিল একথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। অধঃপতিত হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত "মণ্ডলী"তে শশধরের আদর্শ আংশিক রূপায়িত হয়েছিল। ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ভূদেব মন্তব্য করেছেন: "হিন্দুধর্ম অধঃপতিত, একথা আর যে বলে বলুক, আমি বলিব না। ...বস্তুত হিমালয় পর্বত যদি অধঃপতিত হয় পাটকাটি দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া উঠান যায় না, হিন্দুধর্ম অধঃপতিত হইলে শশধর তর্কচূড়ামণি, কি রাজা প্যারীমোহন, কি ভূদেব মুখুজ্যে, তাহা উদ্ধার করিতে পারিবেন না।"[৩৭] হিন্দু প্রতিক্রিয়ার মুখপত্র 'ভাস্কর'কে উগ্ররকম গোঁড়া মনে করতেন বলেই ভূদেব 'এডুকেশন গেজেট' প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সে সময়কার প্রধান উপজীব্য বিষয়টি কিন্তু ছিল রাজনৈতিক—ধর্মীয় কিংবা সামাজিক নয়। ভূদেবের মতে ভালমন্দ বিচার না করেই নতুন সবকিছু গ্রহণ করাও যেমন, কোনো পরিবর্তন মেনে না নেওয়াও তেমনি কুসংস্কার পদবাচ্য।[৩৮] তাছাড়া নব্যহিন্দু আন্দোলনের বিভিন্ন উচ্ছ্বাসকেও তিনি মেনে নিতে পারেননি। বিশেষত থিওসফি—একে তিনি ভেজাল হিন্দুধর্ম বলেছিলেন।[৩৯] পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা, যে বিষয়ে তিনি রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে একমত ছিলেন। বন্ধুর 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' নামক অত্যন্ত জনপ্রিয় রচনার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ভূদেব ছদ্মনামে 'এডুকেশন গেজেটে' লেখেন: "আমি রাজনারায়ণ বসুর গোঁড়া"।[৪০] এই প্রবন্ধের দীর্ঘ প্রশস্তি[৪১] সত্ত্বেও 'সামাজিক প্রবন্ধে' তিনি এর সমালোচনা করেছিলেন, কারণ তাঁর মতে রাজনারায়ণ পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে সবকিছুর বিচার করেছেন। "গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা কিরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন ? এই মাত্র দেখাইয়াছেন যে উহা ইংরাজদিগের ধর্মের সহিত মিলে। গ্রন্থকর্তার মনের মানদণ্ড ইংরাজ।"[৪২] ঐ প্রবন্ধের অনুকূল সমালোচনায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে ভূদেবের বিশ্বাসের কারণ স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত হয়েছে: "যে ধর্মপ্রণালী সুদূরদর্শী, গাঢ় চিন্তাপরায়ণ, পবিত্রমনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহর্ষিদিগের দ্বারা সৃষ্ট হইয়া আর্যসন্তানগণকে বহু সহস্রবর্ষাবধি পাপস্পর্শ হইতে বিমুক্ত রাখিয়াছে, যে ধর্মপ্রণালী সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধনের সোপান হইয়া এই বহ্বায়ত ভারতভূমি নিবাসী হিন্দুমাত্রর মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে একজাতিত্বভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, যে ধর্মপ্রণালী সুখময়, পবিত্রতাময় হিন্দু গার্হস্থ্যধর্মের প্রবর্তক হইয়াছে, যে ধর্মপ্রণালী আধ্যাত্মিক চিন্তার চরম উদ্দেশ্য যে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে সংসাধিত করিয়াছে, যে ধর্মপ্রণালী হিন্দু জাতীয়দিগকে পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা অস্বার্থপর, ঈশ্বরপরায়ণ এবং পারলৌকিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছে, সেই ধর্মপ্রণালীর গুণগরিমা গরীয়ান হইলে কাহার অন্তঃকরণে তৃপ্তিবোধ না হয় ?"[৪৩] অন্তর্নিহিত শক্তি এবং উন্নত প্রকৃতির জন্যই হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল।[৪৪] "ব্রাহ্মণাচারব্রত" পৃথিবীর সকলের অনুকরণীয় বলে তিনি মনে করতেন।[৪৫] নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শকরূপে পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্যবিশিষ্ট যে সমাজের কথা কোঁৎ বলেছেন, ভূদেব তাকে হিন্দুসমাজের যথার্থ বিবরণ বলে স্বাগত জানিয়েছেন। এর ভিত্তিতেই তিনি বলেন যে অন্যান্য যে কোনো সমাজের তুলনায় হিন্দু সমাজে আধ্যাত্মিক আদর্শ অনেক বেশি।[৪৬] খ্রিস্টধর্মের যাবতীয় সদগুণ এবং ইংরাজ জাতির ধর্মীয়-সামাজিক আচরণবিধি হিন্দুধর্মে আছে। উপরন্তু পবিত্রতা, নিষ্কামতা, পরার্থজীবন প্রভৃতি গুণ হিন্দুধর্মে আছে, যা খ্রিস্টধর্ম অথবা, ইউরোপীয় সমাজে বিরল।[৪৭] হিন্দুদের ধর্মান্তর গ্রহণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ জীবনে প্রয়োজনীয় সবকিছুই তো তাদের ধর্মে আছে।[৪৮] ব্রাহ্মদের প্রতি তাঁর সহৃদয়তার কারণও ছিল যে তারা খ্রিস্টধর্মের আক্রমণ প্রতিহত করেছিল।[৪৯] তাছাড়া, ঐ ধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় সব ধর্ম গভীরভাবে চর্চা করে উপনিষদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছিলেন। পাশ্চাত্য জগতে সোপেনহাওয়ারও একই কথা বলেন।[৫০] হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের উপলব্ধি ভূদেবের জীবনে মাতৃদুগ্ধের মত মিশে গিয়েছিল, তার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না ; মাত্র একবারই তা বিঘ্নিত হয়েছিল। হিন্দুধর্মের সেই দিকটিই তিনি তুলে ধরেছিলেন যাকে তিনি সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক এবং দার্শনিক আদর্শ বলে মনে করেছিলেন। জীবনে এবং মরণেও তিনি ব্রাহ্মণ্য আচার নিষ্ঠাসহকারে পালন করেছিলেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাঁর মুমূর্ষু দেহকে গঙ্গাতীরে রাখা হয়, এবং সেখানেই, স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানমত,[৫১] দৃপ্ত ব্রাহ্মণের উপযুক্ত মর্যাদায়, তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।

এই গভীর বিশ্বাসের জন্যই তিনি সমসাময়িক সংস্কার প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সবল যুক্তি দিয়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নিষ্ঠা অন্ধবিশ্বাস নয়, হিন্দু প্রতিক্রিয়ার অশিষ্ট উচ্ছ্বাসও নয়। প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল বলেই তার ভিত্তিতে মেকী বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করে তিনি হিন্দু সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং আচরণবিধির যাথার্থ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি। তিনি সম্পূর্ণ অন্যভাবে হিন্দুসমাজে প্রচলিত নিয়মাবলীর গুণমান প্রমাণ করেছিলেন। তাঁর মতে একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে হিন্দু আদর্শের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ বিধৃত হয়েছে, তা হল, পরার্থে আত্মসুখ বিসর্জন দেওয়া। তা ছাড়া, যে ভূমিব্যবস্থায় জমিতে পরিবারের যৌথ স্বত্ব স্বীকৃত ছিল, যৌথ পরিবার সেই কৃষিভিত্তিক সমাজের স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ইংরাজ যৌথ স্বত্ব অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু ভারতবাসী কেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশী আদর্শ গ্রহণ করবে ? বাল্য বিবাহ হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, সর্বক্ষেত্রে তা প্রযোজ্যও নয় ; কিন্তু ভারতের কৃষিভিত্তিক সমাজের পক্ষে তা অপরিহার্য এবং সেখানে তার প্রয়োজন কোনোদিন ফুরিয়ে যাবে না। যে সব যুবক আধুনিক জীবনযাত্রায় অভিলাষী, অথবা, দেশের উন্নতিকল্পে বিদেশে গিয়ে শিল্প এবং কৃষিবিষয়ক প্রযুক্তিবিদ্যা শিখে আসতে চান, তাদের পক্ষে বাল্যবিবাহ অসুবিধাজনক হতে পারে, কিন্তু শুধু ইংরাজদের অপছন্দ বলেই এই প্রথাকে সর্বতোভাবে বিসর্জন দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই।[৫২] বর্ণাশ্রম ধর্মের পক্ষে সাধারণভাবে প্রচলিত মত যে এই প্রথা নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে হিন্দুত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে, কিন্তু তা ছাড়াও এই প্রথার আরও অনেক গুণ আছে বলে তিনি মনে করতেন। একমাত্র দ্বিজত্বের অহঙ্কারই রাজনৈতিক পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হীনম্মন্যতা থেকে জাতিকে রক্ষা করতে পারে। ব্রহ্মদেশে তিনি অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিদের আক্ষরিক অর্থে ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর পাদ-প্রক্ষালন এবং পূজা করতে দেখেছিলেন। ভারতবর্ষে যতদিন বর্ণাশ্রম প্রথা সক্রিয় থাকবে ততদিন ঐ রকম ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়। ভারতের দীন-দরিদ্রও এত ছোট হতে পারবে না।[৫৩] হিন্দুদের বিরুদ্ধে সঙ্কীর্ণতার অপবাদ দেওয়া হয়, এবং একথা ঠিক যে কূপমণ্ডূকতা সর্বক্ষেত্রেই দূষণীয়। তবে ভূদেব হিন্দুদের আপাত সঙ্কীর্ণতার মধ্যে একটি সদ্‌গুণ লক্ষ্য করেছিলেন : "হিন্দুর বাসভূমি সমুদায় পৃথিবী মণ্ডলের প্রতিকৃতিস্বরূপ। এই বাসভূমির বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন পুণ্যতীর্থ—তীর্থ দর্শন করা শাস্ত্রের বিধি, আর হিন্দুরা সেই বিধি পালনপূর্বক পর্বে পর্বে তীর্থে পর্যটন করিয়া বেড়ান। অতএব স্থূলদৃষ্টিতে হিন্দুদিগকে যত বদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহারা তত বদ্ধভাবাপন্ন নহে।" এই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুর গণ্ডিবদ্ধতাকে মানসিক সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। সমুদ্রযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞার কোনো ঐতিহাসিক কারণ ছিল বলে তিনি বিশ্বাস করতেন—সম্ভবত আরব জলদস্যুগণ কর্তৃক ভারতীয় বাণিজ্যতরীর বিনাশসাধনই এর কারণ। উনবিংশ শতকে বিদেশ প্রত্যাগতদের ঔদ্ধত্যের জন্যই তাদের সমাজচ্যুত করা হত। বঙ্গের তুলনায় মহারাষ্ট্রে এই নীতি অনেক উদার ছিল। মারাঠীদের মত বাঙালি 'বিলাৎ-ফেরৎ'রাও যদি নিজেদের সমাজের প্রতি একটু শ্রদ্ধাশীল হতেন, তাহলেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।[৫৪] তাছাড়া, বিদেশ-ভ্রমণ করলেই যে সঙ্কীর্ণতা দূর হবে এমন তো কোনো প্রমাণ নেই, বরং ভারতের ব্রিটিশদের ব্যবহার অন্যরকমই প্রমাণ করে।[৫৫]

ভূদেব সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টার মধ্যে ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে ব্রিটিশদের মতামতকে বিনাবিচারে মেনে নেওয়ার প্রবণতা দেখেছিলেন। স্বাধীন চিন্তা ব্যতীত কোনো উন্নতি সম্ভব নয়—নিজের এই বিশ্বাস ছিল বলে তিনি সংস্কারদের প্রচেষ্টাকে অকল্যাণকর মনে করেছিলেন। বিধবা-বিবাহের প্রচেষ্টাকে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত মহান ব্যক্তিত্বের কলঙ্ক বলে দেখেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি একটু অস্বস্তিতে পড়েছিলেন, কারণ বিদ্যাসাগরের মত ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যের বিশিষ্ট সম্পদ পরাশর-স্মৃতি নির্ভর, অন্যান্যদের মত বিদেশী মতের অনুকরণ নয়। পরবর্তীকালে "সহবাস সম্মতি" আইন আন্দোলনেও বিদ্যাসাগর "স্মৃতির মতবাদ ত্যাগ করিয়া ইংরাজি মতের পোষক অন্য কিছু খুঁজিতে যান নাই", তাতে ভূদেব তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন।[৫৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"স্বজাতীয়দের অধীনে থাকিয়া ভিন্ন জাতীয়দের আগমন হইতে দেশরক্ষা করিতে পারিলে যেমন স্বাধীনতা রক্ষিত হইল বলা গিয়া থাকে, তেমনি আপনার শাস্ত্রের অধীনে থাকিয়া ভিন্নজাতীয় শাস্ত্রকে যুক্তিমুখে নিজের পক্ষে অনুপযোগী প্রতিপন্ন করিয়া প্রত্যাখ্যাত করিলেই মানসিক স্বাধীনতা রক্ষা করা হয়"[৫৭]—ভূদেবের কাছে এই ছিল সুস্থ সামাজিক জীবনের মূলমন্ত্র। যুগ যুগ ধরে হিন্দুসমাজের সহিষ্ণুতা এবং পরিবর্তনশীলতা প্রমাণিত হয়েছে। শাস্ত্রের বিধানগুলি থেকেই প্রমাণিত হয় যে এই ঐতিহ্য পরিবর্তন বিমুখ নয়, কিন্তু পরিবর্তন করতে হবে সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রেখে। অর্থাৎ, পরিবর্তনের গতি হবে ক্রমান্বয়িক, এবং ঐতিহ্য-বিরোধী হলে সে পরিবর্তন গ্রাহ্য হবে না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের তথাকথিত স্বাধীনতা তাদের পাশ্চাত্যের প্রতি দাসসুলভ মানসিকতার নামান্তর। পাশ্চাত্য আদর্শও গ্রহণযোগ্য হবে যদি তাতে ব্যক্তি যথার্থ স্বাধীনতার অধিকারী হয়, অর্থাৎ তার নিজস্ব রীতিনীতি বজায় থাকে। স্বাধীনতার এই ব্যাখ্যাই মানুষের উন্নতির ভিত্তি।[৫৮] শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত অবস্থাকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়েছে; নতুন নতুন প্রয়োজন অনুসারে পণ্ডিতরা বারবার শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। উন্নতির পথ খুঁজতে গেলে এই সুপরীক্ষিত পথের কথা ভুললে চলবে না। "উপদেষ্টার প্রাধান্য সংযম ও বিদ্যাবত্তার উৎকর্ষে; অতএব ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সংযমশীল ও বিদ্যাবান করিয়া রাখিবার চেষ্টা কর, সকল শুভফল ফলিবে এবং হিন্দুসমাজের সম্যক বলবত্তা জন্মিবে।"[৫৯] হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা সচেতন আত্মনিবেদনের সমতুল্য। "নিজের সমাজ মানুষের পিতার মত"—তিনি লিখেছেন, এবং পিতার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় মমতা সমাজের প্রতি স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয়েছিল। নব্য যুক্তিবাদের আলোকে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের মূল্যায়ন করে সেই মানদণ্ডে ভূদেব সব সাংস্কৃতিক ব্যাপারকে বিচার করতে চেয়েছিলেন। তার জন্যই তাঁর ইউরোপের সংস্কৃতিকে গভীর ভাবে জানা এবং বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়েছিল।

AMARBOI.COM

নিজের সমাজের প্রতি ভূদেবের মমত্ব তাঁর ঐকান্তিক দেশপ্রেমেরই প্রকাশ। বরং তাঁর এই দুই প্রকার মমত্বকে একই গভীর এবং ঐকান্তিক অনুভূতির দ্বৈত অভিব্যক্তি বলা যায়। সমাজকে যদি তিনি ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতীক নিজের পিতৃরূপে দেখে থাকেন, তবে দেশকে তিনি দেখেছিলেন মাতৃরূপে, যে দেবী "নিরন্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্নপান প্রদান করিতেছেন।"[৬০] শিবজায়া সতীর মৃতদেহ বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রে খণ্ডিত হয়ে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তা থেকেই হিন্দুদের অতি পবিত্র "বাহান্ন পীঠ" গড়ে উঠেছিল। ভূদেব এই পৌরাণিক কাহিনীর নতুন ব্যাখ্যা করেছিলেন: "যখন হিন্দু কলেজে পড়িতাম, তখন সাহেব শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে হিন্দুজাতির মধ্যে স্বদেশানুরাগ নাই। কারণ ঐ ভাবার্থ প্রকাশক কোনো কার্যই কোনো ভারতবর্ষীয় ভাষায় নাই। তাঁহার কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাস নিবন্ধন মনে মনে যৎপরোনাস্তি দুঃখানুভব করিয়াছিলাম। তখন অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ হইতে দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক বিবরণ জানিতাম। কিন্তু সেই বিবরণ জানিয়াও শিক্ষক মহাশয়ের কথার প্রকৃত উত্তর অথবা আপনার মনকে প্রবোধ প্রদান করিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিয়াছি যে আর্যবংশীয়দের চক্ষুতে বাহান্ন পীঠ সমন্বিত সমুদায় মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বরী দেহ।"[৬১] পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশাত্মবোধ আবিষ্কার করা অবশ্যই কষ্টকল্পনা, কিন্তু লেখকের নিজের দেশপ্রেম ছিল নিখাদ। তাঁর সমস্ত রচনার উৎস তাঁর দেশপ্রেম। তাঁর সমস্ত শিক্ষামূলক এবং সামাজিক প্রবন্ধের ভিতর জাতীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে দেশের উন্নয়নের পরিকল্পনা ছিল। ভাষার দিক থেকে যাকে বঙ্কিমের পূর্বগামী বলা যায়, সেই 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসে শিবাজীকে আদর্শ হিন্দুনেতারূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই কাহিনীর গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল নিষ্কাম কর্মের আদর্শে জাতীয়তাবোধ জাগরিত করা। এক হিন্দু রাজপুত্র ও মুসলিম রাজকন্যার প্রণয়কে কেন্দ্র করে তিনি এই উপন্যাসের কাহিনী বিস্তার করেছিলেন। তাঁর 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' বাস্তব ঘটনা বিরোধী ; সেখানে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের জয় সূচিত করে তিনি এক রামরাজ্যের চিত্র অঙ্কন করেছেন, যেখানে আদর্শবাদী হিন্দু সম্রাটের অধীনে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সমন্বয় হয়েছে, ধর্মের সঙ্গে জনগণের অধিকারের সংহতি সাধিত হয়েছে। 'পুষ্পাঞ্জলি' এবং 'স্বয়ম্বরাভাসপর্ব' এক অসমাপ্ত হিতোপদেশের আখ্যান ; পুরাণগুলিকে অনুসরণ করে লেখা 'উনবিংশ পুরাণ' নামক রূপক কাহিনীতে দেবী অধিভারতীরূপে[৬২] কল্পিত ভারতমাতার জয়গান এবং বিদেশী শাসনে তাঁর দুর্দশার বিবরণ। হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থায় তাঁকে ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কিছুটা স্থিরনিশ্চয়ভাবেই তিনি বলেছিলেন : "যেন অনুমাত্রও দেশের কোনো কাজে লাগতে পারি।"[৬৩] দিনপঞ্জিকায় বারবার তিনি লিখেছিলেন, "আমার স্বদেশবাসীর স্থায়ী উপকার হইতে পারে এরূপ কোন কার্য্য আমি করিতে পারি ?"[৬৪] নিজের ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে সৃষ্ট, পিতার নামাঙ্কিত "বিশ্বনাথ তহবিল" এই আকাঙ্ক্ষারই বাস্তব রূপায়ণ।[৬৪]

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে এই তহবিল গঠনের মধ্যে দিয়ে দেশের প্রয়োজন সম্বন্ধে ভূদেবের চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা কতগুলি ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে, যেমন, শাস্ত্রপাঠে চিন্তার স্বাধীনতা খর্ব হয়।[৬৬] "মনুষ্যে পশুধর্ম এবং জড়ধর্ম দুইই আছে। ঐ পশুভাবের ন্যূনতাসাধন আমাদিগের শাস্ত্রের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য।... শাস্ত্রাচার স্বাধীনতা নষ্ট করে না ; উহা দ্বারা জড়তার হ্রাস হওয়াতে প্রকৃত স্বাধীনতার বৃদ্ধিই হয়।"[৬৭] ব্রিটিশদের উন্নতির মূলে আছে "তাহাদের স্বদেশের ও স্বধর্মের উপযোগী আচার রক্ষা নিবন্ধন শরীর এবং মনের দৃঢ়তা এবং পটুতা এবং পরস্পর ঐকান্তিক সহানুভূতি। তাহাদের প্রাধান্যের হেতু অনাচার বা অত্যাচার নহে।" সুতরাং এদেশীয়গণও শাস্ত্রোক্ত আচারসমূহ পালন করে ব্রিটিশদের চেয়েও গুণপনা বাড়াতে পারে।[৬৮] এই মন্তব্য থেকে ইউরোপ সম্বন্ধে ভূদেবের অনুসন্ধিৎসার কারণ বোঝা যায়, আরও বোঝা যায় যে তিনি চেয়েছিলেন, ইউরোপের জয়যাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে ভারতবাসী শিক্ষা গ্রহণ করুক।

ভারতের ঐক্যবিনাশী শক্তিগুলি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলেই তিনি ইউরোপীয় ঐতিহ্যকে বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতে দেশের দুর্বলতার অন্যতম কারণ দেশবাসীর জাতীয় স্বার্থবোধের অভাব। নৈতিক বিচারে এই বোধকে ভাল বলে তিনি মোটেই স্বীকার করতেন না, কিন্তু জাতীয়তাবাদের বিকাশের জন্য এই মনোবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। একবার এক ইংরাজের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথোপকথনের সময়ে তিনি ভারতীয়দের প্রসঙ্গে "আমরা" বলে উল্লেখ করেছিলেন ; পরিচিত ইংরাজ ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে উষ্মা প্রকাশ করে বলেন : "দেখ, তোমার যদি 'আমরা' বলিবার যো থাকিত, তাহা হইলে আমরা এখানে থাকিতাম না।" ভূদেব নীরবে এই অপমান মাথা পেতে নিলেন।[৬৯] ঔপনিবেশিক প্রভুদের দ্বারা এক সম্প্রদায়ের সামান্য-উপকার সাধিত হলে অন্যরা তাতে ক্ষুব্ধ হয়, দেশবাসীর এইরকম পারস্পরিক ঈর্ষার মধ্যে ঐক্যবোধের অভাব প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তাঁর মতে এই ঈর্ষা নতুন-সৃষ্ট। দেশের সজ্জন ব্যক্তিদের সম্মান করতে না পারাও ঐ একই মানসিকতার লক্ষণ। বিদেশী শাসনের অধীনে ভারতীয়রা অনেক বিষয়েই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে, যেমন ইংরাজি ভাষায় পারদর্শিতা। কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুর স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত এইসব গুণের কোনো কদর হয় না।[৭০] সর্বোপরি আছে পরাধীনতার দরুন সৃষ্ট হীনম্মন্যতা : "অধীন জাতীয়েরা সম্মিলিত হইয়া বিপক্ষতা করিলে অবশ্যই কর্তৃত্বশালী পুরুষকে কিংবা জাতিকে পরাভূত করিতে পারে ; কিন্তু কর্তৃত্ব এমনই সম্ভ্রমের আধার যে অত্যাচার করা দূরে থাকুক, কেহ তৎপ্রতি অসঙ্কুচিত দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হয় না।"[৭১]

দুর্বলতা এবং অসম্প্রীতির প্রতিষেধক জাতীয় ঐক্য। ভারতের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ভূদেবের ধারণা খুবই ব্যাপক ছিল। এ বিষয়ে সমকালীন অন্যান্য চিন্তাবিদ এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলির তুলনায় তাঁর ভাবনা অনেক অগ্রগামীও ছিল। কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করার ফলে মুসলিম সম্প্রদায় এবং তাদের সংস্কৃতির প্রতি তাঁর চিরস্থায়ী শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছিল। অহিন্দুর সঙ্গে একত্র আহারাদি ব্যাপারে শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে থেকেও তিনি তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।[৭২] মুসলিমদের প্রসঙ্গে তিনি মাত্র দুবার প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞাসূচক 'যবন' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।[৭৩] ভূদেব রচনাবলীর মধ্যে আর কোথাও আমি এই শব্দটি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাইনি। তাদের সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি নির্দোষ এবং সৌজন্যসূচক 'মুসলমান' শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে সমসাময়িক ব্রাহ্ম নেতা রাজনারায়ণ বসু[৭৪] এবং শিবনাথ শাস্ত্রী[৭৫] মুসলিমদের প্রসঙ্গে ঐ আপত্তিজনক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ভারতের ইতিহাসে মুসলিম সংস্কৃতির অবদান সম্পর্কে ভূদেব নিঃসংশয় ছিলেন। 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' একজন মারাঠা নেতার মুখে তিনি এই উক্তি দিয়েছেন : "আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্তর্বিবাদানলে দগ্ধ হইয়া আসিতেছিল, আজি সেই বিবাদানল নির্বাপিত হইবে।...ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহার পর নহেন, ইনি উহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহার পালিত সন্তান। এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃসম্বন্ধ হয় না ? অবশ্যই হয়, সকলের শাস্ত্রমতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষ নিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধ জন্মিয়াছে। বিবাদ করিলে সেই সম্বন্ধের উচ্ছেদ করা হয়।"[৭৬] রূপক উপাখ্যান 'পুষ্পাঞ্জলি'তে তিনি ভারতের ইতিহাসে মুসলিমদের অবদান এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : "ইহারা সাহসিক, বীর্য্যবান ও একাগ্রচিত্ত। ইহারা মহাদেশটিকে পুনর্বার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একচ্ছত্রের অধীন করিল ; ভাষাভেদ প্রায় রহিত করিয়া আনিল ; হর্ম্ম্য এবং বর্ত্মাদির নির্মাণ দ্বারা দেশের শোভা সম্পাদন করিল, এবং মনুষ্যমাত্রেই পরস্পর তুল্য এই মহাবাক্যের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ দ্বারা সম্মিলন সাধনের যত্ন করিল। কিন্তু ইহারা রজোগুণপ্রধান, বিলাসপরায়ণ এবং সুখাভিলাষী লোক। ইহাদিগের সমাগমে মহাদেশ মধ্যে সত্ত্ব ও রজোগুণের একত্র অবস্থানমাত্র হইল, উভয়গুণের সম্মিলন সাধন হইল না। ইহাদিগের মধ্যে অতি অল্পমাত্র লোকেই দেবীর মন্দির মানসিয় আসনপ্রাপ্ত হইয়া আছেন।"[৭৭] বাঙালি হিন্দু লেখকদের মধ্যে বোধহয় তিনিই প্রথম অকুণ্ঠভাবে মুসলিম শাসনকে ব্রিটিশ শাসনের তুলনায় শ্রেয় বলেছেন। সমসাময়িক অনেকের মত তাঁরও খ্রিস্টধর্মের তুলনায় ইসলামের উৎকর্ষে বিশ্বাস ছিল।[৭৮] অবশ্য তর্কের খাতিরে বলা যায় যে ঔপনিবেশিক-বিরোধী মনোভাব থেকেই এই মতবাদ জন্ম নিয়েছিল। উনবিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য হিন্দু লেখকদের মধ্যে ভূদেব একমাত্র না হলেও, তিনিই প্রথম, যিনি, ভারতে মুসলিম শাসনের প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক অসদুদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত বলে সমালোচনা করেছিলেন।[৭৯] সেই ব্যাখ্যা সমকালীন পাশ্চাত্যভাবধারাগ্রস্তদের সমাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বাংলার মুসলিম শাসকরা হিন্দু জমিদারদের জমি গ্রাস করেছিলেন—মার্সম্যানের এই উক্তি তিনি বিশেষরকম অতিরঞ্জন বলে খণ্ডন করেছিলেন। তাঁর মতে হিন্দু জমিদারদের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত তুর্কীদের পক্ষে অত তাড়াতাড়ি উত্তর-পূর্ব ভারতে ক্ষমতা বিস্তার করা সম্ভব ছিল না।[৮০] মুসলিমদের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির প্রতিও তাঁর সহানুভূতি ছিল। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে যখন আমীর আলি এবং আব্দুল লতিফের নেতৃত্বে বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় কংগ্রেসে যোগদানে বিরত হলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে এর মধ্যে ঐ নেতাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রশ্ন উঠতেই পারে না। তৃতীয় পুত্রকে লেখা পত্রে তিনি মন্তব্য করেছিলেন : "আব্দুল লতিফ প্রভৃতি যে আলাদা থাকিতে চাহিতেছেন তাহা স্বজনের সুবিধার জন্য নহে—অতটা ক্ষুদ্র উঁহারা নহেন। ইহাতে মুসলমানদিগের সাধারণভাবে সুবিধা হইবে এই আশা করিতেছেন।" অত্যন্ত বিনীতভাবে তিনি মুসলিমদের এই নীতিকে বাস্তব-বিরোধী বলেছিলেন, কারণ হিন্দুদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে বিদেশী শাসকের তোষণ-নীতি নেহাৎই ক্ষণস্থায়ী।[৮১] ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতে বিভেদনীতি প্রয়োগের কথা তিনি বলেননি, কিন্তু কোনো কোনো আমলা কর্তৃক সাম্প্রদায়িক সংহতি বিনষ্ট করার প্রচেষ্টার কথা বলেছিলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে "এ সব চেষ্টা বিফল হইবে।"[৮২] মুসলিমদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা এবং হিন্দু-মুসলিম সংহতির অপরিহার্যতা বিষয়ক অনুভূতিসম্পন্ন জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যথাযথ মূল্যায়ন, সেইসঙ্গে ইউরোপের ইতিহাসের বিবর্তনের ধারাটি যথার্থভাবে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

উনবিংশ শতকের আশির দশকে জাতীয়তাবাদী প্রচারের অন্যতম বিষয় ছিল হিন্দু-মুসলিম সংহতির প্রয়োজনীয়তা। নিপীড়িত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার দৃঢ় প্রচেষ্টায় ভূদেব নিজেকে যুগের চেয়ে অগ্রগামী বলে প্রতিপন্ন করেছেন। হিন্দু ঐতিহ্য অনুযায়ী জন্মসূত্রে মানুষের জাতিভেদে তাঁর আস্থা ছিল, কিন্তু বৃত্তি এবং আয় অনুসারে নতুন শ্রেণীভেদ তিনি মানতেন না।[৮৩] বর্ণবৈষম্য সম্বন্ধেও তাঁর আপত্তি ছিল। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসকে তিনি দুই পর্যায়ে অনুশোচনার বিবরণ বলে ব্যাখ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন।[৮৪] অস্পৃশ্যতার দ্বারা হিন্দুরা মানুষকে পশুর চেয়েও হীন বলে গণ্য করে—এটা একটা অমার্জনীয় অপরাধ বলে তিনি মনে করতেন।[৮৫] বিদ্যালয়-পরিদর্শকের পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন।[৮৬] বিশেষত সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি সরকারকে নানাভাবে চাপ দিয়েছিলেন।[৮৭] 'বাঙলার ইতিহাসে' তিনি বাঙালি রায়তদের দুর্দশার কথা বিশেষত নীলকরদের লুণ্ঠনের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।[৮৮] কৃষকদের অপরিণামদর্শী, অপব্যয়ী বলতে তিনি রাজি ছিলেন না। ১৮৭৯ সালে ঐ মতবাদ খণ্ডন করে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন।[৮৯] যুগ যুগ ধরে অস্পৃশ্যদের শিক্ষা এবং উন্নয়ন ব্যবস্থায় অবহেলা করা হিন্দুদের পক্ষে এক অমার্জনীয় অপরাধ বলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে সব মানুষই যে সমান, হিন্দুদের এই শিক্ষা দেবার জন্যই ভগবান উদার মানসিকতার অধিকারী মুসলিমদের ভারতে পাঠিয়েছেন।[৯০] অনুরূপভাবে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনও 'বিধিপ্রেরিত'। জাতি, ভাষা প্রভৃতির ভিত্তিতে বহুধাবিভক্ত ভারতীয়রা এখন ব্রিটিশ জাতির কাছে দেশপ্রেমের দীক্ষা নেবে। ব্রিটিশ জাতির দেশপ্রেম তাদের নীতিবোধেরও ঊর্ধ্বে।[৯১] শ্রেণী-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের জাতীয় সংহতি সম্বন্ধে উদ্বেগের জন্যই তিনি ইউরোপের জাতীয়তাবাদকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে চেয়েছিলেন। এক বিশ্বজনীন মমত্বের অনুপ্রেরণায় তিনি যে ইউরোপের সমাজে শ্রেণী সম্পর্কের উপর মন্তব্য করেছিলেন, তা যেন ভারতের নির্যাতিত শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তারই অনুরূপ।

প্রাথমিক পর্বে ভারতের জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয়তাবাদীগণকে একই সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুগামী এবং প্রতিবাদী বলে সমালোচনা করা হয়েছে। ভূদেবের ক্ষেত্রে এই সমালোচনা প্রযোজ্য নয়। স্বীয় ব্যক্তিত্বের উপর ভারতীয় ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্যের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর মতামত ছিল সুস্পষ্ট। 'সামাজিক প্রবন্ধে'র উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি মনু স্মৃতি থেকে যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন, তার মধ্যেই তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে : "সর্বত্র সমবেক্ষেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা। শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম নিবিশেত বৈ।"* আদর্শের স্বচ্ছতা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর বক্তব্যে দ্বিত্ব নয়, বরং বিরোধ লক্ষ করা যায়। এই বিরোধের কারণ অনেকটাই নিহিত ছিল ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা এবং তার মধ্যে তাঁর নিজের আমলা পদাধিকারের মধ্যে। বাকিটা পাওয়া যায় প্রধানত ভিক্টোরিয় যুগের মানসিক গঠন ও মূল্যবোধের সূক্ষ্ম প্রভাবের মধ্যে। বস্তুত, নিষ্ঠাভরে ব্রাহ্মণ্য আচার পালন করা সত্ত্বেও, মৌলিক বিচারে তিনিও ছিলেন পাশ্চাত্য ভাবধারা-প্রভাবিত ভদ্রলোক ; কিন্তু নিজের চরিত্রের এই দিকটি সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না।

পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে চিরাচরিত রীতিনীতি অনুসরণ করার জন্য তাঁর যুক্তিরাজির প্রতিপাদ্য ছিল দুটি সিদ্ধান্ত। প্রথমত, ঐতিহ্যভেদে, উন্নতির পরিমাপে এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিচারে ভালমন্দের মাপকাঠিও পরিবর্তনশীল।[৯২]

* জ্ঞানীব্যক্তি জ্ঞানচক্ষুদ্বারা নিখিল বিশ্বকে সমান দেখেন। কিন্তু শ্রুতির প্রামাণ্যহেতু তিনি নিজের বিশ্বাসকেই আঁকড়ে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদেশের নৈতিক এবং সামাজিক মূল্যবোধ ইউরোপের থেকে একেবারেই আলাদা। সুতরাং পরিবার এবং সমাজ প্রসঙ্গে ইউরোপের কিছুই ভারতীয়দের অনুকরণ যোগ্য নয়।[৯৩] দ্বিতীয়ত, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভারতীয় আদর্শে নিঃস্বার্থভাবে অন্যের মঙ্গলকামনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, এবং প্রচলিত পারিবারিক ব্যবস্থায় তা অনুসৃত হয়েছে। ইউরোপীয় আদর্শের তুলনায় তা নিঃসংশয়ে উৎকৃষ্ট। ভারতীয়দের "উন্নতিবিধানের" প্রশ্নে তিনি তাঁর স্ত্রীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন : "অন্ধকার কোথায় ? ঘরের দোর জানালা সব খোলা আছে—অন্ধকার কৈ ? বাহিরেও বড় একটা বেশী আলো নাই, তবে যথেষ্ট রৌদ্র আর ধূলা আছে বটে।"[৯৪]

হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি দৃঢ় আস্থা থেকে উদ্ভূত ভারতের সামাজিক প্রগতির পরিকল্পনাগুলির ভালমন্দ দুদিকই ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত পাঠ্যপুস্তকগুলিতে পাশ্চাত্যদেশীয় নারী-পুরুষকে আদর্শ হিসাবে দেখানোর প্রচেষ্টা হয়েছে বলে তিনি সেগুলিকে সমর্থন করেননি।[৯৫] তাঁর মতে নিজেদের অতীত এবং ঐতিহ্য থেকেই ভারতীয়দের অনুপ্রেরণা পাওয়া উচিত। মাতৃভাষাই শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।[৯৬] কারণ "(এক) জাতি থাকায় তেজস্বিতা, স্বাধীন বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি যে সকল শুভফল দর্শে তাহা আমাদিগের মাতৃভাষার উন্নতি সহকারেই ঘটিতে পারে।"[৯৭] পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন ও পত্রাদি বিনিময়ের জন্য তিনি দেশবাসীকে কেবলমাত্র মাতৃভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৯৮] পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রতি তাঁর বিরূপ প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র বিশিষ্ট জাতি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা থেকে উদ্ভূত হয়নি। পুত্র কর্তৃক উদ্ধৃত তাঁর একটি তিক্ত মন্তব্যে প্রতিক্রিয়ার কারণগুলি খুঁজে পাওয়া যায় : "ছেলেগুলোকে ইংরাজী পড়াইতেছি, তাহার কারণ, যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে ইংরাজী না পড়িলে হয়তো অর্থকৃচ্ছ্র সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু এটা বুঝিতেছি যে, উহাদের নরকে ডুবাইতেছি।" তাঁর মতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আত্মকেন্দ্রিকতা এবং ভোগ-প্রবণতা জন্মায়। ছেলেদের মধ্যে যাতে এইসব দোষ না জন্মায়, সেদিকে তিনি কঠোর দৃষ্টি রেখেছিলেন। "ইংরাজী পড়ানর সঙ্গে সঙ্গে যদি এইদিকে লক্ষ্য রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে ঐহিকতা এবং বিলাসিতাবৃদ্ধিকর ইংরাজী শিক্ষা পূর্ণভাবে বিগড়াইতে পারে না ; ইংরাজী পড়ানর দোষ অনেকটা কাটে।"[৯৯]

এতৎসত্ত্বেও, নিজের জীবনে তিনি নিজের অনেক আদর্শের বিরোধিতা করেছিলেন। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাকে তিনি আয়ুর্বেদের তুলনায় উৎকৃষ্ট মনে করতেন।[১০০] অবসর সময়ে তিনি সংস্কৃত অথবা বাংলার পরিবর্তে ইংরাজি কবিতা আবৃত্তি করতেন। গ্যেটে তাঁর অত্যন্ত প্রিয়কবি ছিলেন।[১০১] উনপঞ্চাশ বছর বয়স থেকে তিনি দিনলিপি লিখতে শুরু করেছিলেন ; এই একান্ত ব্যক্তিগত জিনিসটিও লেখা হত ইংরাজিতে। ভারতে ভিক্টোরিয় যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে ছেলেদের কাছে চিঠিগুলিও তিনি ইংরাজিতেই লিখতেন।[১০২] তাঁর ব্রাহ্মণ্য নিষ্ঠাবোধের মধ্যে ভিক্টোরিয় যুগের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যালয়গামী বালক-বালিকাদের "আত্মপরীক্ষা নামক একখানি দৈনন্দিন পুস্তক" রাখা উচিত বলে তিনি মনে করতেন।[১০৩] এই মতবাদের অনুপ্রেরণা তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে পাননি, পেয়েছিলেন স্যামুয়েল স্মাইল্‌স্‌-এর কাছ থেকে। নৈতিক ব্যাপারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ্চাত্যের কাছে শিক্ষণীয় কিছুই নেই—এই মন্তব্য এক্ষেত্রে তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। ব্রাহ্মণ্য মতবাদের উপর দৃঢ় বিশ্বাসের প্রেক্ষাপটে তাঁর ফ্রি ম্যাসনলজ, অ্যাফভি এবং হোপ-এর সদস্য হওয়াও অদ্ভুত মনে হয়।* [১০৪] এই বৈপরীত্য অনেক গভীরে প্রবেশ করেছিল। তিনি যে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী ছিলেন তার অনেক নিদর্শন আছে,[১০৫] তা সত্ত্বেও কিন্তু তিনি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন[১০৬] অথবা প্রতিবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না, কারণ তাঁর মতে, এই ধরনের প্রতিবাদ ভারতের ঐতিহ্যবিরোধী।[১০৭] মধ্যপদস্থ এই রাজকর্মচারীর মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের অনুপযুক্ত সাবধানতা চোখে পড়ে। 'এডুকেশন গেজেট'-এর সম্পাদক রূপে তিনি সুহৃদ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ভারত সঙ্গীত'-এর কয়েকটি শব্দ বাদ দিতে বলেছিলেন : "জন কত শ্বেত প্রহরী পাহারা দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা'—বাক্যটা ভারতের সম্মিলন সাধন জন্য বিধি-প্রেরিত ইংরাজ গভর্নমেন্টকে উল্লেখ করে ; উহা ঠিক নয়। বর্তমানকে লক্ষ্য করিয়া কিছু লিখিতে হইলে নরম সুরই সঙ্গত।"[১০৮] ইতিহাসের পটভূমিকাতেই জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং "প্রকৃতপক্ষে শান্ত সংযত হিন্দুর দেশে আইনভঙ্গের বা রাষ্ট্রবিপ্লবের" যৌক্তিকতা তিনি খুঁজে পাননি।[১০৯] যেসব ক্ষেত্রে তিনি আবেগপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, সেইসব ক্ষেত্রে রূপক কাহিনীর মাধ্যমে অস্পষ্ট ভাষায় তিনি বক্তব্য রেখেছেন।[১১০] অবশ্য এই রূপক-আচ্ছাদন ছিল খুবই ক্ষীণ এবং স্বচ্ছ। শাসকশ্রেণী যে তাঁকে রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত করেনি, এটা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। অনেকেই তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ'কে "প্রচ্ছন্ন রাজদ্রোহ" আখ্যা দিয়েছিলেন।[১১১] সত্য বলতে কি, সযত্নে রাজভক্তির অনুজ্ঞা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর গভীর ক্ষোভকে আচ্ছাদিত করতে পারেনি। দুটি ভিন্নধর্মী অনুভূতির মাধ্যমে তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্যায়ন করেছিলেন।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভূদেবের মত একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে মতামত গঠন করেননি। নিজের মূল্যবোধ এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞানকে ভিত্তি করেই তাঁর মতামত গড়ে উঠেছিল। তবে, আধুনিক নৃ-তত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও, যে সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য গবেষক বিশ্লেষণ করতে চান, তাঁর নিজের সম্বন্ধে তাদের প্রতিক্রিয়ার প্রভাব গবেষকের উপর পড়তে বাধ্য। পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে ভূদেবের সব মন্তব্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসূত বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি তাঁর নিজের আদর্শজনিত এবং দেশবাসীর উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রচার। সে যুগের অভিজাত শ্রেণীর অনেকের মতই ইউরোপীয়দের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিদেশী শাসনের চরিত্র সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন।

ভূদেবের সঙ্গে ইউরোপীয়দের, প্রধানত ব্রিটিশদের সম্পর্ক স্বাভাবিক ধরনেরই ছিল। স্বাভাবিক বলতে, তাঁর মত সামাজিক পরিস্থিতির অন্যান্যদের মতই। শিক্ষক

* ফ্রিম্যাসন সম্পর্কে ভূদেবের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য : "তন্ত্রশাস্ত্র একপ্রকার ফ্রিমেশনরি। বড় বড় অনেক সাহেব ফ্রিমেশন আছেন। তাঁহারা কি মন্দ লোক ? কোনসময়ে ফ্রিমেশনরি দ্বারা পৃথিবীর কি অনেক উপকার হয় নাই ? এখনও যে কি হইতেছে, কি না হইতেছে কে বলিতে পারে ?" বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ, ১৬১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং উচ্চপদস্থ সহকর্মীরূপে তিনি তাদের পরিচয় লাভ করেছিলেন (বস্ বা কর্মক্ষেত্রের প্রভু বলাই বোধহয় সঙ্গত, কারণ তাঁর ব্রিটিশ পরিচিতরা প্রধানত এই পর্যায়ভুক্ত ছিলেন)। এছাড়া অবশ্য চন্দননগরে প্রতিবেশীরূপে তিনি ফরাসীদের পেয়েছিলেন। যাত্রাপথে ট্রেনে অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং মাঝে মাঝেই উগ্র স্বভাবের ধর্মযাজকদের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে প্রবৃত্ত হতেন, সে সব সে যুগে অনিবার্য ছিল। তাঁর জীবনীগ্রন্থে বিচিত্রস্বাদের এইসব বহু ঘটনার উল্লেখ আছে, যা থেকে ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা গড়ে উঠেছিল বলে অনুমান করা যায়।

এ বিষয়ে ভাল এবং মন্দর পরিমাপ করা যদি সম্ভব হত, তাহলে বোধহয় বলতে হয় যে ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভূদেবের সম্পর্কটা প্রধানত মধুর এবং হৃদ্যতাপূর্ণ হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের একজন ইংরাজি শিক্ষকের সদয় ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়েই তিনি সংস্কৃতচর্চার পরিবর্তে ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণের জেদ ধরেছিলেন। তাঁর সংস্কৃত শিক্ষকের অযৌক্তিক আচরণ ইংরাজি শিক্ষকের ব্যবহারের একেবারেই বিপরীত ছিল, তিনি তুচ্ছ কারণে ভূদেবকে পিতার কাছে প্রহৃত হতে বাধ্য করেছিলেন।[১১২] শ্রীমতী উইলসন নামক ধর্ম প্রচারিকার ব্যবহারে তাঁর ইংরাজি শিক্ষকের সদয় আচরণের কথা মনে পড়েছিল ; সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করবার পর ঐ মহিলা ভূদেবকে ইংরাজি শেখায় সাহায্য করেছিলেন।[১১৩] হিন্দু কলেজের ছাত্ররূপে তিনি ডেভিড হেয়ারের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় নিজেদের কৃতিত্বের পুরস্কারের জন্য একদল ছাত্রের সঙ্গে ঐ মহাত্মার গৃহে হানা দিয়েছিলেন।[১১৪] তাঁর সময়ে হিন্দু কলেজের বিদেশী শিক্ষক এবং ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ এবং মধুর সম্পর্ক ছিল। মেধাবী এবং সম্ভাবনাপূর্ণ ছাত্র হিসাবে এই সম্পর্কের জন্য তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন।[১১৫] হালফোর্ড নামক জনৈক শিক্ষক সাধারণভাবে ছাত্রদের প্রতি দয়াপরবশ ছিলেন, কিন্তু একবার এক ছাত্রের ব্যবহারে ধৈর্যচ্যুত হয়ে তাকে পদাঘাত করেছিলেন। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে ছাত্ররা ধর্মঘট করে। ভূদেবই তখন ছাত্রবন্ধুদের বুঝিয়ে বৃদ্ধ শিক্ষককে ক্ষমা চাওয়ার অপমান থেকে রেহাই দিয়েছিলেন।[১১৬] রেভারেন্ড লঙের কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল, এমনকি নিরলস প্রচারক রেভারেন্ড ডাফের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঐ খ্যাতনামা ব্যক্তিকে তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। ডাফও অবশ্য কোনোদিন ভূদেবকে ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা করেননি। এইসব পরিচয়ের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে ইঙ্গ-বঙ্গ সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর মতামত গড়ে উঠেছিল : "ইংরাজ যদি নিজের গর্ব এবং বক্রোক্তি পরিত্যাগ পূর্বক সরলভাব গ্রহণ করেন, আর বাঙালী যদি নিজের ইংরাজি বিদ্যা 'প্রকাশ' করিবার চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে সুশিক্ষিত ইউরোপীয়দের সংস্রবে আসিয়া দেশীয়গণ অনেক বিষয়েই শিক্ষালাভ করিতে পারেন।"[১১৭]

সে যুগে ইউরোপীয়দের সাহায্য ছাড়া ভারতীয়দের পক্ষে কোনোরকম উন্নতি, এমনকি কর্মজীবনে ঢোকাও সম্ভব ছিল না। ভূদেবের ওপরওয়ালা ব্রিটিশ সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করতেন। হিন্দু কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্য এফ, জে, মাউয়াটের সাহায্যে কলকাতা মাদ্রাসার শিক্ষকরূপে তিনি চাকুরি জীবন শুরু করেন। হাওড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে সিভিলিয়ান বিদ্যালয়-পরিদর্শক হজসন প্র্যাট-এর পরিচয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল। ভুল-বোঝাবুঝির মধ্য দিয়ে পরিচয়ের সূত্রপাত হলেও পরে তা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। *Indian Magazin* নামক পত্রিকায় প্র্যাটের লেখা ভূদেবের মরণোত্তর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে তৎকালীন ইঙ্গ-বঙ্গ সম্পর্কের এবং ভূদেবের সঙ্গে উক্ত লেখকের গভীর হৃদ্যতার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ ধরা আছে: "তাঁহার হৃদয়ে যাহা উদিত হইত, তদ্ভিন্ন একটি কথাও মুখে বলিতে পারিতেন না। কোনো ইউরোপীয় পরিদর্শকের অথবা তাঁহার উপরিতন কোনো কর্মচারীর তোষামোদ তিনি করিতে পারিতেন না, অথচ নিশ্চয়ই জানিতেন যে তাহাতে সুবিধাই ঘটিতে পারে।

"আমি যখনই যে ইংরাজকে দেশীয়ের অবিশ্বাসিতার এবং কপটতার কথা বলিয়া নিন্দা করিতে শুনিয়াছি, তখনই আমি তাঁহাকে আমার ভারতীয় বন্ধু ভূদেববাবুর কথা বলিয়াছি। ভূদেববাবু কখনও মিথ্যা বলিতে বা কাহারও তোষামোদ করিতে অথবা সরল সৎপথানুসরণের বিরোধী কোনরূপ কার্যই করিতে পারিতেন না। এদিকে আবার তিনি আদর্শ হিন্দুই ছিলেন। চমৎকার গাম্ভীর্য এবং প্রায় স্ত্রীলোকের মত মধুরতা এবং আত্মাভিমান-শূন্যতার ও সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার পবিত্র সমাবেশ তাঁহাতে ছিল। এই সকল গুণ যে কেবল তাঁহারই ছিল, তাহা নহে। এ গুণগুলি যে তাঁহার জাতীয় প্রকৃতিগত, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। ভূদেববাবুর সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই আমার ইচ্ছা যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যজাতির ভিতর আন্তরিক ভালবাসা জন্মিয়া পরস্পরের সম্বন্ধ নিকট হোক।"[১১৮] এই বন্ধুত্বের একটি খুব মজার, অলিখিত ইতিহাস আছে। ইংলন্ডে ফিরে গিয়ে প্র্যাট ভূদেবকে চিঠি লিখতেন। প্রায় দশ বছর ধরে তিনি বন্ধুকে লেখা একটি চিঠিরও উত্তর পাননি।[১১৯] শ্রদ্ধাঞ্জলিতে তিনি "চল্লিশ বছর দুইপক্ষের নীরবতা"র কথা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত চিঠিগুলি যথাস্থানে পৌঁছয়নি, ফলত প্র্যাটের নীরবতায় ভূদেব মর্মাহত হয়েছিলেন। 'সামাজিক প্রবন্ধে' তিনি ইংরাজদের সঙ্গে পরিচয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা[১২০] উল্লেখ করেছেন। এই মূল্যায়নের সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত ঘটনার সম্পর্ক আছে কি?

চাকুরিজীবনে বিদেশী প্রভুদের* সঙ্গে ভূদেবের সৌহার্দ্যপূর্ণ, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই সম্পর্ক শুধুমাত্র শিষ্টাচারে সীমাবদ্ধ ছিল না। প্র্যাট পরিবার প্রায়ই তাঁদের বাড়িতে আসতেন। নিজের চাকুরির ব্যাপারে একবার তিনি ওপরওয়ালার স্ত্রীর সাহায্য নিয়েছিলেন।[১২১] বিদ্যালয় পরিদর্শক লজ জনৈক ধর্মপ্রচারকের অভিযোগের প্রত্যুত্তরে ভূদেবের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন।[১২২] মেডিলকট—যাকে জিওলজিক্যাল সার্ভে থেকে বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদে বদলি করা হয়েছিল—তাঁর সঙ্গে বোধহয় ভূদেবের সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিল।[১২৩] 'বিবিধ প্রবন্ধে' তিনি তাঁকে "আমার অতি আত্মীয় কোনও ইউরোপীয়" বলে উল্লেখ করেছেন।[১২৩]

"আত্মীয়" শব্দটির উৎপত্তি "আত্মা" থেকে এবং সাধারণত আত্মীয় বলতে রক্ত-সম্পর্কিতদের বোঝায়। ভূদেব এখানে তা সুগভীর হৃদ্যতা বোঝাবার জন্য ব্যবহার করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, মেডলিকট যে বিদেশী, তা কিন্তু তিনি

* প্রধানত তাঁরা ছিলেন স্কুল ইন্সপেক্টর। সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে এবং পরে সহ বা অতিরিক্ত পরিদর্শক রূপে তিনি এঁদেরই অধীন ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো সময়েই ভুলে যাননি। সম্পূর্ণ বাক্যাংশটি এইরকম : "অতি আত্মীয় কোন ইউরোপীয়"। ঐ বন্ধু ভারতীয় হলে নিশ্চয়ই নিজের অগোচরে তাঁর জাতির পরিচয় তিনি উল্লেখ করতেন না। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শেষ দশকে আমলাতন্ত্রের শীর্ষস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে সমাজ এবং কর্মক্ষেত্রে, একমাত্র অত্যন্ত উচ্চ পদাধিকারী ভারতীয় ছাড়া সবাইকেই একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হত। অনেকের মতে ইংরেজদের সঙ্গে ভারতের সামাজিক সম্পর্কের ইতিহাসে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ এক সন্ধিক্ষণ। তবে এই মত বোধহয় ঠিক নয়। বিংশ শতকের সূচনা পর্যন্ত প্রাদেশিক সরকারের পদস্থ ভারতীয় কর্মচারী এবং অভিজাত শ্রেণীর অনেকের সঙ্গেই উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজকর্মচারী, এমনকি গভর্নরেরও ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্পর্ক বজায় ছিল। ভূদেব যখন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক ছিলেন তখন কার্যোপলক্ষে বাংলার ছোটলাট স্যার অ্যাশলি ইডেনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। ইডেনের পূর্বসূরী স্যার রিচার্ড টেম্পল্ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে একবার বাঙালি সাহিত্যিকদের নৌকাবিহারে আপ্যায়িত করেছিলেন।[১২৪] নিজে সাহিত্যিক হওয়ায় স্যার অ্যাশলি এবং খ্যাতনামা সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। ভূদেব যখন অপেক্ষাকৃত নিম্নপদে কর্মরত, তখন থেকেই ইডেনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল,[১২৫] এবং সেই বন্ধুত্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ভূদেব যখন প্রথম শ্রেণীভুক্ত পরিদর্শক, তখন রেঙ্গুনে বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে তিনি স্যার অ্যাশলির আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। স্যার অ্যাশলি তখন রেঙ্গুনে চীফ কমিশনার পদে প্রতিষ্ঠিত।[১২৭] ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মার্চ স্বয়ং বড়লাট আলোচনার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান, তার ফলে কর্মচারী মহলে ভূদেবের পরিচয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল।[১২৮]

ইউরোপীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায় তিনি খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে মেনে চলতেন। নিমন্ত্রণকর্তার মানসিকতা বুঝে তিনি অহিন্দুর গৃহে খাদ্য গ্রহণের অক্ষমতার কারণ দেখাতেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি সাধারণত শাস্ত্রের বচন বলতেন না, কারণ হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের প্রতি তাঁর এতই শ্রদ্ধা ছিল যে তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।[১২৯] 'বিবিধ প্রবন্ধে' তিনি এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন : "আমার সহিত বিশেষ সৌহার্দ্যসম্পন্ন কোন ইউরোপীয় আমাকে তাঁহার সহিত একত্রে ভোজন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে আমি তাহা অস্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'তুমি অস্বীকার করিলে আমি আর জিদ করিব না, কিন্তু কেন অস্বীকার করিলে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে।' আমি বলিলাম, 'তোমার সহিত একত্রে ভোজন করা আমাদিগের সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য। ইহা অপেক্ষা গুরুতর কারণ আর কি হইতে পারে? তদ্ভিন্ন, ভাবিয়া দেখ, আমাদের আর কি আছে? আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা গিয়াছে, আমাদের ধর্ম্মের প্রতি তোমাদের আক্রমণ হইতেছে, আমাদের সাহিত্য শাস্ত্রও এ পর্য্যন্ত এমন ভাব ধারণ করে নাই যে তজ্জন্য বিশেষ আত্মগৌরব জন্মে। আমাদের আত্মগৌরবের এবং স্বাতন্ত্রিকতার বস্তু আর কি আছে? থাকিবার মধ্যে কুসংস্কারই বল আর সমাজনিয়মই বল, এই জাতিভেদ এবং আচারভেদ আছে, আমি তাহারও বিসর্জ্জন দিতে পারি না।'"[১৩০] বন্ধু মেডলিকট তখন এইসব 'কুসংস্কারে'র প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেন যে দুটি কারণে এই রকম বিশ্বাস জন্মাতে পারে—পূর্ণ জ্ঞান অথবা নৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধঃপতন।[১৩১]

স্পষ্টই দেখা যায় যে এইসব ব্যাপারে ভূদেবের রক্ষণশীলতার মূলে ছিল তাঁর গভীর জাতীয়তাবোধ, এবং তার কারণও ছিল। কেউ কেউ মনে করেন যে সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায়, ভেবেচিন্তে না করলে ইউরোপীয়দের সঙ্গে একত্রে খাওয়ায় দোষের কিছু নেই ; কিন্তু অনেকে মনে করেন এ একরকমের দুর্বলতা, কারণ যেখানে অন্যান্য শাস্ত্রীয় বিধি লঙ্ঘন করা হচ্ছে না, সেখানে খাওয়া-দাওয়ার নিয়মটি লঙ্ঘন করার অর্থ বিদেশী প্রভুদের বিরাগ ভাজন না হওয়া। অনেকে আবার ইউরোপীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ খুঁজে বেড়াত, এবং উন্নতি ও মর্যাদা বৃদ্ধির আশায় ঐ সুযোগ লাভের জন্য সবরকম সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করতে প্রস্তুত ছিল। ইঙ্গ-ভারতীয়রা শিক্ষিত ভারতীয় বলতে ব্রিটিশদের ভোজসভায় আমন্ত্রণ-লোলুপ ভারতীয়দেরই বুঝত। এর ব্যতিক্রম কেউ থাকতে পারে বলে তারা ধারণাই করতে পারত না। তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্তা অ্যাটকিনসন এই কথা মেডলিকটকে বোঝাবার চেষ্টা করায় তিনি ভূদেবকে পরীক্ষা করতে বলেন। অ্যাটকিনসন ছোটলাট বিডনের সঙ্গে ভূদেবের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলেন, এবং ছোটলাটসাহেব ভূদেবকে প্রাতরাশের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সবিনয়ে সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন এবং প্রত্যাখ্যানের কারণ বললেন যে এ সব ব্যাপারে সামাজিক বিধান লঙ্ঘন করবেন না বলে তিনি যৌবনে পিতার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। "এখন দেশাচার বিরুদ্ধ আহার করিলে আমি নিজের চক্ষে যাবজ্জীবনের জন্য বড়ই ছোট হইয়া যাইব।"[১৩২] শাস্ত্রাচারভঙ্গকারীদের সম্বন্ধে তাঁর ঘৃণা তিনি 'বিবিধ প্রবন্ধে'র একটি ক্ষুদ্র কাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। ভূদেব নৈশভোজের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করায় জনৈক পদস্থ ইংরাজ কর্মচারী মন্তব্য করেন : "যাহাদিগের সহিত আমরা একত্রে খাইতে চাই তাহারা স্বীকার করে না ; আর মনে মনে যাহাদের সহিত চাহি না, তাহারাই খাইতে আইসে।" ভূদেব বলেন : "যদি মহাশয়ের সহিত ভোজন স্বীকার করিতাম তাহা হইলে যাহাদের সহিত চাহেন না, আমিও সেই দলভুক্ত হইয়া যাইতাম না কি ?"[১৩৩]

একসময়ে একজন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বিদায় জানাবার অভিপ্রায়ে ভদ্রতা করে ভূদেবের করমর্দন করতে চাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন যে তিনি সাধারণত এদেশীয়দের সঙ্গে করমর্দন করেন না। ভূদেব প্রত্যাখ্যান করলেন ;[১৩৪] প্রত্যাখ্যানের কারণটি তাঁর আদর্শের সূচী বলা যায় : "ভিন্ন ভিন্ন সমাজে শিষ্টাচার প্রদর্শন পদ্ধতি ভিন্নরূপ। আমি আপনার নিকট আসিলে আপনি যে করমর্দন জন্য হস্ত প্রসারণ করেন নাই, আমরা যে তখন প্রাচ্যধরনে সেলাম (উহাও নমোনারায়ণ ভাবে এক হস্তে নমস্কার) দ্বারাই কার্য্য শেষ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার প্রকৃতই তৃপ্তি হইয়াছিল ; সুতরাং আপনি সে জন্য ক্ষুণ্ণ হইবেন না। আমাদের পরম পবিত্র শাস্ত্র সর্বঘটে নারায়ণ স্বীকার করেন ; জগতে "ঘৃণা"র বস্তু কিছুই দেখেন না। কিন্তু অন্ত্যজ এবং ম্লেচ্ছাদির আচার অশুদ্ধির জন্য বা অন্য কারণে তাহাদের "অস্পৃশ্য" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমার পিতৃদেব কোনোরূপ ঘৃণাবোধ না করিয়া, এমনকি গৃহে আসিলে বিশেষ প্রীতির সহিতই রুগ্ন অন্ত্যজ শিশুর মস্তকে হস্তার্পণ পূর্বক আশীর্বাদ করিয়া তাহার পর স্নান করিতেন। আমি ইউরোপীয় বন্ধুদের সহিত প্রীতিপূর্বক করমর্দনের পর বস্ত্র পরিবর্তন হস্ত ধৌত এবং সুবিধা থাকিলে গঙ্গাজল স্পর্শও করিয়া থাকি। ঘৃণার জন্য এরূপ করি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না ; নিজেদের বিধি পালন জন্যই করি। এজন্য কোন ইউরোপীয় করমর্দন না করায় আমার যে তৃপ্তিই হয়, তাহা এক্ষণে আপনি সুস্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। ইহা জাতীয় গর্ব জন্য করমর্দনে অনিচ্ছা নয়; হিন্দুর প্রীতির সহিতও অপরের শরীর স্পর্শে অনিচ্ছা। এবারে যখন করমর্দন ঘটিয়া যায় নাই এবং আমাদের মধ্যে প্রীতির উদ্রেক বস্তুতই হইয়াছে উহা তখন আজ আর নাই হইল।"[১৩৫]

ভূদেবের ব্রিটিশ বন্ধুবান্ধবগণ তাঁর স্বকীয়তাকে মেনে নিয়েছিলেন। ইডেন অথবা মেডলিকটের গৃহে অতিথিরূপে[১৩৬] তিনি তাঁদের বাগানে আলাদা তাঁবুতে বাস করতেন এবং সেখানে নিজের ভৃত্যদের রান্না খাবার খেতেন। ভূদেবের আগমনের একমাস আগে থেকে মেডলিকট নিজের গৃহে গোমাংস ভক্ষণ বন্ধ রাখতেন।[১৩৭] বলা বাহুল্য, এই বিধিনিষেধ ছিল একতরফা। মেডলিকটকে ভূদেব বলেছিলেন যে হিন্দুর কাছে অতিথি অতি সম্মানিত, তাই তাঁর খাওয়ার ফলে ব্রাহ্মণের গৃহ অপবিত্র হয় না।[১৩৮]

পাশ্চাত্য চরিত্র সম্বন্ধে ভূদেবের বিস্তারিত আলোচনা যে ব্রিটিশ ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণাপ্রসূত, তা সহজেই অনুমেয়। যেখানে যেখানে তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকার অবতারণা করেছেন সেখানেও নিজের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। উচ্চশিক্ষিত এবং আত্মাভিমানী ইংরাজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁর লেখায় একই ধরনের ইউরোপীয় চরিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর প্রশস্তি কখনই অবিমিশ্র হয়নি। বিভিন্ন চরিত্রের ব্রিটিশ কর্মচারীর কথা তিনি লিখেছেন এবং তাদের এমন কতগুলি অশোভন আচরণের উল্লেখ করেছেন, যার ফলে তাদের চরিত্রের ভাল দিকটিও ম্লান হয়ে গেছে। তাঁর লেখা পড়ে মনে হয় যে ইউরোপীয়দের সঙ্গে মেলামেশা থেকে সংগৃহীত বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি ইউরোপীয় চরিত্রের একটি মানস ছবি এঁকেছিলেন, যার ভাল-মন্দ সবদিকই ছিল, এবং নিজের মনের মানদণ্ডে তার উপযুক্ততা বিচার করেছিলেন।

কর্মক্ষেত্রের ভিতরে এবং বাইরে যে সব অপমানকর অভিজ্ঞতার গ্লানি তাঁকে সইতে হয়েছিল, উপনিবেশ-যুগের এই বুদ্ধিজীবীর জীবনীগ্রন্থে বারবার তার উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসনের এই দুর্ভাগ্যজনক দিকটির একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। উপযুক্ত সম্মান না দেখানোর অপরাধে রাজা রামমোহন এক ব্রিটিশ কর্মচারী কর্তৃক অপমানিত হয়েছিলেন। আত্মসম্মান রক্ষা করতে পারছিলেন না বলে বিদ্যাসাগর মহাশয় উচ্চ বেতনের চাকুরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন। একদিন যে সুরেন্দ্রনাথকে সরকারী তহবিল তছরূপের দায়ে বরখাস্ত করা হয়েছিল, পরে তাঁকেই 'স্যার' উপাধির সম্মান দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা বলেই প্রমাণ হয়। দেশাত্মবোধক উপন্যাস 'আনন্দমঠ' রচনা করার জন্য বঙ্কিমকে নানা অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল, এমনকি একজন সামরিক কর্মচারী তাঁকে আঘাত করায় তিনি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ভূদেবের জীবনীকার তাঁর জীবনের এমনি অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যেমন, একবার এক ধর্মপ্রচারক রাস্তায় দাঁড়িয়ে রামায়ণের বিকৃত ব্যাখ্যা শোনাচ্ছিলেন,[১৩৯] আর একবার এক গুণ্ডা প্রকৃতির লোক ভূদেবের ভাড়া করা নৌকায় জোর করে উঠে পড়ে তাকে নিজের গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল,[১৪০] আর একবার ইউরোপীয় যাত্রীদের সুবিধার্থে তাঁকে রেলের কামরা থেকে নেমে যাবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।[১৪১] প্রথম দুবারের ঘটনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু তৃতীয় ঘটনায় উপস্থিত মহিলাদের সম্মানার্থে তিনি ঐ অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

চাকুরিক্ষেত্রে এইসব বিরোধ ছোটখাটো ব্যঙ্গ বা অপমানে সীমাবদ্ধ ছিল না। চাকুরিজীবনের শুরুতেই তাঁকে নানারকম অপমানের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অল্পবয়সে চাকুরিপ্রার্থীরূপে প্রভাবশালী সাহেব প্রভুর দরজায় সাহেবের কুকুর ও চাপরাসীর আপ্যায়ন তিনি ভোলেননি।[১৪২] পরবর্তী কালে ইউরোপীয়দের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক ছেদ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্র্যাটকে বলেছিলেন যে ডাফ, লঙ, মাউয়াট প্রভৃতি যাঁরা তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন, তাদের কাছে তিনি আসা-যাওয়া করেন : "উঁহারা আমাকে ভালবাসেন ; আমাকে অনেকক্ষণ বাহিরে বসাইয়া রাখেন না এবং উহাদিগের চাপরাশীরাও আমার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখায় না—গা ঘেঁষিয়া চলে না।"[১৪৩] মাদ্রাসায় চাকুরি করবার সময়ে ভূদেব প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনতে স্বীকৃত হন নি, তখন যিনি পরিদর্শন করতে আসতেন সেই সৈনিক কর্মচারী (কর্নেল) তর্জন-গর্জন শুরু করে দেন। ভূদেব অবশ্য নিজের মত পরিবর্তন করেন নি, কিন্তু এই অভিজ্ঞতা তাঁকে সচকিত করে তুলেছিল।[১৪৪] তিনি যখন হুগলি নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, বাংলা সাহিত্যের জগতে ইতিমধ্যেই তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি,—তখন একবার শিক্ষা অধিকর্তা অ্যাটকিনসনের পরিদর্শনের সময়ে কোনো কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। এজন্য প্র্যাট তাঁর কৈফিয়ত তলব করেছিলেন। পরে অবশ্য প্র্যাট তাঁর প্রতি খুবই বন্ধুভাবাপন্ন হয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক পটভূমিকায় এই কৈফিয়ৎ তলবের অর্থ ঐ মহান ব্যক্তির ন্যায়নিষ্ঠায় সন্দেহ প্রকাশ করে তাঁকে একজন ক্ষুদ্র কেরানির পর্যায়ে নামিয়ে আনা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে ঐ সময়ে ভূদেবের অনুপস্থিতির কারণ ছিল তাঁর কাকার মৃত্যু, এবং সেই কারণে তিনি ছুটির আবেদনও করেছিলেন।[১৪৫] ক্যাম্বেল সাহেব ছোটলাট হয়ে আসায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হল। শোনা যায় যে শিক্ষানীতি বিষয়ে ক্যাম্বেলের মতামতের সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখায় ভূদেব আগে থেকেই তাঁর বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ভূদেবের প্রথম সাক্ষাৎ তীব্র তর্কযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল এবং সাক্ষাৎকারের শেষে ক্যাম্বেল ধমক দিয়ে বলেন : "বাবু, তুমি রাজকার্য্যও বুঝ দেখছি যে ! তোমার সঙ্গে এবার হইতে রাজকার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ করা যাইবে।" কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন তুচ্ছ ঘটনায়, এমনকি ছোটলাটের পরিদর্শনকালে অনুপস্থিতির জন্যও তাঁর কৈফিয়ত তলব করা হয়। উপস্থিতির জন্য যদিও কোনো আদেশ জারী করা হয়নি, তবুও কর্তারা ধরেই নিয়েছিলেন যে সকলের উপস্থিতি স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।[১৪৬] ওপরওয়ালাদের বলিষ্ঠ সমর্থনের জোরে সে যাত্রা তিনি কঠিন শাস্তির হাত থেকে বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু অপমানের জ্বালায় তিনি একসময়ে পদত্যাগ করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।[১৪৭]

ব্রিটিশ কর্মচারী এবং ইঙ্গ-ভারতীয়দের সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত অপমানের অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট হয়েছিল, একথা বলা যায় না। স্পষ্টভাষায় জাতিবৈষম্য ঘোষণা এবং ব্যবহারে তার নগ্নতর প্রকাশের ফলে সাম্রাজ্যবাদের কুৎসিত রূপটি তাঁর সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছিল এবং তিনি বুঝেছিলেন যে তথাকথিত শিক্ষিত ইউরোপীয়দের ব্যবহারও যথেষ্ট অভদ্র হতে পারে। ১৮৯০ সালে ভারতীয়দের সম্বন্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রান্ট ডাফ যে বলেছিলেন যে তারা "কৃষ্ণবর্ণ, কদর্য্য এবং তাহাদিগের মধ্যে জাতীয়তার কিছু মাত্র নাই," সেই উক্তি তিনি দিনলিপিতে উদ্ধৃত করেছেন। ঐ একই দিনলিপিতে তিনি উক্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তির আরও একটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন : "ইংরাজভীতি ভারতবর্ষীয়ের হৃদয়ে খুব বদ্ধমূল করাই আমাদিগের কর্তব্য, ইংরাজ কোন ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার করিলে ইংরাজের কোন দণ্ড হওয়া উচিত নয়।"[১৪৮] তাছাড়া, ভারত-সচিব ডিউক অফ আর্গাইল-এর সদর্প ঘোষণা যে ভারতকে চিরদিন পদানত রাখাই ব্রিটিশ রাজনীতির উদ্দেশ্য—তাও তিনি লিখে রেখেছিলেন। শাসকশ্রেণীর পছন্দসই এই মন্তব্য অনেকেই প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন।[১৪৯] 'এডুকেশন গেজেটে' ক্যাম্বেল সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে, "ভারতবর্ষ-নিবাসীদিগের কখনই উৎকর্ষসাধন হইবে না—এদেশে ইউরোপখণ্ডের দক্ষিণভাগবাসী স্পেনীয়, ইটলিয়, প্রভৃতি লোকের উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া দেওয়া উচিত"[১৫০]—ছোটলাটের এই উক্তির প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অল্পবয়সী সিভিলিয়ানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাঙালি-বিদ্বেষও তাঁর নজর এড়ায়নি। ভূদেবের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে তাঁর পুত্র ক্যাম্বেলকে লেখা ইডেন সাহেবের একটি চিঠি পেয়েছিলেন। ২৭ এপ্রিল, ১৮৭৩ তারিখের এই চিঠিতে ইডেন ভূদেবের পক্ষে ক্যাম্বেলের কাছে ওকালতি করেছিলেন। বলা বাহুল্য এ চিঠি গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়নি। চিঠির একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "ভূদেবের একমাত্র দোষ এই যে তিনি বাঙালি। আমার ভয় হয় যে বর্তমান নব্য সিভিলিয়ানদলের নিকট এ অপরাধ অমার্জনীয়।"[১৫১] 'বাংলার ইতিহাসে' তিনি বেথুনের "চুক্তিভঙ্গের আইন"[১৫২] নিয়ে ইঙ্গ-ভারতীয়দের আন্দোলনের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং 'ইংলিশম্যান' এবং 'পায়োনীয়র' পত্রিকার জাতীয় কংগ্রেস বিরোধী মনোভাবের কথাও নিরুত্তাপে উল্লেখ করেছেন। দেশবাসীকে তিনি এইসব প্রত্যাশিত আঘাত উপেক্ষা করতে উপদেশ দিয়েছেন।[১৫৩] দিনলিপিতে লিখিত বিভিন্ন মন্তব্যে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর ক্রমবর্ধমান অনাস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৮৭৯-র শেষে তিনি লিখেছিলেন : "যদি লর্ড লিটন কোন বাধাপ্রাপ্ত না হন তাহলে দেশীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাটি ভাণমাত্র হইবে। তিনি এ পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে ইচ্ছুক।"[১৫৪] ঐ বছরেই আগের দিকের একটি মন্তব্য : "বুঝিলাম যে ইংরাজদিগের মধ্যে একটি অপূর্ব বিশ্বাস প্রসার লাভ করিতেছে যে ইউরোপীয় কর্মচারীর নিয়োগ অপেক্ষা দেশীয় কর্মচারীর নিয়োগে প্রকৃতপক্ষে ব্যয়সঙ্কোচ ঘটে না।"[১৫৫]

দিনলিপিতে তিনি বিশেষ বিশেষ কর্মচারী সম্বন্ধে অনেকসময়েই বিরূপ মন্তব্য করেছেন। বিহারের অন্তর্গত মাধেপুরে মহকুমা শাসক সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে লোকটি অত্যাচারী নীলকরদের "পরম বন্ধু"।[১৫৬] ১৮৭৭-এর ৪ঠা জানুয়ারি তিনি লিখেছিলেন, "ইংরাজদিগের পাটনার প্রতি এত আকর্ষণের একটি কারণ শুনিলাম। এখানকার ধনী লোকেরা খুব সাহেবভোজ দেন।"[১৫৭] ব্রিটিশদের বৈষম্যমূলক আচরণ—কিভাবে তারা তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে ব্যবহার করে,[১৫৮] এবং সাদা-কালোর বিবাহ সম্বন্ধে তাদের মনোভাবের বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠপুত্রের এক মুসলিম বন্ধু এক ইউরোপীয় মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ভূদেব বলতেন যে "সকল ইংরাজই মনে করেন যেন তাদের কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মীয়াকে বেইজ্জত করিয়াছেন।"[১৫৯]

ব্রাহ্মণত্বের গর্বকে যদি ভূদেবের জীবনের প্রথম মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলা যায়, তবে দ্বিতীয়টি হল ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের কর্মচারী রূপে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা। নিজের স্পর্শকাতরতা এবং কিছুটা সঙ্কোচের জন্য তাঁর ব্যক্তিত্বের এই দুটি দিকের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ লক্ষ্য করা যায়।[১৬০] ঐ দৃঢ়চেতা ব্রাহ্মণ চাকুরিজীবনে উন্নতি করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।[১৬১] অল্প কিছুদিন বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবার পর কলকাতা মাদ্রাসার শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে তিনি সেই আমলে ভারতীয়দের পক্ষে চূড়ান্ত উন্নতির স্তরে পৌঁছেছিলেন। কর্মজীবনের শেষে তিনি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সাধারণত সেই পদে সিভিলিয়ানরা নিযুক্ত হতেন। আর্থিক বিচারে তাঁর এই ঊর্ধ্বগতি মাসিক পঞ্চাশ টাকা থেকে দেড় হাজারে পৌঁছেছিল—সে যুগে তা খুবই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ। এই উন্নতি সহজে হয়নি। প্রত্যেক পর্যায়ে পদোন্নতির ব্যাপারে বাধা এসেছিল ; ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সঙ্গে বিরোধ হয়েছিল। বোধহয় বন্ধুভাবাপন্ন ব্রিটিশদের ব্যবহারেই তিনি বেশি মনোকষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁর দক্ষতার বিচারে এঁদের ইতস্তত মন্তব্যে তিনি যে ক্ষুব্ধ হতেন সেকথা ভূদেব অনেকবার উল্লেখ করেছেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে একটি সরকারী শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন পদোন্নতির আশায় তিনি ঊর্ধ্বতন কর্মচারী উড্রোর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। প্রধান শিক্ষকরূপে তিনি ইতিমধ্যেই সাধারণত ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত একটি পদ অধিকার করেছিলেন। এক্ষেত্রে উড্রোর প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমেয়, তিনি বলেছিলেন, "আবার তোমার পদবৃদ্ধি কি হইতে পারে ? তোমার তো চূড়ান্তই হইয়াছে।"[১৬২] এই ঘটনা প্রসঙ্গে ভূদেব 'পারিবারিক প্রবন্ধে' লিখেছিলেন, "ইংরাজ জাতীয় মনিবের ঐ হৃদয়শূন্য বিরস বাক্য যেমন কানে গেল, অমনি হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল—ছেলেটাকে মনে পড়ায় প্রজ্বলিত ক্রোধের দমন হইল।"[১৬৩] অর্থাৎ তাঁকে সংসার প্রতিপালন করতে হবে, সুতরাং রাগ দেখানো তাঁর সাজে না। আরও অনেকবারের মত এবারেও তিনি যুক্তি, তর্ক এবং কিছুটা কৌশলে নিজের প্রাপ্য আদায় করেছিলেন। অবশ্য এই প্রচেষ্টার অন্তর্নিহিত মানসিক চাপের পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। অপর একটি ঘটনায় নিষ্ফল আত্মাভিমানের জ্বালা বিদেশী শাসনকে দায়ী করে শান্ত হয়েছে। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি চতুর্থ শ্রেণীর বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদে উন্নীত হলেন—এ পদটিতেও অবশ্য তিনিই প্রথম ভারতীয়—তখন শিক্ষা অধিকর্তা মন্তব্য করেন : "হিন্দু-মুসলমানের আমলে তোমার এরূপ পদোন্নতি ও বেতনবৃদ্ধি হইত কি ?" ভূদেব উত্তর দিলেন : "মুসলমানের মহাসাম্রাজ্যেও হিন্দুরা রাজমন্ত্রীর এবং প্রধান সেনাপতির পদ এবং রাজস্ব বিভাগের কর্তৃত্ব পাইতেছিলেন। আর হিন্দুর আমলে ! আপনি কি সত্য সত্যই মনে করেন যে, তখনকার একটি রাজ্যে আমি প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইতে পারিতাম না ?"[১৬৪] ছেলেদের তিনি শিখিয়েছিলেন যে তাঁদের মত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের সন্তানদের পক্ষে যে কোন চাকুরিই অবমাননাকর। জ্ঞান অন্বেষণ এবং বিতরণই তাঁদের একমাত্র উপযুক্ত কাজ। পরিস্থিতির চাপেই তাঁরা রাজকার্য[১৬৫] করতে বাধ্য হয়েছেন, এবং তাও আবার বিদেশী রাজার অধীনে[১৬৬]। ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে মূল্যবোধের পার্থক্যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব এবং যুক্তি দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যর্থ প্রচেষ্টার একটি উদাহরণ রয়েছে ভূদেবের সঙ্গে এক অভদ্র জমিদারের তর্কাতর্কিতে। এক অচেনা জমিদার পরিচয় চাওয়ায় ভূদেব সংক্ষেপে নিজেকে "ব্রাহ্মণ" বলে পরিচয় দেন এবং দাবি করেন যে তাঁকে ব্রাহ্মণের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হোক। জমিদার বিদ্রূপ করে বলেন, ম্লেচ্ছ রাজার অধীনে যে কাজ করে, সে কেমন ব্রাহ্মণ। উত্তরে শাস্ত্র উদ্ধৃত করে ভূদেব বলেন, "রাজার জাতি বিচার করিতে হয় না।"[১৬৭] অবশ্য ব্রাহ্মণের উপযুক্ত সম্মান তিনি পেয়েছিলেন। তবে সবক্ষেত্রে বিরোধের মীমাংসা এত সহজে হত না। ভারতের রীতিনীতি সম্বন্ধে "সম্পূর্ণ অজ্ঞ" বিদেশী প্রভুর অধীনে কাজ করা খুবই কষ্টকর ছিল।[১৬৮] বিশেষত ভারতবর্ষে বর্ষীয়ান লোকেদের প্রাপ্য সম্মান সম্বন্ধে অনবহিত তরুণ সিভিলিয়ানদের অধীনে কাজ করা অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হত। প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ দিনলিপিতে সক্ষোভ মন্তব্য করেছেন : "এইসকল ছোকরারা কি গর্বের সহিতই এদেশে প্রভুত্ব ফলাইতেছেন।"[১৬৯]

'সামাজিক প্রবন্ধ' প্রকাশিত হবার পর বইখানি ভূদেবের বিস্তৃত পড়াশোনার উপর নির্ভর করে লেখা বলে স্যার চার্লস এলিয়ট মন্তব্য করেছিলেন।[১৭০] তাঁর মতে এত বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ভারতে আর কেউ নেই। ব্যাপক এবং বিস্তৃত পঠনের ফলেই ইউরোপীয় সমাজ এবং সভ্যতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছিল, চাক্ষুষ দেখায় নয়, কারণ তিনি কখনই ইউরোপে যাননি। প্রবন্ধগুলিতে তিনি যে সব উপাদানের উল্লেখ করেছেন[১৭১] তা থেকে বোঝা যায় যে ইউরোপের ইতিহাস, সমসাময়িক দর্শন, রাজনীতিতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্ব বিষয়ে কি গভীর এবং ব্যাপক জ্ঞান তিনি আহরণ করেছিলেন। 'সামাজিক প্রবন্ধে' সমকালীন সমাজবিজ্ঞানের প্রভাব সুস্পষ্ট, যদিও হিন্দু মূল্যবোধের উপর গুরুত্বসমন্বিত তাঁর সিদ্ধান্তগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্য। অন্যান্য রচনায় ইউরোপীয় সাহিত্যে তাঁর দখলের প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাঁর সমসাময়িক রাজনারায়ণ বসু হিন্দু কলেজের উচ্চতম শ্রেণীতে কি রকম পড়াশোনা করতে হত তার বিবরণ দিয়েছেন। ইংরাজি সাহিত্যে বেকন, সেক্সপীয়র, মিলটন এবং পোপের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। তাছাড়া ইয়ং-এর নাইট থট্‌স্ এবং গ্রে-র কবিতাবলীও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপরই ছিল ইতিহাস। তার জন্য এক বছরে ছত্রিশটি বই পড়তে হত। হিউমের ইংলন্ডের ইতিহাস, মিটফোর্ডের গ্রীসের ইতিহাস, ফার্গুসনের রোমান রিপাবলিক, গিবন, এলফিনস্টোনের ভারত এবং রাসেলের আধুনিক ইউরোপ এই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার ওপর ছিল আলোকবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সহ অঙ্কের এক বিরাট পাঠ্যক্রম, এবং নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছাড়া নীতিশাস্ত্র।[১৭২] ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে ভূদেবের ধারণার সূত্রপাত হয়েছিল এই বিস্তৃত পাঠক্রমের মাধ্যমে।

উপরন্তু, অল্পবয়সে তিনি ইংরাজিতে অনূদিত ইউরোপীয় সাহিত্য পড়েছিলেন।[১৭৩] সাময়িকভাবে তিনি খ্রিস্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন এবং বিশেষ উৎসাহে শুধু বাইবেলই নয়, "খ্রিস্টধর্মের সত্যতা" প্রমাণ করেছে, এমন সব বই পড়ে ফেলেছিলেন। চণ্ডীচরণ সিংহ নামে তাঁর এক সহপাঠী, যিনি পরে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ভূদেবের পঠনসঙ্গী ছিলেন।[১৭৪] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে খ্রিস্টধর্মের প্রতি তাঁর দুর্বল আস্থা হিউমের 'প্রবন্ধমালা', টম পেইন, গিবন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভলতেয়ার-এর 'মহম্মদ' পড়ে আরও দুর্বল হয়েছিল। এক বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন যে হিউমের *Essays* গ্রন্থে, 'খ্রিস্টানীর দাঁত ভাঙা আছে।"[১৭৫]

পরবর্তীকালে তাঁর পাশ্চাত্য সভ্যতা বিষয়ে অনেকগুলি বই রচনা করার ইচ্ছা হয়েছিল, কিছুটা সেই কারণেই তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছিলেন। এই পরিকল্পনার একটিমাত্র অংশ 'সামাজিক প্রবন্ধে' রূপ পেয়েছিল। এই প্রবন্ধ থেকেই তিনি হিন্দু ও ব্রিটিশ রীতিনীতি সম্বন্ধে লেখার বিষয়বস্তু পেয়েছিলেন। প্রকৃতির উপর একটি বই লেখার পরিকল্পনা কার্যকরী হয়নি বটে, তবে স্কুলপাঠ্য প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং জ্যামিতি সম্বন্ধে তিনি দুটি বই রচনা করেছিলেন। ইংরাজি ভাষায় লিখিত উন্নতমানের গ্রন্থাদির উপর নির্ভর করে তিনি ইংলন্ড, গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস নিয়ে পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন।[১৭৬] শিল্প এবং স্থাপত্যের ইতিহাস বিষয়ক বইটি শুরুই করতে পারেননি। তবে 'সামাজিক প্রবন্ধে' ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে ঐ বিষয়েও তিনি প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ১৮৮৮ সালে দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দকে তিনি লিখেছিলেন যে তাঁর *Philosophical Essays* নাম দিয়ে অনেকগুলি ছোট ছোট প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা আছে, যাতে ইউরোপের এবং প্রাচীন ভারতের দার্শনিক মতবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকবে। ১৮৭৮-এ তিনি প্লেটো পড়েছিলেন বলে জানা যায়।[১৭৭] দিনলিপিতে তিনি মন্তব্য করেছেন : "মানবীয় অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত হইয়া বিজ্ঞানে পরিণত হয়। ধর্মপরায়ণতা—দেবতাগণের আনন্দদায়ক বলিয়াই কি ইহা সত্য, অথবা সত্য বলিয়াই আনন্দদায়ক?"[১৭৮] দুমাস পরে লেকির *History of Rationalism in Europe* সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন : "বইখানি সুন্দর! গ্রন্থকার সঙ্গতরূপেই বলিয়াছেন যে যুক্তিবাদ (Rationalism) যতই সমাজের উন্নতির সম্বন্ধে সুবিধাজনক হউক না কেন, বীর চরিত্র সম্বর্দ্ধনের পক্ষে অনুকূল নহে। গ্যোটে এবং ফিকটের জর্মন দার্শনিক তত্ত্বের যে আধুনিক প্রতিবাদ চলিতেছে তাহা জনবাদের (ডেমোক্র্যাসির) পোষকতা করিতেছে।"[১৭৯] ঐ বছরই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তিনি কনিষ্ঠ পুত্রকে চিঠিতে লিখেছিলেন যে, *Nineteenth Century* নামক পত্রিকার ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় অধ্যাপক হাক্সলির প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধে'র অনেক মিল আছে, তবে প্রকৃতির "নীতিশূন্যতা" বিষয়ে তিনি হাক্সলির সঙ্গে একমত নন। "আসল কথা এই যে, ইউরোপীয় লেখকরা ধর্মনীতির মূল প্রকৃতিতেই আছে ইহা স্বীকার করিতে অভ্যস্ত নহেন। উহা কোন অপ্রাকৃতভাবে প্রকাশিত (Revealed) অথবা সমাজ দ্বারা পরিণতিকৃত (Evolved) ইহাই বলিয়া থাকেন।" যে সব লেখক মনে করেন যে "বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা এবং সুবিচারের ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুতে হাত দিতে রাজকর্মচারীদিগের অধিকার নাই", ঐ একই চিঠিতে ভূদেব তাঁদেরও সমালোচনা করেছেন।[১৮০] অপর একটি চিঠিতে হিউম, মিল, কান্ট এবং হেগেলের "ব্যক্তিগত পরীক্ষামূলক এবং স্বানুভূতিমূলক" দর্শনের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১৮১] অর্থনীতি বিষয়ে যে সব ইউরোপীয় দার্শনিকের মত তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেছিলেন, তাঁরা হলেন ম্যালথস এবং কোঁৎ। কোঁৎ এর পরার্থপরতা (অলট্রুইজ্‌ম্) এবং "স্বকে সর্বে নিমজ্জন করার" বৈদান্তিক নীতির মধ্যে তিনি মিল খুঁজে পেয়েছিলেন।[১৮২] উপনিষদ সম্পর্কে সোপেনহাওয়ারের সপ্রশংস উক্তি তিনি যে খুশি মনে গ্রহণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন তা বলাই বাহুল্য।[১৮৩] স্পেন্সার এবং মিল যত্নসহকারে পড়ে সমকালীন অন্যদের মত উপযোগিতাবাদ গ্রহণ না করে তিনি বর্জন করেছিলেন।[১৮৪] তিনি রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু ম্যাৎসিনির ধর্মীয় ও নৈতিক মতবাদের সমর্থক ছিলেন। "ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী খ্রিস্টিয় ঈশ্বর নহেন", "ছোটবড় বিশেষ কোন না কোন কার্য্যসাধন জন্যই মানবজীবন, নিজের নিজের সুখ খুঁজিবার জন্য নহে"—এইসব উক্তির মধ্যে তিনি নিজের দর্শন—নিষ্কাম কর্মের আদর্শের সমর্থন পেয়েছেন।[১৮৫] ভিক্টোরিয় যুগের অন্যান্য বাঙালিদের মতই তিনিও আত্মপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবনীপাঠে প্রেরণা লাভ করতেন। Smiles-এর *Industrial Biography,* Daven post-এর *Lives of Individuals who Raised Themselves,* Brewster-এর *Martyrs of Science,* Stephenson, Watt এবং Joshua Wedgwood-এর জীবনী প্রভৃতি বই তিনি এক সহকর্মীকে পড়তে বলেছিলেন।[১৮৬]

সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং সচেতন অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে ভূদেব তাঁর অসংখ্য রচনায় ইউরোপ সম্বন্ধে লিখেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য অবশ্যই প্রচার। সত্য যে তাঁর পক্ষে, এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না। বিষয় বস্তুর দিক থেকে "সত্য" ছিল আদর্শগত, কিন্তু যুক্তির বিচারে আদর্শের মান নির্ধারণ করা যায় এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি যুক্তিসিদ্ধ তর্কের অবতারণা করে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় যেমনটি হওয়া উচিত, অর্থাৎ কখনও যুক্তিবাদ কখনও আবেগপ্রবণতা, তাই হয়েছিল। তবে এই ভারসাম্যের হেলন-দোলন সম্বন্ধে তিনি পুরোপুরি সচেতন ছিলেন না। অকৃত্রিম জাতীয়তাবাদ এবং বলিষ্ঠ হিন্দুত্বের সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ ইউরোপ সম্বন্ধে তাঁর ধারণাকে প্রভাবান্বিত করেছিল।

AMARBOI.COM

পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখ ধাঁধানো কৃত্রিম রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পোশাক-আশাক ইত্যাদির মোহে পড়ে বাঙালিরা যখন তাদের ধর্ম, নীতিবোধ এমনকি জাতিত্ব হারাতে বসেছিল, তখন নিজের জীবনের উদাহরণ দিয়ে ভূদেব সেই প্রবল ধারার গতিরোধ করে জাতিকে রক্ষা করেছেন—ভূদেবের মরণোত্তর প্রশস্তিসমূহে[১৮৭] এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে উনবিংশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের যথার্থ স্থানটি নিরূপণ করা যায়।

তাঁর সমস্ত রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাতন্ত্র্যের ব্যাখ্যা করে তা প্রতিষ্ঠা করা, বিশেষত ভারতীয় সংস্কৃতির কঠিন ব্রাহ্মণ্য হিন্দুত্বের আবরণটি, যার মধ্যে, তাঁর মতে, সমস্ত ভারতীয়, এমনকি মুসলিমদেরও, অবদান আছে। বিচারবিবেচনাহীন পাশ্চাত্যের অনুকরণের প্রভাবে সেই স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে যেতে বসেছিল। সে কারণেই সাধারণভাবে পাশ্চাত্যের, বিশেষত ব্রিটিশ প্রভাবের মূল্যায়ন করতে হবে সাবধানে—পাশ্চাত্য রীতিনীতি ও মূল্যবোধের ব্যাখ্যা করে ভারতীয় রীতিনীতির সঙ্গে তা তুলনা করে দেখতে হবে, তার মধ্যে কতটুকু ভারতের গ্রহণযোগ্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'সামাজিক প্রবন্ধ'[১৮৮] সরাসরি এই উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছে; রূপক এবং ঐতিহাসিক রচনাবলীতে এই উদ্দেশ্য বিক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালিদের উপর পাশ্চাত্যের যে ধরনের প্রভাব পড়েছিল বিচক্ষণতার সঙ্গে তার পরিবর্তন করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং বলা যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে যে পাশ্চাত্য প্রভাব নিয়েই তাঁর জিজ্ঞাসার শুরু। জিজ্ঞাসার যা কিছু উত্তর তিনি পেয়েছিলেন সবই ছিল নেতিবাচক। সমস্যার মূল নিহিত ছিল অতি গভীরে, ভূদেবের মতে বাঙালি রক্তে অনার্য প্রভাবের ফলেই তার অনুকরণ প্রবৃত্তি এবং ভোগসুখ।[১২৯] বাঙালি চরিত্রের এই খারাপ দিকগুলি—বিশেষত অনুকরণপ্রিয়তা—পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার ফল হয়েছে আত্ম-হননকারী। সমকালীন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর ব্যক্তি মধুসূদনের জীবনে এর বিধ্বংসী প্রভাব দেখা গেছে। বিদেশ-প্রত্যাগত মধুসূদন বিদেশী পোশাকে ভূদেবের সঙ্গে দেখা করতে এসে পোশাক পরিবর্তন করে, ধুতি পরে পিঁড়িতে বসে খেতে চাইলেন। ভূদেব লিখেছেন, "ঐ সময়ে মধুর মনে কি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। আমার মায়ের কথা মধুর স্মরণ হইয়া থাকিবে, কিন্তু আমি সে সময়ে মুখ ফুটিয়া তাহার নিকট আমার মার নাম আনিতে পারিলাম না, কারণ এ মধু আর সে মধু ছিল না। সে প্রকৃতির হস্ত-বিনির্মিত প্রোজ্জ্বল প্রতিভাসম্পন্ন এবং যশোলিপ্সু, পবিত্র মানবরত্ন ছিল। কিন্তু এ মধু এক্ষণে বিজাতীয় শিক্ষা ও সংসর্গে, বিকৃত অনুকরণাধিক্যে মলিনীকৃত এবং কবির চক্ষে "নিমেদত্তের"* আদর্শীভূত।"[১৩০]

ইংরেজরা যে এদেশের লোকের, বিশেষত শিক্ষিত বাঙালির অনুকরণের বিষয় হয়েছিল তার কারণ তারা ছিল সমাজের শীর্ষে। "কৃতবিদ্য বাঙালীদিগের চলন, বলন, হাস্য-পরিহাস, শব্দোচ্চারণ, মুদ্রা, ব্যবহার সকলেই একটু একটু ইংরাজি গন্ধ পাওয়া যায়। একজন সেকেলে হিন্দু বা মুসলমান তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তুমি দেখিবে তিনি যত বড় লোকই হউন না কেন, ধীরে ধীরে চলিয়া আসিবেন, মুখে হাস্যের একটু মৃদুপ্রভা মাত্র দেখা দিবে এবং আসন পরিগ্রহ করিয়া তিনি অল্পে অল্পে কোমল স্বরে তোমার সহিত বাক্যালাপ করিবেন। কিন্তু যখন ইংরাজিওয়ালা আসিতেছেন, তখন সিঁড়িতে উঠিবার সময় দমদম্ করিয়া শব্দ হইবে। জুতা মস্‌মস্ করিয়া ডাকিবে, ঝনাৎ করিয়া কবাটের শব্দ হইবে, দর্শনমাত্রে অট্টহাস্যের হো হো রব উঠিবে, ঘড় ঘড় শব্দে চেয়ার সরিবে। অন্তঃপুরবাসিনীরা পর্যন্ত জানিতে পারিবেন বাটীতে একজন মানুষ আসিয়াছেন বটে।... হিন্দু ইংরাজের স্থানে সাহঙ্কার ব্যবহার শিখিতেছে এবং আপনার জাতি-সুলভ নম্রতা পরিত্যাগ করিতেছে।[১৩১]" অনুকরণপ্রিয়তার ফলে যদি বাহ্যিক আচরণে এতখানি অবক্ষয় দেখা দিয়ে থাকে, তবে মানসিক অবক্ষয়ের পরিমাণ নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশি হয়েছিল। বয়োবৃদ্ধদের যথাযথ সেবা-পরিচর্যা করতে না পারলে প্রাচীনপন্থীরা অস্বস্তি বোধ করতেন। আধুনিক তরুণদের কাছে আত্মসুখের সন্ধানই একমাত্র চিন্তা। ভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের মধ্যে এখনও অনেকেই প্রাচীনপন্থী। এই আলোচনার মূল বক্তব্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই: "ইংরাজীর বৃদ্ধি এবং ইংরেজের অনুকরণে অহং ভাবের আতিশয্য হইতেছে।"[১৩২]

অন্ধ অনুকরণের ফল দুর্ভাগ্যজনকও বটে, হাস্যকরও বটে, কারণ ভাল অপেক্ষা

* দীনবন্ধু মিত্রের অতি জনপ্রিয় প্রহসন 'সধবার একাদশী'র 'নিমাই দত্ত', মদ্যপ, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অধঃপতিত বাঙালী; চরিত্রটি মাইকেল মধুসূদনের অনুকৃতি বলে মনে করা হত, যদিও নাট্যকার দৃঢ়ভাবে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্দের অনুকরণই সহজ। ভারতে বসবসকারী ইংরেজরা মোটা অঙ্কের বেতন পেত এবং বিলাসবহুল জীবন যাপন করত। অনুকরণকারীরা নিজেদের আয়ের কথা বিবেচনা না করে অন্ধভাবে ইংরাজদের অনুকরণ করত। একটি মাত্র ভৃত্যকে দিয়ে তাঁরা "কোই হ্যায়" সাহেবদের অগুণতি পরিচারকের কাজ করাতেন। বিলাস-বহুল জীবন যাপনের জন্য ইংরেজরা প্রভূত পরিমাণে দৈহিক পরিশ্রম করত। ঘোড়া, গাড়ি, আসবাবপত্র এবং পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি তারা যথেষ্ট যত্ন নিত। আমাদের "বাবু" বিলাসিতা ভালবাসতেন কিন্তু আনুষঙ্গিক প্রচেষ্টার জন্য যত্নবান ছিলেন না। ইংরাজের বাচ্ছল্যও তাঁর ছিল না। আর যেটুকু বা ছিল, তার যথাযথ যত্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর মন ছিল না। ফলে অনুকরণের পরিণতি হয়েছিল ছন্নছাড়া, দেউলিয়া অবস্থা। "অনুকরণ প্রবৃত্তির সঙ্গে যদি পানদোষ থাকে, তাহলে দুর্দশা আরও শীঘ্র গতি হয়।"[১৯৬] অবশ্য "একেবারে সাহেব হইবার চেষ্টা করা নিতান্ত আত্মগৌরববিহীন ব্যক্তির কার্য্য।"[১৯৪]

আত্মমর্যাদাহীনতা-জনিত এই অবক্ষয় বাঙালি জীবনের সর্বক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছিল। চূড়ান্ত মানসিক নির্ভরতার মধ্যেও অবক্ষয় প্রকট। শিক্ষিত বাঙালি তার নিজের সমাজের মতামত সম্বন্ধে নিরুত্তাপ হয়ে ইংরাজরা কি বলল—নিন্দা করল না প্রশংসা করল—তাই নিয়েই মাথাব্যথা করত।[১৯৫] ইংরাজদের কাছে যা শুনত, তোতাপাখির মত তাই আওড়াত। যেহেতু ইংরাজরা আত্মগরিমায় গর্বিত, সুতরাং তাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বাঙালিরাও নিঃসংশয় হয়েছিল। এবং ইংরাজ আগমনের ফলে যে আমাদের দেশের নৈতিক মান উন্নত হয়েছে, এই বহুল-প্রচারিত তত্ত্বেও তাদের কোনো সংশয় ছিল না। ভূদেবের মতে, নৈতিক ব্যাপারে হিন্দুদের ইউরোপের কাছে শেখবার কিছু নেই। হীনম্মন্য অনুকরণপ্রিয়রা "নৈতিক সাহস" প্রভৃতি কয়েকটি কথা লিখে শাস্ত্রাচার লঙ্ঘন করাকে সাহসিকতা মনে করত। কিন্তু হিন্দু সমাজে জোর খাটানোর কোনও প্রথা নেই তাই তাকে ভয় করবারও কোনও কারণ নেই। বরং সকল ক্ষমতার অধীশ্বর ইংরাজদের থেকেই ভীতির কারণ ছিল। "দেশীয় শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় কিছুমাত্র সাহসিকতার প্রমাণ হয় না। ...এখন ইংরাজের অনুকরণে সাহস নাই—উহাতে প্রবলের তোষামোদ হয় মাত্র। ...ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে শাস্ত্রাচার অপরিজ্ঞাত এবং অনভ্যস্ত; এই জন্য তাঁহাদিগের মনোমধ্যে বশ্যভাবের ন্যূনতা এবং তাহাদের ব্যবহারে নম্রতার ত্রুটি জন্মিয়া যাইতেছে। তজ্জন্য তাহাদের যে গুণগুলি আছে, সেগুলিও লোকের চক্ষে সুস্পষ্টরূপে সমুদিত হয় না এবং তাঁহারা সুখ্যাতিভাজন হইতে পারেন না।"[১৯৭] শাসকশ্রেণী এখন তাদের ভক্তির আধার, এবং আত্মগর্বী, প্রচারসর্বস্ব একশ্রেণীর কর্মচারীর উৎসাহে ভক্তিপ্রদর্শন ব্যয়বহুল বিনোদনে পর্য্যবসিত হয়েছিল, যদিও অধিকাংশ ভারতীয়ের পক্ষে তা সাধ্যাতীত ছিল।[১৯৮] "হিন্দুর সন্তুষ্টচিত্ততাও তিরোহিত হইয়া ইংরাজ-সাহচর্য্যে লোভ-পারবশ্য জন্মিতেছে।"[১৯৯] ব্রিটিশ রাজত্বে স্বার্থপরতাকে জাতে তোলা হয়েছে। "ইংরাজী আইনের মতে প্রসবিনী মাতারও খোরপোষের জন্য কৃতিপুত্রের বিরুদ্ধে মামলা চলিতে পারে না।"[২০০] "হিন্দুর হৃদয়ে পরার্থ-জীবনতা যতদূর উঠিয়াছিল, পৃথিবীর অপর কোনো জাতির হৃদয়ে উহা ততদূর উঠে নাই। ইংরাজের হৃদয়ে স্বার্থপরতা যেমন বলবান পৃথিবীতে আর কোন জাতির হৃদয়ে তত প্রবল নয়; আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলি, এরূপ দুইটি সমাজের পরস্পর সংস্রবে হিন্দুর স্বভাবে পরিবর্তন না ঘটিয়া যদি ইংরাজের স্বভাবেই ঘটিত, তাহা হইলেই ভাল হইত।"[২০১]

ভূদেব কিন্তু মঙ্গলজনক পরিবর্তনের কোনো আশা দেখতে পাননি, বরং শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে এক সর্বাত্মক অবক্ষয় দেখেছিলেন। উনবিংশ শতকের "প্রগতি"র জয়গানে তাঁরা তাদের পূজ্যপাদদের সঙ্গে গলা মেলালেন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁরা কোন পথে যাচ্ছেন, তা ভেবে দেখলেন না।[২০২] তাঁদের ইংরাজ-ভক্তিটি ছিল "অন্তরের অন্তস্থল ভাগের ভক্তি", অর্থাৎ তাঁদের দাস-সুলভ মানসিকতা অনেক গভীরে প্রবেশ করেছিল। কোনো সভার কার্যবিবরণী বাংলায় লেখার প্রস্তাব শুনে তাঁদের ঘৃণার উদ্রেক হয়, কারণ তাতে "দেশটি দুই সহস্র বছর পাছু হইয়া যাইবে।" জনৈক "কৃতবিদ্য" মুনসেফ নতুন কর্ম্মস্থলে গিয়ে সমস্ত ইংরাজ কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, দেশীয় লোকের কোনো ক্ষমতা নেই বলে তথাকার রাজার সঙ্গে দেখা করেননি। এমনকি উচ্চমনা, দেশহিতৈষী রাজনারায়ণও ইউরোপীয় মানদণ্ডে হিন্দুধর্মের যাথার্থ্য বিচার করেছিলেন।[২০৩] স্পষ্টত, এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা ছিন্নমূল হয়ে স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ, এমনকি মূল্যবোধটিও হারিয়ে ফেলেছিলেন।[২০৪]

লাভ যা হয়েছিল, তার বেশিরভাগই ছিল অন্তঃসারশূন্য ; বহুল প্রচারিত পাশ্চাত্য শিক্ষা চকচক করলেও সোনা নয়। শৈশব থেকে লোকে যে শিক্ষালাভ করত তার মাধ্যম ছিল দুর্বোধ্য এবং কঠিন এক বিদেশী ভাষা। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বিদেশী ভাষার ব্যবহার কখনই সন্তোষজনক হতে পারে না, কারণ "শুদ্ধ অপরিজ্ঞাত বস্তুর নামই যে বিদেশীয় ভাষার পুস্তকে থাকে, তাহা নহে, অপ্রচলিত বিজাতীয় ভাবও যথেষ্ট থাকে। সে ভাবগুলির সমগ্ররূপে পরিগ্রহ হইতে পারে না। ...অতএব ইংরাজি শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের লোকগুলি বাল্যাবধিই সুপরিস্ফুটরূপে বস্তু এবং ভাব গ্রহণ করায় অনভ্যস্ত।" পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রকৃত গৌরব যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, সেটাই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। এদেশের কলেজের বিদেশী শিক্ষকদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান নেই বললেই চলে, তাছাড়া উপযুক্ত ল্যাবরেটরি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভাবে বিজ্ঞানশিক্ষা এদেশে এক বিড়ম্বনা বলা চলে। ব্যবহারিক শিক্ষাদ্বারা এই অভাব পরিপূরণ করে নেবার কোনো উপায়ই নেই, কারণ এখানে কারখানা-শিল্পের সংখ্যাও অতি নগণ্য। ফলত, বিজ্ঞান শিক্ষা এখানে বৈজ্ঞানিক মনোভাবকেই ধ্বংস করছে—সংস্কৃত বা আরবী ব্যাকরণের মত না বুঝে বিদেশী গ্রন্থকার এবং শিক্ষকের ভাষা মুখস্থ করা হচ্ছে। শাস্ত্রকারদের স্থান নিয়েছেন আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানী—পরিবর্তন শুধু এখানেই। "ইউরোপীয়দিগের মধ্যে বাহ্যবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন হইতেছে," শুধুমাত্র এই কারণেই একে প্রগতি বলা যায়। ভারতীয় ছাত্রদের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের জোরেই ঘটনাকে মেনে নিতে হয়। সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যে যুক্তিহীনতা এবং মেনে নেওয়ার মানসিকতা গড়ে উঠেছে, পাশ্চাত্য দেশের কুসংস্কারগুলিকে নির্লজ্জভাবে গ্রহণ করার মধ্যে তা প্রকট। হাজার হাজার প্ল্যানচেট বিক্রী, "লিঙ্গশরীরী" তিব্বতী মহাত্মাগণের উপর বিশ্বাস প্রভৃতি তার উদাহরণ। 'ইহারা দেশী হাতচালা ছাড়িয়া বিলাতী হাতচালা ধরিয়াছেন, ইহারা দেশীভূত ছাড়িয়া বিলাতী ভূত লইয়াছেন, ইহারা দেশী অবতার ত্যাগ করিয়া বিলাতী অবতার গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।"[২০৫] পাশ্চাত্য শিক্ষার আরও গুরুত্বপূর্ণ কুফল হল শিক্ষিত-অশিক্ষিতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবধান সৃষ্টি। বহুল পরিশ্রমলব্ধ ইংরাজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষাকে শিক্ষিত সম্প্রদায় হইয়াছেন।"[২০৫] পাশ্চাত্য শিক্ষার আরও গুরুত্বপূর্ণ কুফল হল শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধান সৃষ্টি। বহুল পরিশ্রমলব্ধ ইংরাজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষাকে শিক্ষিত সম্প্রদায় অমূল্য ধন বলে মনে করে, তার প্রকৃত মূল্য কোথায়, তা বোঝবার চেষ্টা করে না।[২০৬] ইংরাজি ভাষার প্রতি আকর্ষণের ফলে সমাজের দুই শ্রেণীর মধ্যে ভাষার ব্যবধান গড়ে উঠেছে। অফিস-কাছারিতে ইংরাজি ব্যবহারের ফলে বাস্তবক্ষেত্রে এই ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রিটিশ কর্মচারীদের কাছে এই ব্যবস্থা সুবিধাজনক হওয়ায় দরিদ্র ও অশিক্ষিত দেশবাসীর অসুবিধা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাবও সেই রকমই, কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করে তারা যে সাধারণের থেকে প্রগতিসম্পন্ন, এই গর্বেই তারা গর্বিত।[২০৭]

এই দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে ভূদেব দুটি আশার রশ্মি দেখেছিলেন। প্রথমত, অন্ধ অনুকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আত্মঅবমাননা সম্বন্ধে সচেতনতা আস্তে আস্তে জাগরিত হচ্ছিল, তিনি লক্ষ করেছেন যে ইদানীং হ্যাট-কোট-বুটের প্রাধান্য কমেছে, টেবিলে খাওয়া, ইংরাজি বলা, এসবও একটু কমেছে। আগের যুগের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের তুলনায় এ যুগের স্নাতকদের মধ্যে এইসব প্রবণতা কম। নতুন ধারা অনুযায়ী যারা সস্ত্রীক বিদেশ যায়, অনুচিকীর্ষা তাদের মধ্যে একটু বেশি জোরালো। ভূদেব আশা করছিলেন যে বিলাত-যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে হয়ত তা কমবে।[২০৮] তাঁর আশার অন্য কারণ জাতিভেদ প্রথা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত ছিল বলে তিনি মনে করতেন। হিন্দুর কাছে দেশবাসী একজন ব্রাহ্মণই সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী, কোনো বিদেশী সে স্থান নিতে পারে না। এই কারণেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের হীনম্মন্যতা একটা বিশেষ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যে ব্যক্তি জাতীয়ভাব সম্পূর্ণ হারিয়েছে, সেই ইংরাজ তার সাথে করমর্দন না করলে অপমানিত বোধ করে ; যার বিন্দুমাত্র আত্মমর্যাদা নাই, সেই ইংরাজের ভোজসভায় যোগ দেবার জন্য লালায়িত হয় ; সে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়েছে, সেই কথোপকথনকালে অথবা পত্র বিনিময়ে ইংরাজ তার নাম ধরে সম্বোধন করলে কৃতার্থ বোধ করে। যে পিতৃপুরুষের ধর্ম বিস্মৃত হয়েছে, সেই বিদেশী রীতিনীতি অনুকরণ করে গর্বিত বোধ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে সে ইংরাজের ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি এবং মূল্যবোধকে নিজেদের তুলনায় উৎকৃষ্ট মনে করে এবং প্রাণপণে সেগুলি অনুকরণ করে ব্রিটিশের সমান হতে চেষ্টা করে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, নিজের বোনকে বা মেয়েকে রক্ষিতারূপে ইংরাজের হাতে তুলে দিয়ে ধন্য হতে চায় না, অথবা ইংরাজের পায়ে ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা করে না। ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করে তিনি বুঝেছিলেন যে একমাত্র জাতিভেদ-প্রথা ভারতবাসীকে ঐ রকম অধঃপতন থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।[২০৯] ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং উল্লিখিত দুটি ক্ষীণ আশার উপর তিনি ভরসা করেছিলেন। আবার বলি যে, লুপ্তপ্রায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ঔপনিবেশিক শিক্ষিত-আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণীর দুর্বল প্রচেষ্টার মধ্যে তিনি যে ক্ষীণ আশার রশ্মি দেখেছিলেন, তাকে উজ্জ্বল করে তোলার উদ্দেশ্যেই তাঁর পাশ্চাত্য ভাবধারার যত কিছু সমালোচনা।

অবশ্য ব্রিটিশদের উপস্থিতিই এদেশে পাশ্চাত্য জীবনধারার বাস্তব রূপ উদ্‌ঘাটন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর যেসব প্রতিক্রিয়া তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলিকে দ্ব্যর্থক না বলে বরং স্পষ্টত পরস্পরবিরোধী বলা চলে। 'সামাজিক প্রবন্ধ'-এর মুখবন্ধে তিনি "ইংরাজ-রাজ প্রদত্ত ডাক, রেলওয়ে, মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিদ্যাবিস্তারের উপাদান এবং এই অভূতপূর্ব শান্তিসুখের অবসর"-এর কথা উল্লেখ করেছেন।[২১০] রূপক কাহিনী 'পুষ্পাঞ্জলি'-তে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "ইহারা আসিয়া দেশটিকে কেবল একচ্ছত্রতলে আনিলেন, এমত নহে; তাহার সর্ব্বাবয়ব আয়স-বন্ধনে সম্বদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্মিলন সাধনের কোন চেষ্টাই করিলেন না। কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ইহারা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, তাহাতে আপনা হইতেই সম্মিলন ব্যাপারের যথেষ্ট সহায়তা হইতে লাগিল। ঐ সকল লোক নিতান্ত স্বার্থপর—কিন্তু সুদূরদর্শী; একান্ত অহঙ্কার বিমোহিত— অথচ ভোগ-সুখাভিলাষী নহে। অপরিমেয় বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক বলশালী—কিন্তু পরোপকারবিরত; জ্ঞানচর্চায় উন্মুখ—কিন্তু মুক্তিভজনা করে না। ইহারা ঘোর তমোগুণের আশ্রয়। ইহারা যেমন আসিতেছে, অমনি চলিয়া যাইতেছে। মহাদেবীর মন্দির মধ্যে একজনও একটি সম্ভ্রমসূচক আসন প্রাপ্ত হইতেছে না।"[২১১] আর একটি রূপক কাহিনী 'স্বয়ম্বরাভাষ পর্ব'-তে ব্রিটিশ শাসনের কঠোরতর সমালোচনা করেছেন। সেখানে ভারতবর্ষকে 'দেবী অধিভারতী' রূপে কল্পনা করা হয়েছে; তাঁর স্বামী আর্যস্বামী (অর্থাৎ আর্য হিন্দু শাসক) যাবনিক, অর্থাৎ মুসলমান বিজেতাগণ কর্তৃক নিহত হয়েছেন। দীর্ঘকাল যাবনিকদের দাসত্ব করবার পর সেন্ট জর্জ, সেন্ট ডেনিস এবং সেন্ট নিকোলাস নামক তিন দৈত্য, যথাক্রমে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং রাশিয়া, দেবীর পাণিপ্রার্থনা করল। ক্রমশ সেন্ট জর্জ যাবনিকদের ক্ষমতা অপহরণ করলেন এবং তিনিই দেবীর প্রকৃত স্বামী বলে দাবি করলেন। দেবী বিরক্ত হয়ে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে জর্জ একজন অসাধু দেওয়ান মাত্র। কোম্পানির দেওয়ানী লাভ এবং সেই ক্ষমতার অপব্যবহারের ঘটনা এই বক্তব্যের বিষয়বস্তু। এরপরে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা করে জর্জের প্রতি অধিভারতীর দ্ব্যর্থহীন উক্তি: "তোমার আর যাচিয়া উপকার করায় কাজ নাই। তুমি চলিয়া যাও না কেন? আমার ছেলেদের আর এরূপ ক্ষীণজীবী, সভ্য ও সুশিক্ষিত হইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা মূর্খ হইয়া থাকিবে। পাঁচ সের ধানের বেরুন করিয়া মোটা ভাত খাইবে, চরকার মোটা সুতো পরিবে, চটিজুতা পায়ে দিবে। তথাপি তোমার কৃত অশ্ব-জিনের মোজা ও বুটজুতা প্রভৃতির প্রয়োজন নাই। আমাদের এ সকল মোটা ব্যবস্থা লক্ষগুণে শ্রেয়স্কর। তোমার বাবুয়ানা খোরাক পোশাকে আর কাজ নাই। আমি তোমার সুপালন আর প্রার্থনা করি না।"[২১২] ব্রিটিশ শাসনের ভালমন্দ বিচারের পরিণতি সর্বক্ষেত্রেই একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছিয়েছে, কিন্তু আর কোথাও তা এত স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত হয়নি।

'উনবিংশ পুরাণ' আবেগ ও উচ্ছ্বাসে পূর্ণ উপন্যাসের ভাষায় লিখিত। এক ছাত্রকে দিয়ে লেখা শুরু করলেও রচনার বিষয় ভূদেব বিশদভাবে পরিবর্তন করেছিলেন। এই অসমাপ্ত রচনার যে দুটি অংশ ছাপা হয়েছিল—'পুষ্পাঞ্জলি' এবং 'স্বয়ম্বরাভাষ পর্ব—সেগুলি প্রকৃতপক্ষে তাঁরই লেখা।[২১৩] এই অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিতর্কিত—পড়লে মনে হয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল, কোনোক্রমেই এগুলিকে বিশ্লেষণমূলক বলা যায় না। তাঁর রচনায় সাধারণত ব্রিটিশ শাসনের যথোচিত মূল্যায়ন দেখা যায়, এবং এই রূপক কাহিনীগুলিতে যেমন আবেগধর্মী কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তার উদাহরণ মেলে না। তবে মৌলিক উপসংহারে বিশেষ কোনও তারতম্য ছিল না।

"বিদেশী শাসন সর্বক্ষেত্রেই ক্ষতিকর"—তৎকালীন ইউরোপে সুপ্রচলিত এই মতবাদকে খণ্ডন করে ভূদেব তাঁর সমীক্ষা শুরু করেছিলেন। তাঁর মতে, ইংরাজ শাসনের ফল ভারতে বিষময় হয়েছে, একথা বলা যায় না। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি ব্রিটিশ শাসনে ভারতের ঐক্য, শান্তি, সংহতি, বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রভৃতি উদাহরণ দিয়েছেন।[২১৪] এইসব সুফলের পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন ভারতীয়রা ব্রিটিশ শাসনের অনুবৃত্তি চাইতেন বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।[২১৫] বীরজাতি ইংরাজ যে তাদের শাসন করছে, তাতে তাঁরা গর্ব অনুভব করতেন, বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণাবোধ করতেন না। পরে আলোচিত বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভূদেব এক অভূতপূর্ব ঘটনা বলে মনে করেছেন: "এমন ক্ষুদ্র দেশের এত অল্পসংখ্যক লোক এত দূরে এমন অতি-বিস্তৃত সাম্রাজ্য আর কখনও অধিকার করিতে পারে নাই।"[২১৬] চূড়ান্ত উন্নতির যুগে রোম সাম্রাজ্য পৃথিবীর স্থলভাগের বিংশতিতম অংশ অধিকার করেছিল, রুশ সাম্রাজ্যের অধিকারে সপ্তম অংশ, কিন্তু ইংরাজ সাম্রাজ্য ইতিমধ্যেই স্থলভাগের এক-ষষ্ঠাংশ জয় করেছে। তাছাড়া পূর্বোক্ত দুটি সাম্রাজ্যই ছিল কৃষিভিত্তিক এবং এক-কেন্দ্রিক। পক্ষান্তরে "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাণিজ্যসূত্রক এবং বহুচক্র। অর্থাৎ পরস্পর অসংলগ্নরূপেই অবস্থিত।" সেই সাম্রাজ্যের শাসনও কঠিন ব্যাপার। অতএব "ভারতরাজ্যের অধিকারই ইংরাজের ক্ষমতার সর্বপ্রথম প্রমাণ নয়, তার মহিমার অন্যতম প্রমাণ মাত্র।"[২১৭]

ব্রিটিশ শাসনের ভালমন্দের তালিকা প্রস্তুত করেই ভূদেব ক্ষান্ত হননি। ব্রিটিশ শাসনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি এবং তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সুচারুরূপে বিশ্লেষণ করেছিলেন। সাম্রাজ্যের বিশালতা এবং জটিলতা বিস্ময়কর বোধ হলেও তিনি বুঝেছিলেন যে "ইংল্যান্ড যদি ভারতবর্ষ অধিকার না করিতেন, তবে এখন ইউরোপীয় রাজ্যসকলের মধ্যে উহার যে উচ্চ আসন তাহা পাইতেন না—ইংল্যান্ড প্রথম শ্রেণীর রাজ্য না হইয়া পোর্তুগালের ন্যায় একটি সামান্য রাজ্য বলিয়াই গণ্য হইতেন।"[২১৮] এই প্রসঙ্গে তিনি একটি অস্বাভাবিক মন্তব্য করেছেন: "ভারতরাজ্য অধিকারের জন্য ইংরাজকে স্বীয় প্রভূত বলের অতি অল্পমাত্রই প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। ভারতরাজ্য যেন স্বয়ং ইচ্ছা করিয়াই ইংরাজকে আপনার সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন।...বস্তুত নিবিষ্টমনে ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীত হয় যে, ভারতবর্ষ আপনাতে পূর্বনিহিত শক্তিসকলের প্রভাবে যে দিকে অভিমুখ হইয়াছিল, ইংরাজ ইহাকে সেইদিকে লইয়া গিয়াছেন এবং সেইজন্যই তাঁহার কার্যটি এত সত্বরে এবং সহজে সম্পন্ন হইয়াছে।"[২১৯] প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতের যে "সম্মিলন প্রবণতা", ব্রিটিশ শাসনে তাই সম্পন্ন হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। 'উনবিংশ পুরাণে' এই অভিমত অন্যভাবে এবং উগ্ররূপে ব্যক্ত হয়েছে: "দেবী অধিভারতী সেন্ট জর্জকে বলিলেন, 'আমার অবোধ সন্তানেরা যাবনিকের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমার সাহায্য গ্রহণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে...তুমি যে ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হইবে তাহা আমার পুত্রগণ বুঝিতে পারে নাই।”[২২০] ভারতবাসীর মেনে নেওয়ার উপর জোর দেওয়া হলেও, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা যে তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নয়, তা এই মন্তব্যে স্পষ্টভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ব্রিটিশ অধিগ্রহণের প্রাথমিক পর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকবৃত্তিতে তিনি কতগুলি সদ্‌গুণ লক্ষ করেছিলেন। লাভের দিকে প্রখর দৃষ্টি থাকায় বণিকের স্বাভাবিক সাবধানতার ফলে ব্রিটিশ নীতিতে বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যেত। স্পেনীয় ও পোর্তুগীজদের ব্যবহার ছিল অন্যরকম : তারা রাজার হুকুম তামিল করতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং তাদের উদ্ধত ব্যবহারে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। সে তুলনায় ইংরাজদের ব্যবহার ছিল সদ্বিবেচনাপ্রসূত, তারা বিজিত জাতিকে বন্ধু করে তোলবার চেষ্টা করেছিল। অতি ধীরে এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে তারা আগ্রাসী নীতির প্রয়োগ করেছিল। প্রচলিত ধর্ম এবং সামাজিক আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করেছিল। ফরাসী বা পোর্তুগীজরা এই পথ অবলম্বন করেনি। ভারতে প্রচলিত হিন্দু ও মুসলিম আইনসমূহকে ভিত্তি করে ব্রিটিশরা তাদের আইনপদ্ধতি রচনা করেছিল। কোম্পানির শাসনের আমলে তারা দেশীয় নিয়মকানুনের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা স্থাপন করেছে, “অতএব মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে, ইংরাজ ভারতকে তাহার গন্তব্যপথে লইয়া আসিয়াছেন—ইংরাজ অতি ধীরতা সহকারে প্রজাবৃন্দের প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন—ইংরাজ ভারতে যে কাজ করিয়াছেন তাহা ইংরাজ ভিন্ন অপর কেহ করিতে পারেন নাই, এবং পারিতেন না—এইজন্য ইংরাজ ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার, শ্রদ্ধার এবং ভক্তির ভাজন হইয়াছেন।”[২২১]

ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি কোম্পানির আমল এবং পরবর্তী যুগের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। কোম্পানির শাসনে কয়েকটি সদ্‌গুণ তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, যেগুলি পরবর্তী যুগে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের উপযোগিতাবাদের যুগকে[২২২] উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছেন : “ভারতবর্ষ যতদিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীন ছিল ততদিন ইংরাজরা বলিতেন যে ভারতবর্ষের লোক সকলকে আত্মশাসনে সক্ষম করিয়া তুলিবার নিমিত্তই আমরা ভারতবর্ষে আছি। কথাটা গোড়া থেকেই মিছা। কিন্তু কথাটার একটা মহৎ গুণ ছিল। ভারতবর্ষের শাসনকার্য যে একটা অত্যুচ্চভাব মনে রাখিয়াই করিতে হইবে, ঐ কথাটা দ্বারা তাহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইত। ভারতবর্ষকে সম্মিলিত, সম্বদ্ধ, ধনশালী এবং স্বাধীন প্রাকৃতিক করাই ইংরাজ শাসনপ্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। ভারতবর্ষ অধিকারে ইংরাজদিগের নিজের লাভ অবান্তর বিষয় থাকিবে। ভারতবর্ষ সবল এবং ধনশালী হইলে ইংল্যান্ডের লাভ।” পরবর্তীকালে এইসব উচ্চ আদর্শের স্থান নিয়েছিল জাতিগত অহঙ্কার এবং ঔদ্ধত্য।[২২৩]

বাস্তবে কিন্তু কোম্পানির শাসনকে এইসব উচ্চ আদর্শের বিপরীত বলেই মনে হত। ভারত-স্থিত ব্রিটিশরা কোম্পানির দেওয়ানী আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে থেকে আইনের চোখে বিশেষ সুবিধাভোগী সম্প্রদায় ছিল। ব্রিটিশের অনুরূপ ব্যবহার আশা করা বাঙালির পক্ষে দুরাশা ছিল। পুলিশের ব্যবহার সমাজবিরোধীদের চেয়েও খারাপ ছিল। ত্রিশের দশকে ভূসম্পত্তির মূল্য কমে গিয়েছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঞ্জাত অর্থ বিপুল পরিমাণে মামলা-মোকদ্দমায় এবং "অলীক আমোদ প্রমোদে" ব্যয় করা হত।[২২৫] তাছাড়া শোষণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিভিন্ন ধরনের পন্থা ছিল।[২২৬] এইসব কুফলের পরিপ্রেক্ষিতে সৎ এবং ন্যায়-পরায়ণ শাসনব্যবস্থার দাবি ক্রমশই সোচ্চার হচ্ছিল, বিশেষত বেন্টিঙ্কের সুশাসনের আমল এবং ১৮৩৩-এর আইনে সরকারি মধ্যপদগুলি ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হবার পর থেকে। "ফলত এতদ্দেশীয় লোকেরা বহুকালাবধি বিজাতীয় যথেচ্ছাচারী রাজার শাসনাধীন থাকিয়া অপেক্ষাকৃত নিয়ম পরায়ণ ইংরাজ রাজতায় যে অধিকতর স্বাধীন এবং সুখী হইবেন তাহার সন্দেহ কি ? মুসলমানদিগের মধ্যে কোন কোন অতি উদার প্রকৃতির বাদশাহ সাধারণ আদালতের বিচার মান্য করিয়া চলিতেন ; ইহাই তাঁহাদিগের পরম প্রশংসার বিষয় ছিল। কিন্তু ইংরাজ গভর্নমেন্ট পদে পদে আদালতের বিচার মান্য করিয়া চলিতেছিলেন।"[২২৭]

যতদিন পর্যন্ত ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি ছিল, ততদিন ব্রিটিশরা পরাজিত ভারতীয় নৃপতিদের সঙ্গে ব্যবহারে হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ মেনে চলত এবং ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত না।[২২৮] কিন্তু কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যকলাপ হ্রাস পাবার পর শাসকরূপে তাদের মানসিকতার সঙ্গে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের মৌলিক পার্থক্য ছিল। হিন্দু ঐতিহ্যে আইন, প্রশাসন এবং বিচারবিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের ধারণার কোনও অস্তিত্ব ছিল না। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রীয় বিধানই এদেশের আইন—তার ব্যাখ্যা দিতেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা এবং শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে প্রচলিত ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ন রাখার প্রচেষ্টাতেই রাজার কর্তব্য সীমাবদ্ধ ছিল। তুলনায়, ইউরোপের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য রাজা, অভিজাত এবং জনসাধারণের মধ্যে ক্ষমতার সামঞ্জস্য বিধান করা। ভারতে এ রকম কোনও প্রশ্নই ছিল না—এখানে রাজা-প্রজা উভয়েই শাস্ত্রোক্ত ধর্মনীতি অনুসরণ করবে, এটাই বিধেয়। ইংরাজরা অবশ্য এই ধর্মনীতি অনুসরণ করেনি, কিন্তু বাস্তববোধ এবং দূরদর্শিতার ফলে তাদের শাসনব্যবস্থায় কিছুটা ন্যায়পরায়ণতা বজায় ছিল।[২২৯] ব্রিটিশ শাসনের বিদেশীয়ানার সঙ্গে এই মৌলিক পার্থক্যের কোনও সম্পর্ক নেই। তাদের দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়, শ্রেণী এবং রাজনৈতিক দলগুলি সবসময়েই পরস্পরের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা করেছে। "একপক্ষে রাজশক্তি খর্ব করিয়া রাখিবার জন্য যে চেষ্টা করিতে হয়, এই ইউরোপীয় নীতি ভারতবাসী জানে না ; আর পক্ষান্তরে ইংরাজরাজ জানেন যে, প্রজাকর্তৃক নিবারিত না হইলে যথেচ্ছ শক্তি প্রসারণে তাঁহার সম্যক অধিকার আছে। এইরূপে ইংরাজাধিকারে ভারতবর্ষমধ্যে রাজা-প্রজায় একটি গূঢ় মতান্তরতা জন্মিয়া রহিয়াছে।" অনুরূপভাবে ইংল্যান্ডে নর্ম্যান বিজয়ের ফলে "দেশের সমস্ত ভূসম্পত্তিতে রাজার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব...এবং রাজার স্থানে প্রাপ্ত হইয়া ভূম্যধিকারীবর্গের সেই নির্ব্যূঢ় স্বত্বে অধিকার" এর নীতি ভারতবর্ষে প্রচলন করা হয়েছিল। এইভাবে রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ভূমিস্বত্ব নির্ধারিত হয়েছে। এবং আইনত যাই হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শাসক নিজের ইচ্ছামত প্রজার উপর কর আরোপ করতে থাকেন, ততক্ষণ "প্রজারা...আপনাদের স্বত্ব দেখিতে পায় না।" হিন্দু ঐতিহ্যে রাজা প্রজার সেবক হিসাবে উৎপন্নের এক-ষষ্ঠাংশ বৃত্তি ভোগ করেন। ইংরাজ এই দেশ জয় করে নিজেকে সমস্ত জমির মালিক বলে রাজস্ব আদায় করে। অন্যান্য কাজের জন্যও কর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরোপ করা হয়। বিশেষত আদালতের স্ট্যাম্প কর ভারতীয়দের কাছে অন্যায় বলে মনে হত, কারণ তাদের ধারণায় বিচার তো রাজার কর্তব্যেরই অঙ্গ।[২৩০]

ব্রিটিশ শাসনের সুফলগুলি ভূদেব এইভাবে গ্রন্থনা করেছেন : "ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রতাপ দোর্দণ্ড, তাহার শাসনরীতি দৃঢ়শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাহার কার্যপ্রণালীতে হঠকারিতা, অন্যায়কারিতা, পক্ষপাতিতাদি দোষ নাই বলিলেও চলে ; অথবা যাহা কিছু আছে, তাহা বিশেষ যত্নসহকারেই সমাচ্ছাদিত। ইংরাজের রাজত্বে ভারতবর্ষের প্রতি বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ নাই, সমস্ত দেশ সর্বতোভাবে উপশান্ত। ইংরাজের রাজত্বে বহির্বাণিজ্যের বিস্তৃতি হইতেছে, অন্তর্বাণিজ্যের সৌকর্য বাড়িতেছে, বিচারকার্যে ন্যায়পরতা রক্ষিত হইতেছে, মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনভাবে চলিতেছে, বিষয়জ্ঞতা বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং ইউরোপীয়দিগের অনুমোদিত লেখাপড়ার প্রসার হওয়ায় দেশীয়দিগের কোন কোন বিষয়ে চক্ষু ফুটিতেছে—ফলকথা, ইংরাজের রাজত্ব একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার।"[২৩১]

অন্যান্য বৈদেশিক শাসনের সঙ্গে তুলনা না করলে এই "অভূতপূর্ব ব্যাপারের" ঐতিহাসিক চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। প্রথমেই যার সঙ্গে তুলনা করা চলে, তা হল রোম সাম্রাজ্য। রোমীয়দের মতই ইংরাজরাও বিজিত রাজ্যগুলিকে স্বজাতির লোকেদের শাসনাধীনে রাখে। এইসব শাসনকর্তারা রোম সাম্রাজ্যের সেনেটের সঙ্গে তুলনীয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আজ্ঞাবহ। উভয়েই নিজের দেশের ভাষা শেখাবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে, তবে ব্রিটিশরা স্থানীয় ভাষা চর্চার প্রতিও দৃষ্টি রেখেছে। রোমীয়রা কর সংগ্রহ করে নিজেদের দেশে পাঠাত। ইংরাজরা ভারতবর্ষ থেকে যে টাকা দেশে পাঠায়, তাকে কর বলা হয় না। রোমীয়রা বিজিতদেশের দেবদেবীকে নিজেদের দেবতাদলভুক্ত করে নিত, একেশ্বরবাদী ইংরাজ অবশ্য ভারতীয়দের ধর্মের প্রতি প্রকাশ্যে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে না। রোমীয়রা বিজিত দেশে নিজেদের আইন প্রচলন করত। ভারতের আইনব্যবস্থা ব্রিটিশ আইনবিধিকে ভিত্তি করে রচনা করা হয়েছে।

তুলনামূলকভাবে, ব্রিটিশ শাসনের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল মুসলিম, স্পেনীয় এবং পোর্তুগীজ শাসন, যারা সর্বপ্রকারে বিজিত দেশের ধর্ম ও রীতিনীতি উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করত। ওলন্দাজ-অধিকৃত যবদ্বীপে আবার আর এক রকমের বৈপরীত্য দেখা যায়, সেখানে বর্ণের পার্থক্য না করে বিজিতদের নিয়েই সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। কোন কোন উচ্চপদও যবদ্বীপবাসীকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যেমন ভারতে আফিং ব্যবসায়ে একচেটিয়া স্বত্ব ভোগ করে, ওলন্দাজরা তেমনি যবদ্বীপে কৃষিজাত সমস্ত রপ্তানি পণ্যের উপর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার কায়েম করেছিল। আবার, প্রধানত বেগার খাটিয়ে এইসব পণ্য উৎপাদন করা হত। রুশীয়গণ মধ্য এশিয়ায় শান্তি স্থাপন করেছে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে চূড়ান্ত শোষণেরও ব্যবস্থা করেছে। স্থানীয় অধিবাসীদের তারা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না। ফলে, যেমন পশ্চিম তুর্কীস্থানে, তেমনি নব্যবিজিত অঞ্চলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোনও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। অ্যালজিরিয়া প্রভৃতি উপনিবেশে ফরাসীগণ স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য একেবারেই বিলুপ্ত করে দিতে চায়। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যারা ফরাসী আইন পুরোপুরি গ্রহণ করবে, শুধুমাত্র তাদেরই ফরাসীদের সমান অধিকার দেওয়া হবে বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানানো হয়েছিল। প্রকারান্তরে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন উঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ জাতি বিভিন্ন উপনিবেশে তাদের নিজেদের আইন বলবৎ করেছে বটে, কিন্তু কোথাও ব্রিটিশ নাগরিকের সমান অধিকার দেওয়ার কথা বলেনি।[২৩২]

কোম্পানির শাসনের অবসানে তাদের বিঘোষিত আদর্শের অবসান হয়েছিল। ভারত-সচিবরূপে ডিউক অব আর্গাইল-ই প্রথম ঘোষণা করেন যে ভারতকে চিরকাল দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখাই ব্রিটিশ শাসনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য কার্যকর করতে গিয়ে তাদের মনে হয়েছে যে সর্বক্ষেত্রে ব্রিটিশদের প্রাধান্য বজায় রাখলেই ভারতের মঙ্গল হবে। এই নীতি গ্রহণ করার ফলে ব্রিটিশ অপরাধীরাও বিশেষ সুবিধা-সুযোগ ভোগ করত।[২৩৩]

ভূদেবের মত, ব্রিটিশরা বিদেশী বলেই তাদের শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে, তা নয়। তবুও, তাদের বিদেশীয়ানার মধ্যে, কিম্বা একটি বিশিষ্ট বিদেশী ঐতিহ্যের মানসিকতার মধ্যে তিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি দেখেছিলেন। লর্ড ডাফরিনের একটি উক্তি তিনি উদ্ধৃত করেছেন : "ভারতবাসীর ইংরাজের প্রতি অনুরাগটি যতটা বিচারমূলক ততটা ভক্তিমূলক নহে।" মন্তব্যটি মেনে নিলেও তিনি কিন্তু ডাফরিনের ব্যাখ্যা মানতে পারেননি : "ভারতবাসীরা আপনাদিগের স্ত্রী-পরিজনকে ইংরাজদিগের সহিত আলাপ করাইয়া দেন না, তারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী" ইত্যাদি। তাঁর মতে ভারতে মুসলিম শাসনের সময়েও এই সব কারণ বিদ্যমান ছিল, তা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে হিন্দুদের যতটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, ইংরাজদের সঙ্গে তা হয়নি। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বাঙালিরা যখন নিজেদের পরিবারের সঙ্গে বিদেশীদের আলাপ-পরিচয়ের ব্যবস্থা চালু করেছিলেন, তখনও হয়নি। ভূদেবের মতে এই অপ্রীতির কারণ ছিল অন্যত্র ; "ইংরাজ স্বদেশে সামাজিক শক্তির সামঞ্জস্য বিধানে যেরূপ অভ্যস্ত সেই অভ্যাসানুযায়ী এদেশেও রাজশক্তি প্রসারণের সীমা প্রজার প্রতিরোধ সাপেক্ষ, এইরূপ মনে করিয়া চলেন। কিন্তু ভারতবাসীর অভ্যাস সেরূপ নয়,...অসংযত শক্তি প্রসারণ দেখিয়া মর্মাহত হয় মাত্র।...ইংরাজ প্রায় শতবর্ষাবধি পৃথিবীতে অতুল বিক্রমশালী হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার আত্মনির্ভর এবং আত্মগৌরব অপরিসীম হইয়াছে। তিনি আর আপনার দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত (অথবা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য) হইতে পারেন না। তিনি অন্যের অজ্ঞতা, অবিশুদ্ধতা, অক্ষমতা প্রভৃতি দোষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সর্বপ্রকার অকার্যের কারণ নির্দেশ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতবাসী আমাকে তেমন ভালবাসে না, অতএব আমাতে কোন দোষ আছে' এরূপ ভাব ইংরাজের মনে প্রবেশলাভ করিতে পারে না। 'ভারতবাসী যে আমাকে তত ভালবাসে না, তাহা ভারতবাসীরই দোষ'—এই ভাবই ইংরাজের মনে বদ্ধমূল।"[২৩৪]

অন্যান্য জাতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি ইংরাজদের অশ্রদ্ধা শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদিতার ঔদ্ধত্য বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাদের দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে এর কারণ নিহিত আছে বলে ভূদেব মনে করেছিলেন। "বস্তুত ইংরাজ ইংল্যান্ডকেই মনের সহিত ভালবাসেন এবং পৃথিবীর অপর সকল দেশকে নিতান্ত হেয়জ্ঞান করেন।"[২৩৫] অথচ উপনিবেশ স্থাপনে তাদের সাফল্য অতুলনীয়। এক্ষেত্রে বলা যায় যে "ইংরাজ বিদেশ-বিদ্বেষ্টা নহেন, তিনি বৈদেশিক বিদ্বেষ্টা।" কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ উপনিবেশকে সর্বতোভাবে ইংল্যান্ডের অনুরূপ করে গড়ে তুলতে পারলেই তারা খুশি। উপনিবেশগুলিতে আদিম-অধিবাসীদের ধ্বংসসাধন করে তারা ইংরাজি ভাষা ও আইন প্রচলন করেছে। অন্যান্য দেশের ঔপনিবেশিকগণ অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু "ইংরাজ কখনও কাহারও সহিত মিশেন না।" জাতিগত মিশ্রণ, বিশেষত ইউরোপীয় ভিন্ন অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রণ তারা পরিহার করে চলে। এ বিষয়ে তারা অন্যান্য টিউটনিক জাতির মতই। স্পেনীয়, পোর্তুগীজ, ইতালীয় এবং কিছুটা ফরাসীদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় জাতিগত মিশ্রণের ব্যাপারে স্পেনীয় এবং পোর্তুগীজদের ঔদার্যই প্রমাণিত হয়েছে। এমনকি ফরাসী-অধিকৃত কানাডা প্রদেশ, যেখানে আদিবাসীদের অধিকাংশই নিহত হয়েছে, সেখানেও কোনও কোনও অঞ্চলে অধিবাসীদের এক-দশমাংশ বর্ণশঙ্কর। প্রভেদ বোঝাবার জন্য ভূদেব উত্তর আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির ইতিহাস উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় জাতিসমূহ, মাওরি এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের দুর্ভাগ্যের উদাহরণ দিয়েছেন। "ইউরোপীয়দের ঘ্রাণমাত্র পাইলেই অপরাপর ক্ষুদ্রপ্রাণ মনুষ্যেরা একেবারে শুকাইতে আরম্ভ করে"—জনৈক অজ্ঞাতনামা "ইংরাজ পণ্ডিতের" এই উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি মন্তব্য করেছেন—"অন্যান্য সকল ইউরোপীয়রা অপেক্ষা ইংরাজের ঘ্রাণ অধিকতর তীব্র সন্দেহ নাই।"

এতদসত্ত্বেও তাঁর মতে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির তুলনায় ইংরাজরা কম নিষ্ঠুর ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি মেক্সিকো, পেরু এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয়, ব্রেজিল এবং ভারতে পোর্তুগীজ, এবং কানাডা, অ্যালজিয়ার্স এবং আন্নান-এ ফরাসীদের নৃশংস ব্যবহারের সঙ্গে ইংরাজদের ব্যবহারের তুলনা করেছেন। ইংরাজ তার কোনও উপনিবেশেই এতখানি নিষ্ঠুরতা দেখায়নি। (এখানে ভূদেব নিজেই নিজের মতের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। ১৮৫৮-র বিদ্রোহ দমন করতে ব্রিটিশের নিষ্ঠুরতাকে তিনি নিজেই ক্ষমার অযোগ্য বলেছেন:[২০৬] "দেবীপুত্রেরা শিশু ও একপ্রকার মূর্খ, তাহাদের বিজ্ঞতা বা তাদৃশ শান্তিময় গুণগ্রাম জন্মে নাই। সুতরাং তাহারা যে জর্জের হতভাগ্য কর্মচারিগণকে সপরিবারে নিপীড়িত করিয়াছিল তজ্জন্য তাহাদের মূর্খতা ব্যতীত গুরুতর নিন্দা করা যাইতে পারে না। কিন্তু ঝগড়া থামাইয়া জর্জের লাঠিয়ালেরা যে দেবীর রম্যতর উপবন সকলের দারুণ দুরবস্থা ও পুত্রগণের ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সাধিত করিয়াছিল, তাহাতে বিজ্ঞম্মন্য জর্জের অবশ্যই নিন্দা করিতে হয়। কতশত পল্লীর সমুদায় দেবীপুত্রগণ একেবারে নিহত হয়,—কত বৃক্ষবাটিকা একেবারে বিধ্বংসিত হয়—এ সকল জর্জের সুসভ্য বৈর-নির্যাতন।"[২০৭]) অথচ ইংরাজের উপনিবেশগুলিতেই আদিম অধিবাসীদের "সমূলোৎসাদন" হয়ে গেছে। ভূদেবের বক্তব্য: "অপরাপর ইউরোপীয় জাতির যে বৈদেশিক-বিদ্বেষ তাহারও অভ্যন্তরে যেন ঘৃণার কতকটা ন্যূনতা আছে,—যেন অপর জাতীয় প্রতি কতকটা মনুষ্যবুদ্ধি আছে। স্পেনীয় কিম্বা ফরাসী অথবা অন্য ল্যাটিন জাতীয় খ্রীষ্টান যেন অপর জাতীয় লোককে বলেন—'তোরা কেন আমাদের মত হইবি না, আমাদের ধর্ম গ্রহণ কর, আমাদের পরিচ্ছদ পর, আমাদের ন্যায় খাওয়া-দাওয়া কর—আমাদের মত হইবি।' ইংরাজের ভাব ওরূপ নহে। তাঁহার ভাব—'তুমি ইংরাজ নহ। তুমি আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্ম, আমার আচার, আমার ব্যবহার, আমার ভাষা, আমার পরিচ্ছদাদির অনুকরণ করিতে চাও কর, কিন্তু কখনই আমার সমান হইতে পারিবে না। কারণ আমি ইংরাজ, তুমি ইংরাজ নহ।"[২৩৮]

এই মানসিকতার সঙ্গে ভূদেব হিন্দুধর্মের বর্ণভেদের একটি ক্ষীণ যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন ; "একজাতীয় লোক কিছুতেই অপর জাতীয় হইতে পারে না।" কিন্তু হিন্দুর সামাজিক বিধানে বিভিন্ন জাতির মিলনে যে নিষেধ আছে, তা পরস্পরের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করে না। বরং এই বিধানের ফলে সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের মানসিকতা গড়ে উঠেছে। কিন্তু ইংরাজের জাতিবিদ্বেষ অতি প্রখর, এবং বর্ণভেদ মানে না বলে আত্মগৌরব বজায় রাখতে সামাজিক প্রভেদগুলি সযত্নে রক্ষা করে চলে।

ভারতের বিপুল সংখ্যক জনগণ প্রচলিত ধর্ম, ভাষা প্রভৃতির প্রতি একান্ত বিশ্বাসী হওয়ায় এখানে পাশ্চাত্য ধারা পুরোপুরি গড়ে উঠতে পারে না। সেই কারণেই এদেশের প্রতি ইংরাজের কোনও অনুরাগ জন্মায়নি। তা সত্ত্বেও, শক্তি ও সম্পদের উৎস বলে ভারত উপনিবেশ তাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। তারা বুঝেছিল যে অধিকার স্থায়ী করতে গেলে ন্যায়পরায়ণতার প্রলেপ লাগিয়ে রাখতে হবে, তাই ভারতের মঙ্গলসাধন তাদের শাসন নীতির উদ্দেশ্য বলে তারা ঘোষণা করেছিল। এই নীতির মৌখিক স্বীকৃতিরও একটা মূল্য আছে, কারণ তাই দিয়ে অন্তত তাদের জাতিবিদ্বেষের কুফল কিছুটা প্রশমিত হবে। জাতিবিদ্বেষ ইংরাজের স্বভাবসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধি, বিদ্যা এবং আত্মসংযমের ফলে "ঐ স্বভাবের সমগ্র অশুভফল কোথাও ফলিতে পায় নাই।"[২৩৯] তারা নিজেদের কার্যকলাপের ঔচিত্য বিষয়ে একেবারেই নির্বিকার, অন্যের পক্ষে কি ভাল সে বিবেচনা নিয়েও তারা মাথা ঘামায় না। যাতে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি হবে তাতেই সকলের ভাল হবে—এই বিবেচনায় কাজ করে। তবে তারা যোগ্যতার মর্যাদা দিতে জানে এবং সেই অনুসারে মত পরিবর্তন করে। "ইংরাজ স্বার্থপর এবং সহানুভূতিশূন্য হউন, কিন্তু তিনি বীরপুরুষ। তিনি সক্ষমের সমাদর করেন।"[২৪০]

মুসলিম সম্রাটদের স্বৈরাচারিতার অপরাধে অভিযুক্ত করলেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু ভূদেব তাদের শাসনকে ব্রিটিশ শাসনের তুলনায় উৎকৃষ্টতর বলেছেন। তারাও ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, শাসনকাজে এক ভাষার প্রচলন করেছিল[২৪১] এবং স্থাপত্যশিল্পে এক মনোরম ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিল। সর্বোপরি, সাম্যের বাণী প্রচার করে তারা সংহতির সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। তারা "রজোগুণপ্রধান", ব্রিটিশদের মত "ঘোর তমোগুণের আশ্রয়" নয়, কিন্তু মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট গুণ—সত্ত্বগুণ—তাদের নেই। মুসলিমদের মধ্যে অন্তত সামান্য কয়জন ভারতমাতার মন্দিরে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রিটিশরা শ্রদ্ধার আসন একটিও পায়নি।[২৪২] 'উনবিংশ পুরাণে' অবশ্য মুসলিমদের ততটা ভাল বলেননি, সেখানে মুসলিম শাসনের প্রতীক 'যাবনিক'কে দুষ্কর্মা এবং লুণ্ঠক বলেছেন।[২৪৩] যাই হোক মুসলিম শাসনের গুণগান করে (ব্রিটিশদের তুলনায় তাদের শোষণের মাত্রা কম ছিল) বলে এই বিরূপ মন্তব্যের উপর প্রলেপ দিয়েছেন। উদাহরণ দিয়েছেন মুর্শিদকুলির আমলে সৈন্য সংখ্যা ছিল ছয় হাজার, হার্ডিঞ্জের আমলে তা আড়াই লক্ষের উপর গিয়েছিল।[২৪৪] আরও উল্লেখযোগ্য যে মুসলিম আক্রমণকারী এবং ইসলাম ধর্মে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মান্তরিতগণ ভারতবর্ষকে নিজেদের দেশ বলে মনে করত সেই কারণে তাদের হিন্দুদের 'পালিত ভাই' বলা যায়।[২৪৫] তারা সর্বোচ্চ সরকারি পদেও হিন্দুদের নিয়োগ করত, কিন্তু ব্রিটিশরা তা করে না।[২৪৬]

ভূদেবের ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনার ভিত্তি ছিল তাঁর মৌলিক মূল্যবোধ, যা তিনি পেয়েছিলেন ব্রাহ্মণ্য আদর্শের মধ্যে। তাঁর নিজের উক্তির মধ্যেই তা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে: "শান্তিপ্রবণ হিন্দুসমাজ সুখাভিলাষী ইংরাজকে আপনার শিরোদেশে ধারণ করিয়াছে। নিবৃত্তিমার্গে দীক্ষিত জনগণ প্রবৃত্তি-মার্গানুসারী লোককে আপনার আদর্শস্থলে প্রাপ্ত হইয়াছে। উচ্চাধিকারী নিকৃষ্টাধিকারীর বশে আসিয়াছে।"[২৪৭] পশ্চিমী সভ্যতার বহুবিধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। ভূদেবের রচনাবলীতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিস্তারিত সমালোচনা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে। বলা বাহুল্য, সমকালীন ভারতের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের অনন্য সৃষ্টি এবং বহুল প্রচারিত কয়েকটি বিষয় তাঁর সমালোচনাতে স্থান পেয়েছে, যেমন, দুর্বহ করভার, সম্পদ নিষ্কাশন, হস্তশিল্পের বিনাশসাধন, বাণিজ্যে ব্রিটিশের একচেটিয়া অধিকার, উচ্চ সরকারি পদে ভারতীয় নিয়োগের ভণ্ড নীতি ও উন্নতির ক্ষেত্রে বিরোধিতা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও জীবনযাত্রার মানের অবনতি। নিপুণ বৈদগ্ধ্য ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যেসব তথ্য দিয়েছেন তার বিন্যাস এবং গভীরতা মনে রাখবার মত। তা সত্ত্বেও বলতে হয় যে এসব বিষয়ে তাঁর বক্তব্য নওরোজী, ভোলানাথ চন্দ্র কিম্বা রমেশচন্দ্র দত্ত—এঁদের থেকে বিশেষ কিছু আলাদা নয়।[২৪৮]

অবশ্য ভূদেব প্রধানত নৈতিক দিকটিতেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং সেই কারণে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনায় তিনি নৈতিক যুক্তির অবতারণা করেছেন। সেনাবাহিনীতে উচ্চপদ এবং অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ করে ব্রিটিশ প্রভু ভারতীয়দের হীনবীর্য করে দিয়েছিল, ফলে প্রতিরক্ষার জন্য তারা সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল। শোষণনীতিকে তিনি যে ধিক্কার জানিয়েছিলেন তার কারণ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দুর্দশা নয়, "যদি...রাজনিয়ম এমন হয় যে তাহার পরিশ্রমার্জিত অর্থ নিজভোগে না আইসে, তাহা হইলে তাহার শ্রমবিমুখতা সহজেই জন্মিয়া যায়।"[২৪৯] উদাহরণ স্বরূপ, অস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকায় নতুন বন্দোবস্তের আগে বহু চাষযোগ্য জমি অনাবাদী পড়ে থাকত বলে তিনি দেখিয়েছেন।[২৫০] আগে দণ্ডবিধানের দায়িত্ব অনেকাংশে সমাজের হাতে ছিল, এখন তা রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার। রাষ্ট্র শুধু অপরাধের বিচার করে, সমাজ অন্যায় এবং পাপেরও বিচার করে। সমাজের উদ্দেশ্য নৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং প্রত্যেকের জন্য ন্যূনতম মঙ্গল বিধান করা। এমনকি অপরাধীকেও শুধুমাত্র শাস্তি দেওয়াই সমাজের উদ্দেশ্য নয়। ব্রিটিশ আমলে বিচারের ভার গ্রাম্য পঞ্চায়েতের হাত থেকে জমিদার অথবা বিচারালয়ে ন্যস্ত হয়েছে। আদালতের বিচারকরা এ দেশ সম্বন্ধে অজ্ঞ। নৈর্ব্যক্তিক এবং ব্যয়বহুল বিচার ব্যবস্থায় মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বেড়ে গেছে, অনেকেই দেউলিয়া হয়ে গেছেন। তাছাড়া, সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় আইনের বিন্দুমাত্র সঙ্গতি নাই।[২৫১] ঔপনিবেশিক শাসনে মূল্যবোধের যে অবনতি হয়েছিল, তার ফল শাসক এবং শাসিত উভয়ের উপরই বর্তেছিল। বাঙালিরা বুঝেছিল যে ব্রিটিশরা ভোজন-রসিক, তাই যে অর্থ দিয়ে সমাজের উন্নতিসাধন হতে পারত, তা তারা রাজপুরুষদের বিলাসবহুল ভোজে ব্যয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে শুরু করেছিল। বাংলার প্রথম চারজন লেফটেনান্ট গভর্নরের ব্যবহার আড়ম্বরহীন এবং সাদাসিধে ছিল। কিন্তু ক্যাম্বেল যেখানে যাবেন সেখানে সাজসজ্জা, বাজী প্রভৃতি জাঁকজমক পছন্দ করতেন। তারপর থেকে ঐগুলিই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছোটলাটরা সবাই পানভোজনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের দলবল—এমনকি "চুনাপুঁটি সকল সাহেব" এদেশের লোকেদের দেওয়া ভোজে অংশগ্রহণ করত।[২৫২] ব্রিটিশ রাজপুরুষদের মধ্যে কয়েকজন সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু ভূদেবের মতে তাদের মধ্যে চার ধরনের লোক ছিল : (১) অত্যাচারী, (২) স্বজাতিপোষক, (৩) "বাহ্যদর্শক" এবং (৪) ভারতবিদ্বেষী। অন্যদিকে আবার ভারতপ্রেমী—যথার্থ মঙ্গলকামী ব্যক্তিও ছিল। ভূদেব এক অবিশ্বাস্য ঘটনার উদাহরণ দিয়েছেন, প্রথম ভারতীয় শিল্প স্থাপিত হওয়ার খবরে একজন গম্ভীর প্রকৃতির ব্রিটিশ আনন্দে নৃত্য করেছিলেন।[২৫৩]

অদূরদর্শী এবং বিদ্বেষী রাজকর্মচারীদের প্রভাবে শাসননীতি যে কতটা অবিমৃশ্যকারী হতে পারে, তার প্রমাণ ইংল্যান্ডের বিদ্যালয়ে শেখা রোমীয় সাম্রাজ্যবাদের অনুকরণে বিভেদ-নীতির প্রয়োগ। বিভেদ নীতিকে সরকারি নীতিরূপে গ্রহণ করা হয়নি সত্যি, কিন্তু কিছু কিছু অমার্জিত কর্মচারীর ধারণা ছিল যে এই নীতির প্রয়োগে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হবে। সেই কারণেই তারা প্রথমদিকে একটানা মুসলিম শাসনের বিরূপ সমালোচনা করেছে, আর পরে মুসলিমদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দানের আশ্বাস দিয়েছে। "তাঁহারা স্বদেশীয় বিদ্যালয়ে অতি যত্নপূর্বক প্রাচীন রোমীয়দিগের...রাজনীতিশাস্ত্র অভ্যাস করিয়া থাকেন।...রোমীয়রা যেমন শত্রুরাজ্যের মধ্যে পরস্পর ভেদ জন্মাইয়া দিয়া তাহাদের সকলগুলিকেই জয় করিয়াছিল...এই ভাবিয়া উঁহারা সর্বদাই হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে যাহাতে সম্মিলন না হয়, তাহার জন্য যত্ন করেন।"[২৫৪]

ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসী নীতির অনৈতিকতায় তাঁর সন্দেহের কোনও অবকাশ ছিল না। লর্ড অকল্যান্ডের শাসনকালে আফগান যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি 'বাংলার ইতিহাস'-এ লিখেছেন : "ঐ যুদ্ধকাণ্ড ইংল্যাণ্ডীয় মন্ত্রিবর্গের অভিমত্যানুসারেই হইয়াছিল ; সুতরাং অকলাণ্ড বাহাদুর ঐ অন্যায্য কার্যের সম্পূর্ণ দোষভাগী হইতে পারেন না।"[২৫৫] অহিফেন যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর মত আরও স্পষ্ট "ভবিষ্যতের কথা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু ধর্ম যে সর্বথা প্রবল হইতে পায় না, প্রত্যুত অধর্ম অনেকানেক স্থলে বিজয় লাভ করে, এই চীনীয় যুদ্ধই তাহার একটি উত্তম উদাহরণ হইয়া রহিয়াছে।"[২৫৬] দীর্ঘ আলোচনায়[২৫৭] তিনি ইউরোপের জয়যাত্রাকে এই সিদ্ধান্তের বিশিষ্ট উদাহরণ বলেছেন।

বহুবিধ ত্রুটি সত্ত্বেও, অন্য কোনও জাতির চেয়ে ব্রিটিশ জাতির শাসনকে ভূদেব বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। তার কারণ তিনি মনে করতেন, "ইংরাজ রাজনীতি-বিষয়ে পৃথিবীর অপর সকল জাতির আদর্শ স্থানীয়।...প্রকৃত যোগ্যতার পরিচয় না পাইলে কাহার বন্ধন অল্পপরিমাণ শিথিল করিয়া দেন না, আবার যোগ্যতার প্রমাণ পাইলেই দেন।...সুতরাং ইংরাজের সংসর্গে রাজনীতি শিক্ষার উপায় সর্বোৎকৃষ্ট।"[২৫৮]

দিগ্বিজয়ে ভূদেব কোন অন্যায় দেখেননি। "অসভ্য দেশমাত্রেই সংগ্রাম কামনার বাহুল্য থাকে, সুতরাং অসভ্য দেশে অনন্যকর্মা কেবল যুদ্ধবিশারদ যত লোক পাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় সভ্যদেশে কখনই তত পাওয়া যায় না।[২৫৯] "...মূর্খ স্পার্টিয়েরা পণ্ডিত এথেনীয়দিগকে জয় করিয়াছিল, অসভ্য ম্যাকিডোনিয়েরা গ্রীকদিগকে অধীন করিয়াছিল...অসভ্য বর্বর জাতীয়েরা রোম সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল।" ব্রিটিশের পরাক্রম অপেক্ষা ভারতের শান্তিপ্রিয়তাই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টায় শান্তি প্রতিষ্ঠার কারণ, তা ব্রিটিশরা বোঝে না।[২৬০] কারণ ইউরোপের ঐতিহ্যে সহিষ্ণুতা বা শান্তিকামিতার স্থান নেই। "ঈর্ষানলে এবং সুখলালসায় জ্বলিত হইয়া" ইউরোপীয়রা "আপন আপন সমাজ মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে" যুদ্ধ করছে এবং "পৃথিবীর সর্বত্র মার-কাট" করে ছুটে বেড়াচ্ছে।[২৬১]

অনেক ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণে তিনি একঘেয়ে যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রত্যেক ঐতিহ্যের সুদূরপ্রসারী ভাবধারার উপরই তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। সমাজের পরিবর্তনশীল মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব, বিশ্বাস এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে ওগুলির উৎস বলে তিনি মনে করেছিলেন।

খ্রিস্টিয় মতবাদের মূল্যায়ণ দিয়ে তিনি সামাজিক প্রবন্ধে ইউরোপীয় সভ্যতার সমালোচনা শুরু করেছেন। একই ধর্ম মতে বিশ্বাসী জাতিসমূহের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐক্যমত গড়ে ওঠে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, এবং সেই কারণেই, তাঁর মতে ইউরোপের বিভিন্ন খ্রিস্টধর্মাবলম্বী জাতির মধ্যে কয়েকটি সাধারণ গুণ দেখা যায়। কর্মফল, বা মানুষের নিজের কাজে তার ভাগ্য রচিত হয়—এ বিশ্বাস খ্রিস্টধর্মে নেই; এই ধর্মে বলা হয় যে ঈশ্বরের ইচ্ছাই জগতের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। "খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা সাদিবাদী এবং একেশ্বরবাদী, তাহারা অদ্বৈতবাদী বা ব্রহ্মবাদী নহে।" এই মতবাদ "অদ্বৈত ব্রহ্ম"র বিপরীত।[২৬২] খ্রিস্টের বক্তব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টধর্মে অনন্ত সুখ-দুঃখ ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মনে করা হয়। কোনটি পাপ এবং কোনটি পুণ্য তা এই ধর্মে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। হিন্দুমতে আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে যে পাপপুণ্যের বিচারবোধ জন্মায়, তা খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে না। তাদের মতে জীবনের শেষে স্বর্গ অথবা নরকপ্রাপ্তি মানুষের নিজের কর্মফলেই উপরই নির্ভর করে, কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। উপরন্তু কর্মফলের পরিবর্তে বিশেষ ধর্মমত অনুসরণেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ-নিগ্রহ নির্ভর করে বলে তারা বিশ্বাস করে। ইউরোপের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন সবকিছুর মধ্যে থেকে এই বিশ্বাস ইউরোপীয় মানসিকতায় সদাস্থিতি লাভ করেছে।[২৬৩]

"ইহলৌকিক যাবৎ বৈষম্যের কারণ সাক্ষাৎ ঈশ্বরেচ্ছা—এরূপ মতবাদের সূক্ষ্ম এবং গূঢ় তাৎপর্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিরা যাহাই বুঝুন, কিন্তু সাধারণ অবিদ্যা, অবুদ্ধি, জাড্যস্বভাব লোকের মনে উহা অবশ্যই স্বৈরাচারের প্রবর্তক ও পরিবর্দ্ধক হইবে, সন্দেহ নাই।" তাদের মধ্যে বড়জোর আত্মপ্রসাদ গড়ে উঠতে পারে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য সুদীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন নেই, ন্যায়-অন্যায় তো আলাদা করাই কাছে, সুতরাং পাপপুণ্য সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার জন্য সমাজজীবনের সাধনার দরকার হয় না।[২৬৪] নিজের কর্মফলের উপর মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে—এ বিশ্বাস না থাকায় নৈতিক দিক থেকে ইউরোপের সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছে, তাদের যা-খুশি-তাই করায় কোনও বাধা নেই। "উহাদিগের মত অনিষ্টাচার, দুর্দান্ত, অবিমৃশ্যকারী, স্বার্থপরায়ণ লোক পৃথিবীর আর কোন সমাজে নেই।" সুখ এবং সন্তুষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে তাদের কিছুই নেই। হতাশাজনিত হিংসাপরায়ণতা তাদের স্বাভাবিক ব্যবহার। "উহাদের সমাজগুলি তদন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যুদ্ধ-ক্ষেত্রস্বরূপ। উহারা যে সম্বদ্ধ এবং সংঘট্ট হইয়া এক একটি প্রবল জাতি হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও বাহিরের চাপে যত হইয়াছে, আন্তরিক সহানুভূতির বলে তত হয় নাই। প্রত্যেক ইউরোপীয় জাতীয়কে আপন আপন চতুর্দিশ্বর্তী অপরাপর জাতীয়ের সহিত অনুক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইয়াছে এবং তাহা করিতে ক্রমে ক্রমে স্ব-স্ব অন্তর্ভেদ অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়া দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়াছে। সামরিক হইয়া থাকিতে হইলেই দলবন্ধন দৃঢ় করিতে হয়; এবং দল দৃঢ় করিতে হইলেই কতকগুলি নীতিসূত্রের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে—যথা নেতার বশ্যতা, নিজ দলের পক্ষপাতিতা ইত্যাদি।"[২৬৫] কিন্তু হিংসা যেখানে জীবনের অঙ্গ, সেখানে অন্যকে, বিশেষত ইউরোপীয় না হলে, সীমাহীন নিপীড়ন করার পথে কোনও বাধা নেই।[২৬৬] যে বর্বর জাতি রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল, ইউরোপীয়রা যে তাদেরই বংশধর, সেখানকার সাধারণ লোকের ব্যবহারে তাই প্রতিপন্ন হয়।[২৬৭]

বর্বর পিতৃপুরুষের ধারাটির গুরুত্ব কিন্তু কম নয়, কেননা, ইংল্যান্ডের প্রাচীন বর্বর অ্যাংলো-স্যাক্সনদের রীতিনীতিই আধুনিক ব্রিটেনের ভদ্রসমাজের রীতিনীতি হয়েছে[২৬৮] আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান ধারাগুলি এভাবে দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাবে গড়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিজয়ী বর্বরগণ "রোম সাম্রাজ্য নষ্ট করিয়া সেই সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং সেই সাম্রাজ্যের যে ধর্মপ্রণালী প্রচলিত ছিল তাহাই কুড়াইয়া লয়।" আগেই দেখা গেছে যে তাদের হিংস্র এবং অপরাধমূলক কাজকর্মকে শান্ত করবার ক্ষমতা খ্রিস্টধর্মের ছিল না, কারণ মানুষের নিজের কর্মফলে তার ভাগ্য নির্ধারিত হয় এই মত ঐ ধর্মে অস্বীকার করা হয়। সুতরাং এইসব অসভ্য জাতির সহজাত দৌরাত্ম্য অপ্রতিহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। রোমীয় আইনে সম্পদ এবং ব্যক্তিগত মালিকানার জয়গান গাওয়া হয়েছিল, ফলে, কোনোরকম নৈতিক বিধিনিষেধ আরোপিত না হওয়ায় সুখ-সম্ভোগ ও স্বার্থপরতার স্বাভাবিক প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাদের ধর্মে সমস্ত পৃথিবীকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করবার অনুজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা ধর্মান্তরিত করার চেয়ে ধনসম্পদের আশাতেই পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিল। "পূর্বপুরুষদিগের জলদস্যুতা এখন বাণিজ্যপরতা দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়াছে মাত্র। ইউরোপীয়দিগের মূল প্রকৃতি ধৃষ্টতা এবং সুখ-লালসা।"

ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্ম উভয়ই ইহুদীধর্ম থেকে উদ্ভূত এবং এই তিন ধর্মই কর্মফলবাদ, অর্থাৎ, নিজের কাজের ফলই মানুষকে ভোগ করতে হয়, এই মতবাদকে অস্বীকার করেছিল। কর্মফলে বিশ্বাস না থাকায় এই সব ধর্মে আত্মসংযম শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা নেই। ইসলাম অবশ্য রোমীয় আইন এবং সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে সৃষ্ট নানারকম কুসংস্কারসম্পৃক্ত দৈহিক সুখসম্ভোগের নীতি গ্রহণ করেনি। মুসলিমরা ক্ষয়িষ্ণু গ্রীক ও লাতিন দার্শনিকদের সংশয়বাদ গ্রহণ করেনি। ইসলাম ধর্মে নির্দেশিত সাম্যবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখে বলা যায় যে লুণ্ঠন স্পৃহায় নয়, বরং ধর্ম প্রচারের উত্তেজনাতেই তারা দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিল। ন্যায়ভিত্তিক সমাজের আদর্শ খ্রিস্টধর্মেও উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু তার ব্যবহারিক প্রয়োগ হয়নি। "স্বধর্মে সুগম্ভীর ভক্তিমূলক এই যে উদারতা, ইহাই মুসলমানদিগের অভূতপূর্বরূপ বিজয়ের প্রকৃত কারণ।"[২৬৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার বলি, পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে ভূদেবের জ্ঞানলাভের আগ্রহের প্রতীয়মান কারণ ছিল একটি, তা হল, ইউরোপের কাছে ভারতের কি কি শিক্ষণীয় আছে। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্য পাশ্চাত্য প্রভাবের গতিরোধ করা। বিশ্লেষণের শুরুতে তিনি ইংরাজ ও ভারতীয় সমাজের বৈসাদৃশ্যগুলি দেখিয়েছেন, কারণ ইংরাজরাই ভারতে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিভূ, আর এদেশে প্রধানত তাদেরই অনুকরণ করা হত। জ্যামিতিশাস্ত্রে প্রমাণিত উপপাদ্যের মত তাঁর সব প্রচেষ্টা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে: "হিন্দু সমাজের প্রকৃতি শান্তিপ্রবণতা, ইংরাজ সমাজের প্রকৃতি ভোগসুখানুসন্ধানে কার্যতৎপরতা। হিন্দু সমাজ প্রধানত কৃষ্যুপজীবী ; ইংরাজ প্রধানত শিল্প এবং বাণিজ্যোপজীবী ; হিন্দুসমাজ মিলিতস্বত্ব এবং মিলিত স্বত্বাধিকার স্বীকার করে, ইংরাজ জ্যেষ্ঠাধিকার মানে এবং পৃথক স্বত্বের একান্ত পক্ষপাতী। হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, ইংরাজ সমাজে বয়োধিকে বিবাহই নিয়মিত। হিন্দু সামাজিক অন্তঃশাসনের পক্ষপাতী, ইংরাজ অধিকার পালনে রাজশাসনকেই সর্বমকর্ষ করিতে উন্মুখ। ভারতবর্ষে এই দুইটি পরস্পর ভিন্নধর্মী সমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ কার্যতৎপর, কার্যকুশল, অহঙ্কারী এবং লোভী ; হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব, এবং সন্তুষ্টচেতা। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে ইংরাজের স্থানে হিন্দুকে কার্যকুশলতা শিখিতে হয়, আর কিছুই শিখিতে হয় না।" ভূদেবের মতে, "প্রত্যুত আর কিছু না শিখিলেই ভাল হয়।"[২৭০]

এই দ্ব্যর্থহীন মূল্যায়নের সমর্থনে তিনি পাশ্চাত্য মানসিকতার বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। সুদীর্ঘ তালিকার শুরুতেই রয়েছে স্বার্থপরতা, ব্রিটিশদের মধ্যে যা বিশেষরকম তীব্র। ভূদেবের ভাষায় "ইংরাজ জন্মগুণেই স্বার্থবাদী।" এই স্বার্থপরতা আত্মপ্রেমী অহঙ্কার-সঞ্জাত এবং "অজ্ঞানকৃত" বলে তিনি মেনে নিয়েছেন। স্বার্থান্বেষণে মগ্ন থাকায় স্বার্থসিদ্ধির সঙ্গে ন্যায়ের কোনও বিরোধ থাকতে পারে বলে তারা ভাবতেই পারে না। "যেটিতে তাঁহার স্বার্থ, সেটি তাঁহার মনে চিরকাল ধর্মজ্ঞানের অবিরোধীরূপেই প্রতীয়মান হয়। এই ঘোর স্বার্থপরতার প্রভাবে ইংরাজ একেবারেই সহানুভূতিশূন্য। তাহারা বুঝিতেই পারে না, যাহাতে তাহার স্বার্থ সেটি কেমন করিয়া অপরের অনিষ্টজনক হইতে পারে।...একটি বালসুলভ মোহময় ভাব ইংরাজের মনে বিরাজমান।" যারা তাদের কাছাকাছি এসেছে, তারাই তাদের এই চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে। "ইংরাজ যতক্ষণ উপকার বা সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন, ততক্ষণই খুব ভালবাসেন। আর যেই উপকার প্রাপ্তি থামিয়া গেল মনে করেন, অমনি পূর্বোপকৃতি স্মরণ করিতে অশক্ত হইয়া পড়েন।" হজসন প্র্যাটকে লেখা যে চিঠিগুলি গন্তব্যস্থানে পৌঁছায়নি এবং যার উত্তরও আসেনি, এই তিক্ত মন্তব্য সেই ঘটনারই প্রতিক্রিয়া কি না কে জানে।[২৭১] আত্মসর্বস্ব ব্রিটিশ জাতির পক্ষে অন্যের হিতাহিত বোঝা যে সম্ভব নয়, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাহায্যে তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন। আয়োনিয় দ্বীপপুঞ্জের গ্রীকরা যখন স্বাধীন গ্রীক রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্তি চাইল তখন তারা ব্রিটিশ শাসনের সুখসুবিধা ছেড়ে যেতে চাইছে কেন সেই চিন্তা ব্রিটিশদের অবাক করে দিয়েছিল। ওইরকমভাবেই আফগানদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলা সত্ত্বেও তারা মনে করত যে আফগানরা তাদের খুবই পছন্দ করে। বর্মীরাও পথ চেয়ে আছে, কবে ব্রিটিশরা তাদের জয় করবে বলে। রাজা থিবো সিংহাসনচ্যুত হওয়ায় যেন তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দের সীমা ছিল না। বর্মীদের মধ্যে যারা খুশী হয়নি, তাদের অবশ্যই বিদ্রোহী বা অপরাধী বলতে হবে। অন্যদের কাছে এই সরল বিশ্বাস ভণ্ডামি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এর মূল ছিল স্বার্থান্ধতার মধ্যে। এ বিষয়ে ইংরাজরা সত্যিই অনন্য। প্রসঙ্গত, ফরাসীরা অ্যালজিরিয়া এবং রুশরা তুর্কমেনিস্থান দখল করেছিল, কিন্তু বিজিত জাতিগুলি পরাধীনতার আশায় অপেক্ষা করেছিল এবং বিজিত হয়ে ধন্য হয়েছে, এরকম দাবি করেনি। স্পষ্টতই তারা অন্যকে সভ্য করবার মহৎ উদ্দেশ্যের কথা জানত না।

একটি ক্ষুদ্র উপসংহারে তিনি এই অভিমতটি গুছিয়ে বলেছেন : "একজন একটা পায়রা ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল দেখিয়া কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'পায়রাটা লইয়া কি করিবি ?' সে উত্তর করিল, 'পুষিব'।—আহা, কৃষ্ণের জীব হত্যা করিবি কেন ? আমাকে দে, আমি পোড়াইয়া খাব। ইংরাজের মনের ভাবটি যেন অবিকল এইরূপ। তিনি পোড়াইয়া খাইলেও হত্যা হয় না—অন্যে পুষিবার চেষ্টা করিলেও হত্যা করিতেছিল বলেন।"[২৭২] ইংরাজের এই বিকৃত স্বার্থপরতার মধ্যে তাদের জাতীয় স্বার্থবোধকে ভূদেব মন্দের ভাল মনে করেছিলেন। "ইংরাজ আপনার জাতির স্বার্থে এবং নিজের স্বার্থে অনেকটা অভিন্নতা দেখিতে পায়।" তারা সর্বদাই "স্বজাতীয়ের স্বার্থানুসন্ধানে মনোযোগী, স্বজাতীয়ের প্রশংসাবাদে শতমুখ, স্বজাতীয়ের নিন্দাবাদে ক্রুদ্ধ ও উদ্যত-প্রহরণ।[২৭৩]...যাহাকে ইংরাজের উন্নতি বলা যায় তাহার হেতু ইংরাজের স্বার্থপরতা নয়, ইংরাজের স্বজাতি-বাৎসল্য। ইংরাজের যদি অবনতি হয় তাহা ঐ স্বার্থপরতার জন্যই হইবে।"[২৭৪]

অতিরিক্ত স্বার্থপরতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাঁদের সমাজে অন্যের মঙ্গল বিষয়ে নতুন ভাবনার সূত্রপাত হয়েছে। ভবিষ্যতে এর সুফল ফলতে পারে, কিন্তু ভূদেব আমলাতন্ত্রের এই তথাকথিত জনহিতবাদী নীতি মানতে পারেননি, কারণ প্রথমত তা ভারতের ঐতিহ্য-বিরোধী, এবং দ্বিতীয়ত স্বেচ্ছাচারিতার মনোভাবকে প্রশ্রয় দিলে সমাজের অমঙ্গল ডেকে আনা হবে।[২৭৫]

পাশ্চাত্য মানসিকতার আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল প্রগতি বা উন্নতিশীলতা। তারা মনে করে যে প্রগতি প্রকৃতির নিয়ম—জীবজগতের বিবর্তনে যে আজকের মানবদেহ রূপ পরিগ্রহ করেছে, তা প্রগতির পরিচায়ক। মানব সমাজের বিবর্তনেও ঐ অগ্রগতি লক্ষ করা যায় ; আধুনিক ইউরোপীয় সমাজে বিবর্তন চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। ভূদেবের মতে এই আত্মগৌরব, যা ইংরাজদের মধ্যে অতিমাত্রায় প্রকট[২৭৬], যারা নিজেদের সবকিছুকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে, তারা আসলে সেই প্রাচীন জাতির মত, যারা নিজেদের সমাজের বাইরে সবাইকে ঘৃণাভরে বর্বর, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি নাম দিয়েছিল ; পাশ্চাত্যের সমাজ দর্শনে এই আত্মশ্লাঘা সর্বত্র বিরাজমান, সেই কারণেই এই মানসিকতার যুক্তিগ্রাহী বিশ্লেষণ প্রয়োজন।[২৭৭] ভূদেব বুঝেছিলেন যে সমাজের বিবর্তনবাদ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটি মতের প্রবক্তাগণ বিবর্তনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য—বৃহত্তর সুখের দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা বলেছেন এবং তাকেই প্রগতি বলে চিহ্নিত করেছেন ; অন্যেরা বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যের উপস্থিতি স্বীকার না করলেও বিবর্তনের মধ্যে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের আশ্বাস দেখেছেন। আর এক দল আবার মানিয়ে চলা এবং পরিবর্তনশীলতার মাধ্যমে বেঁচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকার মতটি গ্রহণ করেছেন। শেষোক্ত মতবাদটির যুক্তি অনেক বেশি জোরদার হলেও, ভারতীয় দর্শনে যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের চক্রনেমির কথা বলা হয়েছে, তা তাঁরা বোঝেননি।[২৭৮] "তাঁহাদের মতে পরিণামবাদের মোটামুটি অর্থ জগৎকার্যে উন্নতিশীলতার স্বীকার।" তাছাড়া ইতিহাসের গতি একই পথে ধাবিত হওয়ার কোনও নজির নেই। প্রাচীন ইজিপ্ট, পারস্য, গ্রীস অথবা রোমের তুলনায় বর্তমান ইউরোপ যে সর্ববিষয়ে অগ্রগামী, এমন কথা বলা যায় না। প্রাচীন যুগের বর্মধারী সৈনিক অথবা বলবান ভারতীয় সিপাইদের চেয়ে এখনকার ইউরোপীয় সৈনিকরা বলীয়ান নয়। প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের নিদর্শনকে যদি পরিমাপক ধরি, তাহলে অঙ্গসৌষ্ঠব এবং দেহ সৌন্দর্যে প্রাচীন যুগের মানুষকেই অগ্রগামী বলতে হয়। কারিগরীবিদ্যার অগ্রগতি, সামাজিক সংগঠন, সাহিত্যিক বিকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভূদেবের মতে সাহিত্য সৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সাহিত্যের মাপকাঠিতে প্রাচীন যুগ বর্তমানের চেয়ে নিশ্চয়ই উন্নততর ছিল, কারণ প্রাচীন ধ্রুপদী রচনাবলী এখনও সাহিত্যিকদের ধ্রুবতারা, তাঁরা সেখানেই পৌঁছতে চান। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, আর্কিমেডিস বা অ্যান্টোনাইনস-এর সঙ্গে তুলনীয় কোনও ব্যক্তি বর্তমান যুগে জন্মায়নি। তার কারণ কিছুটা নিহিত আছে বর্তমানের সঙ্কীর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থায়, যে ব্যবস্থা প্রাচীন যুগের মত মানুষের ব্যক্তিত্বের সবটুকুকে বিকশিত করতে পারে না। "সাধারণ লোকের মধ্যে সামান্য একটু শিক্ষার বাহুল্য হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে উহাদের স্বভাবের উন্নতি বা ধর্মের বৃদ্ধি কিছুই হয় নাই।"[২৭৯] একই পথ ধরে এগোনোর চিন্তা মানুষের সহজাত বৈচিত্র্যের বিরোধী। "দেশভেদে মনুষ্যের আচারভেদ, ব্যবহারভেদ, ধর্মভেদ এবং শাসনপ্রণালীর ভেদ হইবে। যাহারা নিতান্ত অবিবেচক এবং অপ্রকৃতদর্শী তাহারাই সকলকে একরূপ করিতে চায়। সকলেই কখনও একরূপ হইতে পারে না, একরূপ হইলেও ভাল হয় না, ভাল দেখায়ও না।"[২৮০] সামাজিক অগ্রগতির মনোভাবটির জন্মদাতা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি তত্ত্ব। সেখানেই শ্রমবিভাজনকে প্রগতির মূল কারণ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কারিগরি বিদ্যার অগ্রসরতার ক্ষেত্রে শ্রমবিভাজনের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না ; তাছাড়া, পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য বিস্তার, ব্যবহার সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি ধনবান শ্রেণীর অবসরবৃদ্ধিতে সহায়তা করে পরোক্ষভাবে সভ্যতার অগ্রসরের পথে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু ভূদেবের মতে "যে শ্রমবিভাগের গুণে প্রথমাবস্থায় অবসরলাভ, বিদ্যাচর্চার উপায় এবং ধনের বৃদ্ধি হইয়াছে, পরে সেই শ্রমবিভাগেরই প্রভাবে মানুষ একেবারেই অবকাশশূন্য, জ্ঞানচর্চায় অশক্ত, মনুষ্যত্ববিহীন যন্ত্র স্বরূপ এবং কতকগুলি লোক অপরিসীম ধনী এবং অধিকাংশ লোক সর্বতোভাবে নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঐরূপ ভীষণ বৈষম্য হইতে অতি তীব্র অসন্তোষ এবং সেই অসন্তোষের অবশ্যম্ভাবী ফলে সমাজের উপপ্লব আসন্ন হইয়াছে।" তাছাড়া, দেশের বাজারের সীমাবদ্ধতা এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে আন্তর্জাতিক বাজার এবং উপনিবেশের প্রয়োজনীয়তা অসম্ভবরকম বৃদ্ধি পেয়েছে, তার থেকে আবার ঔপনিবেশিকতার আনুষঙ্গিক কুফলগুলি ফলতে শুরু করেছে।[২৮১]

ভারতীয় সমাজের অভিজ্ঞতাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ভূদেবের এই আন্তরিক বিশ্বাস এই আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে। জাতিভেদ প্রথার ভিত্তি বংশানুক্রমিক বৃত্তির পরিবর্তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে কোন বৃত্তি গ্রহণের সুযোগকে তিনি অগ্রগতি বলতে রাজী ছিলেন না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে তিনি "জাতীয় বন্ধনের অঙ্গীভূত" বলে মনে করেছিলেন। তাঁর মতে "ঐ দলবন্ধনের প্রভাবেই..মূলধনিগণ শ্রমজীবীদিগের প্রতি সহৃদয় দৃষ্টি করিতে শিখিতেছেন।"[২৮২] আধুনিক যুগের তথাকথিত "অগ্রগতির" অসারতার আর একটি প্রমাণ এখানে স্পষ্ট, এক্ষেত্রে বলা যায় যে অন্তত কোনও কোনও ভারতীয় প্রথা পাশ্চাত্যদেশ গ্রহণ করতে পারে।

তাঁর মতে, প্রগতিকে কোনও মতেই প্রাকৃতিক নিয়মের অঙ্গ বলা যায় না, বরং মানবসমাজের নীতিসম্মত এবং ব্যবহারিক আদর্শ বলা যায়। কারণ জীবজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই আত্মবোধ এবং তজ্জনিত সচেতন চেষ্টাশক্তি আছে। "অতএব প্রাকৃতিক কার্যের সর্বস্থলে যে চক্রনেমি-ক্রম দেখা যায় যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম সম্ভবে, তাহা মানুষের কার্যে এবং মানুষের আত্মবোধজনিত বিশেষ চেষ্টা শক্তির যথাযথ প্রয়োগেই জন্মিতে পারে।" আত্মসচেতন মানুষ তার আদর্শ বর্ণনা করতে পারে এবং আয়ত্ত করতেও পারে। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তিনি এই ক্ষমতার উদাহরণ দিয়েছেন : "যদি ইউরোপীয়রা মনে করেন যে শ্রমবিভাগের এবং যন্ত্রাদি প্রয়োগের শুভময় ফলই ফলাইব, ইহার অশুভ ফল ফলিতে দিব না, তাহা হইলে তাঁহারা সমুদায় পৃথিবীময় বলছলের প্রয়োগে আপনাদের শিল্পজাত বেচিয়া বেড়াইবার অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্বদেশের ব্যবহারের এবং সরল বাণিজ্যের জন্য যাহা উপযোগী সেই পরিমাণমাত্র শিল্পজাত প্রস্তুত করিতে পারেন, এবং তাহা হইলে পৃথিবীর অপরাপর লোকেও উদ্বেগ পায় না এবং তাহাদিগের কারিগরেরাও দুই চারি ঘণ্টা মাত্র পরিশ্রম করিয়া অব্যাহতি পায়।"[২৮৩] অন্যত্র তিনি বলেছেন যে মানুষের ইচ্ছা তার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের একটি উপায়মাত্র, অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে প্রাক্তন জন্ম, সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি।[২৮৪]

তাঁর বিশ্বাস, মানুষের অগ্রগতি বিষয়ক মতবাদ ভেবেচিন্তে সৃষ্টি করে অনুসরণ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতগুলি আদর্শের তুলনামূলক বিচার করে নতুন আদর্শের সৃষ্টি হয় এবং এইভাবে ক্রমোৎকর্ষের পথ প্রস্তুত হয়। তবে মানুষের 'উৎকর্ষবোধটি' সবসময়ে একরকম থাকে না। আজ যা গ্রহণযোগ্য বলে বোধ হচ্ছে, কাল তা নাও হতে পারে।[২৮৫] ইউরোপীয় চিন্তার মধ্যে তিনি সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্য বিধানের একান্ত অভাব লক্ষ করেছিলেন। "তাঁহারা কোন জাতিকে নিকৃষ্ট সভ্যাবস্থা বলেন, কাহাকেও বা অসম্পূর্ণ বা অর্ধ সভ্যাবস্থা বলেন, কাহারও সভ্যাবস্থা স্থগিতগতি বলেন, আবার কাহারও অর্থাৎ আপনাদিগের সভ্যাবস্থাকে উন্নতিশীল বলেন।" সংশয়বাদের অগ্রগতি, সামাজিক সাম্য, অথবা আরও স্থূলভাবে, ঐহিক সুখভোগের উন্নতিকেই তাঁরা সমাজের উন্নতির মাপকাঠি করেছিলেন। "কিন্তু সমাজের প্রকৃত উন্নতি শুদ্ধ কলকৌশলের সৃষ্টিতে হয় না", অথবা সাম্যের নীতিকে মৌখিক স্বীকৃতি দিলেও হয় না, সভ্যতার যথার্থ মূল্যায়নের জন্য তিনি নৈতিকতার পরিমাপ করতে বলেছিলেন : "যে সমাজে মানুষের চিন্তাদর্শ যত উচ্চ, তাহার প্রতি যত প্রীতি এবং ভক্তি এবং তৎসাধনার্থে কায়মনোবাক্যে যত চেষ্টা, সেই সমাজ সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট সভ্যাবস্থা, ধর্মনিষ্ঠ এবং উন্নতিশীল।" আবার "সমাজ মনুষ্যের সম্মিলন-জাত। সুতরাং অন্তঃসম্মিলন যত দৃঢ় হইবে, সমাজ ততই সবল হইবে, এবং উহার ক্রিয়াশক্তিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ততই বাড়িবে। সম্মিলন বাড়ে সহানুভূতির বৃদ্ধি হইতে, সম্মিলন বাড়ে স্বার্থত্যাগ হইতে, মোটকথায় সম্মিলন বাড়ে ধর্মের বৃদ্ধি হইতে।"[২৮৬] তাঁর দ্বিমুখী মাপকাঠির বিচারে সমাজ হয় এগিয়ে যাবে, না হয় পিছিয়ে পড়বে, তা না হলে স্থাবর হয়ে পড়বে।

এই মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে খ্রিস্টীয় ইউরোপের আদর্শগুলিকে ভূদেব অসম্পূর্ণ বলে মনে করেছিলেন। প্রথমত, খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের আদর্শ ছিলেন যীশু এবং মেরি—তাঁদের জীবনাদর্শ অসম্পূর্ণ, কারণ গার্হস্থ্যাশ্রমী সামাজিক ব্যক্তিজীবন তাঁরা যাপন করেননি। "যীশুর জীবনযাত্রা তাঁহার যৌবনদশাতেই নিঃশেষিত, তাঁহার বিবাহ হয় নাই। কোন সাধারণ হিতকর কার্যে তিনি হস্তার্পণ করেন নাই। তাঁহার জীবনবৃত্ত কোন গৃহস্থাশ্রমী সামাজিকের আদর্শীভূত হইতে পারে না।" এইজন্য খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের সামনে কোনও পবিত্র জীবনাদর্শ নেই। তাছাড়া, যীশু-মেরির জীবনকে তারা কখনই অনুকরণীয় মনে করেছিল কি না, তাতেও সন্দেহ আছে। পবিত্র আদর্শের অভাবে তারা "লোভাদি রিপুবর্গের বশ।" "বরং একটি উটের পক্ষে সূঁচের গর্ত পার হওয়া সম্ভব, কিন্তু ধনী লোকের পক্ষে স্বর্গের দ্বার পার হওয়া সম্ভব নয়"—যীশুর এই উক্তির মর্মান্তিক ফল ফলেছে।[২৮৭] সরল আধ্যাত্মিকতা-প্রণোদিত এই উক্তির বাস্তব কোন সঙ্গতি নাই। এই ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে একদল লোক সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নিয়েছে, বাকীরা অন্তহীন লোভের বশবর্তী।[২৮৮] "কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টাশক্তি অতি প্রবলা, সুতরাং তাঁহাদের সভ্যতা অসম্পূর্ণ হইলেও অতি ত্বরিতগতি। নরজীবনের উচ্চ-চিন্তাদর্শ না থাক, দ্রব্যসামগ্রী সম্বন্ধে উচ্চ চিন্তাদর্শ তাঁহাদের আছে এবং দ্রব্যসামগ্রী গঠন করায় তাঁহাদের ক্ষমতা কম নয়। এইজন্য বাহ্যদৃশ্যে উঁহাদের সভ্যাবস্থা যে কোন শ্রেণীর তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। আচার ব্যবহার রীতিনীতি প্রভৃতি আসল জিনিসের দিকে দৃষ্টি করিলেই দেখা যায় যে, ইউরোপে সভ্যাবস্থা...আংশিক ও পতনপ্রবণ।"[২৮৯] অন্যদিকে আদর্শ নরনারী রাম ও সীতার মধ্যে হিন্দু ধর্মের আদর্শ রূপায়িত হয়েছে বলে ভারতীয় সভ্যতা এক উচ্চমার্গের সভ্যতা রূপে প্রতিষ্ঠিত, তেমনই, মহম্মদের জন্মধন্য হয়েছে ইসলাম। কিন্তু হিন্দু আপন আদর্শ পরিহার করেছে বলেই তার "সভ্যাবস্থা স্থগিতগতি হইয়া পড়িয়াছে।"[২৯০]

কিন্তু ব্রিটিশদের আগমনে ভারতবাসীর নৈতিক মান উন্নত হয়েছিল—ব্রিটিশদের সৃষ্ট এই মত শিক্ষিত ভারতীয়রাও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, ভূদেব তা নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করেছিলেন।[২৯১] ইংরাজদের নীতিশাস্ত্রে ভারতকে শেখাবার মত কিছুই নাই, বরং ভারতের যা আছে, তাদের তারও অভাব আছে। গ্রীস, রোম এবং প্রাচীন জার্মান সমাজ এবং ইহুদিধর্ম ও খ্রিস্টধর্ম থেকে ইউরোপের নীতিশাস্ত্র উদ্ভূত হয়েছে বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন। গ্রীকরা স্বাধীনতা, দেশাত্মবোধ এবং সাহসিকতার গুণগান করত। তাছাড়া শারীরিক ও মানসিক উভয়ক্ষেত্রে তাদের একধরনের অত্যন্ত উচ্চস্তরের সৌন্দর্যবোধ ছিল ; অন্যদিকে রোমীয়রা ছিল দুর্ধর্ষ, আইনপ্রয়োগ করে তাদের পাশব প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখতে হত। প্রাচীন জার্মানদের কুলবৃত্তি ছিল ডাকাতি। এমনিতে তারা রোমীয়দের চেয়েও দুর্ধর্ষ ছিল, কেবলমাত্র মহিলাদের প্রতি আচরণে এবং একবিবাহ নীতি অনুসরণ করায় কিছুটা সভ্য ছিল। তাদের জীবনযাত্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোষ্ঠিবদ্ধতার প্রতি ঝোঁক ছিল। ইহুদিরা পরধর্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণু এবং তাদের জীবনদর্শন ষোলো আনাই ইহলৌকিক। ইউরোপের নীতিশাস্ত্রের সবকটি উৎসের মধ্যে একমাত্র খ্রিস্টধর্মেই পরকাল এবং পাপের ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে বিশ্বাস সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া এই ধর্মে শান্তিপ্রিয়তা, নম্রতা এবং দয়ার গুণপনা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সামঞ্জস্যহীন পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি এইসব সদগুণগুলির সুফল বিনষ্ট করে দিয়েছে, কেননা অখ্রিস্টান সমস্ত মানুষকে এই ধর্মে ঘৃণা করতে শেখানো হয়েছে। খ্রিস্টানদের, প্রধানত ক্যাথলিকদের মতে, অখ্রিস্টানদের নিপীড়ন, এমনকি ধ্বংস করাতেও কোন অপরাধ নেই। স্পেনীয় এবং পোর্তুগীজরা সমস্ত অ-ইউরোপীয় জাতিকে শয়তানের উপাসক বলে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। দ্বিতীয়ত খ্রিস্টধর্মে দৈব অনুগ্রহের নীতিতে মানুষের নিজের কর্মফল ভোগ করতে হবে, এই ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে ; শাস্তি এবং পুরস্কার ভগবানের ইচ্ছা বলে বিবেচিত হয়েছে। ঈশ্বরের এই যথেচ্ছাচারিতার ফলে, বিশেষত প্রটেস্টান্টদের মধ্যে মানুষের নিজের কার্যকলাপের উপর কোনও রকম সংযম রক্ষার চেষ্টা করা হয়নি।

এইসব বিভিন্ন উৎস থেকে আহৃত ইংরাজদের নীতিবোধে স্বাধীনতা, দেশপ্রেম, সাহসিকতা, সৌন্দর্যবোধ, শৃঙ্খলা, একবিবাহ, গোষ্ঠিবদ্ধতা এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাদের মূল্যবোধের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব ছিল—একদিকে ইহুদিদের কাছ থেকে পাওয়া অন্য ধর্ম ও জাতি-বিদ্বেষ এবং ঐহিকতা, অন্যদিকে খ্রিস্টধর্মের শান্তিপ্রিয়তা, নম্রতা, দানশীলতা এবং পাপের ভীতি। এই দ্বন্দ্বের ফলে পাপ এবং পুণ্য উভয়েরই তীব্রতা হ্রাস পাবার সম্ভাবনা। অনুরূপভাবে, প্রাচীন জার্মানদের বৈশিষ্ট্য যে ঔদ্ধত্য তা খ্রিস্টীয় বিনয়ের বিপরীতে থাকায় দুই মনোভাব বিষমভাবে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ভূদেব বলেছিলেন যে তাঁর এই মূল্যায়নের বিচার করতে হবে ইংরাজদের বাস্তবিক জীবনযাত্রার পদ্ধতি দিয়ে, বইতে তারা কি লিখেছে—তা দিয়ে নয়।

পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রের সবকটি সদগুণ তো হিন্দু আদর্শের মধ্যে আছেই, তাছাড়াও দৈব ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ এবং বেদান্ত থেকে শেখা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ ইত্যাদি উচ্চতর আদর্শও আছে। হিন্দু ধর্মের পবিত্রতা, বৈরাগ্য এবং পরার্থে আত্মনিবেদন প্রভৃতি সদ্‌গুণ ইউরোপের ঐতিহ্যে নেই। গ্রীক এবং রোমীয়দের অনৈতিক জীবনযাত্রার কথা, তাদের বড় বড় লোকের মধ্যেও যে সব ঘৃণ্য ব্যবহার প্রচলিত ছিল (সম্ভবত এখানে সমকামিতার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে) তিনি তার উল্লেখ করেছেন। খ্রিস্টিয় বিশ্বাস যে দেহ এবং আত্মা পৃথক, এবং তার অন্তর্নিহিত বক্তব্য যেদেহের পাপ আত্মাকে স্পর্শ করে না—ভূদেব এই বক্তব্যের সমালোচনা করেছিলেন। সুতরাং নৈতিক দিক থেকে হিন্দুরা তাদের কাছ থেকে শুধুমাত্র সংহতির শিক্ষা নিতে পারে। যাঁরা মনে করেন ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর কাছে ভারতীয়দের সৌন্দর্যবোধ শেখা উচিত, তাঁরা নিশ্চয়ই দক্ষিণ ভারতের অনুপম মন্দিরগুলি দেখেননি।

সামাজিক বিধানের অপ্রতুলতা তিনি ইউরোপীয়দের নীতিবোধের অভাবের অন্যতম কারণ বলে মনে করেছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের মত ইউরোপে রাষ্ট্রের বাইরে সমাজের শাস্তিবিধানের কোনও ক্ষমতা ছিল না রাষ্ট্র শুধু অপরাধের বিচার করে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যায় বা পাপের বিচার করে না। ইউরোপের ইতিহাসে দুবার অন্যায় এবং অপরাধের মধ্যে এই অহিতকর বিভাজন পরিহার করার চেষ্টা করা হয়েছে—একবার রোমে সেন্সর নিয়োগের মাধ্যমে, আর একবার ইংল্যান্ডে ক্রমওয়েলের শাসনকালে। ভূদেবের মতে ইংল্যান্ডের গৌরবের যুগ ছিল পিউরিটান আমলে, ক্রমওয়েলের শাসনকালে, কারণ ক্রমওয়েল অন্যায় এবং অপরাধের মধ্যে তফাত না করে সমানভাবে দণ্ড দিয়েছেন। ওই সময়ে ইংল্যান্ডে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন এবং নাগরিক জীবনের মধ্যে কোনও তফাৎ করা হত না। "এখন যেমন কথা উঠিয়াছে আমি সরকারি কাজকর্ম কিরূপ নির্বাহ করি তাহাই দেখ, আমি ঘরে বসিয়া কি করি না করি অন্যের তাহা দেখিবার কোন অধিকার নাই—তখন সেরূপ কথা উঠে নাই। ইংরাজ তখন তেজোবীর্যে জাজ্জ্বল্যমান হইয়াছিলেন।"[২১২]

ভগবান পাপের শাস্তি দেবেন আর রাষ্ট্র অপরাধের বিচার করবে—অগস্ট কোঁৎ এই খ্রিস্টিয় অভিমতের বিরুদ্ধে তর্ক তুলেছিলেন। তাছাড়া ইউরোপের অভিজাত সম্প্রদায় ঈশ্বর এবং রাষ্ট্র ছাড়াও আর এক রকমের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। "ভদ্র সমাজে একটা ইজ্জতের বা সম্ভ্রমের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে এবং ঐ ব্যবস্থা ইউরোপীয় ভদ্র লোকদিগের মধ্যে আছে বলিয়াই উহারা ভদ্রলোক।"[২১৩] ইউরোপের সুবিধাভোগী শ্রেণীর মার্জিত আচরণের অন্য একটি বিশেষ অর্থ ছিল বলে ভূদেবের ধারণা ছিল। তাঁর মতে, প্রত্যেক সমাজে সব মানুষের মধ্যে প্রাণী হিসাবে তার দৈহিক কার্যকলাপ এবং মানুষ হিসাবে সচেতনতার মধ্যে যে বৈপরীত্য, তার দরুন একটা দুঃখানুভূতি আছে। হিন্দুরা অদ্বৈতবাদের মাধ্যমে এই বৈপরীত্যের সমাধান করেছে—ভক্ষণ, নিদ্রা, প্রজনন প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়ার সঙ্গে তারা চৈতন্যের ওতপ্রোত যোগ কল্পনা করেছে। "তাঁহারা প্রাণিমাত্রের ভক্ষ্যগ্রহণ, নিদ্রাগমন এবং সন্তানোৎপত্তি ক্রিয়াতে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান দেখিয়াছিলেন, এবং চিত্তক্ষেত্রে তাদৃশ ঈশ্বরাধিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াই ঐ সকল অবশ্য করণীয় ব্যাপার নির্বাহ করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।" ইউরোপীয়রা ধর্মচর্যা এবং জীবনচর্যাকে আলাদা করে দেখে, সমস্ত কাজের মধ্যে তারা ধর্মভাব আনাকে ঘৃণা করে। কিন্তু মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তিগুলিকে আচ্ছাদিত করে চলার প্রয়োজন তারাও মেনে নিয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি করার জন্য যে আহারের প্রয়োজন, সেই বাস্তব প্রয়োজনকে তারা আলাপ-পরিচয়, নাচ-গান ইত্যাদির মাধ্যমে একটি সৌষ্ঠবময় সামাজিক আচরণে রূপান্তরিত করেছে। তবে তাদের সব কাজে মার্জিত আচরণের প্রলেপ পড়েনি। উদাহরণ স্বরূপ, উগ্র মাদক ব্যবহারের অভ্যাস থাকায় তার প্রভাবে তারা সবরকম সৌজন্যবোধ হারিয়ে ফেলে।[২১৪]

হিন্দু ঐতিহ্যে মানুষের আচরণের উপর অনেক নিয়ন্ত্রণ—ধর্মশাস্ত্র, রাজা, প্রচলিত নিয়মাবলী এবং বিজ্ঞ ও সাধু ব্যক্তির বচন। ইউরোপের জনসাধারণের অধিকাংশ কেবলমাত্র রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকার করে। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্থূল অনৈতিক আচরণের শাস্তিবিধানে সীমাবদ্ধ থাকায় এবং অন্য কোনও প্রতিবিধান না থাকায় ইউরোপের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তির কোনও সংযম নেই।[২১৫] তাদের রসিকতা এবং অশালীন কথাবার্তায় ভূদেব এই মন্তব্যের কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন।[২১৬] এই অসংযমী ব্যবহারের পিছনে আরও একটি কারণ ছিল—ইউরোপের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মমত—খ্রিস্টধর্ম—এসেছিল বিদেশী ইহুদিদের কাছ থেকে, কিন্তু তাদের আচরণবিধি ইউরোপীয়রা গ্রহণ করেননি। ফলে, আচরণের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হওয়ায় "ইউরোপীয় ছোটলোকেরা অত্যন্ত পশুধর্মপ্রবণ।"[২৯৭]

ভারত এবং ইউরোপের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার একটি সুফল ফলেছিল। খ্রিস্টিয় ধর্মপ্রচারকগণ হিন্দু ধর্মের সমালোচনায় এই ধর্মের দ্বৈতবাদের উপর জোর দিয়েছিল। অন্যদিকে কয়েকজন জার্মান দার্শনিক হিন্দু অদ্বৈত দর্শনের সঙ্গে নিজেদের ধর্মের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ যোগ দেখেছিলেন। এই নতুন মতবাদের উদ্গাতারূপে ভূদেব হেগেল এবং সোপেনহাওয়ার-এর নাম করেছেন ; সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মের প্রতি নবসৃষ্ট উৎসাহের ফলে ইউরোপে দ্বিতীয়বার নবজাগরণ দেখা দিতে পারে, সোপেনহাওয়ারের এই মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন। ইংরাজরাও খ্রিস্টিয় মতের সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করে হিন্দুধর্মের সার্বজনীন সহিষ্ণুতা গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসছিল। অন্যভাবে বলা যায় যে ইউরোপের সঙ্কীর্ণ জড়বাদের দিন ফুরিয়ে এসেছিল, ভূদেবের বিশ্লেষণ অনুসারে এর মধ্যেই প্রগতির সম্ভাবনা ছিল।[২৯৮]

সমস্ত ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে অগস্ট কোঁৎ-এর মতাদর্শই ভূদেব গ্রহণযোগ্য মনে করেছিলেন। সমকালীন অন্যান্য অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর মতের মিল ছিল। কোঁৎ সমাজে পুরোহিত শ্রেণীর প্রসঙ্গে যে বলেছিলেন যে তাঁরাই ভবিষ্যতের শিক্ষক এবং সমাজ-বিধায়ক, ভূদেব সেই কারণেই কোঁৎ-কে পছন্দ করেছিলেন, তিনি এই পুরোহিত শ্রেণীকে ভারতীয় সমাজের ব্রাহ্মণ বলে চিহ্নিত করেছেন। মানবসমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোঁৎ-এর মন্তব্যের উপর তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ভবিষ্যতে ধর্মীয় ভেদাভেদ ঘুচে যেতে পারে, এই অভিমত তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তবে তাঁর মতে "নরদেব পূজা" বা মানবতাবাদ নয়, অদ্বৈত দর্শনের "সর্বেশ্বরবাদই পৃথিবীতে ক্রমশ বিস্তৃত হইবে।"[২৯৯] যুদ্ধবিগ্রহ এবং বর্ণভেদ রহিত হওয়া সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আশাবাদী ছিলেন না, কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে মানুষ এবং সমাজের চরিত্রের মধ্যে ওইসবের কারণ নিহিত আছে।[৩০০] বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা বন্ধ হবে, এমন কোনও আশা তাঁর ছিল না। তাঁর ধারণায় ইউরোপের তৎকালীন মানসিকতা সাম্রাজ্যবাদিতার দিকেই অঙ্গুলীনির্দেশ করছিল, যেসব সাম্রাজ্যে এক এক জাতির সমস্ত লোক সংশ্লিষ্ট হবে, যেমন, প্রুশিয়ার অধীনে জার্মান জাতি, রুশিয়ার অধীনে শ্লাভ জাতি—এইভাবে। জাতিগত সহানুভূতির ফলে যেমন এই মানসিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি আবার পারস্পরিক সংঘর্ষে তা ব্যাহত হতে পারে। বলকান অঞ্চলের শ্লাভ জাতীয় লোকরা তুর্কীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে বটে, তবে তারা রুশদেরও বিশ্বাস করে না। ইংল্যান্ডের অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি অধ্যুষিত উপনিবেশগুলি মাতৃভূমির জন্য কোন স্বার্থত্যাগ করতে রাজী নয়। মনে হয়, দূর ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবন্ধনের পরিবর্তে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারই কায়েম হবে, তবে সাম্রাজ্যবাদিতার মূল যে অসাম্য, তা সহজে দূরীভূত হবে বলে মনে হয় না।[৩০১]

ভূদেব অনুমান করেছিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হবে, কারণ যে সমস্ত কারণে অতীতের সাম্রাজ্যসমূহের পতন ঘটেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তখনও সেগুলির উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়নি। সমৃদ্ধিজনিত পরিশ্রমবিমুখতা—যা থেকে পতন শুরু হয়, তা ব্রিটিশ জাতির চরিত্রে ছিল না, কারণ তারা, অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের ছাত্রই হোক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা ঔপনিবেশিক কর্মচারিই হোক পুরুষের উপযুক্ত খেলাধুলা এবং বিভিন্ন ধরনের দৈহিক শ্রমে অভ্যস্ত ছিল। পতনের আর একটি কারণ—অতিরিক্ত বিস্তৃতির ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উন্মেষ—তাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দুর্বল করতে পারেনি। মার্কিন উপনিবেশগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরও সাম্রাজ্যের জীবনীশক্তি অটুট ছিল। তৃতীয় সঙ্গত কারণ—প্রবলতর শক্তির কাছে পরাজয়—তাও সম্ভব ছিল না, কারণ হল্যান্ড এবং ডেনমার্ক অধিকার না করা পর্যন্ত জার্মানির পক্ষে ইংল্যান্ডের সমকক্ষ হওয়ার প্রশ্ন ছিল না। একই ভাবে, রুশিয়ার পক্ষেও আগে তুর্কী এবং আফগানিস্তান দখল করা প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া, জার্মানির শক্তিবৃদ্ধিতে ফ্রান্স এবং রুশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া প্রতিবন্ধকতা করবে। আবার, ইউরোপে ইংল্যান্ডের রপ্তানি বাণিজ্য কিছুটা ব্যাহত হলেও, ভারত প্রভৃতি উপনিবেশে তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সংক্ষেপে, অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের কোনও লক্ষণই দৃষ্টিগোচর নয়।[৩০২] যে কোনও ঘটনার প্রতি প্রযোজ্য সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অমোঘ বিধানে যে ভূদেবের অটল বিশ্বাস ছিল, তিনি কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে এই বিশ্বজনীন রীতির বাইরে বলে ভেবেছিলেন? নাকি, সাম্রাজ্য সম্বন্ধে স্পষ্টবাদিতার জন্য বঙ্কিম প্রভৃতির শাস্তির কথা মনে রেখে তিনি সাবধানী হয়ে গিয়েছিলেন? তাঁর রচনাবলীর মধ্যে এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া যায় না।

হিন্দু আদর্শকে ভিত্তি করে মানব সমাজের অগ্রগতি সম্ভব—এই বিশ্বাস ভূদেব একটি প্রবন্ধে স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছেন।[৩০৩] উপযোগিতাবাদ এবং জার্মানি সাংস্কৃতিক দর্শন-সৃষ্ট ঐহিক সুখভোগই মানুষের পরমার্থ—বাঙলার ইংরাজি-শিক্ষিত বাবুদের এই মনোভাবকে তিনি ধিক্কার জানিয়েছিলেন। যে সমাজে মানুষের সাধনা শান্তি ও সন্তোষ লাভ, সেই সমাজের মহৎ ভূমিকার মূল্যায়ন তারা করতে পারেনি।[৩০৪] কোৎ-কে অনুসরণ করে তিনি বলেছিলেন যে পুরোহিত-শ্রেণী-শাসিত সমাজই শ্রেষ্ঠ। সেই কারণেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব: "যদি সত্য অসত্য হইতে বলবান, অস্বার্থপরতা স্বার্থপরতা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ অবিশুদ্ধ ভাবমার্গ হইতে উৎকৃষ্ট হয়, তবে হিন্দু সমাজ অবশ্যই উহার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে। ভারতবর্ষীয় অপরাপর সকল সমাজগুলিকে আত্মসাৎ করিবে, এবং ইউরোপ খণ্ডাদি পৃথিবীময় প্রকৃত জ্ঞানের এবং ধর্মের আলোক বিকীর্ণ করিবে, বেকন, ডেকার্ট, কান্ট প্রভৃতিরা যে পর্যন্ত জ্ঞানমার্গ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, হিন্দু শাস্ত্রের জ্যোতি তাহা অতিক্রম করিয়া উঠিবে এবং হিন্দু চীন জাপান প্রভৃতি আসিয়া খণ্ডকে যেমন ধর্মজ্যোতি দিয়াছে, তা অপেক্ষাও বিশুদ্ধতর, তীব্রতর, রমণীয়তর জ্যোতি ইউরোপে বিকীর্ণ করিবে।"[৩০৫] ইউরোপকে শিষ্য করে এই সাংস্কৃতিক বিজয়ের স্বপ্ন তখন অন্যান্য অনেকের মতই বিবেকানন্দকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। পরাধীনতার আনুষঙ্গিক মানসিক ও বাস্তবিক বঞ্চনার যে গ্লানি, সেই ক্ষতি পূরণ করতেই বোধহয় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের আত্ম প্রচার, তার চেয়েও বেশি এই সব দিবাস্বপ্ন। ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধের উপর দৃঢ় আস্থাবশত ভূদেব স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের প্রাধান্য এবং প্রগতিকে অভিন্ন বলে দেখেছিলেন।

পাশ্চাত্য ভাবধারার সমীক্ষায় তিনি সাম্যভাবকে তৃতীয় স্থান দিয়েছেন। তার আগে আছে স্বার্থপরতা এবং অগ্রসারিতাবাদ। তাঁর মতে সাম্যবাদের মূল আছে খ্রিস্টধর্মে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসঙ্গক্রমে তিনি দু'ধরনের ধর্মের কথা বলেছেন—হিন্দু এবং বৌদ্ধ, যাদের তিনি 'প্রাকৃতিক' ধর্ম বলেছেন, এবং অন্যদিকে ইহুদিধর্ম, খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলাম,—যাদের তিনি আবেগপ্রসৃত বা 'ভাবমূলক' ধর্ম বলেছেন। "প্রাকৃতিক ধর্মে একমাত্র কার্যকারণ—শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করিয়া সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখিতে হয়।...এই ধর্মে পরমাত্মার অপাপবিদ্ধত্ব, নিত্যত্ব, সর্বময়ত্ব প্রতিপাদিত হয়।" এই ধর্মে জ্ঞানলাভই হল মুক্তির পথ। পক্ষান্তরে, ভাবমূলক ধর্ম মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার খতিয়ান থেকে সৃষ্ট এবং দয়া, দানশীলতা, রাগ প্রভৃতি অনুভূতি ঈশ্বরে আরোপিত। "এই ধর্মে উপাসনার পথ সুবিস্তৃত, ইহাতে অনুগ্রহের আশা এবং নিগ্রহের ভয় করিতে হয়।" অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছা তার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু স্বাভাবিক ধর্মে মানুষের কর্ম ও তার পরিণতির মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ স্বীকৃত আছে। দৈব অনুগ্রহ কিম্বা মানুষের ইচ্ছা কিছুই এই অবিচল সম্বন্ধকে বিচলিত করতে পারে না। ভূদেবের অনুভূতিতে কঠোর নিয়মের জন্যই স্বাভাবিক ধর্ম উৎকৃষ্টতর। পার্থিব জীবনে পবিত্রতার উদাহরণের প্রয়োজন আছে এবং সেই প্রয়োজনেই অবতারবাদ বা ধর্ম প্রবর্তকবাদের অবতারণা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এর জন্য সত্যের বিচ্যুতি ঘটেছে। সেই অর্থে অদ্বৈতবাদ এবং আচার-নিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত ভক্তি আন্দোলন হিন্দু ধর্মের অবক্ষয় এবং ক্রমিক দুর্বলতার সাক্ষ্য।

আপাতদৃষ্টিতে, ভাবমূলক ধর্মগুলির একটি সদগুণ হল সাম্যভাব। প্রতীয়মান সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এই সাম্যভাবের সূচনা হয়েছিল, একইসঙ্গে দৃশ্যমান বৈসাদৃশ্যগুলিকে অস্বীকার করে বাস্তবতা-বিবর্জিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এক আবেগের সৃষ্টি করা হয়েছিল। "জগতের কোথাও সাম্য নাই...একটি বালুকারেণুও আর কোন বালুকারেণুর সমান নয়।" মানুষের আবেগজনিত সাম্যভাব ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে প্রচার করায় বিশ্ব প্রকৃতির অনেক কিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, এমনকি ঈশ্বরের কাজেরও যুক্তি দেখাবার প্রয়োজন হয়েছে।

এই মৌলিক দুর্বলতা সত্ত্বেও এই নীতির প্রবক্তাগণ দাবি করেন যে এর অনেকগুলি সুফল আছে যথা,—মানুষের প্রতি মানুষের অবিচারের উপর বাধা সৃষ্টি হয়েছে, সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য চিন্তার উদ্রেক হয়েছে এবং সর্বস্তরে মানুষের আশা-উদ্দীপনার সুযোগ হয়েছে। ভূদেবের মতে এইসব দাবি আংশিকভাবে সত্য এবং "ঐ সকল শুভ ফল আছে বলিয়াই দুঃখজীবী জনসাধারণের কর্ণে সাম্যবাদ বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়।" এর আবেদন এতই মধুর যে "যথায় উহার সত্য হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই, সেই ইংরাজের মুখেও উহা আজিকালি ভারতবাসীর মনোহরণ করিতেছে।" তিনি "অলীক সাম্যবাদের" ত্রুটিগুলি এইভাবে গ্রথিত করেছেন—এই নীতি দয়া এবং সন্তুষ্টির পরিবর্তে ঈর্ষা, বিদ্বেষ এবং দুরাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। মানুষের সহজাত উন্নতির প্রচেষ্টা এবং সাম্যভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটতে পারে না বলেই তাঁর ধারণা ছিল। ফলত "সাম্যবাদটা কথায় মাত্র থাকে, ব্যবহারে...মানুষ মানুষের অপেক্ষা বড় হইতে চায়।" উদাহরণস্বরূপ, "মার্কিনেরা চাকরদিগকে চাকর বলেন না, সহায় বা সাহায্যকারী বলেন, কিন্তু মার্কিনদিগের ধনবত্তার গৌরব ইংরাজদিগের অপেক্ষাও অধিক।" আমেরিকায় সম্পদ ব্যতীত বংশমর্যাদা, বিদ্যা কোন কিছুরই মর্যাদা নেই। অর্থাৎ কার্যত বাগাড়ম্বর ব্যতীত সাম্যবাদের অস্তিত্ব ছিল না। এমনকি বহুল-প্রচারিত দাসত্ব-প্রথার বিলোপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধনও স্বার্থ-প্রণোদিত, কারণ নব-উদ্ভাবিত প্রয়োগ-বিদ্যার ফলে দাস-শ্রম অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়েছিল। অসাম্য জীবনের অঙ্গ এবং তা প্রকৃতির কাছ থেকেই পাওয়া। হিন্দু ধর্ম, ভূদেবের ভাষায় প্রাকৃতিক ধর্ম, এই সত্য উপলব্ধি করেছিল এবং স্বাভাবিক বা সহজাত শ্রেষ্ঠত্বের উপর আস্থা রেখে সামাজিক বর্ণভেদের মাধ্যমে জন্মসূত্রে উচ্চনীচের ভেদ রচিত হয়েছিল। জাতিভেদ প্রথার অনেক গুণের মধ্যে একটি মহৎ গুণ এই যে এই প্রথায় মূল্যবোধের মানদণ্ডে ধনগৌরব একেবারেই তলিয়ে যায়। বিদ্যা, নৈপুণ্য, প্রাচীনত্ব, আভিজাত্য এবং ধন—এই পাঁচটি ভূদেবের বিচারে সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের মাপকাঠি। সব সমাজই এগুলি গ্রহণ করেছে, তবে এক এক সমাজ এক একটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এগুলির মধ্যে যেটি নিকৃষ্টতম, ইউরোপ সেই ধনকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। সম্পদ অনুসারে সমাজ বিন্যাসের ফলে হয়ত মানুষের চেষ্টা-শক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু সেইসঙ্গে লোভ, ঈর্ষা, শঠতা মনের অস্থিরতা প্রভৃতি অনেক অনর্থও সৃষ্টি হয়েছে।

খ্রিস্টধর্মকে যদি সাম্যবাদের একটি উৎস মনে করা যায়, তবে দ্বিতীয়টি হল ফরাসী বিপ্লব।[৩০৬] শুনতে বিপরীতধর্মী মনে হলেও, এই বিপ্লবের ফলেই ধনবত্তা নতুন গুরুত্ব পেয়েছে। ভূদেব মনে করেন যে ফরাসী বিপ্লব থেকে ইউরোপের ইতিহাসের তৃতীয় বা আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে। রোম সাম্রাজ্যের পতনে যে দ্বিতীয় যুগের অভ্যুদয় হয়েছিল, তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে ফরাসী বিপ্লবে। এই বিপ্লব থেকে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী ধ্রুব সত্য বলে গৃহীত হয়েছে। যেসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই মতবাদ গড়ে উঠেছিল, বিপ্লবের মাধ্যমে ফ্রান্সে এবং ইউরোপের অন্যত্র সেগুলির কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদী এবং কয়েকটি স্বল্পকালীন পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, যথা—যাজকশ্রেণীর ক্ষমতানাশ, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা, জমিদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, আইনের চোখে সমানাধিকার, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রজাহিতকর কর্ম সম্পাদন ইত্যাদি। সংক্ষেপে, "প্রজাসাধারণের হিতোদ্দেশের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সমাজের পরিচালনা করাই ফরাসী বিপ্লব কাণ্ডের প্রদত্ত অতি মহতী শিক্ষা।"[৩০৭]

কিন্তু "মহতী শিক্ষায়" কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছিল কারণ "ধর্মশিক্ষার প্রভাবে সুশাসনের শিক্ষা হয় নাই—বিপ্লবের বলে হইয়াছে", এবং সেই বিপ্লব "বিদূষিত সাম্যভাব ধরিয়া করিতে হইয়াছে।" এই সাম্যবাদ ভূদেবের মতে "অলীক", শিল্প-বাণিজ্যের মাধ্যমে বণিক শ্রেণীর সম্পদ ও ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা মাত্র। অন্য একটি প্রবন্ধে[৩০৮] তিনি যাজক এবং অভিজাত শ্রেণীর প্রচেষ্টায় রাজকীয় ক্ষমতা হ্রাসের ক্রমিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাষ্ট্র এবং শাসনযন্ত্রের বিবর্তন আলোচনা করেছেন। আমেরিকা এবং ইউরোপের কোনও কোনও অঞ্চলে রাষ্ট্রক্ষমতা শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ শ্রেণীর হাতে চলে গেছে। "কিন্তু ইউরোপেও অদ্যাপি প্রজাসাধারণের বিশেষ গৌরব হয় নাই" বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। বিপ্লবের ফলে "জন্মবৈষম্যের ফলে ধনবৈষম্য সংস্থাপিত হইয়াছিল মাত্র। বৈষম্য যায় নাই, উহার একটু গতি ফিরিয়াছিল।"[৩০৯] প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রায় ঐ একই সময়ে সংঘটিত শিল্প-বিপ্লবের ফলে অসাম্য এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৩১০]

পাশ্চাত্য দেশের প্রবল অর্থকরী চিন্তা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে ভূদেব মনে করেছিলেন, অন্তত সেই কারণে হিন্দুদের পাশ্চাত্য নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্জন করা উচিত। অর্থকে তারা দেবতার স্থলাভিষিক্ত করেছে, ফলত অতি নিকট আত্মীয়ের ক্ষেত্রেও অর্থসাহায্য আদান-প্রদানে তারা অস্বস্তি বোধ করে। ভারতবর্ষে সন্তানকে সাহায্য না করা সামাজিক অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। গারফিল্ডের জীবনবৃত্তান্তে এর বিপরীত দুঃসহ চিত্র পাওয়া যায়। বালক অবস্থায় তিনি অর্থের বিনিময়ে নিজের দিদির বাড়িতে থাকতেন, না হলে ভগ্নীপতির কাছে তাঁকে অস্বস্তিতে পড়তে হত। গারফিল্ড একবার তাঁর বড় ভাইয়ের কাছে কিছু টাকা ধার করেছিলেন এবং অঙ্গীকাররূপে জীবনবীমার প্রমাণ-পত্র তাঁকে দিয়েছিলেন, দাদাও তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনীকার ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের প্রশংসনীয় উদাহরণ বলে এইসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবার পর গারফিল্ড নিজের ছেলেদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিলেন, জীবনীকার তা উল্লেখ করেননি।[৩১১]

অর্থসাহায্য দানকে কেন অনুচিত বলে মনে করা হবে, ভূদেব তার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাননি। যদি না অর্থকে সব কিছুর মানদণ্ড করা হত, তাহলে অন্য যে কোনও ধরনের সাহায্যকে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই অনেক বেশি মূল্য দিত। অর্থের বিশেষ গুরুত্ব এই নিষেধের মাধ্যমেই ধরা পড়েছে।[৩১২]

অর্থকে দেবতার আসনে বসানোর আর একটি উদাহরণ হল ইউরোপে আতিথ্য ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে পাশ্চাত্য ভাবানুগামী ভারতীয়রাও তাঁদের "গুরু"দের এইসব ধরনধারণ অনুসরণ করতে শুরু করেছে। ভূদেবের মতে এই হীন মনোবৃত্তির উৎস হল আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে সর্বান্তঃকরণে ধনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা। তাঁর ভয় ছিল যে ভারতীয়রা যদি পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ করে, তাহলে ভারতেও আতিথ্যধর্ম বিলুপ্ত হবে।[৩১৩]

কোনও কোনও আচরণবিধিতে স্বার্থপরতাকে আদর্শ করা হয়েছে বলেই ধনের অসাম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপে নিজের আত্মীয়স্বজনের প্রতি দয়া বা সাহায্যপ্রদান উচিত বলে মনে করা হয় না, তাই সেখানকার দরিদ্রদের অবস্থা ভারতের হতদরিদ্রের চেয়েও শোচনীয়। ভূদেব দেখিয়েছেন যে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস্-এ শতকরা ৩৮ জন লোককে ৬৫ বছর বয়সের ওপরে "দরিদ্রাবাসে খাটিয়া খাইতে হয়।"[৩১৪]

ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বিশেষত সমাজতন্ত্রবাদীদের শোষণহীন আদর্শ সমাজ স্থাপনের প্রচেষ্টার মধ্যে ভূদেব একটি কার্যকারণ সম্বন্ধ লক্ষ করেছিলেন ; তাদের উদ্দেশ্য ছিল "সম্পত্তির অধিকার ব্যক্তিনিষ্ঠ না হইয়া সমাজনিষ্ঠ হউক।" "যদি বাণিজ্যিক সুবিধার প্রতি তন্মনস্কতাবশত সম্মিলিত স্বত্বের জ্ঞান বিলুপ্ত না হইত, যদি ঐ বোধটিকে আপনাদের সহিত মিলে না বলিয়া অসভ্যতার বা অনুন্নতির চিহ্ন বলিয়া গণনা না করিতেন, তবে আজি ইউরোপের মধ্যে সামাজিক স্বত্ব সংস্থাপনের জন্য এমন আগ্রহাতিশয্য হইত না।" এই প্রচেষ্টার ফল তখনও ফলতে শুরু করেনি বটে, কিন্তু ভূদেবের মতে ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর যে স্বার্থপরতা, ঐ প্রচেষ্টা তার বিপরীতমুখী। ঐ নতুন মতবাদে তিনি "প্রকৃত উন্নতির" লক্ষণ দেখতে পাননি, কারণ "পূর্ববর্তী সমস্ত তথ্যকে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াই ব্যাপকতর সত্যের আবির্ভাব হয়", তাদের পরিত্যাগ করে নয়। এই নতুন আদর্শে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহ্যকে কোনও মূল্য দেওয়া হয়নি। প্রবক্তাগণ প্রায়শই স্বেচ্ছাচারমূলক আদর্শ প্রচার করেন, তাঁদের মতে শারীরিক সুখভোগই মানুষের পরমার্থ এবং রিপুগুলিকে দমন করার চেষ্টা অন্যায়। তাঁরা কোনও ধর্মীয় বিধানও মানেন না। ম্যালথাসের আদর্শে বিশ্বাসবশত এইসব ত্রুটির তালিকায় ভূদেব আরও লিখেছিলেন, "তাঁহারা প্রজাসংখ্যার বৃদ্ধি সঙ্কোচ করা আবশ্যক বলেন না।"[৩১৫] বিবাহবন্ধন এবং পরিবার সম্পর্কে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন যে সেগুলি সবই ব্যর্থ হয়েছে। "স্বাধীনতা বর্দ্ধনের প্রয়াসে শিথিল সমাজবন্ধনগুলি ছিন্ন করিতে গিয়া তদপেক্ষা বিবিধ কঠিনতর বন্ধনজালেই জড়িত হইয়াছে।" এ বিষয়ে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রক্ষণশীল মনোভাবের উজ্জ্বল নিদর্শন: "সমাজ পদার্থটি কুম্ভকারের প্রতিমাদির ন্যায় হাতে করিয়া গড়িবার বস্তু নহে; উহা প্রাণী বা উদ্ভিজ্জ শরীরের ন্যায় জন্মিয়া ক্রমশ বৃদ্ধিশীল হয়। উহার উপর অতিরিক্ত কাটাছেঁড়াও চলে না।"[৩১৬]

ভূদেব নিহিলিস্ট (বিধ্বস্তৃ)—নৈরাজ্যবাদীদের শাসনব্যবস্থা রহিত করার আদর্শও আলোচনা করেছেন, এবং সম্পত্তির সামাজিক স্বত্বকে একই আদর্শের অঙ্গ বলে গণ্য করেছেন। নিহিলিস্ট—অ্যানার্কিস্টদের মতে সামাজিক বিবর্তনের ফলেই শাসনব্যবস্থা লোপ পাবে। ভূদেবের কাছে এই মত গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ প্রয়োজনের তাগিদেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। "যদি শিক্ষাগুণে এবং অভ্যাসগুণে মানুষমাত্রেই এরূপ ধর্মশীল হইয়া উঠে যে, আপনি সর্বতোভাবে আপনাকে শাসন করিতে পারে, তবে বাহির হইতে কোন শাসনের প্রয়োজন হয় না।" ইতিহাসের আলোচনায় এরকম ঘটনা ঘটা সম্ভবপর বলে মনে হয় না। ইউরোপের ইতিহাসের ঘটনাবলী এ বিষয়ে বিশেষ রকম সংশয় জাগিয়ে তোলে। "ইউরোপীয়দিগের মধ্যে পররাজ্যগ্রহণ চেষ্টা যেরূপ বলবতী এবং বৃদ্ধিশীলা হইতেছে—এবং ভোগসুখতৃষ্ণার যেরূপ তীক্ষ্ণ ধার জন্মিতেছে, তাহাতে ও ধর্মের বৃদ্ধি হইয়াছে, বা হইতে পারিবে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না।" যতদিন না তারা পররাজ্যগ্রাসের ছল-বল-কৌশল ত্যাগ করছে, ততদিন পর্যন্ত তাদের কোনরকম নৈতিক উন্নতি হচ্ছে এ কথা মনে করা ভুল। "প্রত্যুত তাঁহাদের সন্তানেরাও ঐ দস্যুপ্রকৃতির উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মিবে, ইহা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।...ইউরোপে যদি শাসনের প্রয়োজন নাই, তবে কোথায় আছে?"[৩১৭]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ভূদেবের মতে ইউরোপে ধনবৈষম্যের কারণ সেখানকার সামাজিক ব্যবস্থার ত্রুটি এবং পুরুষানুক্রমে পরার্থপরতা শিক্ষার অভাব। অতএব, ঐ সব দোষ সংশোধন করলে বৈষম্য দূরীভূত হতে পারে। তবে তাঁর মতে "বিধ্বস্তৃগণ আর্থিক বৈষম্যের যে সকল হেতু নির্দেশ করিয়া বিচার করেন, তাহার মধ্যে একটি প্রধান কারণের উল্লেখ করেন না। সে কারণটি মনুষ্যের মধ্যে ক্ষমতার বৈষম্য এবং পরিশ্রমশক্তির এবং পরিশ্রম প্রবৃত্তির তারতম্য।" বৈষম্যের অন্যান্য কারণ দূরীভূত হলেও শুধুমাত্র এই কারণেই বৈষম্য সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ "বিধ্বস্তৃ প্রভৃতি লোকের যে সকল মতবাদ উঠিয়াছে তাহার অধিক কথাই অভিলাষমূলক, বিচারমূলক নহে।"[৩১৮]

রুশিয়া এবং ফরাসীদেশের সমাজব্যবস্থা এবং ঐ দেশগুলিতে সাম্যবাদী মতবাদের প্রভাবের মধ্যে একটি কার্যকারণ সম্বন্ধ ছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন। তাঁর মতে একান্নবর্তী পরিবার—অন্তত্তপক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত আদর্শ—সমস্ত কৃষিপ্রধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের পক্ষেই উপযুক্ত। ঐ ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে ঐ সব দেশে যে বিরাট পরিমাণ ভূমিহীন দরিদ্র শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রভাব সমাজের উপর পড়েছে। রুশিয়াতে জমির উপর গ্রামবাসীদের যৌথ স্বত্ব এই বিপর্যয়ের প্রতিকার করতে পারত। সর্বক্ষেত্রে সামাজিক স্বত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানোর জন্য যে নিহিলিস্ট এবং সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রভাব ক্রমশই বাড়ছে তার কারণ যৌথস্বত্বভোগী একান্নবর্তী পরিবারের ঐতিহ্য, জারের দুঃশাসন বা অত্যাচার নয়। ফরাসীদেশে সমাজতন্ত্রবাদী এবং সাম্যবাদীদের অভ্যুত্থানের কারণ আলাদা। সেখানে পিতার সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করার রীতি প্রচলিত থাকায় সম্পত্তির পরিমাণ ক্রমশই কমতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত ভূমিহীনতায় পর্যবসিত হয়। যেহেতু ইংল্যান্ডের সঙ্গে তুলনীয় কোনও শিল্পব্যবস্থা বা উপনিবেশ ফরাসীদের নেই, সেই কারণে সে দেশে এক ভয়াবহ বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানকার সাম্যবাদী দলগুলি এই সামাজিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে।"[৩১৯]

"অলীক সাম্যবাদের" সমালোচক ভূদেব উপযোগিতাবাদকেও সরাসরি অগ্রাহ্য করেছিলেন। "সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক মঙ্গল" নীতিকে তিনি "অলীক দর্শন" বলেছিলেন। কারণ এই নীতিতে বিশেষ বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর ক্ষতিবৃদ্ধিকে গুরুত্ব না দিয়ে অধিকাংশের মঙ্গলের জন্য সমাজ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত আর্থ-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তাঁর মতে 'হৃদয়হীন', কারণ সমাজের কোনও একটি অংশের মঙ্গলবিধান না করা সমাজের পক্ষে অনুচিত। "অবাধ বাণিজ্যনীতিতে" অধিকাংশের মঙ্গলের জন্য যে কয়েকটি শিল্পের ধ্বংস সাধন মেনে নেওয়া হয়েছে, সেই কারণেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমেরিকার সংরক্ষণ নীতি ভাল, কারণ তার ফলে কোনও কোনও জরাজীর্ণ দেশীয় শিল্প টিকে থাকার, এমনকি পুনর্জীবন পাবার সুযোগ পায়।[৩২০]

পাশ্চাত্যের নতুন নতুন সামাজিক দর্শনগুলি সম্বন্ধে ভূদেবের চূড়ান্ত সমীক্ষা তাঁর নিজের সামাজিক আদর্শের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। দণ্ডদাতারূপে রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবেই, কিন্তু তার কঠোরতা কম হতে পারে, এবং শুধুমাত্র দণ্ডদাতারূপে না থেকে শিক্ষাদাতারূপেও রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা যেতে পারে। তেমনি, বৈষম্য দূর করা সম্ভব নয় বটে, তবে তার মাত্রা কমানো অসম্ভব নয়। "সুতরাং ইউরোপীয় সমাজ-বিপ্লাবকবর্গের ধ্বনিত 'স্বাধীনতার' পরিবর্তে 'শাস্ত্রাধীনতার' এবং 'সাম্যের' পরিবর্তে 'ন্যায়ানুগামিতার' এবং 'ভ্রাতৃত্বের' পরিবর্তে 'ভক্তি, প্রেম এবং দয়ার' ধ্বনি উত্থিত হইলেই ভাল হয়। কতকটা এইরূপ ধ্বনি, অন্তত 'শাস্ত্রাধীনতার' ধ্বনি ইংল্যান্ডের বিপ্লবে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল—তাহার ফলও ইউরোপীয় অপরাপর বিপ্লবকাণ্ডের ন্যায় তেমন অপকৃষ্ট হয় নাই।"[৩২১]

অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—তিন যুগের পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের নেতিবাচক সমীক্ষায় ভূদেবের চূড়ান্ত অভিমত হল এই যে বাস্তববুদ্ধি ব্যতীত ইউরোপের কাছে ভারতের আর শেখার কিছুই নেই। সেই বুদ্ধি ভারতবাসী আস্তে আস্তে এবং সচেতনভাবে নিজের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বয় করে নেবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, তাই তাঁর মতে, ভারতের পক্ষে তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলি—অর্থনীতি, শিক্ষা, এবং বিশেষত তার চিরাচরিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক রীতিনীতিগুলি সংরক্ষণ করা উচিত। যুগপুরুষের আবির্ভাবের জন্য ভারতবাসীকে অপেক্ষা করতে হবে। ভারতের নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উত্তরাধিকারী সেই প্রাজ্ঞ নেতা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হবেন।

উপসংহারে বলা যায় যে নিজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কৌলীন্য সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন ভূদেব ভারতীয় ঐতিহ্যকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন এবং এই অবিচল বিশ্বাসের ফলেই তাঁর নিজের চরিত্র গঠনে পাশ্চাত্য শিক্ষার যে প্রভাব, সে সম্বন্ধে তিনি অনবহিত ছিলেন। সুগভীর পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভরশীল তাঁর যুক্তি-তর্কের উৎস ছিল কতগুলি নৈতিক আদর্শ। ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে সেগুলির অভাব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এবং তাঁর ভয় ছিল যে ইউরোপের কাছে অধীনতার ফলে তাঁর নিজের সমাজ থেকেও ঐ প্রাচীন আদর্শগুলি উৎপাটিত হবে। তাঁর গভীর দেশপ্রেম সুদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যগুলিকে বজায় রাখার উপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। ঐ সব নিয়মকানুন অবশ্যই পরিবর্তিত হবে, যেমন আগেও অনেকবার হয়েছে। তবে সে পরিবর্তন হবে তার নিজস্ব নিয়মানুগ। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আদর্শ ও মূল্যবোধ ভারতের নিজস্ব ভাবধারার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, সেটাই তার বিপদের কারণ। ভারতে এ পর্যন্ত যত বৈদেশিক আক্রমণ হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হল এই বিদেশী ভাবধারার আক্রমণ। ইউরোপ সম্বন্ধে ভূদেবের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হল ঐ ভীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক ; বাংলার বাইরের জগতে তিনি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত "বন্দে মাতরম্"-এর রচয়িতারূপেই সমধিক প্রসিদ্ধ। যে পারিবারিক প্রেক্ষাপটে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা প্রায় ভূদেবেরই মত।[১] দুজনেই রাঢ়ী শ্রেণীভুক্ত কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিলেন। একই নদীর এপারে-ওপারে ছিল দুজনের জন্মস্থান। দুই পরিবারেই সংস্কৃতচর্চার প্রবল ঝোঁক ছিল। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভূদেবের চেয়ে বারো বছরের ছোট বঙ্কিম তাঁর সমসাময়িক অগ্রজের মত একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন। অবশ্য তাঁর সময়ে হিন্দু কলেজের নাম পরিবর্তিত হয়ে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হয়েছে। তাঁরা দুজনেই ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রে কর্মরত ছিলেন এবং সে যুগে ভারতীয়দের পক্ষে যতটা উন্নতি সম্ভব ছিল, ততটাই উঠেছিলেন (ভারতীয় সিভিলিয়ানদের কথা স্বতন্ত্র, তাদের সংখ্যা কুড়ির বেশি নয়)। দুজনেই সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাত দিয়েছেন এবং দুজনেরই উপদেশাত্মক রচনার প্রেরণা ছিল তাঁদের দেশপ্রেম। তবে তাঁদের দেশপ্রেম রাজনীতির গন্ধ-বর্জিত ছিল, বরং বলা যায় যে, সমসাময়িক সংগঠিত রাজনীতিতে তাঁদের আস্থা ছিল না। রাজনীতি-বিমুখ দেশপ্রেম থেকেই হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি তাঁদের সচেতন এবং দৃঢ় আস্থা জন্মেছিল এবং তার ফলেই, যে সংস্কার প্রচেষ্টায় হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য পালন বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, অথবা ভারতীয় সমাজের একান্ত অন্তরঙ্গ বিষয়গুলিতে বিদেশী শাসকদের হস্তক্ষেপ আহ্বান করা হয়েছিল—সেগুলি তাঁরা মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। এইসব দৃষ্টিগোচর সাদৃশ্য সত্ত্বেও দুজনের ব্যক্তিসত্তা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে মতামত এবং পাশ্চাত্যের প্রতি মনোভাবের মধ্যে তাঁদের ঐ পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান।

আগের অধ্যায়ে দেখা গেছে যে ভূদেব আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সমাজ এবং কৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম ছিলেন। বাংলার উচ্চবর্গের যৌথপরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি সর্বতোভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং ওই ব্যবস্থাকে তিনি শক্তি, সমতা এবং সম্ভবত গভীর সুখেরও উৎস বলে মনে করেছিলেন। এই মূল্যবোধের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কারণ ছিল নিজের পিতামাতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং বালিকাবধূ রূপে যাঁকে পেয়েছিলেন, সেই পত্নীর প্রতি ভালবাসা। এই মূল্যবোধের বিরুদ্ধে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না এবং বিদেশীরা যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কয়েকটি সামাজিক নিয়ম সম্পর্কে ঘৃণা প্রদর্শন করত, ভূদেবের তাতে কিছুই এসে যেত না। তাঁর মতে দীর্ঘস্থায়িত্বই হিন্দু ঐতিহ্যের উপযুক্ততার প্রমাণ। বাঙালি হিন্দুর পারিবারিক ব্যবস্থার চেয়ে পৃথিবীর আর কোনও কিছুকেই তিনি উপযুক্ততর মনে করেননি। হিন্দু কলেজ-বেষ্টনীর পরিবেশ-সঞ্জাত বয়ঃসন্ধিক্ষণের সাময়িক উত্তেজনা ব্যতীত সারা জীবনই ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধ এবং প্রক্রিয়াগুলিকে তিনি প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করেছিলেন। বিদেশী শাসনের অধীনে না থাকলে বোধহয় অন্যান্য সংস্কৃতির তুলনায় ভারতীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে তিনি কখনোই মাথা ঘামাতেন না। বিদেশী শাসকশ্রেণী প্রচার করছিল, কোনও কোনও ভারতীয়ও তাদের ধুয়ো ধরেছিল, যে ভারতীয়রা এক অপকৃষ্ট জাতি ; দৃপ্ত এবং অনুভবনশীল ভূদেব তাই জীবনের কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্তত ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এই শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস মনগড়া নয়। নিজেকে নয়, পথভ্রষ্ট দেশবাসীকে সচেতন করে তোলার জন্যই তিনি পাশ্চাত্যপ্রথায় দীর্ঘ যুক্তিরাজির অবতারণা করেছিলেন। পাশ্চাত্যের কাছ থেকে তিনি যা শিখেছিলেন, এবং বিদেশী শাসকের অধীনে, তাঁর মতে, তাঁর মাঝারি ধরনের সরকারি পদ—এ দুটি বিষয়েই তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব ছিল। তিনি নিজেকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে হিন্দু ঐতিহ্য এবং জীবনধারাকে ঘিরে তাঁর যে ভাবনাচিন্তা, সেটাই আসল, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা বা সরকারি চাকরির প্রভাব নিতান্তই বাহ্য। এই ধারণা সর্বৈব ভুল এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের একমাত্র দ্বন্দ্ব। যে দৃষ্টিকোন থেকে তিনি পাশ্চাত্যের মূল্যায়ন করেছিলেন, এবং সেক্ষেত্রে তাঁর বিষয়মুখিতা থেকে বিচ্যুতির কারণ ছিল এই দ্বন্দ্ব। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি দ্বিধাহীন, সার্বিক বিশ্বাস তাঁর জীবনের ভারসাম্য বজায় রেখেছিল।

সে তুলনায় দ্বন্দ্ব ছিল বঙ্কিমের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতেই তিনি শেষজীবনে উপদেশমূলক সাহিত্য রচনায় উৎসাহ বোধ করেছিলেন, যদিও এই উদ্দেশ্যে তিনি সফল হয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁর জীবনীগ্রন্থে সংস্কৃতচর্চা, বৈষ্ণব ভক্তিবাদ এবং হিন্দুধর্মের মহান আদর্শ নিষ্কাম কর্ম ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট তাঁর শৈশবের পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে তাঁর প্রতিভা স্ফূরণের ক্ষেত্রের অনুসন্ধান করা হয়েছে। শতবর্ষাধিক প্রাচীন, পরিবারের রাধাবল্লভের মন্দিরে সারা বছর ধরে বৈষ্ণব রীতিতে নানারকম অনুষ্ঠান হত বলে জানা যায়। গঙ্গানন্দ নামে বঙ্কিমের এক পূর্বপুরুষ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, উচ্চ পর্যায়ে সংস্কৃত চর্চার জন্য তিনি একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর মাতামহেরও একটি চতুষ্পাঠী ছিল এবং তার সঞ্চিত পুস্তকাবলী বঙ্কিম উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। বঙ্কিমের পিতাও শাস্ত্রজ্ঞ বলে পরিচিত ছিলেন এবং বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র অদূরবর্তী ভাটপাড়ার বিদগ্ধ পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। পিতার বন্ধু এবং সে যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামণির মাধ্যমে ঐতিহ্যের অনন্ত ভাণ্ডার মহাভারত সম্পর্কে বঙ্কিম প্রথম জ্ঞানলাভ করেছিলেন।[৩] সেখান থেকেই তিনি নিজের জীবনদর্শন গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কাঁঠালপাড়া গ্রামের এক বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে শৈশবে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। কনিষ্ঠপুত্র পূর্ণচন্দ্রের বিবরণ অনুসারে পিতা যাদবচন্দ্র নিবৃত্তিমার্গ অনুসারী ছিলেন, দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে বঙ্কিম স্বয়ং এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতের সমর্থন জানিয়েছেন ; উক্ত উপন্যাস নিবৃত্তিমার্গেরই জয়গান।[৪] মোটকথা, এইসব আলোচনা থেকে বলা যায় যে পরবর্তী জীবনের উপন্যাস এবং অন্যান্য রচনাতে বঙ্কিম যে হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান নিবৃত্তি এবং নিষ্কাম কর্মের আদর্শে মানুষের সদ্বৃত্তিগুলির চর্চার কথা বলেছেন, তা তিনি শিখেছিলেন পিতার কাছে এবং এক ব্রাহ্মণ পরিবারের পবিত্র গার্হস্থ্য পরিবেশে, যেখানে প্রাচীন ঐতিহ্যের সবকিছুই ভাল এবং উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হত।[৫]

ভূদেবের পরিবারে এই ঐতিহ্য অনুসৃত হওয়ায় তিনি একধরনের মানসিক তৃপ্তি ও বৈদগ্ধ লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, অন্য কোনও ঐতিহ্য সম্বন্ধে তিনি অনবহিত ছিলেন ; ধৈর্যসহকারে তিনি পুত্রকে পৈতৃকধর্মে ফিরিয়ে এনেছিলেন। ঐহিকতাবিমুখ, অপাপবিদ্ধ ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে উক্ত "যজ্ঞাগ্নির ন্যায় পূত-পবিত্র" বিশেষণটি দিয়ে বোধহয় ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বোঝানো যেতে পারে। বঙ্কিমের পরিবারে পাণ্ডিত্যের ইতিহাস থাকলেও হিন্দু অতীতের সঙ্গে অবিমিশ্র ধারাবাহিকতার কোনও উপযুক্ত নজির নেই। লেখকের চিরকালীন মানসিক দ্বন্দ্বের উৎস তাঁর পারিবারিক ইতিহাস।

ব্রাহ্মণ আদর্শের উজ্জ্বল শিখা—দারিদ্র্যকে মেনে নিয়ে পুরুষানুক্রমে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বৃত্তি গ্রহণ এবং বর্ণাশ্রমধর্মের কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করে স্বশ্রেণীর বাইরে (অনুলোম) বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন না করা—কোনটিই বঙ্কিমের পরিবারে রক্ষিত হয়নি। জানা গেছে যে যাদবের পিতাও "শিক্ষিত ছিলেন।" কিন্তু তাঁর শ্বশুরের মত "বিদগ্ধ পণ্ডিত" ছিলেন না।[৬] যাদবের প্রপিতামহ রামজীবন অপেক্ষাকৃত নিম্নকূলের ধনী রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করে কুলভঙ্গ করেছিলেন। এই "সুবিধাজনক" বিবাহের ফলে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কৌলীন্য অপসৃত হয়েছিল, আক্ষরিক অর্থে তাঁরা "ভঙ্গ" হয়েছিলেন।[৭] ব্রাহ্মণ পরিবারের রীতি অনুসারে এই পতনের ফল শুধু মর্যাদাহানিই নয়, এর একটা বাস্তব দিকও ছিল, তা হল, অর্থলোভে বংশগৌরব বিসর্জন দেওয়া। কুলভঙ্গকারীর উত্তরপুরুষরা সমাজে অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধার পাত্র হতেন। অবশ্য এই মন্তব্যের অর্থ এই নয় যে, বঙ্কিমের বৃদ্ধ প্রপিতামহ কুলভঙ্গ করে বিবাহ করেছিলেন বলে উনবিংশ শতকের বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিভা একরকমের অপরাধবোধ এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগতেন। বঙ্কিম যে কেন ভূদেবের মত হিন্দু ঐতিহ্যকে স্বতঃস্ফূর্ত এবং সার্বিকভাবে গ্রহণ করে তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যেতে পারেননি, তার সম্ভাব্য কারণ হিসাবে আমি তাঁর পারিবারিক ইতিহাসের এই ঘটনাটির উল্লেখ করছি। কঠোর সামাজিক নিয়মে এজন্য তাঁর পরিবারকে শাস্তিভোগ করতে হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ঐতিহ্যে ভূদেবের গৌরববোধে কোনও মালিন্য ছিল না, কারণ তাঁর পরিবারে কোনও সম্মানহানি বা অপমানের ইতিহাস ছিল না। বঙ্কিমের পরিবারে দুই পুরুষে পাঁচজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদলাভ করায় হিন্দু সমাজব্যবস্থায় তাঁরা যে মর্যাদা পেতেন, তার চেয়ে ঢের বেশি পেয়েছিলেন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায়।

ব্রাহ্মণ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং তার দরুন সৃষ্ট দ্বন্দ্ব যাদব নিজের জীবনে বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। বেশ বেশি বয়সে নিজে পড়াশুনা করে তিনি শাস্ত্রজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন। শৈশবে তিনি সংস্কৃতের পরিবর্তে আরবী এবং ফার্সী শিখতে শুরু করেছিলেন। তখনও পর্যন্ত ফার্সী ছিল সরকারি ভাষা এবং কোম্পানির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধীনে কাজ পেতে হলে ফার্সী জানার প্রয়োজন ছিল। তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইতিমধ্যেই সরকারের নিমক মহালে চাকুরি করছিলেন। অর্থাৎ চট্টোপাধ্যায় পরিবার ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণের সনাতন বৃত্তি পরিত্যাগ করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথম কয় দশকের মধ্যেই তাঁরা বিদেশী শাসনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। যাদবের জীবনের অন্য একটি ঘটনায় তৎকালীন ব্রাহ্মণ পরিবারের শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়েছিল এবং তাঁর সরকারি কাজে যোগদানও ত্বরান্বিত হয়েছিল। তাঁর বাল্যকালের একটি তুচ্ছ ঘটনায় কোনও শাস্ত্রীয় কিংবা নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করায় যাদব পিতার নিকট তিরস্কৃত হয়ে (এ ঘটনার কোনও স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না) গৃহত্যাগ করেন। হঠাৎই তাঁর দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, পরে যাঁর নিমক মহালের 'দারোগা' বা পর্যবেক্ষকের পদটি তিনি পেয়েছিলেন।[৮] প্রথামত শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও যাদব চাকুরি জীবনে যথেষ্ট উন্নতি করেছিলেন এবং কালক্রমে ডেপুটি কালেক্টরের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তবে এই উন্নতি সহজে হয়নি। একসময়ে ছয়শ' সহকর্মীর সঙ্গে তাঁকে অসাধুতার দায়ে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যাদবের বিবরণ অনুসারে, বিচারকালে তাঁর ওজস্বী বিবৃতির ফলে তিনি খালাস পান এবং তাঁর পদোন্নতিও হয়। মনে হয় এই বিবরণ মিথ্যা নয়।[৯] কিন্তু ভাবলে অবাক লাগে যে এই ঘটনা ওই অহঙ্কারী ব্রাহ্মণের জীবনে কি গভীর ছাপ ফেলেছিল। বঙ্কিম নিজের অনুচ্চ পদাধিকারকে জীবনের অভিশাপ বলে বার বার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।[১০] পিতার কর্মজীবনেও যে অবিমিশ্র আশীর্বাদ ছিল না, সেকথা জানা থাকার জন্যই কি এই তিক্ততা?

ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশ লিখিত বঙ্কিমের জীবনীগ্রন্থে চট্টোপাধ্যায় পরিবারে পিতামাতার সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্কের এক আদর্শ ছবি আঁকা হয়েছে। কনিষ্ঠভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রও ধর্মশিক্ষার জন্য পিতার শিষ্যত্ব গ্রহণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমের পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[১১] শচীশের লেখায় একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার উল্লেখ পাই—চাকুরিতে যোগদান করতে যাবার আগে বঙ্কিম সলজ্জভাবে পিতার পাদোদক সংগ্রহ করেছিলেন।[১২] ধর্মবিশ্বাসী হিন্দুর কাছে পিতামাতা দেবতাস্বরূপ এবং প্রথানুযায়ী এইভাবে তাঁদের উপযুক্ত সম্মান দেখানো হত। শোনা যায় যে বঙ্কিম কখনও পিতার সামনে বসতেন না বা তাঁর সঙ্গে উচ্চগ্রামে কথা বলা অন্যায় মনে করতেন এবং মা-গঙ্গার থেকে নিজের মাকে বেশি ভক্তি করা উচিত বলে বিশ্বাস করতেন। এইসব কাহিনী যদি সত্য হয়, তবে বলতে হয় যে সন্তানের ঔচিত্য বিষয়ে তাঁর আদর্শ এবং বাস্তবে নিজের পিতামাতার সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে যথেষ্ট অসঙ্গতি ছিল।

একজন অল্পবয়সী গুণমুগ্ধ পাঠকের কাছে নিজের শৈশব সম্বন্ধে বঙ্কিম বলেছিলেন, "বাপ থাকতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশি, কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষা কিছু হয়নি, নীতিশিক্ষা কখনও হয়নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখিনি, বলা যায় না।" এই একান্ত ব্যক্তিগত বিবরণে তিনি স্বীকার করেছেন যে তাঁর জীবনে নৈতিক প্রভাব ছিল শুধুমাত্র তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর।[১৩] তাঁর নিজের এবং তাঁর প্রধান জীবনীকারের পক্ষে যাদবচন্দ্রকে নিষ্কাম কর্মের জীবন্ত আদর্শরূপে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের অমিতব্যয়িতার সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে সঙ্গতিপন্ন বঙ্কিমকে পিতৃঋণের মোটা অংশ পরিশোধ করতে হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিতার অবিমৃশ্যকারিতার জন্য তাঁকে যে চাকুরিজীবনের আগাগোড়াই ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে, তার জন্য তাঁর ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে একটি চিঠিতে : "যাহার স্কন্ধে ঋণের ভার চাপে, তাহার অপেক্ষা অসুখী পৃথিবীতে আর কেহ নাই। উদাহরণ আমাকেই দেখিতেছেন। রমেশ মিত্র হাইকোর্টের জজ আর আমি মালদহের ক্ষুদ্র চাকুরিজীবী। পিতৃঋণই ইহার কারণ।" পিতার আগ্রহে একমাত্র ছেলের বিয়েতে টাকা ধার করে জাঁকজমক করতে উদ্যত মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্রকে নিরস্ত করবার জন্য লেখা একটি চিঠিতে তিনি এই তিক্ত মন্তব্য করেছিলেন। সন্তানের কর্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট তৎপর হওয়া সত্ত্বেও, যে ঋণ তিনি পরিশোধ করতে পারবেন না, তা গ্রহণে তিনি দাদাকে পিতার আদেশ অমান্য করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।[১৪] অবশ্য এ উপদেশ গ্রাহ্য হয়নি। বিবাহ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিশোর বর ভাড়া করা হাতিতে চড়ে বিয়ে করতে গিয়েছিল। পিতার এই আড়ম্বরপ্রিয়তার দরুন ঋণ যথাকালে বঙ্কিমকেই পরিশোধ করতে হয়েছিল। যাদব বোধহয় "মা ফলেষু কদাচন" উক্তির এই অর্থই করেছিলেন! কিন্তু বঙ্কিম এই উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করার বিশেষ সুযোগ পাননি। কারণ টাকাটা তাঁকেই দিতে হয়েছিল। পিতার সঙ্গে বঙ্কিমের বিরোধের চূড়ান্ত হয়েছিল যখন সচ্ছলতার অজুহাতে তিনি জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ এবং বঙ্কিমকে পৈতৃক গৃহের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং বঙ্কিম কিছুকালের জন্য দেশত্যাগ করেছিলেন।[১৫]

তীব্র স্পর্শকাতর বঙ্কিমের পক্ষে এইসব মানসিক চাপের মধ্যে সবচেয়ে অব্যবস্থকারী ছিল পিতার অন্য একরকম মানসিকতা—তিনি কিন্তু তাঁর যশস্বী পুত্রকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। বঙ্কিমের দিক থেকে ভালবাসা কতটা ছিল বোঝা যায় না। উষ্ণ আবেগের পরিবর্তে সশ্রদ্ধ দূরত্ব বজায় রাখাই পিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের আসল রূপ বলে মনে হয়। কারণ পিতার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা এবং সন্তানের উপযুক্ত কর্তব্যবোধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। তিনি লিখেছেন যে পিতার মৃত্যুর পরই তিনি চিরকালের জন্য পৈতৃক আবাস ছেড়ে যান, কারণ ঐ বৃদ্ধের জীবিতকালে "এই কাজ করিতে সাহসী হইনি।" পিতা প্রচলন করেছিলেন বলেই তিনি বহু অর্থব্যয়ে পৈতৃক ভিটায় দুর্গোৎসব বজায় রেখেছিলেন।[১৬] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তাঁর জীবনদর্শনের মূলমন্ত্র, যাকে তিনি বহু সাধনায় নিজের জীবনে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন, সেই নিষ্কাম কর্মের আদর্শের দীক্ষাগুরু ছিলেন তাঁর পিতা। স্পষ্টত, ঐতিহ্যগত আদর্শের ভিত্তিতে এবং নিজের অনুভূতিতে পিতা তাঁর জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। তা সত্ত্বেও, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর নিজের মনোভাব পরস্পরবিরোধী আবেগে ছিন্নভিন্ন হয়েছে—একদিকে ছিল শ্রদ্ধা এবং কর্তব্যবোধ, অন্যদিকে অসহিষ্ণুতা এবং অপছন্দ। আমি দেখিয়েছি যে ভূদেবের অবিমিশ্র হিন্দু ঐতিহ্য গ্রহণ তাঁর পিতার প্রতি ভালবাসার অন্যরকম প্রকাশ, কারণ তাঁর পিতা ঐ ঐতিহ্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। পিতার সঙ্গে বঙ্কিমের সম্পর্ক এরকম স্বচ্ছন্দ ও নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। আমার মনে হয় যে পৈতৃক ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ এবং ঐ উচ্চমানের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত সরকারি আমলাকে নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষিত বলাটা খানিকটা ভেবেচিন্তে তৈরি করা ছিল। পিতার অযৌক্তিক কার্যকলাপের প্রতি যে স্বাভাবিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরূপ প্রতিক্রিয়া, তাকে সংযত করা এবং উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন ছিল : পিতামাতার প্রতি অবিচল কর্তব্যনিষ্ঠা হিন্দু পরিবারের ঐতিহ্য এবং সচেতন নব্য হিন্দু আদর্শের আনুষঙ্গিক ছিল। এরই স্বাভাবিক পরিণতি পিতাকে আদর্শপুরুষরূপে উপস্থাপন করা। কিন্তু বঙ্কিম পিতার সঙ্গে সম্পর্কের মানসিক চাপ থেকে কখনওই রেহাই পাননি। প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর মনোভাবেও ঐ দোটানা দেখতে পাওয়া যায়। হিতবাদী এবং প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা বিশেষ সফল হয়েছিল বলে মনে হয় না। সুতরাং বলা যায় যে ভূদেবের মত তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণ পিতার স্বাভাবিকভাবে অনুগত পুত্র ছিলেন না। তবে তিনি যে এইরকম একটি সুন্দর জীবন চেয়েছিলেন, তা স্পষ্ট। প্রাচীন ঐতিহ্যকে তিনি যেভাবে দেখেছিলেন তাতে ভূদেবের মত স্বচ্ছন্দ বিশ্বাস তাঁর গড়ে ওঠেনি, বিদেশী যুক্তিরাজি ব্যবহার করে তিনি এর থেকে একটি জীবনাদর্শ গড়ে তোলার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হয়নি। এক্ষেত্রে বলা যায় যে আহৃত জ্ঞানের চেয়ে তার কাছে ঐ যুক্তিরাজির মূল্য বেশি ছিল, কিন্তু সেই সত্য তিনি নিজের কাছেও স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। বাঙালি সাহিত্যিকদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধে এই সত্য মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

ভাই এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে বঙ্কিমের সম্পর্ক এইরকমই পরস্পরবিরোধী আবেগে অস্বচ্ছন্দ হয়েছিল। প্রাপ্ত উপাদান অনুসারে চার ভাইয়ের সম্পর্ক অস্বাভাবিকরকম ঘনিষ্ঠ ছিল। পরস্পরের সঙ্গ তাঁদের অতি প্রিয় ছিল। সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় তিন ভাই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। পরস্পরের মঙ্গলের জন্য তাঁরা যে কতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন তা বাস্তব ঘটনায় প্রতিফলিত হয়েছে এবং এই উদ্বেগের জন্য অন্তত বঙ্কিমকে অনেক স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছে।[১৭] মেজদাদা সঞ্জীবের সর্বদাই আর্থিক টানাটানি এবং ছোট ভাই পূর্ণ জীবনের একেবারে শেষদিকে কিছুটা সাচ্ছল্যের মুখ দেখেছিলেন। বঙ্কিম স্বেচ্ছায় এই ভায়ের পরিবার প্রতিপালন করতেন। স্বেচ্ছায় বটে, তবে অনেকবারই তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে যে সঞ্জীবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল, তাঁর ব্যাপারে। সঞ্জীবের অবিমৃশ্যকারিতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং অমিতব্যয়িতা সন্ন্যাসীরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারত। আর বঙ্কিমের যত গুণই থাক, মহানুভবতা অথবা অন্তহীন ধৈর্য কোনটাই তার ছিল না। পিতা এবং ভাইদের আর্থিক বোঝা বইতে গিয়ে তাঁকে যে দারিদ্র্যবরণ করতে হয়েছিল, তার জন্য তিনি প্রায়শই গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।[১৮] তা সত্ত্বেও, বৃদ্ধ বয়সে দাদারা যাতে অবহেলিত বা চিকিৎসার অভাব বোধ না করেন, সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট তৎপর ছিলেন।[১৯] বদমেজাজের ফলে পাছে বড়দাদার শরীর খারাপ হয়ে পড়ে, তার জন্যও তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল।[২০] অন্তত একবার ভাইদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। পিতার উইল অনুসারে পৈতৃক গৃহের অংশ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তিনি গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাতেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সঞ্জীব এবং পূর্ণর প্রচেষ্টায় এক জটিল ব্যবস্থার মাধ্যমে শেষপর্যন্ত ঝামেলা এড়ানো গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও, বেশ কয়েক বছর পরে বিশেষ রাগতভাবে তিনি লিখেছিলেন, "যেখানে বড়বাবুর মত সহোদরের মুখ দর্শন করিতে হয়" সেখানে ফিরে যাবার কোনও ইচ্ছা তাঁর নেই।[২১] একজন মননশীল জীবনীকার ঠিকই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছেন যে ভাইদের সঙ্গে বঙ্কিমের সম্পর্ক কখনই সত্যিকারের শত্রুতায় পর্যবসিত হয়নি, কারণ তাঁদের পারস্পরিক ভালবাসা এবং সৌহার্দ্য খুবই দৃঢ় ছিল। বরং এগুলিকে বঙ্কিমের ধৈর্যের পরীক্ষা বলা যায়, অনেকবারই তাঁর ধৈর্য প্রান্তসীমায় এসে গিয়েছিল।[২২] তিনি মনে করতেন যে তিনি যাঁদের ভালবাসেন তাঁরা তাঁর প্রতি অন্যায়-অবিচার করছেন। ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রে কর্মরত থাকার মতই এটাও তাঁর জীবনের "একটা অভিশাপ।" ভূদেবের মতই তিনিও বাঙালি হিন্দু পরিবারের আদর্শগুলি মেনে চলছেন, কিন্তু মেনে চলার বিষয়ে তিনি ভূদেবের মত আগ্রহী ছিলেন না। যতীশ নামে যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি দত্তক নেবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও সে আত্মনির্ভরতার মূল্য উপলব্ধি করুক, তাই তিনি চেয়েছিলেন—যেন যে পারিবারিক ব্যবস্থায় পরিবারের অপদার্থ সদস্যরা কৃতকার্যদের গলগ্রহ হয়ে বাঁচতে চায়, সেই ব্যবস্থায় তিনি আস্থা হারিয়েছিলেন।[২৩] বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বে সেই নতুন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদেরই প্রাধান্য দেখা যায়, যে মতবাদ ব্যক্তির সময়, অর্থ ও ক্ষমতার উপর পরিবার এবং আত্মীয়দের সীমাহীন দাবি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছে।[২৪] যে হিন্দু সংস্কৃতির ভিত্তি তার পারিবারিক ব্যবস্থা, অন্তত ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত বাংলায় তার যেমন অস্তিত্ব ছিল, সেই ব্যবস্থা সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করার অর্থ সমস্ত ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা। আবেগ ও বুদ্ধি—উভয়ক্ষেত্রেই এই মননশীল সাহিত্যিককে আদর্শ হিন্দু হবার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করতে হয়েছিল।

পিতামাতার যৌনজীবন যেমন প্রায় সর্বত্রই আলোচনার বহির্ভূত বলে মনে করা হয়, আধুনিক কাল পর্যন্ত তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতিতে মহাপুরুষদের যৌনজীবন নিষিদ্ধ বিষয় বলে গণ্য হয়েছে। একজন সাহিত্যস্রষ্টার সাহিত্য যথাযথভাবে বোঝার জন্য অপরিহার্য তাঁর জীবনের আবেগের দিকটি এতদিন অজ্ঞাত থাকত। বঙ্কিমের ক্ষেত্রে তাঁর রচনাবলী এবং তাঁর জীবনের ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর মাধ্যমে কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়, কিন্তু সঠিক জানা যায় না। তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসগুলিতে অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্নভাবে হলেও পার্থিব সুখের মধ্যে ইন্দ্রিয় সুখের গভীর তৃপ্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। যৌবনে উত্তরণকালে লেখা কবিতাগুলিতে প্রেম ও সম্ভোগের ছাপ সুস্পষ্ট। উপন্যাসগুলি সুন্দরী রমণী পরিবৃত। তাঁর নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা পড়ে সংস্কৃত কাব্যের কথা মনে পড়ে, নেহাৎই ভিক্টোরিয় যুগের রীতি অনুসারে তিনি শ্রোণিচক্র অথবা বক্ষোরুহ প্রসঙ্গ আনতে পারেননি। পাঁচ বছরের বালিকাকে এগারো বছর বয়সে বিবাহ করে তিনি জীবনের শুরুতেই প্রেমের স্বাদ পেয়েছিলেন। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে তিনি লিখেছেন: "বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না", এবং কিশোর-প্রণয় অভিশপ্ত বলেও মন্তব্য করেছেন। হয়ত একুশ বছর বয়সে বালিকাবধূকে হারানোর বেদনাময় অভিজ্ঞতা তিনি কোনদিন বিস্মৃত হননি। তাঁর মিলনান্তক উপন্যাসের চেয়ে হতভাগ্য প্রেমিকদের নিষ্ঠুর নিয়তিই বেশি মনোগ্রাহী। শেষোক্ত বিষয়টিই তাঁর রচনায় বেশি পরিমাণে স্থান পেয়েছে এবং তাদের বিষয়বস্তু রোমান্সের তুলনায় অনেক বেশি বাস্তবধর্মী।

সাম্প্রতিককালের একটি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন রচনায় বঙ্কিমের উপন্যাসে নিষেধের গণ্ডির সীমানায় পৌঁছানো, এমনকি প্রথাভঙ্গের স্বতঃপর প্রচেষ্টা দেখা যায় বলে মন্তব্য করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে।[২৫] প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীতে হিন্দু জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার প্রণয়ে ধর্ম ও সম্প্রদায়গত বাধার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা হয়েছে; মৃণালিনীতে পশুপতির ভালবাসা মনোরমার প্রতি, যার বৈধব্য প্রেমের অন্তরায়। বিষবৃক্ষতে বিধবা কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রর অবৈধ প্রণয় দ্বিতীয়বার বিবাহবন্ধনে আইনসিদ্ধ হল বটে, তবে পরিণতি হল দুঃখময়; ইন্দিরা গৃহপরিচারিকার ভূমিকায় অভিনয় করে নিজের স্বামীকে প্রলুব্ধ করেছে; ঋষিকল্প ব্রাহ্মণের পত্নী হয়েও শৈবলিনী সারাজীবন বাল্যপ্রণয়ী প্রতাপের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে; কৃষ্ণকান্তের উইলে গোবিন্দ মোহময়ী বিধবা রোহিণীর প্রতি আসক্ত হয়ে নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে। বঙ্কিমের চিন্তার জগতের কেন্দ্রে ছিল যে দ্বন্দ্ব, তাই বার বার রূপ পরিগ্রহ করেছে তাঁর রচনায়—দেহে না হলেও মনে সামাজিক বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করার প্রবণতাকে তিনি গভীর অনুভূতি দিয়ে চিত্রিত করেছেন, কিন্তু নৈতিক সমর্থন জানাননি। হয়ত তাঁর নিজের জীবনের কোনও গভীর আবেগের যে মর্মবেদনা তাই এইসব কাহিনীতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। অসাধারণ শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন এই মানুষটির ব্যক্তিগত জীবনে গোপনীয় বলে প্রায় কিছুই ছিল না, সে বিষয়ে তাঁর নিজের দুটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: প্রথমত যৌবনে কুসঙ্গ এবং তার কুফলের কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন।[২৬] অন্যত্র বিষবৃক্ষ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে এই উপন্যাসের কিছুটা তাঁর আত্মজীবনীমূলক, যেখানে পরকীয়া প্রেমের দুঃখময় পরিণতি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি জীবনের "অনেক ভ্রম-প্রমাদের" কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলি প্রকাশ করা সম্ভব নয় এবং যেগুলির কথা জানেন শুধু তাঁর স্ত্রী। এই কারণেই তাঁর জীবনী লেখা সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেছিলেন। ঘটনাগুলি অবশ্য অজ্ঞাতই থেকে গেছে, কিন্তু তাঁর তরুণ অনুরাগীর উল্লিখিত এই ধরনের কথাবার্তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই।

বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাসে মানুষের কামনার বিধ্বংসী শক্তির কথা পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়েছে, যদিও দার্শনিক প্রবন্ধগুলিতে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তার যৌক্তিকতা তিনি স্বীকার করেছেন। বুদ্ধি দিয়ে তিনি যেভাবেই ব্যাখ্যা করুন, কল্পনার ছবিতে কামনা যে মানুষের সুখশান্তির বিঘ্ন ঘটায়, তারই উপর জোর দিয়েছেন। 'কপালকুণ্ডলা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং 'সীতারামের' মর্মান্তিক পরিণতির কারণ অসংযত কামনা। চন্দ্রশেখরের নায়িকার পরপুরুষে আসক্তির পরিণাম অসহ্য নিষ্ঠুর মানসিক পীড়ন। 'আনন্দমঠে' ভবানন্দ তার অবৈধ কামনার প্রায়শ্চিত্ত করেছে আত্মাহুতি দিয়ে। এমনকি দেশসেবা প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শের পথে বৈধ প্রেমও অন্তরায়। তুর্কী আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার মহৎ কাজে হেমচন্দ্রের প্রয়োজন বলে সন্ন্যাসী মাধবাচার্য প্রিয়তমা মৃণালিনীর সঙ্গে তাঁর মিলনের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে নিবেদিত আনন্দমঠের 'সন্তানগণ' যতদিন না তাঁদের কার্যসিদ্ধি হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন করার ব্রত নিয়েছিলেন। গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ককে বঙ্কিম অসত্য বলে পরিহার করেছেন।[২৭] রাজা সীতারামের সন্ন্যাসিনী রানীর উক্তিতে সংযমশীলতার আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে: "ধর্মার্থে ভিন্ন যে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি, তাহা অধর্ম। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুবৃত্তি।"[২৮] বঙ্কিমের সর্বশেষ উপন্যাসের এই বিচক্ষণ উক্তির সঙ্গে পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুপথযাত্রী প্রতাপের স্বীকারোক্তি তুলনীয়: "পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবনবিসর্জনের আকাঙক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে।...আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী ?" তার প্রশ্নের উত্তরে সন্ন্যাসী রমানন্দ বলেন : "তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ ; শাস্ত্র এখানে মূক। তুমি যে লোকে যাইতেছ, সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার উত্তর কেহ দিতে পারিবে না।"[২৯] স্পষ্টতই ধর্ম এবং অধর্মের বিভাজক রেখাটি বঙ্কিম-মানসে অদৃশ্যপ্রায় ক্ষীণরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁর নায়কচরিত্রগুলির মধ্যে কামনা ও নৈতিকতার মধ্যে যে বেদনাময় দ্বন্দ্ব দেখা যায় তা তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন কিনা কে জানে। "সংস্কৃতি" বিষয়ে তাঁর মতবাদের একটি উদ্দেশ্য অবশ্যই এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো।[৩০] তাঁর চিন্তাজগতে অশান্তির সৃষ্টি করেছিল যে সংস্কৃতির সংঘাত, তা তাঁর চিন্তার উর্বরা ভূমিতেই পরিপুষ্ট হয়েছিল। বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিভিন্ন প্রকারের দ্বন্দ্ব তাঁর জীবনধারার বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। এই দ্বন্দ্বই তাঁর জীবনদর্শন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল, এবং একদিকে পিতৃপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া হিন্দু ঐতিহ্য, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা—তাঁর চেনা এই দুটি জগৎ সম্বন্ধেও তাঁর মতবাদ সৃষ্টি করেছিল। জীবনের শেষ পর্যায়ে শেষেরটির মোহজাল তিনি সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যদিও যতটা কথায় কাজে ততটা নয়। নিষেধের বেড়া ডিঙোন যতই লোভনীয় হোক, শেষপর্যন্ত তাকে স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

বোধহয় ভারতস্থিত ইউরোপীয়দের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্কের প্রভাবেই তিনি পাশ্চাত্য মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যদিও এই প্রত্যাখ্যান কখনই সার্বিক হয়নি। বহু বছর ধরে গড়ে ওঠা ভাবনাচিন্তার শিকড় তাঁর মনের এত গভীরে প্রবেশ করেছিল যে তাকে পুরোপুরি উৎপাটন করা সম্ভব ছিল না। তাঁর সযত্ন-সৃষ্ট জীবনদর্শনে এইসব ভাবনাচিন্তা প্রচ্ছন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। অবশ্য প্রত্যাখ্যানের প্রচেষ্টাও যথেষ্ট প্রবল ছিল, কারণ পুঁথিগতভাবে ইউরোপের প্রতি যত আকর্ষণই বোধ হোক না, বাস্তবে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সংঘর্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মাভিমানী বঙ্কিমের কাছে অসহনীয় মনে হয়েছিল।

সমকালীন সকলেই তাঁর প্রগাঢ় অহমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। সমালোচকরা তাঁকে আত্মশ্লাঘার অপরাধে অভিযুক্ত করেছেন।[৩১] এমনকি প্রিয়বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র সরকারও তাঁর চরিত্রের পর্যালোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে অহমিকার কথা না লিখলে বঙ্কিমের চরিত্র[৩২] সম্বন্ধে সঠিক বলা হবে না। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, আকর্ষণীয় চেহারা, সাহিত্যিকরূপে খ্যাতি এবং সর্বোপরি নিজের বুদ্ধিমত্তা এবং সৃজনীশক্তির উপর আস্থাই এই বহু-আলোচিত অহমিকার উৎস। চার ভাই-ই যে সরকারি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তার জন্য তাঁদের পরিবারের উন্নাসিক বলে নাম হয়েছিল।[৩৩] ভূদেবের জীবনীকার পুত্র লিখেছেন যে কর্মক্ষেত্রে নিম্নবর্গের লোকেদের সঙ্গে সামাজিক আদান-প্রদান বঙ্কিম পছন্দ করতেন না। তাঁর সম্বন্ধে যাঁরা লিখেছেন, প্রায় প্রত্যেকেই তাঁর ব্যক্তিত্বের কঠিন আবরণের কথা উল্লেখ করেছেন, যার ফলে কেউই নিজেকে তাঁর সমকক্ষ ভাবতে পারতেন না।[৩৪] তিনি নিজেও বলেছেন যে কর্মস্থলের কার্যনির্বাহের পর তাঁর সাহিত্যসাধনা ছিল, তাই তাঁর গল্প-গুজবের সময় ছিল না এবং সেই কারণেই বাঙালি সমাজের কর্মনাশা আড্ডাবাজদের আগমন তিনি পছন্দ করতেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। তার জন্য তিনি অপদার্থ নাম কিনতেও রাজী ছিলেন।[৩৫] তবে "আত্মগর্বী" বলে তাঁর খ্যাতি এত যুক্তিপূর্ণ সুবিবেচনার ফল কিনা তাতে সন্দেহ আছে। সমালোচনা তিনি সহ্য করতে পারতেন না, এবং শোনা যায় যে তাঁর বিখ্যাত গান 'বন্দেমাতরম্'কে অপছন্দ করায় তিনি বন্ধুদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন।[৩৬]

অনেকে মনে করেন যে মানসিক দুর্বলতাই তাঁর স্পর্শকাতরতার মূল কারণ। তাঁর শরীর, মন, দুইই ছিল দুর্বল। সে যুগে তাঁর মত উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে ঘোড়ায় চড়া শিখতেই হত, কিন্তু তিনি শেখেননি, এবং সারাজীবন তিনি পাহাড়-পর্বত এড়িয়ে চলেছেন।[৩৭] নিজের শারীরিক দুর্বলতা সম্বন্ধে বোধহয় তিনি অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন, তাই দিনে চারটি মুরগী ও আটটি ডিম দিয়ে নিজের জন্য এক অবিশ্বাস্যরকম খাদ্যতালিকা তৈরি করেছিলেন।[৩৮] তাঁর ধারণা হয়েছিল যে দুর্বল শরীরে তিনি যত পরিশ্রম করেন তার জন্য তাঁর প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন। বার বার নৈতিক সাহস দেখাতে গিয়ে নিশ্চয়ই তাঁকে অনেক ক্ষতিস্বীকার করতে হয়েছে, কিন্তু বোধহয় নৈতিক সাহস দেখিয়েই তিনি শারীরিক দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ করতে চেয়েছেন। ইংরাজদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ইতিহাসে দেখা গেছে যে কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, বার বারই তাঁকে অপমানের জ্বালা সইতে হয়েছে। তাতে তাঁর বিশেষ ক্ষতি হয়েছিল। বঙ্কিম নিজেকে সামান্য কর্মচারী বলতেন এবং জানতেন যে "সাহেবরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে, বাঙালি, বিশেষত...ক্ষুদ্র চাকুরের কোনও কথারই জোর চলে না।"[৩৯] এই ব্যথার কাঁটা তাঁর মর্মে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল।

উনবিংশ শতকের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালিদের সকলের জীবনেতিহাসেই একটি জিনিস লক্ষ করা যায়, তা হল ইংরাজদের নানারকমের অপমান-অত্যাচার এবং তার প্রতিবাদে বাঙালিদের সাহসিকতা প্রদর্শন। কর্মক্ষেত্রের বাইরে এবং ভিতরে বঙ্কিমের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনে জাতিবৈষম্যের পরিচয় তিনি শৈশবেই পেয়েছিলেন। ছ'বছর বয়সে তিনি মেদিনীপুরে এফ, টিডের বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। টিড পরিবারের সকলেই তাঁকে স্নেহ করত এবং শ্রীমতী টিড নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁকেও হেলিবেরিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান জেলাশাসক মোলেট-এর গৃহে নিয়ে যেতেন। একদিন বিকেলে তাঁকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সাহেব ছেলেমেয়েদের ভিতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে চা-খাবার খাওয়ানো হয়, তারপর থেকে তিনি আর কোনদিন মোলেটদের বাড়ি যাননি।[৪০] তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধের নাম "জাতিবৈর"। জীবনের শুরুতেই তিনি এই অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতায় সচেতন হয়েছিলেন। মোলেটগৃহের অভিজ্ঞতার আগেই তিনি বুঝতে শিখেছিলেন যে তাঁর দেশের লোকেরা সাহেবদের সমীহ করে চলে। একদিন এক শীতের সকালে গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল, কারণ একদল গোরা সেপাই হঠাৎ নৌকো করে নদীর ঘাটে এসে নেমেছে। তাদের আগমনের ফল যে কি ভয়ানক হতে পারে তা কারও অজানা ছিল না, তাই সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল, বঙ্কিম একা ঐ দুর্বৃত্তদের দেখার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। পরবর্তীকালে একটি উপন্যাসে তিনি লিখেছেন: "বাঙালির ছেলেমাত্রেই জুজুর নামে ভয় পায়, কিন্তু এক একটি এমন নষ্ট বালক আছে যে জুজু দেখতে চায়।"[৪১] উনিশ বছর বয়সের মধ্যেই ব্রিটিশদের সঙ্গে তাঁর নানারকম গোলযোগ হয়েছিল। একদিন স্থানীয় জেলশাসক ভুল করে চাটুজ্যেদের অন্তঃপুরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢুকে পড়েছিলেন, বঙ্কিম তাঁকে তিরস্কার করতে ছাড়েননি। ১৮৫৫-য় চুঁচুড়ার জনৈক সৈনিক খেলাচ্ছলে নিজের কুকুরকে বঙ্কিমের ছোটভাই পূর্ণর ওপর ছেড়ে দেওয়ায় বঙ্কিম তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন।[৪২] প্রত্যেক জীবনীকার এই তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং উল্লেখযোগ্য মনে করেছেন। জীবনীকারদের মধ্যে দুজন বঙ্কিমের আত্মীয়। তাই মনে হয়, এইসব ঘটনার স্মৃতি পরিবারের ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সাহসিকতার সঙ্গে জাতিবিদ্বেষের প্রতিবাদের কাহিনীগুলি আধুনিক ভারতের কিংবদন্তীর বিশিষ্ট ধারায় পরিণত হয়েছে। এইরকম আরও অনেক ঘটনার উদাহরণ আছে। যেমন, দুজন মাতাল সাহেব বঙ্কিমকে রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে গায়ের জোরে বের করে দিয়েছিল। এই ঘটনার পরে তিনি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বাঙালিদের দ্বিতীয় শ্রেণী পরিহার করে চলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কারণ ব্রিটিশদের মধ্যে নিম্নমানের লোকেরাই দ্বিতীয় শ্রেণীতে চলাফেরা করত। প্রসঙ্গক্রমে বহরমপুর ছাউনির অধিকর্তা কর্নেল ডাফিন-এর কুখ্যাত ঘটনাটিও উল্লেখযোগ্য। ঐ কর্নেল বন্ধুদের নিয়ে মাঠে ক্রিকেট খেলছিলেন, সেই সময়ে মাঠের পাশ দিয়ে পাল্কি চড়ে গিয়েছিলেন বলে তিনি বঙ্কিমকে দৈহিক আঘাত করেন। অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় ডাফিন প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন যে তিনি বঙ্কিমকে চিনতে পারেননি। অর্থাৎ সাধারণ ভারতবাসীকে আঘাত করা তিনি অন্যায় বলে মনে করেননি। শোনা যায় যে বঙ্কিম বলেছিলেন, দৈহিক শক্তি বেশি থাকলে তিনিও আঘাত করেই তাদের প্রত্যুত্তর দিতেন। এই ঘটনা বলবার সময়ে বঙ্কিমের ভাগিনেয় কৈলাস বাঙালিদের ব্যায়াম করে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করার উপদেশ দেন, কারণ আদালতে ইউরোপীয়দের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের আশা করা বৃথা।[৪৩]

যে বিদেশী শাসক শ্রেণীর ঘৃণা প্রতিনিয়ত ভোগ করতে হত, জীবিকার জন্য তাদেরই অধীনে এবং মতানুসারে কাজ করতে হত, এটাই ছিল সেই যুগে তাঁর শ্রেণীর সকলের মতই বঙ্কিমের জীবনের দ্বন্দ্বের মৌলিক কারণ। নিজের মত অন্যান্য বাঙালিকে তিনি "ক্ষুদ্র চাকুরে" বলে উল্লেখ করেছেন এবং সেই চাকরির জন্য তিনি নিরন্তর মনোবেদনা ভোগ করেছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই এই তিক্ত, ঘৃণ্য বিশেষণে ভূষিত ছিলেন। তাঁর পিতা এবং জ্যেষ্ঠতাত কোম্পানির অধীনে কাজ করতেন; চার ভাইয়ের সকলে এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। দুই ভাই, এমনকি বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন সঞ্জীবচন্দ্রও সামান্য কেরানিরূপে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রিয়পাত্র ভাইপো যতীশ পুলিশ ইন্সপেক্টর হয়েছিলেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন পরিদর্শক পোস্টমাস্টার এবং কালিনাথ দত্ত ছিলেন বড়বাবু।[৪৪] অপছন্দের কারণ হলেও, দাসত্বের চিহ্ন আবার আভিজাত্যের প্রতীক বলেও গণ্য হত। সরকারি কাজে দক্ষতার জন্য বঙ্কিমের পিতা 'রায় বাহাদুর' খেতাব পেয়েছিলেন। জনৈক জীবনীকার সগর্বে এক সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন: "দক্ষিণ বঙ্গে রায়বাহাদুর বলিতে একমাত্র যাদব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেই বোঝায়।"[৪৫] বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের ঐ খেতাব পাওয়া সম্পর্কে বঙ্কিম মন্তব্য করেছিলেন: "এই উপাধি যিনি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি আপনাকে কতদূর কৃতার্থ মনে করেন বলিতে পারি না।"[৪৬] তবু, আশ্চর্য এই যে, বন্ধুর বইয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখবন্ধে তিনি অনেকটা দেখাবার মত করেই এই উপাধি ব্যবহার করেছেন।[৪৭] সেই যুগে বিদেশী শাসকের অধীনে কাজ করার অপমান এবং গৌরববোধের বিভাজক রেখাটি স্পষ্ট ছিল না। এমনকি বঙ্কিমের কাছেও, একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট "ক্ষুদ্র চাকুরে" হলেও, একজন হাইকোর্টের বিচারককে তিনি ক্ষুদ্র মনে করতেন না ;[৪৮] অর্থাৎ পদমর্যাদা যথেষ্ট উচ্চ হলে লজ্জা বা অপমানবোধ লোপ পেত।

বারংবার ওপরওয়ালাদের সঙ্গে বিরোধ হলেও আমলাতন্ত্রে বঙ্কিমের যথেষ্ট পদোন্নতি হয়েছিল। বেতন এবং পদমর্যাদায় পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে জীবন শুরু করে তিনি বারো বছরের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিলেন। প্রত্যাশিত প্রথম শ্রেণীতে উঠতে তাঁর আরও চোদ্দ বছর লেগেছিল।[৪৯] অবসর গ্রহণের পরে নিয়মমাফিক তাঁর নাম সম্মানিতদের তালিকায় উঠেছিল, কিন্তু জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা প্রৌঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে বোধহয় 'সি. আই. ই.' এবং "রায়বাহাদুরের" যৌথ সম্মান গৌরবের বদলে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিদেশী শাসনের অধীনে ভারতের বাস্তব অবস্থার সমীক্ষায় নিজের পরিমিত কৃতিত্বের চেয়ে অপমানকর পরিস্থিতিগুলিই বঙ্কিমের মনে বেশি গভীর রেখাপাত করেছিল। অতিমাত্রায় আত্মসচেতন হওয়ায় বাঞ্ছিত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ সম্বন্ধে তিনি দোটানায় পড়েছিলেন এবং পিতার নির্দেশের প্রতি বিশেষ মূল্য না দিয়েই মত পরিবর্তন করেছিলেন।[৫০] ভাগ্যে কৈলাস যদি ঠিক ঠিক লিখে থাকেন তবে বলা যায় যে আমলাতন্ত্রে ঢোকার প্রথম দিনটি থেকেই তিনি অস্বস্তিতে পড়েছিলেন, কারণ ইউরেশিয় কেরানিরা কৌশলে প্রয়োজনীয় ফাইলগুলি তাঁর হাতে পৌঁছতে দিত না।[৫১] অলাভজনক নীলচাষে অস্বীকৃত চাষী এবং জমিদারদের জব্দ করতে যারা নীলকরদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিল, চাকরির তৃতীয় বছরে বঙ্কিমকে সেই দুরাত্মা নীলকর মরেল ও তার মেজসাহেব ডেনিস হেলির মোকাবিলা করতে হয়েছিল। এই ঘটনায় ঔপনিবেশিক শাসনে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের স্বরূপটি তাঁর সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। কারণ ছোটলাট জে. পি. গ্রান্ট এবং চাষীদের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য নিযুক্ত ব্রিটিশ বিশেষ কমিশনার, উভয়েই মরেলকে আদর্শ নীলকর বলে প্রশংসা করেছিলেন। একজন জীবনীকার লিখেছেন যে হেলি বঙ্কিমকে বিরাট অঙ্কের ঘুষ দিতে চেয়েছিলেন এবং বঙ্কিম অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁর প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিলেন। চন্দ্রশেখর উপন্যাসের দুর্বৃত্ত ইংরাজ ফস্টারের চরিত্র বোধহয় এই ভাগ্যান্বেষী দুর্বৃত্তের চরিত্র অবলম্বনে সৃষ্ট হয়েছিল। শেষপর্যন্ত অবশ্য হেলি এবং মরেল দুজনকেই শাস্তিভোগ করতে হয়েছিল, এবং বঙ্কিমও সরকারের তরফ থেকে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।[৫২] নীলকরদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই ব্রিটিশ ন্যায়বিচারের স্বরূপ তিনি বুঝেছিলেন, পরে যে সরকারের তরফে তার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা হয়েছিল, তা তাঁর মনে বিশেষ রেখাপাত করেনি।

কর্মজীবনের প্রথম কয় বছরে তাঁর যে বিরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা তাঁর মনে এক স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং আমলাজীবনে বার বার তারই অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছিল। বাকল্যান্ড, মেকলে, ওয়েস্টম্যাকট, বেকার—প্রভৃতি ওপরওয়ালা ব্রিটিশ জেলাশাসকদের সঙ্গে তাঁর প্রায় নিরবচ্ছিন্ন বিরোধ লেগেই থাকত। বেশ কয়েকবার তাঁর মনে হয়েছিল যে তাঁকে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ ছিল অপরাধীর, বিশেষত পুলিশের দুষ্কার্যের লঘুদণ্ড। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানতেন যে পুলিশ অত্যন্ত অত্যাচারী এবং তাদের বিবৃতি বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু ইংরাজ জেলাশাসকগণ তা মানতে চাইতেন না। একটি স্মরণীয় ঘটনায়—দাহ্যবস্তু দিয়ে ঘরের চাল তৈরি করা চলবে না, গৃহনির্মাণ আইনের এই নিয়ম ভঙ্গ করার অভিযোগে এক নিরক্ষর বৃদ্ধাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বাংলায় আদেশ জারী করবার সময়ে জ্বলীয় (দাহ্য) না লিখে ভুল করে জলীয় (তরল) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। নিরক্ষর বৃদ্ধার কাছে অবশ্য সংস্কৃত শব্দ দুটির কোনটিরই অর্থ বোধগম্য ছিল না। "শুকনো পাতা কোনক্রমেই 'জলীয়' হতে পারে না" এই মন্তব্য করে বঙ্কিম মামলার নিষ্পত্তি করে দেন। বাকল্যান্ড এই ঘটনাকে "বিদ্যা জাহির করার অসহ্য উদাহরণ" বলে মন্তব্য করেন, আরও বলেন যে "বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙলা ভাষাজ্ঞানের অহঙ্কারে এই বিচার অন্যায় হয়েছে।"[৫৩] বঙ্কিম যেসব সাহেবকে অপদার্থ এবং মূর্খদের তালিকাভুক্ত করেছিলেন, তাদের সকলেরই একটি বিশেষ লক্ষণ হল এই যে তারা ভাবে তারা স্থানীয় ভাষা আয়ত্ত করেছে। এই ধারণা হয়ত তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই গড়ে উঠেছিল।

অন্তত দুবার তিনি ওপরওয়ালার কোপে পড়েছিলেন বলে মনে হয়, বঙ্কিমের নিজেরও সে রকমই ধারণা হয়েছিল। প্রথম ক্ষেত্রে গণ্ডগোলের কারণ ছিল সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল্যায়ন। দ্বিতীয় ঘটনায় একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নিকট মাথা হেঁট করতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁকে বেশ কিছুকাল যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সহসচিব নিযুক্ত হন। উপযুক্ত বাঙালি কর্মচারীদের উৎসাহদানের উদ্দেশ্যেই ওই পদটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। পাঁচ মাস পূর্ণ হবার আগেই—১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি—মাত্র এক ঘণ্টার সময় দিয়ে তাঁকে কার্যভার হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়। বাহ্যত পদটি বিলুপ্ত করা হয়, কিন্তু আসলে অন্য নাম দিয়ে ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। 'বঙ্গদর্শনে' 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অংশবিশেষ প্রকাশিত হওয়ার ফলেই তাঁকে এই শাস্তি পেতে হয়েছিল বলে মনে হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত, ১৮৮২সালের জানুয়ারি মাসে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত এই উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেশপ্রেমী বিদ্রোহীদল কর্তৃক এক লম্পট সেনাপতি পরিচালিত ব্রিটিশ বাহিনী বিধ্বস্ত হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল। এই অধ্যায়টি প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই আচমকা তাঁকে উচ্চপদ থেকে অপসারিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার সময় এই উপন্যাসের আপত্তিজনক অনুচ্ছেদগুলি তিনি বাদ দিয়েছিলেন।[৫৪]

বাদামী চামড়ার কোন চাকুরেই ব্রিটিশ শাসনে যথাযথ ব্যবহার আশা করতে পারে না, এই বিশ্বাস বঙ্কিমের বদ্ধমূল ছিল। যোগ্যতার পুরস্কার হিসাবে যে বন্ধু দীনবন্ধু শুধুমাত্র এক বিতর্কিত সাম্মানিক উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন, বঙ্কিমের মতে তার কারণ "দীনবন্ধু বাঙালি-কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" তিনি লিখেছেন যে দীনবন্ধু "যদি বাঙালি না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেক দিন পূর্বেই তিনি পোস্টমাস্টার জেনারেল হইতেন, এবং কালে ডাইরেক্টর জেনারেল হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন শতবার ধৌত করিলেও অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহস্র গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না।" শেষপর্যন্ত যে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীর বেতন দেওয়া হয়েছিল, তার কোনই মূল্য ছিল না, কারণ "কালসাহায্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন চতুষ্পদ জন্তুদিগেরও প্রাপ্য হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রথম-শ্রেণীভুক্ত গর্দ্দভ দেখা যায়।"[৫৫] দাদা সঞ্জীবচন্দ্রের কর্মজীবন প্রসঙ্গেও তাঁর এমনই অনেক তিক্ত মন্তব্য আছে। একটি পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে কিছু গণ্ডগোল হওয়ায় সঞ্জীবচন্দ্রকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদটি খোয়াতে হয়েছিল।[৫৬] কিন্তু বঙ্কিমের ধারণা হয়েছিল যে সঞ্জীবের রসিকতায় একজন বিচারক ক্ষুব্ধ হওয়াতেই তাঁর চাকরি গিয়েছিল।[৫৭] বঙ্কিম অবশ্য ঐ ঘটনাটির উল্লেখ করেননি, কিন্তু বার্টন নামক একজন কালেক্টরের হাতে দাদার হেনস্থার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ; "একজন নরাধম ইংরাজ...ভারতে আসিয়া বার্টনের একমাত্র ব্রত ছিল—শিক্ষিত বাঙালি কর্মচারীকে কিসে অপদস্থ ও অপমানিত করিবেন বা পদচ্যুত করাইবেন, তাহাই তাঁহার কার্য।"[৫৮] ১৮৮২ সালে উড়িষ্যার দুর্গম ও বসবাসের অনুপযোগী জাজপুরে নিজের বদলি হওয়ার ঘটনাকেও তিনি শাস্তি বলে মনে করেছিলেন। এই শাস্তির কারণ, তাঁর মতে, "একটা সেলাম লঙ্ঘনের ফল"—একদিন বিকেলে কলকাতার ইডেন উদ্যানে বিভাগীয় কমিশনার মনরোকে তিনি সেলাম ও শুভেচ্ছা জানাতে ভুল করেছিলেন।[৫৯] তাঁর জীবনীকার শচীশ লিখেছেন যে ইউরোপীয়দের প্রকাশ্য বিরোধিতার জন্যই তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত করার প্রস্তাবটি বানচাল হয়ে গিয়েছিল।[৬০]

সরকারি চাকরির বিরূপ অভিজ্ঞতার মধ্যে কেচিৎ কোন ইংরাজ কর্মচারীর সৌহার্দ্য তাঁর আনন্দ ও সুখের কারণ হয়েছিল। চাকরিতে ঢোকার আগে স্কুল-কলেজে ইউরোপীয় শিক্ষকদের কাছেও তিনি ভালবাসা ও সহৃদয়তা পেয়েছিলেন। জেল-শাসকের বাড়ির অপ্রীতিকর ঘটনা সত্ত্বেও বালক বঙ্কিমের টিডের বাড়ি যাওয়া-আসা অব্যাহত ছিল। হুগলি কলেজে তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে সাতজন ছিলেন ইউরোপীয়। বঙ্কিম সম্বন্ধে তাঁদের খুবই উচ্চ ধারণা ছিল।[৬১] পরে, যশোর-খুলনায় কর্মজীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝাময় দিনগুলিতে যশোরের জেলাশাসক বেনব্রিজের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং বেনব্রিজ সবসময়েই তাঁর অধীনস্থ বিপর্যস্ত তরুণ কর্মচারীকে সমর্থন করে চলতেন। দুর্বৃত্ত নীলকরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকেও বঙ্কিমকে প্রশংসা জানানো হয়েছিল। এছাড়া, ১৮৮০-১ সালে বর্ধমানে স্বল্পকালীন কর্মজীবনে তিনি সেখানকার তরুণ সহ-শাসক এইচ এ ডি, ফিলিপস্-এর সৌহার্দ্য লাভ করেছিলেন। আরও অনেক উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। যে ঘটনা প্রসঙ্গে বাকল্যান্ড বিরক্ত হয়েছিলেন, ছোটলাট স্যার অ্যাশলি ইডেন কিন্তু সে ব্যাপারে বঙ্কিমকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁর অনুরোধেই স্যার অ্যাশলি পূর্ণকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বহাল করেছিলেন। সামান্য সরকারি কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও ছোটলাট স্যার চার্লস এবং তাঁর পত্নী লেডি এলিয়ট বঙ্কিমের ব্যক্তিগত সুহৃদ ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশ লিখেছেন যে লেডি এলিয়টের অনুরোধে বঙ্কিম তাঁকে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদের একটি পাণ্ডুলিপি উপহার দিয়েছিলেন।[৬২] কর্মজীবনে যেসব ব্রিটিশ কর্মচারী তাঁর প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার করেছিলেন, বোধহয় তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্যই ব্যঙ্গরচনায় তিনি কয়েকটি সচ্চরিত্র, সদাশয় ইংরাজ চরিত্রের অবতারণা করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকবারই তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে আইনজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত কেন যে তা করেননি তা সঠিক জানা যায় না। সম্ভাব্য কারণ হিসাবে তাঁর বিরাট অর্থনৈতিক দায়িত্বের কথা মনে করা যেতে পারে। "জীবনের অভিশাপের" বোঝা নামাতে না পারার জন্য সর্বদা যে অশান্তি তিনি ভোগ করেছেন, অহঙ্কারী, আত্মসচেতন, বঙ্কিমের পক্ষে তা নিশ্চয়ই খুবই অপমানজনক বোধ হত। ঋণগ্রস্ত কর্মচারীর প্রতি ব্রিটিশ প্রভু বিরক্ত হতে পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র যতীশকে ঋণমুক্ত থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন : "চাকরি রক্ষা করা সর্বাগ্রে কর্তব্য। নচেৎ অন্ন জুটিবে না।" যতীশ যখন প্রথম চাকরি পেলেন, তখন বঙ্কিম তাঁকে সাতটি 'বিশেষ উপদেশ' দিয়েছিলেন, তার মধ্যে তৃতীয়টি ছিল "উপরওয়ালাদিগের আজ্ঞাকারিতা, তাঁহাদের নিকট বিনীত ভাব" এবং তর্কাতর্কি পরিহার। তিনি লিখেছেন, "ঐ সাতটি গোল্ডেন রুল বিবেচনা করিবে। ইহার অনুবর্তী হইলে মঙ্গল ঘটিবে।" উপদেশাবলীর প্রথমটি ছিল "সত্য ভিন্ন মিথ্যা পথে যাইবে না"। এক্ষেত্রেও উপরওয়ালার সন্তুষ্টি বিধানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেই সন্তুষ্টিবিধানই সততা রক্ষার একমাত্র না হলেও অন্যতম কারণ।[৬৩]

সরকরি চাকুরেরূপে চাকরি বজায় রাখা এবং তার জন্য আমলাদের বিরাগভাজন না হওয়ার স্বতঃপর প্রচেষ্টা বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বের একটি বিশিষ্ট দিক ছিল এবং সেটা তাঁর বিরক্তিরও অন্যতম কারণ ছিল।[৬৪] 'আনন্দমঠ' প্রসঙ্গে সরকারের বিরক্তি অপনোদন করার জন্য তাঁকে রীতিমত কষ্ট করতে হয়েছিল। ধারাবাহিক প্রকাশনার সময়ে যেখানে "ইংরাজ এবং মুসলমানদের" আক্রমণ করার জন্য স্বদেশী নেতাদের আহ্বান ছিল, পুস্তকাকারে প্রকাশনের প্রথম সংস্করণে সেখানে 'ইংরাজ' কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু, তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে একমাত্র 'আনন্দমঠের' প্রথম সংস্করণে কাহিনীর সারাংশ মুখবন্ধে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, এবং "বিজ্ঞাপনে" লেখা হয়েছে, "ইংরাজরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" দ্বিতীয় সংস্করণে সাঁওতাল রমণীদের প্রতি ক্যাপ্টেন টমাসের লুব্ধ দৃষ্টির প্রসঙ্গ উহ্য রাখা হয় এবং কিছুটা ওপরপড়া হয়েই যোগ করা হয় যে উনবিংশ শতকের উত্তরসূরীদের তুলনায় অষ্টাদশ শতকের ইংরাজরা নিম্নমানের ছিল। কিন্তু এতেও শেষ নয়। একজন উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী, সম্ভবত স্বয়ং ছোটলাট, বইটি যে রাজদ্রোহমূলক নয়, এই মর্মে একটি প্রমাণপত্র ইংরাজদের বিশ্বাসভাজন কেশব সেনের কাছ থেকে বঙ্কিমকে আনতে বলেছিলেন। অন্যথায় বইটিকে বাজেয়াপ্ত করা হবে, অথবা আরও কঠোর কোনও শাস্তি দেওয়া হবে। সম্ভবত কেশব সেনের 'লিবারেল' পত্রিকায় অনুরূপ একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল, অন্ততপক্ষে ছোটলাটকে পাঠানো হয়েছিল। কেশবের ভাই পত্রিকায় বইটির বিশদ সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন। 'আনন্দমঠ'-এর পরবর্তী সব সংস্করণে ঐ সমালোচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছিল।[৬৫] বন্ধুদের কাছে বঙ্কিম বলেছিলেন যে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠা রমণী ঝাঁসীর রানীকে নিয়ে তাঁর একটি উপন্যাস লেখবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু "এক আনন্দমঠেই সাহেবরা চটিয়াছে, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না!"[৬৬] রুশ প্রাচ্যবিশারদ মিনায়েভ কলকাতা পরিদর্শনে এসে ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার নিয়ে বাংলায় কোনও বই লেখা হয়েছে কি না জানতে চেয়েছিলেন। তদুত্তরে বঙ্কিম বলেছিলেন যে মনের ভাব প্রকাশ করার সাহস কারও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই।[৬৭] ঔপনিবেশিক শাসনে পরাধীন এলিট গোষ্ঠীর সকলের মতই বঙ্কিমের নিজেরও সেই সাহস ছিল না। তাঁকে অযাচিতভাবে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করা হলে একটি পত্রিকা মন্তব্য করেছিল যে তাঁর এই উপাধি প্রত্যাখ্যান করা উচিত, সেইসঙ্গে একথাও লিখেছিল যে "ইংরাজ রাজার নিকট তিনি এরূপ তেজের কথা বলিতে পারেন না, কারণ তিনি ইংরাজের কর্মচারী।"[৬৮] বোধহয় সেখানেই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ট্র্যাজেডি এবং এই বোধ নিয়েই তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক জগতের মূল্যায়ন করেছিলেন।

ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে জাতিবৈষম্যের অপ্রতিহত প্রকাশ ঊনবিংশ শতকের ব্রিটিশ-ভারত সম্পর্ককে বিশেষ রকম প্রভাবিত করেছিল। শেক্সপীয়র-আওড়ানো শিক্ষিত, রাজদ্রোহী বাঙালিই প্রধানত শাসক শ্রেণীর বিরক্তি ভাজন ছিল। ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের পত্র-পত্রিকায়—বিশেষত 'ইংলিশম্যান' জাতীয় পত্রিকায় যে গালিগালাজের ফোয়ারা ছুটত তা বাস্তবিকই বিরক্তিকর ছিল। তার ওপর আবার সেই গালিবর্ষণের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া বাঙালি বাবুদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। জাতিবৈষম্যের এই সরব এবং নির্বোধ প্রকাশগুলিকে বঙ্কিম তাঁর ব্যঙ্গরচনায় বহুবার ব্যবহার করেছেন। কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে যখন কুখ্যাত নীলকর মরেল নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে একজন স্থানীয় জমিদারকে আক্রমণ করল, তখন 'ফ্রেন্ড অব্ ইন্ডিয়া' পত্রিকায় লেখা হলো যে "বেচারা পুলিশ প্রহরার জন্য ব্যর্থ আবেদন করে নিজেই আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছে।" পরে ঐ কাগজে লেখা হয়েছিল যে "আইন, আদালত এবং পুলিশের রক্ষণাবেক্ষণে বঞ্চিত হয়ে ইংরাজেরা সর্বত্রই যা করে থাকে, ঐ নীলকর সেভাবেই নিজের হাতে আইন তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে।" অপরাধীর পক্ষে নিজেকে নিগৃহীতরূপে উপস্থাপন করা বঙ্কিমের বিখ্যাত ব্যঙ্গাত্মক রচনা ব্র্যাননিজম্-এর প্রধান বিষয়বস্তু।[৬৯] নীলকর সমিতি বড়লাট ক্যানিং-এর কাছে এই মর্মে আবেদন করে যে, নীলকরদের ক্ষতি হবেই এমন কোন পথ নিতে তিনি যেন ছোটলাট স্যার জন পিটার গ্র্যান্ট-কে নিরস্ত করেন। এই আবেদন ক্যানিং-এর অসম্মতি, এবং নীলকরদের বাড়াবাড়ি বন্ধ করবার জন্য গ্র্যান্ট-এর নিরন্তর প্রচেষ্টাকে কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা স্বাগত জানিয়েছিল। এই ঘটনা থেকে ঔপনিবেশিক যুগের লেখকরা তাদের একঘেয়ে বিষয়বস্তু—'ভাল' এবং 'মন্দ' ইংরাজের উপাদান পেয়েছিলেন। বঙ্কিমের রচনাতেও এর অন্যথা হয়নি।

অবশ্য বঙ্কিমের ব্র্যানসনিজম্ 'মন্দ' ইংরাজের চূড়ান্ত নিদর্শন। জাতিবৈষম্যে বিশ্বাসী যে সব ইংরাজ বিচারক্ষেত্রে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রজাদের সমতা আনার সরকারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল, এরা তারাই। বৈষম্যনিরোধক আইনকে আন্দোলনকারীরা 'কালা কানুন' নাম দিয়েছিল। এই ধরনের দুটি আন্দোলন বঙ্কিম প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৮৫০ সালে ভারতস্থিত ব্রিটিশ অপরাধীদের ভারতীয় বিচারালয়ের আওতায় আনার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলনটি হয়েছিল। বঙ্কিমের স্নাতক হওয়ার আগের বছর, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে "সকল ব্রিটিশ প্রজার বিচারে সমতা আনার উদ্দেশ্যে" প্রস্তাবিত আইনের জন্য কলকাতার নাগরিকগণ সরকারকে অভিনন্দিত করেছিল।[৭০] দ্বিতীয়টি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ইলবার্ট বিল-বিরোধী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দোলন—যে বিলে ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট এবং মফঃস্বলের নিম্ন আদালতের বিচারকদের ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচারের অধিকার দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন জাতিবৈষম্যের উগ্র সমর্থক, ব্যারিস্টার ব্র্যানসন। সঙ্গত কারণেই সে যুগের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বঙ্কিম যাকে জাতিবৈর বলেছেন, তার স্বরূপটি হৃদয়ঙ্গম করেছিল।

অপ্রতিহত জাতিবৈষম্য কেবলমাত্র নীলকরদেরই একচেটিয়া ছিল না। সাহিত্যিক জীবনে বঙ্কিম রেভারেন্ড হেস্টির মত একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির অশোভন জাতিবৈষম্যমূলক উক্তির প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন। রেভারেন্ড হেস্টি ছিলেন স্কটিশ জেনারেল মিশনারি বোর্ড পরিচালিত জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউসনের অধ্যক্ষ। শোভাবাজার রাজপরিবারের গৃহে এক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে কলকাতার বিশিষ্ট হিন্দু ভদ্রলোকদের উপস্থিতিতে ঘটনাটি ঘটেছিল। কলকাতার 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজে ঐ সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের বিবরণ দেখে উক্ত স্কচ ধর্মযাজক মর্মাহত হয়েছিলেন। পরিবারের গৃহদেবতা গোপীনাথকে সভায় সর্বসমক্ষে রাখা হয়। উচ্চশিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকরা পৌত্তলিকতার এই ঘৃণ্য প্রকাশ মেনে নিয়েছে দেখেই হেস্টি সন্ত্রস্ত বোধ করেছিলেন। "শোকাহত পরিবারের মনে কোনরকম আঘাত না করে" নিজের মনের বিরক্তি তিনি 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় একটি চিঠির মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে রাজপরিবারের গৃহদেবতা "এক জড়পুত্তলী, অমার্জিত লোকের চোখে মনোহারী করবার জন্য তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে চাকচিক্যময়" করে রাখা হলেও তা প্রাচীন মার্বেলের মতই, "জড় পেরেকের মত নিষ্প্রাণ," এবং "সমাগত সাড়ে তিনহাজার মহিলার পক্ষে, সৌভাগ্যক্রমে, জীবন্ত দেবতার তুলনায় তাঁর অনিষ্ট করার ক্ষমতা কিছুই নেই।" "হিন্দু সমাজের বিশিষ্ট বন্ধুরূপে" তিনি "পৌত্তলিকতার পাপের" বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন বলে মনস্থ করেন, তবে "খ্রিস্টধর্মাবলম্বীর ঔদার্য এবং সহিষ্ণুতা" অবলম্বন করেই তিনি সংগ্রাম করবেন।[১১] বলা বাহুল্য, পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে এর প্রতিবাদে 'স্টেট্‌স্‌ম্যানে' বহু চিঠি প্রকাশিত হয়। প্রতিবাদীদের মধ্যে বঙ্কিমও ছিলেন। তিনি প্রথমে ছদ্মনামে লিখে পরে পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন। এই চিঠিগুলি পরে "জ্ঞানদীপ্ত ইংরাজ এবং হিন্দু পৌত্তলিকতা" (English Enlightenment and Hindoo Idolatry) এই গভীর অর্থবহ শিরোনামে হেস্টি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিশিষ্ট গ্রন্থটিতে পৌরাণিক দেবদেবী সম্বন্ধে ধর্মযাজকদের প্রচলিত মতামত ব্যক্ত হয়েছে—কালী তাদের মতে বীভৎস, শিবলিঙ্গ অশ্লীল, গণপতি হাস্যকর, এবং কৃষ্ণ বলা বাহুল্য, লম্পট।[১২] "জান্তব ব্যাভিচার, অর্থহীন ক্রিয়াকলাপ, ন্যক্কারজনক অপবিত্রতা এবং ভয়ঙ্কর বর্বরোচিত বলিদান"[১৩]-কেই তাঁরা হিন্দুধর্ম বলে দেখেছিলেন। এই হীন পৌত্তলিকতার ফলেই হীনম্মন্য কাপুরুষ, বিবেকহীন প্রতারক, পশ্বাধম অলস, কদর্য গায়ক, চরিত্রহীন মেয়েমানুষ এবং লম্পট পুরুষের দল সৃষ্টি হয়েছিল। একমাত্র খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেই এই পতিত জাতি উদ্ধার পাওয়ার আশা করতে পারে।[১৪] সৌভাগ্যক্রমে কোনও কোনও ক্ষেত্রে আশার আলো দেখা গিয়েছিল। যেমন, পলাশীর যুদ্ধের পর শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিম অপশাসনের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে বলে বাঙালি হিন্দুদের মুখে মুখে ইংরাজের জয়গান শোনা যাচ্ছিল।[১৫] 'ইংরাজদের ন্যায়পরায়ণতা', 'নবোত্থিত শক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরাজেয়তা” ‘ইংরাজদের জ্ঞানদীপ্তি’ ‘ইউরোপের শক্তিমান বিদ্বজ্জন’ প্রভৃতির বহুল উল্লেখ লক্ষণীয়।[৭৬] ওই পত্রাবলী যে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তার নামের মধ্যে দিয়েই হেস্টি ব্রিটিশ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছেন। ভারতকে সভ্য করার মহান আদর্শ, আনাড়ি প্রাচ্যবিদ্‌দের অজ্ঞতা ইত্যাদি বঙ্কিমের ব্যঙ্গ-রচনার পছন্দসই বিষয় ছিল। যে কোনও প্রহসন-রচয়িতার কাছেই হেস্টির ঢক্কা-নিনাদ আশাতীত লাভ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পর্কে বঙ্কিমের মানসিক উত্তেজনা তাঁর জীবনধারাতে প্রতিফলিত হয়েছিল। সমসাময়িক অনেকের মতই ইউরোপীয় জীবনযাত্রার অনেক রীতিনীতি তিনিও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কলকাতার বাড়ির বৈঠকখানার বিবরণ দিতে গিয়ে সুরেশ সমাজপতি লিখেছেন : “ঘরের মেঝেয় সুচিত্রিত কার্পেট পাতা। প্রাচীরে অয়েল পেন্টিং। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃদেবতা ও তাঁহার নিজের ছবি, কৌচ কেদারা প্রভৃতি সুন্দর ও সুবিন্যস্ত। এক কোণে একটি টেবিল হারমোনিয়ম।”[৭৭] সংক্ষেপে বলা যায় যে তাঁর ঘরের চেহারায় পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন বা সিভিলিয়ান ভারতীয়ের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি ‘ধর্মতত্ত্ব’ লিখেছেন, কিংবা নিবেদিত-প্রাণ ‘সন্তানদের’ সন্ন্যাসব্রতের গুণগান করেছেন, তাঁর মানসিকতার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। “নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী” নামক একটি অসমাপ্ত রচনায় তিনি একবারই মাত্র “একটু রোস্ট মটন প্লেটে করিয়া, ছুরি কাঁটা দিয়া” সেরি (Sherry) সহযোগে দুই ভাইয়ের আহারের বৃত্তান্ত ব্যঙ্গ না করেই উল্লেখ করেছেন।[৭৮] একসময়ে তিনি নিজেও ছুরি-কাঁটা নিয়ে পাশ্চাত্য প্রথায় খাওয়ার রীতি গ্রহণ করেছিলেন, শুধু তাই নয়, দেশীয় রীতিতে হাত দিয়ে খাওয়াকে অসভ্যতা বলতেন। একদিন ঐসব বিদেশী হাতিয়ার নিয়ে অবাধ্য কৈ মাছ সামলানোর বৃথা চেষ্টা দেখে স্ত্রীর ঠাট্টায় তাঁর চৈতন্যোদয় হল। ঐ সময়ে সর্ববিষয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণের প্রবণতা কমে আসছিল, এবং সেই পরিবর্তনকে বঙ্কিমও স্বাগত জানিয়েছিলেন। একজন উঠতি লেখককে তিনি বলেছিলেন : “যা নিজের হয়ে দেখা দেবে, তাই তোমার স্টাইল। অন্যের মত করে লিখতে যেও না। তাতে দুকূল যাবে, আমাদের সাহেব হবার মত।”[৭৯] হিন্দু ঐতিহ্যের উপর জোর দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে গোঁড়া বলা যাবে না। ১৮৮৫-তে নিরামিষাশী হবার আগে পর্যন্ত নিষিদ্ধ খাদ্য খেয়েছেন এবং সারাজীবনই পরিমিতভাবে মদ্যপান করেছেন।[৮০] হিন্দু ধর্মে যে তাঁর আস্থা ফিরে এসেছিল তা ঐ ধর্মের আচারনিষ্ঠার জন্য নয়, বরং তার দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধায়। স্বাজাত্যবোধ বলতে তিনি আত্মমর্যাদার উপর জোর দিয়েছেন, এবং বলা বাহুল্য যে স্বাজাত্যাভিমান বজায় রাখতে গেলে বিদেশী আদবকায়দা অনুকরণ করা চলে না। জনৈক বিলাত-ফেরত বাঙালি চিঠিতে তাঁকে ‘মিঃ বঙ্কিমচন্দ্র’ বলে সম্বোধন করেছিলেন। বঙ্কিম উত্তরে লেখেন, “এ বাড়িতে মিস্টার বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া কোন ব্যক্তি নাই। আপনি বোধ হয়, সে কথা বিস্মৃত হইয়াছেন।”[৮১] স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে স্বাজাত্যবোধ নষ্ট করে দেয় এমন সব বিদেশী রীতিনীতির অনুপ্রবেশ ঠেকিয়ে রাখার আবশ্যিকতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু গ্রহণীয় এবং অগ্রহণীয়র মধ্যেকার সীমারেখাটি সারাজীবনই তাঁর কাছে অস্পষ্ট থেকে গিয়েছিল।

জগৎ-সমীক্ষা এবং যে সব নতুন ভাবধারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারাকে রূপ দিয়েছিল, সেই চিন্তাধারার একটি অংশ ছিল তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা। ইউরোপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বন্ধে তাঁদের অনুভূতি এবং উপলব্ধির উৎস ছিল তাঁদের পঠন, বিশেষত যাঁরা সাহিত্য এবং সামান্য কজন পরিচিত বিদেশীর মাধ্যমে ঐ সংস্কৃতিকে চিনেছিলেন। স্কুল-কলেজে প্রাপ্ত শিক্ষাকে বঙ্কিম স্পষ্টভাষায় 'অসহ্য' বলে নিন্দা করেছেন।[৮২] তাঁর পরীক্ষার ফল দেখে অবশ্য ধারণা হয় যে পাঠক্রম তিনি ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন ; বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় তাঁর পাঠ্যতালিকায় ছিল—অ্যাডিসনের গদ্যরচনা (Prose), পোপের প্রহসন (Satires), জনসনের Rasselas, বেকনের Essays, ড্রাইডেন, সাদি, অ্যাবারক্রম্বির Moral Feelings, কিটলের History of England এবং গণিত, ভূগোল এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বিষয়ে কিছু ধারণা। এগুলির সঙ্গে তিনি ইতিহাস, জীবনীগ্রন্থ এবং সাহিত্য নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছিলেন। ইংরাজি রোমান্টিক সাহিত্যের চেয়ে ক্লাসিকাল সাহিত্যই তাঁর বেশি পছন্দসই ছিল এবং একজন সমালোচকের মতে, গদ্যসাহিত্য পাঠেই তিনি বেশি উপকৃত হয়েছিলেন।[৮৩] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষার্থীদের দলে তিনি ছিলেন। ছাত্রদের শাস্তিস্বরূপ এই পাঠ্যক্রমে নানা ধরনের বিষয় ছিল, যেমন, ইংরাজি, গ্রীক ও লাতিন ; সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দী ; ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও প্রকৃতিবিজ্ঞান। পরের বছর উচ্চতর পর্যায়ে, ঐ একই বিষয় নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুজন স্নাতকের একজন হয়ে তিনি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ওই পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তাঁকে নিজেকেই পড়ে নিতে হয়েছিল, কারণ যদিও তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু কলেজে ওইসব বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা ছিল না। সংক্ষেপে বলা যায় যে কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে নিজের অধ্যবসায়ে তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।[৮৪]

AMARBOI.COM

যৌবনে লব্ধ জ্ঞানকে তিনি সারাজীবন বাড়িয়েই তুলেছেন। একজন লিখেছেন যে তিনি প্রতিদিন একটি করে বই আদ্যোপান্ত পড়তেন।[৮৫] বিভিন্ন উপন্যাসের শুরুতে তিনি যে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সাহিত্যে সেক্সপীয়র, বায়রন এবং সাদি, টমসন এবং ক্যাম্বেল তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন। প্রধানত যেসব ঐতিহাসিকের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হলেন মেকলে এবং বাক্‌ল ; দ্বিতীয়জনকে পছন্দ করার কারণ অবশ্যই তাঁর প্রত্যক্ষবাদী মত, কারণ বঙ্কিমের দার্শনিক রচনায় কোঁৎ-এর গভীর প্রভাব রয়েছে। ইউরোপের ক্লাসিকাল এবং সমকালীন সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর বাড়িতে সাহিত্য সভায় দান্তে, গ্যোটে, য়ুগো এবং বালজাক-কে নিয়ে তর্কযুদ্ধ হত। তাঁর জীবনীকাররা কেউই উল্লেখ না করলেও তিনি যে ফরাসীভাষা জানতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় তিনি জে. বি. স্যাঁতিল্যার Le Bouddha et sa Religion গ্রন্থের পর্যালোচনা করেছিলেন।[৮৬] লাতিন এবং আরবী ভাষা আয়ত্ত করায় তাঁর ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় ; জ্যোতিষশাস্ত্রে আগ্রহের জন্য তিনি আরবী ভাষা শিখেছিলেন। কিন্তু রোমীয় লেখকদের গ্রন্থাবলী ঐ ভাষাতেই তিনি পড়েছিলেন, এমন কোনও প্রমাণ নেই।[৮৭]

ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মানসিকতার কথা তাঁর লেখায় বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁর চিন্তায় তাঁর যুগের মানসিকতারই প্রতিফলন হয়েছে। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানসিকতার উদ্গাতা ছিলেন অক্ষয় দত্ত, বেকন সম্বন্ধে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা এবং জর্জ কুম্বের অনুসরণে লেখা বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ক রচনাটি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হওয়া মাত্র পাঠ্যপুস্তক রূপে অনুমোদিত এবং যুবসমাজের প্রিয় পাঠ্য হয়েছিল। পরীক্ষার জন্য বঙ্কিম যে প্রকৃতিবিজ্ঞান পড়েছিলেন, তাতে ল্যাবরেটরির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর জ্ঞান খুব গভীর হয়েছিল মনে হয় না ; তবে প্রকৃতিবিজ্ঞানে তাঁর বরাবরই আগ্রহ ছিল এবং খেলাচ্ছলেই তিনি সে কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করেছেন। ছাত্রাবস্থার শেষে একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্র এবং বিস্তৃত পঠনের মাধ্যমে তিনি আজীবন কৌতূহলের পরিচয় রেখে গেছেন। 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত সাধারণের জন্য লেখা এগারোটি বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ এবং বিজ্ঞান-ঘেঁষা দার্শনিক প্রবন্ধগুলির জন্য তিনি ডারউইন, হাক্সলি, টিন্ডাল, লাকিয়ার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের রচনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অলঙ্কার, বিষয়বস্তু এবং মানসিকতার দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সমকালীন অন্যান্য বিশিষ্ট লেখকদের মতই জার্মানি দর্শনের দুটি ধারা—উপযোগবাদ এবং কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদ এবং মানবতাবাদের প্রতিই তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই আকর্ষণের ফলাফল পরে আলোচনা করব। এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে পাশ্চাত্য দর্শনের যে অংশটি তিনি বিশেষভাবে আয়ত্ত করেছিলেন, তা হল হিউম, বেন্থাম, জেমস্ মিল এবং অগস্ত কোঁৎ-এর দর্শন। ঔপনিবেশিক যুগের অর্থনৈতিক সম্পর্কের খতিয়ান করতে গিয়ে তিনি সম্পদনিষ্কাশন-তত্ত্ব এবং হস্তশিল্পের ধ্বংসসাধনজনিত দারিদ্র্য-তত্ত্ব গ্রহণ করেননি। এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থক ছিলেন এবং ক্লাসিকাল যুগের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বিশদভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। জ্ঞানদীপ্তির যুগের রচনাবলী, বিশেষত রুশো, এবং উনবিংশ শতকের সমাজতন্ত্রবাদী মতবাদের সঙ্গে যে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাম্য বিষয়ক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে ; অবশ্য পরে এই প্রবন্ধের মতবাদ তিনি নিজেই খণ্ডন করেছিলেন। জনৈক 'মাওসুখ সাহেবের' উল্লেখ মার্ক্সকে নির্দেশ করে কিনা, ছাপার ভুল অথবা বর্ণান্তরিতকরণের ভুলের জন্য তা নির্ধারণ করা আর কোনদিনই সম্ভব হবে না।

বঙ্কিমের সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা ছিল বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন, সেইসঙ্গে তাঁর মতে হিন্দু ঐতিহ্যের যা শ্রেষ্ঠ অংশ, তার উপর ভিত্তি করে দেশবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্দীপিত করা। যে বাঙালি নিজের ভাষা এবং সাহিত্যকে ঘৃণা করত, নিজের ভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারত না, প্রধানত তারাই তাঁর উপহাসের পাত্র ছিল।[৮] কৈশোরেই তিনি তখনকার দিনের খ্যাতনামা কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত জনপ্রিয় পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর'-এ বাংলা ভাষায় লিখতে শুরু করেছিলেন। তখন সংস্কৃত কলেজ ছাড়া আর কোথাও প্রথাগতভাবে সংস্কৃত শিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় বঙ্কিম বাড়িতে ভাটপাড়ার বিশিষ্ট পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্য শিক্ষা করেছিলেন।[৯] উত্তরকালে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যপাঠে অনেক সময় অতিবাহিত করেছিলেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে মাতামহের সঞ্চিত বই এবং পাণ্ডুলিপি লাভ করেছিলেন।[১০] তবু তিনি নিজে মনে করতেন যে তাঁর সংস্কৃত ভাষার দখল কখনওই ইংরাজির সমান হয়নি। তাছাড়াও, তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে বাংলার চেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরাজি বলা এবং লেখা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল।[১১] তাঁর বন্ধুরা লিখেছেন যে কথোপকথনের সময়ে, বিশেষত সাহিত্য এবং দর্শন আলোচনার সময়ে তিনি প্রচুর ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করতেন। তাঁর ব্যঙ্গ রচনার উপলক্ষ্য, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত "বাঙালি বাবুদের" সঙ্কট থেকে তিনি নিজেও মুক্ত ছিলেন না। সে যুগে তাঁর মত ব্যক্তিদের মানসিকতার অনেকখানিই তাঁদের পাশ্চাত্য শিক্ষাকে নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, যে প্রভাব তাঁদের মনোজগৎকে ঢেলে সাজিয়েছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্যায়নে তার ভূমিকা কম ছিল না। স্পষ্ট করে বলতে গেলে তাঁরা যেন ভারতীয় হিসাবে অভারতীয় এক ঐতিহ্যের মোকাবিলা করেননি, বরং বিদেশী সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তাঁদের বুদ্ধি এবং অনুভূতি আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তাগণ অনেক গভীরে গিয়ে বঙ্কিমের রচনায় ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব খুঁজে বার করেছেন। তাঁরা বলেন যে তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সংযোজন নভেল বা উপন্যাসকে সার্থকভাবে একটি ভারতীয় ভাষায় রূপ দিয়েছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র সঙ্গে স্কটের *Ivanhoe*-র সঙ্গতির কথা বহু সমালোচক উল্লেখ করেছেন। অন্ধ বালিকা 'রজনী' চরিত্রের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন লিটনের *Last Days of Pompeii* এবং উইল্কি কলিন্স্-এর *The Woman in White* উপন্যাস থেকে, এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। তাঁর সৃষ্ট ঐতিহাসিক রোমান্টিক উপন্যাস এবং পরবর্তীকালের সামাজিক উপন্যাস সবগুলিই সমকালীন সাধারণ নরনারীকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে এবং এক বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানুষের সমস্যাগুলির আবর্তনের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুরণন শোনা যায়। এক্ষেত্রে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ এবং পদ্ধতি কতটা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার বিচারে না গিয়ে যেসব অনুভূতি দ্বারা তাঁর বুদ্ধি এবং ভাবনার জগৎ গড়ে উঠেছিল, সেটাই আমাদের বিচার্য। বঙ্কিমের আগে অন্তত দুজন বাংলায় উপন্যাস লেখার প্রচেষ্টা করেছিলেন। বিখ্যাত 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং স্বল্পখ্যাত ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' তার উদাহরণ। অনুভূতি, সৌন্দর্যবোধ এবং বুদ্ধিমত্তায় বঙ্কিমের রচনা এবং পূর্বযুগের ওইসব সাহিত্য প্রচেষ্টাকে এক চৌহদ্দির মধ্যে আনা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভাই যে অমিলের একমাত্র কারণ, তা নয়, বরং বলা যায় যে, এক বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির প্রভাবের জটিলতায় ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল।

নানাভাবে এবং নানা প্রসঙ্গে অভিব্যক্ত গভীর রোমান্টিক আবেগই বোধহয় বঙ্কিমের উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য নতুন বৈশিষ্ট্য। আরবী এবং ফার্সী ভাষার সংস্পর্শে এসে বাঙালিরা যে অলৌকিক এবং রোমাঞ্চকর ঘটনায় পরমানন্দ পেতে শিখেছিল, বঙ্কিমের রোমান্টিকতা তার থেকে একেবারে আলাদা। অতীতের উপস্থাপনায় অথবা নারীর এবং প্রকৃতির মোহিনী কিম্বা ভয়ঙ্করী রূপ বর্ণনায় তাঁর গদ্যরীতি এবং বিষয়বস্তু বাস্তবকে অতিক্রম করে ভাবনার এক সুউচ্চ জগতে বিরাজমান। তাঁর প্রথম উপন্যাস বাংলার পাঠান এবং আকবরের রাজপুত সেনাপতিদের মধ্যে যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত।[১] এর বিচ্ছেদান্তক প্রেমের জগতের বীর পাত্রপাত্রীগণ অপার্থিব সৌন্দর্যের অধিকারী। তুর্কী আক্রমণ থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য এক হিন্দু বীরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মোৎসর্গের কাহিনীকে উপলক্ষ করে রচিত হয়েছে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। পাষণ্ড পশুপতিও এখানে অতি-মানুষ, নীতিজ্ঞানহীন, অসংযত আকাঙ্ক্ষা এই অসাধারণ চরিত্রের বিনাশের কারণ। মনুষ্যবসতিহীন গহন অরণ্যে কাপালিক-প্রতিপালিত, সারল্যের প্রতীক, অসামান্য সুন্দরী এক রমণীর কাহিনী 'কপালকুণ্ডলা'। এমনকি, বঙ্কিমের উপদেশাত্মক উপন্যাসগুলিও অসাধারণ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, নিঃস্বার্থভাবে আত্মবলিদানে উদ্যত নরনারীর কাহিনী। সামাজিক উপন্যাসগুলির পাত্রপাত্রীগণ গভীর আসক্তি-কবলিত। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি বিচ্ছেদ-বেদনাবিধুর। সেক্ষেত্রেও মনুষ্য-চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতির চেয়ে রোমান্টিকতাই তাঁকে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর বিচ্ছেদান্তক উপন্যাসগুলিকে দৈনন্দিন সুখদুঃখের কাহিনী বলা যায় না। অসাধারণ চরিত্র অথবা অসামান্য রূপ-লাবণ্যের অধিকারী নরনারীকে ঘিরে রচিত কাহিনীর পটভূমিকা অপার্থিব জগৎ থেকে নৈসর্গিক জগৎ পর্যন্ত বিস্তৃত। ঔপন্যাসিকের দক্ষ লিখন-শৈলীর দ্বারা এইসব ঘটনা স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হয়েছে।

ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে প্রধানত ইংরাজি সাহিত্য পাঠের মাধ্যমেই তিনি রোমান্টিক কল্পনাশক্তি লাভ করেছিলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে দেশের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিকে তিনি যেভাবে দেখেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর নিজস্ব পছন্দের সংমিশ্রণ ঐ কল্পনাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। তাঁর মতে সাহিত্যের জগতে ওয়াল্টার স্কটের স্থান অতি উচ্চে। তিনি তাঁকে কালিদাসের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন, এবং মানব চরিত্রের গভীরে পৌঁছবার ক্ষমতার জন্য সেক্সপীয়রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বায়রনের কাব্য এবং সেক্সপীয়রের নাটকগুলি তিনি বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে পাঠ করতেন।

তাঁর প্রথম উপন্যাসে বর্ণিত ইতিহাস সম্বন্ধে এক রোমান্টিক ধারণার উৎস বোধহয় এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী'তে তুর্কী সেনাদল কর্তৃক বাংলা জয় এবং নদীয়া লুণ্ঠনে ইতিহাসের রোমান্টিকতা বেদনাময় ট্র্যাজেডিতে ঢাকা পড়ে গেছে। রাজনৈতিক দুর্যোগ এবং হিন্দু তথা বাঙালিদের উপর উৎপীড়নের বিষয়টি আবার তাঁর শেষ চারটি উপন্যাসে স্থান পেয়েছে এবং এর মধ্যে দুটিতে তিনি ব্যক্তিগত এবং জাতীয় পুনর্জাগরণের জন্য শৃঙ্খলা সহকারে মানুষের সদ্বৃত্তিগুলির চর্চার কথা বলেছেন। এই চারটি উপন্যাসের মধ্যে দুটি বিচ্ছেদান্তক। তৃতীয়, 'আনন্দমঠ'ও জাতীয় বিপর্যয়ের কাহিনী, বোধহয় রাজনৈতিক কারণে তার উপর এক আবেগধর্মী কৃত্রিম ব্যাখ্যা চাপানো হয়েছে। যুগ যুগ ধরে বিদেশী শাসনে দেশের ভাগ্যবিপর্যয়ের ঘটনা বঙ্কিমের ইতিহাস চেতনাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। প্রসঙ্গত, এক জায়গায় তিনি বলেছেন যে একমাত্র ব্রিটিশ শাসনই ভারতে যথার্থ বিদেশী শাসন। ভারতের প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মধ্যযুগের কবি বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে বিদেশী শাসন এবং দেশের দুর্দশা সম্বন্ধে সচেতন বিদ্যাপতি অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি লিখেছেন : "বিদ্যাপতির সময় দুঃখের সময়। ধর্ম্ম লুপ্ত, বিধর্ম্মিগণ প্রভু, জাতীয় জীবন শিথিল, সবেমাত্র পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে—কবির চক্ষু ফুটিল। কবি সেই দুঃখে, দুঃখ দেখাইয়া দুঃখের গান গাহিলেন।"[১২] স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে বঙ্কিম বিদ্যাপতির সঙ্কটের মধ্যে নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থার প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন। অন্তরের আলোয় যে দেশকে তিনি নবচেতনায় জাগরণ-উন্মুখ বলে দেখেছিলেন, তিনি তো সেই দেশ এবং পরাধীন জাতিরই কবি এবং উদ্গাতা। তাঁর মনে হয়েছিল যে, জাতির জীবনেই যখন এই দুর্ভাগ্য তখন মানুষের অবস্থা আর অন্যরকম কি হবে। তাই তিনি সর্বত্র পরিব্যপ্ত বিষাদময় পরিস্থিতির কথা বলেছেন। ঐ একই রচনায় তিনি বলেছেন যে কবি ও লেখক তাঁদের যুগেরই সৃষ্টি।[১৩]

বঙ্কিমের জীবনের জ্ঞাত ও সম্ভাব্য ঘটনাবলী থেকে মনে হয় যে তাঁর জীবনে দ্বন্দ্ব ও অশান্তির অনেক কারণ ছিল। নিজের জীবিকাই তাঁর মনে সর্বদা কাঁটার মত বিঁধে থাকত—এক আত্মগর্বী জাতির পক্ষে রাজনৈতিক পরাধীনতা কতটা দুঃখের তা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিত। তাঁর দুঃখবোধের গভীরে ছিল সচেতন রাজনৈতিক অনুভূতি। জাতির নবজাগরণের আশা ও পরিকল্পনা ঐ অনুভূতি প্রসূত। নৈর্ব্যক্তিক হবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি বিদেশী শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন পর্যবেক্ষক হয়ে থাকতে পারেননি।

দেশের পুনর্জাগরণ সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য বটে, তবে তাঁর মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়। নৈতিক উন্নতির মাধ্যমে জাতি উন্নতির চরম সীমায় উঠতে পারে। এই উন্নতি—যাকে তিনি চিত্তশুদ্ধি বলেছেন, তাঁর মতে সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য। "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।[১৪] সাহিত্যের এই মানবতাবাদই সব সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি। সাহিত্যসৃষ্টির অধিকার তাঁর মতে সমগ্র মানবজাতির উত্তরাধিকার। ইতিহাসে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ ঐতিহ্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও, সাহিত্য দেশ-জাতি-সম্প্রদায়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে অভিজ্ঞতার এক বিভেদহীন জগৎ। তাঁর মতে সব সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণাই এক মৌলিক ঐক্যবোধ : "কাব্যের দুইটি উদ্দেশ্য ; বর্ণন ও শোধন।...সুন্দরেও যে সৌন্দর্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ যে গন্ধ, কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, 'যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই', সেই আত্মচিত্ত প্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া কবি সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন—সৌন্দর্যের অতি প্রকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতি প্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে, তাঁহাদের সৃষ্টিতে অযথার্থ, অভাবনীয় সত্যের বিপরীত প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না। যে কাব্যে এই শোধনের অভাব...তাহাকেই আমরা বর্ণনা বলিয়াছি।" নান্দনিক বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বজনীন বিচারবোধ এবং জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সহাবস্থানে ভারসাম্য বজায় ছিল। এবং শিল্পী হিসাবে তিনি এই সমীক্ষার মধ্যে মানবসভ্যতার অনেকখানিকে সাংস্কৃতিক শিল্পকীর্তি বলে মূল্যায়ন করেছিলেন।

সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক বন্ধুর কাছে তিনি বলেছিলেন, "সুন্দরের মধ্যে ভালও জড়িত।" তবে তাঁর মতে ভালর মধ্যে নীতিবোধ ও সৌন্দর্যতত্ত্বও জড়িত, যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বে আলোচিত বিশ্বজনীন সাহিত্যিক আদর্শের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় না। আদিরস—প্রথম বা আদিম রস—ইন্দ্রিয়সুখকে সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টাকে তিনি 'কদর্য' বলেছেন। ভিক্টোরিয় যুগের গোঁড়ামি এই মনোভাবের কারণ।[১৫] আবেগধর্মী কবিত্বের উচ্চস্থানের অধিকারী কবি ভারতচন্দ্রকে বঙ্কিম কুপ্রবৃত্তির বশীভূত বলেছেন।[১৬] পূর্ববর্তী যুগের বাঙালিরা তাঁর মতে অশ্লীল রুচির লোক ছিলেন। নিজের গুরুস্থানীয় ঈশ্বর গুপ্তকে তিনি ঐ পদবাচ্য বলে মনে করতেন। "সুরুচি" বিষয়ে তাঁর মতামত এতই প্রখর ছিল যে নিজের সম্পাদনায় তিনি ঐ কবির কবিতাগুলি এমনভাবে সংশোধন করেছিলেন যে নিজেই স্বীকার করেছেন, "আমরা তাঁহার কবিতাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছি।"[১৭]

তাঁর সাহিত্যিক মানসিকতা অবশ্য এই সঙ্কীর্ণ পরিচ্ছন্নতা বোধের ঊর্ধ্বে উঠতে পারত। নিজের সংশোধিতকরণকে তিনি নিজেই সাহিত্যিক দস্যুবৃত্তি আখ্যা দিয়েছেন এবং এইভাবে তার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন : "এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা পাঠকের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কোনরূপেই অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র রাখিতে পারি না।" পরবর্তী বাক্যেই সৌন্দর্যবোধের অন্যরকম মাপকাঠির কথা বলা হয়েছে : "ইহাও জানি যে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্যভাবের অভিব্যক্তির জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্য ভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহাসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা, রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে।"[১৮] স্পষ্টতই, সভ্যতার এই মাপকাঠি অন্য সমাজের কাছ থেকে পাওয়া, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালি 'উন্নতমানের' বলে তা গ্রহণ করেছিল। পূর্বসূরীগণ খারাপ ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। বঙ্কিম লক্ষ করেছিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হচ্ছে।"[১৯]

ভিক্টোরিয় যুগে ভদ্রসমাজে ব্যবহার্য ভাষার নবলব্ধ ধারণার সঙ্গে বঙ্কিম আবার সম্যক ব্যবহারের আবশ্যিকতাও বোধ করেছিলেন। নৈতিক ব্যবহার বলতে তিনি অনেকাংশে সংযমশীলতা এবং অনন্যচিত্ত একবিবাহের কথা বুঝতেন। তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস আসলে স্মৃতির তাড়নায় দগ্ধ অসংযত মানুষের কাহিনী। নৈতিকতার এই ব্যাখ্যা বাস্তববাদী হতে পারে, কিন্তু পরবর্তীকালে এক জটিল জীবনদর্শনের প্রবক্তা হলেও নৈতিকতা সম্বন্ধে বঙ্কিমের মনোভাবকে সৃজনশীল সাহিত্যিকের মানবতাবাদী অন্তর্দৃষ্টি না বলে পাঠ্যপুস্তকসুলভ উপদেশ বলাই সঙ্গত। আবার, এই নীতিকথামালা গ্রহণ করা হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুটি ঐতিহ্য থেকে—একদিকে ছিল উচ্চবর্ণের বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত রক্ষণশীল পারিবারিক নীতি, অন্যদিকে ব্রিটিশ ভদ্রলোক অনুসৃত তথাকথিত পবিত্রতা ও সংযমশীলতার নব্য নীতি। কুন্দ যদি বিধবা না হত, তা হলে, বাংলার প্রচলিত সমাজব্যবস্থা অনুসারে, ঐ অভাগিনী রমণীর প্রতি নগেন্দ্রর ভালবাসায় কোনও সমস্যা হত না। পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ সমাজে অনুমোদিত ছিল। শেষের দিকের দুটি উপন্যাসে তিনি কোনোরকম কটূক্তি না করেই বহু-বিবাহ-আবদ্ধ পরিবারের বিবরণ দিয়েছেন। এ দুটির অন্যতম 'দেবী চৌধুরানী' বরং নিষ্কাম কর্মের মত এক অত্যুচ্চ আদর্শের উদাহরণ। 'বিষবৃক্ষ' কিন্তু গভীর বিচ্ছেদের মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করেছে। তা সত্ত্বেও এই উপন্যাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে মনে হয় যেন নীতিকথা শোনানো হয়েছে। ব্যভিচারী নগেন্দ্রর পাপ সকলকেই স্পর্শ করেছে, এমনকি নিরপরাধ কুন্দকেও। বিদেশী ঐতিহ্য থেকে নেওয়া এই নীতিবোধের অন্য আর একটি উদাহরণ হল মোহিনী রোহিণীর ভয়াবহ পরিণতি। সতীত্বের গুণগান করে বঙ্কিম হিন্দু ঐতিহ্যের একটি পারিবারিক নীতিকে উচ্চতম আদর্শের স্থান দিয়েছেন। চন্দ্রশেখরের বিপথগামী স্ত্রী শৈবলিনীকে ঔপন্যাসিক কঠোর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে দিয়ে ঔচিত্যের গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়ে এনেছেন। বঙ্কিমের রচনায় সতীত্বের বিচ্যুতির একমাত্র ঘটনায় সে যুগের নীতিবোধের ধারণা সম্বন্ধে বেশ একটি কৌতুককর উদাহরণ পাওয়া যায়। 'ইন্দিরা'য় দস্যুদল কর্তৃক অপহৃত স্ত্রীকে কখনও ঘরে নেবেন না বলছেন যে স্বামী, হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী রাঁধুনী রূপে সেই স্বামীকেই সম্মোহিত করেছে। স্বামী যখন চাকরানীকে শয্যাসঙ্গিনী করতে উদ্যত, সম্ভোগ-বঞ্চিত পুরুষের পক্ষে তা স্বাভাবিক বলে বিব্রত ইন্দিরাকে ঐ তুচ্ছ ঘটনাকে গুরুত্ব না দিতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। স্বামীর ব্যভিচার এবং নির্দোষ পত্নীকে পরিত্যাগ করার নিষ্ঠুর সঙ্কল্পের মধ্যে লেখক কোনও অন্যায় দেখেননি। গৃহ-পরিচারিকার সঙ্গে সংসর্গে ভিক্টোরিয় যুগের নীতিবোধেও কোনও অসঙ্গতি ছিল না। গোঁড়া হিন্দু রীতিতে স্ত্রীলোকের সতীত্বের আদর্শ অনুযায়ী অপহৃতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা অন্যায় ছিল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক মানবতাধর্মী আদর্শকে বঙ্কিম বিচারবুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু এদের নিষ্ঠুর আদর্শগুলিকে তিনি বর্জন করেননি।

তাঁর ব্যক্তিত্বের জটিলতা এবং মনোজগতে সংস্কৃতির বিরোধের ফলে তাঁর মানসিকতায় কোনও ধারাবাহিকতা ছিল না। রক্ষণশীল হিন্দুরূপে বিবাহিত নারীর পরপুরুষের প্রতি আসক্তিকে তিনি অন্যায় বলেছেন, আবার ভিক্টোরিয় যুগের গৃহকর্তারূপে পুরুষের অবৈধ প্রেমকেও একই রকম অন্যায় বলে দেখেছেন, তা সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসগুলি জটিলতাবিহীন সরল নীতিশিক্ষার উদাহরণ নয়। প্রথমত সাধারণ নরনারীকে সাহিত্যের পাত্রপাত্রী নির্বাচন করে এ যাবৎ এ দেশে অপ্রচলিত এক নতুন সৌন্দর্যতত্ত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়বস্তুর ব্যবহারে তিনি নীতিশিক্ষাদানের পরিবর্তে সাহিত্যকে রসোত্তীর্ণ করার দিকেই মনোযোগ দিয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টার জন্য সংবেদনশীল অনুভূতির প্রয়োজন ছিল, এবং বঙ্কিমের চরিত্রে তার অভাব ছিল না। তাঁর 'অপরাধীরা' সর্বতোভাবে মানুষ ছিলেন এবং পাঠকমাত্রেই তাঁদের সঙ্কটগুলি অনুধাবন করতে পারবেন। অপরাধীদের শাস্তিবিধান করা হয়েছে সামাজিক নীতিপরায়ণতার কাঠগড়াতে, লেখকের শিল্পীমানসে নয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিল্পোৎকর্ষের চেয়ে তিনি যে নৈতিক বিচারই উপযুক্ত মনে করে ঈশ্বর গুপ্তের রচনাগুলিকে সংশোধিত করেছিলেন, সেই মানসিকতাই এক্ষেত্রেও কাজ করেছে। এমনকি, মেয়েদের সম্বন্ধে বিভিন্ন উক্তিতে সতীত্বের আদর্শও সর্বত্র সমানভাবে প্রতিফলিত হয়নি। তাঁর সাম্য বিষয়ক প্রবন্ধটিতে হিন্দু সমাজে পুরুষ ও নারীর অসম ব্যবহার নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা আছে। এখানে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত বলেই তিনি মন্তব্য করেছেন, যদিও মনের দিক থেকে তিনি কখনওই তা গ্রহণ করতে পারেননি। পরে যখন 'সাম্য' প্রবন্ধের মতবাদ তিনি নিজেই খণ্ডন করেছিলেন, বিধবাবিবাহের যুক্তিও তার মধ্যে ছিল কিনা সঠিক জানা যায় না। সাহিত্যিকের সৃজনশীল মনোভাব এবং চিন্তাশীল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিরূপে কিছুটা রক্ষণশীল, দক্ষিনপন্থী মনোভাবের মধ্যে বরাবরই একটা গরমিল থেকে গেছে। আবার বাঙালি হিন্দুর নির্দিষ্ট জীবনধারাও তিনি কখনওই পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। এক্ষেত্রে, বিধবা-বিবাহের প্রশ্নে তাঁর দুঃসাহসিক প্রতিক্রিয়া তাঁর যুক্তিবাদী মানসিকতার পরিপন্থী ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং বিচারবোধের অসামঞ্জস্য যেমন ছিল বিভিন্ন পর্যায়ে, তেমনি তা বহুমুখী।

বঙ্কিমের গভীর স্বাজাত্যবোধে অবশ্য কোনও অসামঞ্জস্য অথবা দ্বন্দ্ব ছিল না। সৃজনশীল সাহিত্য এবং সমাজ-চেতনার উৎস, এবং অনুভূতিময় জীবনের প্রেরণা ছিল তাঁর জাতীয়তাবোধ। দেশের কথা বলতে গিয়ে তিনি তাঁর স্বাভাবিক সংযম হারিয়ে ফেলতেন। "বিরক্তি, লজ্জা, আনন্দ, দুঃখ, রাগ এবং প্রবল গর্ববোধের আবেগে তাঁর আত্মসংযম ভেসে যেত।"[১০০] এই প্রগাঢ় দেশাত্মবোধ সে যুগের সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল।[১০১] বঙ্কিমের ক্ষেত্রে যে তা এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তার কারণ বোধহয় তাঁর অভিমানী প্রকৃতি এবং কর্মজীবনের বিরূপ অভিজ্ঞতা।

তাঁর জাতীয়তাবাদী আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে অবশ্য কয়েকটি আপাতবিরোধী উপাদান লক্ষ করা যায়। প্রথমত ব্রিটিশের মহানুভব শাসনের উপর আস্থাবশতই তিনি রাজভক্তির যুক্তি দেখিয়েছেন।[১০২] এই বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত কারণগুলি পরে আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে এইটুকুই উল্লেখযোগ্য যে সে যুগের অন্যান্যদের মতই তিনিও বিশ্বাস করতেন যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন দীর্ঘস্থায়ী হবে, এবং দীর্ঘকালব্যাপী জাতীয় পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টার পরেই স্বাধীনতা আসতে পারে। মধ্যবর্তীকালীন সময়ে রাজানুবর্তিতাই উচিত পথ।[১০৩] 'আনন্দমঠ' প্রসঙ্গে দেখা গেছে যে সরকারি চাকুরে হওয়ায় কেমনভাবে তাঁকে ঔপনিবেশিকতা তথা ব্রিটিশ-বিরোধী যথার্থ উক্তিগুলিও পরিহার করতে হয়েছিল। চাকুরি বজায় রাখার জন্য বঙ্কিমের বাস্তবজ্ঞান প্রশংসার্হ না হলেও, তাঁর জীবনের ঘটনায় ঔপনিবেশিক যুগের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সঙ্কট প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এবং এ থেকে অনুমান করা যায় যে ব্রিটিশ শাসনের সমীক্ষায় বঙ্কিম যে মত প্রকাশ করেছেন, তা সর্বক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থে সত্য নাও হতে পারে। এমন অনেক উদাহরণ আছে যা থেকে বোঝা যায় যে ব্রিটিশ শাসনকে তিনি দুঃসহ পরাধীনতা বলেই মনে করতেন। এক বন্ধু তাঁকে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রের একটি স্মারক দেখাতে চাওয়ায় তিনি বলেন, 'দেখে আর করব কি ? কেবল কাঁদা বই তো নয়।"[১০৪] ঝাঁসীর রানীকে তিনি মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠা রমণী বলে সম্মান করতেন এবং তাঁর বীরত্ব নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। 'আনন্দমঠ'-এর শেষ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে এমন একদিন আসবে, যেদিন দেশমাতৃকার মুক্তিসংগ্রাম দেশকে আলোড়িত করবে—নিঃসন্দেহে ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে উপলক্ষ করে একথা বলেছেন। নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' মহাকাব্যের সমালোচনায় তিনি দুটি জোরালো মন্তব্য করেছিলেন। প্রথমটিতে এই যুদ্ধকে একাধারে ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক বলা হয়েছে, "কেননা ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই।"[১০৫] দ্বিতীয়টিতে তিনি লেখকের প্রশংসা করে বলেছেন : "যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্মভেদী কাতরোক্তি...যদি দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীন বাবুর।"[১০৬] 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ তিনি একটি সারগর্ভ প্রশ্ন রেখেছেন, মেয়েমানুষ কাকে বলা হবে ? সিংহাসনচ্যুত নবাব ওয়াজেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলি—যিনি কলকাতায় আরামে দিনাতিপাত করছিলেন, তাঁকে, না অযোধ্যার বেগমকে—যিনি ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করলেন ?[১০৭] লেখকের বক্তব্য এখানে স্পষ্ট এবং জোরালো।

সমসাময়িক সংগঠিত রাজনীতির সঙ্গে বঙ্কিমের একেবারেই মতের মিল ছিল না, যদিও সুরেন্দ্রনাথ এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। 'আবেদন-নিবেদন' এর রাজনীতিকে তিনি "অন্ধ ভিক্ষুকের ভিক্ষা চাওয়া" বলে ব্যঙ্গ করেছেন।[১০৮] দেশীয় সংবাদপত্রগুলির ভূমিকাতেও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর মতে তাদের পক্ষে "ইংরাজের নিন্দা যে কোনও প্রকারে করিতে পারিলেই রাজনীতির একশেষ হইল।"[১০৯] এই অপছন্দের জন্যই বোধহয় তিনি দেশীয় সংবাদপত্র আইনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এর জন্য অবশ্য তাঁকে অনেক গঞ্জনা ভোগ করতে হয়েছিল।[১১০] সশস্ত্র বিপ্লববাদ—অন্তত পক্ষে বিদেশী রাজশক্তিকে বিপ্লবের ভয় দেখানোর যোগ্যতা অর্জন করাই যে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের উদ্দেশ্য ছিল, এই অনুমান বোধহয় অন্যায় হবে না। "মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রতিরোধশক্তি তার বাহুবলে"—এই ছিল তাঁর সুচিন্তিত মত। জর্জ ওয়াশিংটন এবং উইলিয়ম অব অরেঞ্জকে তিনি মহানুভব নেতৃত্বের উদাহরণ বলে দেখিয়েছেন। ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানে ভারতীয়রা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলেও, ইংরেজদের পক্ষেও সেই জয় সহজসাধ্য হয়নি,—"তাঁহারা বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা দেখিলে বাঞ্ছিত পথে গতি করেন না।"[১১১] এই মন্তব্যে লেখকের বক্তব্য অতি প্রাঞ্জল।

'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী' এবং 'চন্দ্রশেখর'—এই তিনটি উপন্যাস ব্রিটিশদের সঙ্গে সংঘর্ষের বিবরণ নিয়ে রচিত। সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখলে, এইসব উপন্যাসের পাত্রপাত্রী হয় ব্রিটিশদের সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে, না হয়, দেবী চৌধুরানী এবং ভবানী পাঠকের মত রবীন হুডের ধারায় ব্রিটিশ বিজয়-সঞ্জাত দারিদ্র্যের দুঃখ মোচনের ব্রত নিয়েছে। প্রতিটি উপন্যাসই ব্রিটিশের জয়লাভে শেষ হয়েছে। দুজায়গায় উপসংহারে ব্রিটিশ শাসনের গুণকীর্তন করা হয়েছে, উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে যার মোটেই সঙ্গতি নেই। 'চন্দ্রশেখর' একটু অন্যভাবে মীর কাশিমের পরাজয়ে বাংলার স্বাধীনতা বিপর্যস্ত হল, এইকথা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, শাসকশ্রেণীর সঙ্গে বিরোধ এড়াবার জন্যই এইসব প্রচেষ্টা। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করার জন্য একজন নাট্যকার এবং প্রযোজক দণ্ডিত হয়েছে।[১১২] 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হবার আগেই স্পষ্ট সমালোচনার প্রতি শাসকশ্রেণীর মনোভাব বোঝা গিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের জটিল এবং স্পষ্ট মূল্যায়নে বঙ্কিম মনোভাবের আসল রূপটি ধরা পড়েনি।

ভারতের পুনর্জাগরণ সম্বন্ধে তাঁর যে পরিকল্পনা, তাতে কিছুটা দার্শনিক-নীতিবাদী মনোভাবের উপর জোর দেওয়া হলেও ভারতে ব্রিটিশ শক্তির অপ্রতিহত ক্ষমতার ইঙ্গিত সেখানে সুস্পষ্ট। উপদেশমূলক রচনায় তিনি আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা সহকারে বাহুবল সহ মানুষের সমস্ত রকম ক্ষমতার বিকাশের কথা বলেছেন। সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে দেশ ও মানবজাতির প্রতি কর্তব্যসাধনই তার উদ্দেশ্য। 'আনন্দমঠ'-এর দেশপ্রেমী সন্ন্যাসীরা এই আদর্শ জীবনযাত্রার প্রতীক।[১১৩] উন্নতমনা ভবানী পাঠক এবং তাঁর শিষ্যা দেবী চৌধুরানীও তাই। প্রেমের দেবতা কৃষ্ণরূপে নয়, জগতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষাকর্তা, ন্যায় ও সদ্ধর্মের প্রতীক, দুষ্টের দমন ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য যাঁর অস্ত্র ঝনঝনিয়ে ওঠে, সেই বিষ্ণু সন্ন্যাসীদের আরাধ্য দেবতা। 'নিজের কর্তব্য পালন করেন না যে রাজা', তিনি হলেন দুষ্টের প্রতীক। আনন্দমঠের ধারাবাহিক সংস্করণে ক্ষমতাসীন ব্রিটিশ এবং তাদের ক্রীড়নক মুর্শিদাবাদের নবাবকে স্পষ্ট ভাষায় দুষ্ট রাজা বলা হয়েছে। কল্পনার উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতীকরূপে বঙ্কিম দেশমাতৃকার মূর্তির আবাহন করেছিলেন—যে দেশমাতৃকা পূর্বে গৌরবের অধিকারিণী ছিলেন, বর্তমানে দুর্দশাকবলিত। শক্তিরূপে যে মাতৃদেবীর অর্চনা করা হয়, তিনিই দেশমাতৃকা। তাঁর বিখ্যাত গান বন্দেমাতরম্-এ নানা অস্ত্রে সজ্জিতা, বহু সন্তানের হস্তধৃত শাণিত তরবারিতে বহুবলধারিণী, অতুল শক্তির অধিকারিণী দেবীকে বন্দনা করা হয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত রাজনীতিতে তাঁর অনাস্থা এবং নতুন ধরনের কোনও পন্থার অভিপ্রায় ধরা পড়েছে তাঁর এই সঙ্গোপন উক্তিতে—"এই গানের প্রকৃত মর্ম বুঝবে ভবিষ্যতের জনগণ।" ১৯০৫ সালের পর 'বন্দে মাতরম' ভারতের জাতীয়তাবাদের শ্লোগান এবং 'আনন্দমঠ' সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের বাইবেল-এ পরিণত হয়েছিল। রচয়িতা বোধহয় এরকমটিই আশা করেছিলেন।

ঔপনিবেশিকদের উপস্থিতি বঙ্কিমের মনে উগ্র জাতীয়তাবাদের বীজ অঙ্কুরিত করেছিল—এ কথা মেনে নিলে বলতে হয় যে সেই উপলব্ধি নিয়েই তিনি পাশ্চাত্যকে বিচার করেছিলেন। ভারতের ঐতিহ্য, বিশেষত হিন্দু অতীত সম্বন্ধে তিনি গভীর গর্ববোধ করতেন, কিন্তু সেইসঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে "হিন্দুরা সাধারণত স্বাধীনতালাভে অভিলাষী বা যত্নবান নহে।"[১১৪] কালে কালে ভারতীয় সভ্যতার অবক্ষয় হয়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল, তাঁর মতে তুর্কীবিজয়ের ফলে প্রাচীন যুগের বীরত্বের স্থান নিয়েছিল নিষ্ফল ভোগসুখ।[১১৫] আধুনিক হিন্দুরা তাদের গৌরবময় অতীত সম্বন্ধে অনবহিত বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।[১১৬] সাহিত্যিক এবং শিক্ষিত বাঙালিরূপে জাতিকে অতীত গৌরব, আধুনিক সমস্যা এবং জাতির প্রতি কর্তব্য বিষয়ে অবহিত করা কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন।[১১৭] পরবর্তীকালের দার্শনিক রচনাসমূহে তিনি এই কর্তব্য সম্পাদন করেছেন।

যে জাতির কথা তিনি গভীর আবেগসহকারে বলেছেন, সে জাতি বা 'নেশনের' নৃতাত্ত্বিক এবং সামাজিক পরিসীমা খুব স্পষ্ট নয়। কখনও তা ভারতের সঙ্গে সমার্থক। তিনি লিখেছেন যে দেশের উন্নতির জন্য ভারতের সব জাতির মধ্যে সংহতি প্রয়োজন।[১১৮] অনেক জায়গায় আবার জাতি বলতে হিন্দুদের বুঝিয়েছেন। তাঁর ক্ষোভের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল বাঙালির দুর্দশা—'বন্দেমাতরম্' গানে 'দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃত' সন্তানের উল্লেখ বাঙালি জাতির সমার্থক হয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্যে মুসলিমদের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর ধারণা যতই খারাপ হোক, একজায়গায় তিনি স্পষ্টভাষায় মুসলিমদের বাঙালি তথা ভারতবাসীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে উল্লেখ করেছেন।[১১৯] পরবর্তীকালে 'সাম্য' প্রবন্ধকে অস্বীকার করলেও সমাজের শোষিত-নিপীড়িত শ্রেণীর জন্য তাঁর উদ্বেগ বহু রচনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যথার্থ সহৃদয়তার অভাব ভারতের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়।[১২০] ধনের সমবন্টন দেশের শ্রীবৃদ্ধি আনবে। তিনি লিখেছেন : "এখন যে জন পাঁচ ছয় বাবুতে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে বসিয়া মৃদু মৃদু কথা বলেন, তৎপরিবর্তে তখন এই ছয়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোটি প্রজার সমুদ্রগর্জনগম্ভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।”[১২১] দেশের সমস্যার কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি কখনই দেশের গরীবদের দুর্ভাগ্যের কথা ভোলেননি এবং ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচনায় এই বিষয়েই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন।

ভারতের মুসলিমদের সম্বন্ধে বঙ্কিমের মনোভাবের বিষয়টি এই আলোচনায় খুবই প্রাসঙ্গিক, কারণ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল্যায়নে মুসলিম শাসন সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের ছাপ স্পষ্ট। সমালোচকরা এ বিষয়ে বঙ্কিমের জটিল মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তির কথা বলেছেন। মুসলিমদের সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন জায়গায় অনুকূল মন্তব্য করেছেন, তাছাড়া, ভারতের ঐস্লামিক শাসনের যুগকে তিনি বিদেশী শাসন বলেননি—বঙ্কিমের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ খণ্ডন করতে এইসব যুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।[১২২] তাঁর মনোভাবের জটিলতা এবং বিপরীতধর্মী মন্তব্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মুসলিমদের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, চূড়ান্ত বিরূপ মনোভাবের কথাও অস্বীকার করা যায় না। এখানে মাত্র দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। নবাবের অত্যাচারের সঙ্গে যেসব গ্রামবাসীর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, 'আনন্দমঠ'-এর বিজয়ী সন্তানদল সোল্লাসে সেইসব মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম লুণ্ঠন করে অগ্নি সংযোগ করেছে। দ্বিতীয় উদাহরণটি আরও জোরালো। পলাশীতে কি ঘটেছিল সেই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : "আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, গোহত্যাকারী, ক্ষৌরিতচিকুর মুসলমানের লিখিত ঐ মুতাখ্ খরীন নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ।”[১২৩] ভূদেব অভিযোগ করেছেন যে ভারতে মুসলিম শাসন সম্পর্কে ব্রিটিশদের অভিমত ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে প্রভাবান্বিত করেছিল। সমসাময়িক আরও অনেকের মতই বঙ্কিমও ঐ শতকগুলিকে পরাধীনতার যুগ বলেই চিহ্নিত করেছেন এবং দিল্লী সুলতানীর বিরুদ্ধে হিন্দু রাজাদের প্রতিরোধকে জাতীয় প্রতিরোধ আখ্যা দিয়েছেন। প্রাক্-আধুনিক যুগের মুসলিম বাদশাহ্দের শাসনকালের সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিত ঔপনিবেশিক শাসনের তুলনা ঐ মনোভাবের স্বাভাবিক পরিণতি।

নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে ক্ষমতাসীন সংস্কৃতির প্রবক্তাদের ভাষ্য মেনে নেওয়া ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে অনেকে মনে করেন।[১২৪] এদের মতে প্রাচ্যবাদীদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল "আমরা ও তাহারা"—এই দ্বৈতবাদের স্বাভাবিক পরিণতি হয়েছিল পরাধীন জাতির ঐতিহ্যের নিম্নমান সম্পর্কে দীর্ঘস্থায়ী বদ্ধমূল ধারণা। সেই কারণেই পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনায় ভারতীয় ঐতিহ্যের উচ্চমান, অন্ততপক্ষে সমতা, দেখাবার একটা মানসিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। আগের অধ্যায়ে দেখিয়েছি যে এই ধরনের চিন্তা এবং প্রতিক্রিয়ার ব্যতিক্রমও ছিল। কিছু ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীবিশেষের পরম্পরায় প্রাপ্ত সংস্কৃতিতে অটুট আস্থা ছিল এবং বিদেশী মাপকাঠিতে তার মূল্যায়ন সম্পর্কে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না।

যে আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হচ্ছি, বঙ্কিমের পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা সেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। কেউ কেউ বলেছেন যে এই ধারণার ফলশ্রুতি যে হীনম্মন্যতা, তাকে কাটিয়ে ওঠবার জন্যই বঙ্কিম আধ্যাত্মিকতার উপর জোর দিয়েছিলেন, কারণ ভারতীয় ঐতিহ্যের ঐ দিকটিই তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ এবং অতুলনীয়।[১২৫] থিওসফিপন্থীরা এবং বিবেকানন্দসহ আরও অনেকেই আলাদা আলাদা ভাবে তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিতে এই দৃষ্টিভঙ্গির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনবিংশ শতকের শেষদিকে এইসব মতবাদ বুদ্ধিজীবীদের শব্দভাণ্ডার পূর্ণ করেছিল এবং পশ্চিমের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিজয় অভিযানে সন্ত্রস্ত রুশিয়া থেকে জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমণ্ডলের বিভিন্ন এলাকায়, আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে নৈতিকতার উপর জোর দিয়ে এই মত বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। ভারতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার যুক্তি খুঁজে বার করতে গিয়ে তিনি যে খামখেয়ালীর মত ভারতীয় ঐতিহ্যকে তোলপাড় করেছেন, একথা বলা যাবে না, কারণ স্বাভাবিক সরল পথে তিনি যাননি। সে যুগের যুক্তিবাদী দর্শনের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল তাঁর মন—নিরন্তর প্রশ্ন জেগে উঠত যে মনে, সেই মন নিয়েই তিনি ভারতীয় দর্শনের বাছাই করা সম্ভারের সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। শুধুমাত্র হীনম্মন্যতার ক্ষতিপূরণই নয়, বরং জাতীয় পুনর্জাগরণের জন্য একটি আদর্শ এবং কর্মসূচি গড়ে তোলা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর দার্শনিক রচনাবলীতে এই উদ্দেশ্যের কথা তিনি নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন।[১২৩] একথা সত্য যে, যে সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে পাওয়া যায় না, সেগুলি হিন্দু দর্শনে পাওয়া যায় বলে তিনি দাবি করেছেন। উত্তরগুলি অবশ্য তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি, এবং অনেক ক্ষেত্রেই যেসব পাশ্চাত্য দার্শনিককে তিনি পছন্দ করতেন, তা তাঁদেরই মতামতের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ। ব্যক্তিগত মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের সৃষ্ট মতবাদ দিয়ে হিন্দু ও পাশ্চাত্য দর্শনের উদ্ভট সমন্বয় সাধন আধুনিক যুগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক বিশিষ্ট অঙ্গ এবং গান্ধী তার অন্যতম প্রধান উদাহরণ। এই সমন্বয় যে আমাদের ঐতিহ্য লব্ধ জ্ঞানের অন্তর্নিহিত সেই দাবিও জাতীয়তাবাদের অঙ্গ। প্রাচীনত্ব প্রমাণ করবার জন্য বিশ্বাসযোগ্যতার সূক্ষ্ম যুক্তিজাল দিয়ে কল্পিত ঐতিহ্যের মাধ্যমে গৌরবময় অতীতে জাগ্রত বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করা হয়েছিল। রাজনৈতিক পরাধীনতার ফলে যে গৌরবের উচ্চশিখর থেকে পতন ও বর্তমানের এই দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি, এ সবের ক্ষতিপূরণ এবং ভবিষ্যতের আশার আলোকবর্তিকা ছিল ঐ বিশ্বাস।

বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদী এবং আদর্শবাদী চিন্তাধারা গঠনে দুটি স্তর এবং পাশ্চাত্যের মূল্যায়নেও অনুরূপ স্তরভেদ লক্ষ করা যায়। দুটি পর্যায়ের সীমারেখা খুবই স্পষ্ট এবং কিছুটা আকস্মিক। গভীর সংশয়বাদ থেকে হঠাৎ তাঁর আস্তিক্যবাদে উত্তরণের কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। মনে হয় ব্যক্তিগত কোনও বিশেষ অভিজ্ঞতার ফলেই এই পরিবর্তন এসেছিল, কিন্তু তাঁর জীবনীকাররা কেউই এরকম কোনও ঘটনার উল্লেখ করেননি। তবে এই পরিবর্তন সম্বন্ধে বিশেষ মাথাব্যথা করারও কোনও কারণ নেই, কেননা যে সব যুক্তির প্রভাবে তাঁর সামগ্রিক মতামত গড়ে উঠেছিল, তার অনেকগুলির প্রভাব দ্বিতীয় পর্যায়েও অব্যাহত ছিল।

উনবিংশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবী মানসিকতার একটি বিশেষ অংশ ইউরোপের জ্ঞানদীপ্তির যুগের যুক্তিবাদ দিয়ে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু তার প্রভাব সকলের উপর সমান ছিল না। চিরাচরিত রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকারকে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য ভূদেব ঐ পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। বঙ্কিমের সমসাময়িক কেশব সেন ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় আস্থা এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অবিচল আনুগত্য প্রচার করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ তাঁর যে সব শিষ্য পরে তাঁর দল পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁরা ভারতের স্বাধীনতার আশা সহ নিরীশ্বরবাদী ধার্মিকতা প্রচার করতেন। সংক্ষেপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা যায় যে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যুক্তিবাদের প্রতি অবিচল ভক্তি ছাড়াও বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভাবনার আরও অনেক দিক ছিল। ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক এবং নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ তাঁর মতামতের ধারা নির্দেশ করত।

অতি অল্প বয়সেই বঙ্কিমের ব্যক্তিগত মতামতের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। বছর দশেক বয়সের সময় তিনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে প্রশ্ন করেছিলেন, "যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য আপনি কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কি ষোলশো গোপিনীর ভর্তা ছিলেন ? তিনি গোপিনীদিগের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন ?" তাঁর এই প্রশ্ন গ্রামে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেই সময়ে তিনি বাংলায় অনূদিত 'ভাগবত পুরাণ' পড়েছিলেন এবং স্পষ্টই বোঝা যায় যে সে কাহিনী তাঁর পছন্দ হয়নি। এই প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে পরিণত বয়সে তাঁর চরিত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়—শেখানো জ্ঞানে অনাস্থা এবং নগ্ন যৌনতায় বিতৃষ্ণা।[১২৭] বন্ধু শ্রীশ মজুমদারকে তিনি বলেছিলেন যে আগে তিনি নাস্তিক ছিলেন।[১২৮] ১৮৮০-তে লেখা 'আনন্দমঠ' তাঁর ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস জাগরিত হওয়ার অবিসংবাদী উদাহরণ, যদিও আগেকার কোনও কোনও রচনাতেও এই বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়। ১৮৬৯-এ প্রকাশিত হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ *On the origin of Hindu Festivals*-এ তিনি নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সহকারে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা করেছেন। দু বছর পরে তিনি নির্দ্বিধায় হিন্দু দর্শনকে "ভ্রমের স্তূপ" (a great mass of errors) বলেছেন। প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রশ্ন তোলার "বিধ্বংসী যুক্তিবাদ" এর জন্য যে সাংখ্যদর্শনে তিনি আস্থা পেয়েছিলেন, "আবশ্যকমত প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য স্থানে স্থানে বেদের দোহাই দিয়েছেন" বলে সেই সাংখ্যকারকে আবার পরিহার করেছেন। শাশ্বত বাণী প্রচার করার জন্যই বুদ্ধদেবের "অনন্তকালস্থায়ী মহিমা"। তিনি প্রচার করলেন, "বর্ণবৈষম্য মিথ্যা। যাগযজ্ঞ মিথ্যা, বেদ মিথ্যা, সূত্র মিথ্যা।" বঙ্কিমের মতে, স্মৃতিশাস্ত্রের অসংখ্য নিয়মাবলী ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যাহত করেছিল বৈষ্ণবদের পরম আদরণীয় জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'তেও কোনও নতুন সত্য উদ্ঘাটন করা হয়নি। অন্তর্নিহিত যুক্তিবাদ, বিশেষত মিলের পূর্বসূরীরূপে কার্যকারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য একমাত্র ন্যায়শাস্ত্রকেই 'অসাধারণ' বলা যায়। বুদ্ধিদীপ্ত সংশয়বাদের জন্য সাংখ্যদর্শনের যে বৈশিষ্ট্য, বেদের মাহাত্ম্য স্বীকার করায় তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অন্যান্য সব মতবাদের তুলনায় এ দুটি শ্রেষ্ঠ, কারণ এখানে "ঈশ্বরে বিশ্বাসের পরিবর্তে প্রকৃতির নিয়ম দ্বারাই প্রকৃতির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।" অবশ্য অবরোহণ পদ্ধতির প্রয়োগে তাও কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কারণ হিন্দুরা আবার সমীক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতিকে মানহানিকর মনে করে। এমনকি অবরোহণ পদ্ধতিকেও তার স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর হতে দেননি তাঁরা ; কতগুলি অযৌক্তিক তত্ত্ব খাড়া করে অবরোহণ পদ্ধতির "সুষ্ঠু নীতিগুলি প্রয়োগ না করে" তার পরিবর্তে কতগুলি "মনগড়া সিদ্ধান্ত" গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু ঐতিহ্যের চিন্তাধারা এবং জাতীয় অবক্ষয়ের মধ্যে তিনি একটি কার্যকারণ সম্বন্ধ দেখেছিলেন। প্রথমত, উপকথা এবং দর্শনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে কঠোর যুক্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে মনগড়া কুসংস্কার মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈদিক প্রকৃতিদর্শন থেকেই দর্শনের বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা থেকে আবার নৈতিক ও ঐহিক জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তর্মুখী ভাবনার জাল বিস্তৃত হয়েছিল। শেষপর্যন্ত অবশ্য দার্শনিক মতবাদ উপকথায় পরিণত হওয়ায় যুক্তিবাদ অতলে তলিয়ে গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ তিনি তিনটি বৈদিক জ্যোতির (আলোক) দেবতা থেকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের উৎপত্তির কথা বলেছেন। ক্রমশ এই দার্শনিক তত্ত্ব 'ব্রহ্মের ত্রিগুণ'—এই কল্পনাশ্রয়ী মতবাদে রূপান্তরিত হল। প্রসঙ্গত অল্পকালের মধ্যেই ঐ মতবাদের মধ্যে এমন এক যুক্তির সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন যা সেই যুগের বৈজ্ঞানিক যুক্তিরই অনুরূপ ছিল। চিন্তার প্রথম পর্বে তিনি ধর্মমত ও দর্শনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগকে হিন্দু ঐতিহ্যের সবচেয়ে ক্ষতিকারক অংশ বলে মনে করতেন।

রক্ষণশীলতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবর্তিত হওয়ার ফলে হিন্দু দর্শন কতগুলি ভ্রান্ত নীতিতে পর্যবসিত হয়েছিল। এইভাবে কলুষিত হওয়ায় কুসংস্কার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত নীতিকে সমর্থন করাই দর্শনের উপজীব্য হয়েছিল এবং কূট, অধ্যস্ত ভাষা ব্যবহার করে সেগুলিকে অটুট রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[১২৯] এই ঐতিহ্য ভারতবাসীকে ইহলোকের আনন্দ অস্বীকার করতে এবং কর্মবিমুখতাকে সুখের আদর্শ বলে ভাবতে শিখিয়েছিল। বঙ্কিম নিজের এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করবার জন্য বাক্‌লের মানুষের অন্যায় প্রবণতা বিষয়ক ঐতিহাসিক তত্ত্বের সাহায্য নিয়েছিলেন। প্রকৃতির অদম্য ক্ষমতার কাছে মানুষের অসহায়তাবোধের ফলেই দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস এবং সর্বদা তাদের স্তুতি করার ধারণা গড়ে উঠেছিল। তাঁদের রোষের ফল মানুষের ব্যর্থতার কারণ বলে মনে করা হত। এইভাবে পাপবোধ সৃষ্টি হওয়ার ফলে অনুশোচনা, দেবতাদের অর্চনার জন্য আত্মনিগ্রহ ইত্যাদি ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাকৃতিক কারণে ভারতবাসীর কার্যশক্তি সীমিত এবং দার্শনিকেরা দেবতার রোষের পরিবর্তে প্রকৃতিকেই মানুষের সর্বময় দুঃখের কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রতিটি বিখ্যাত দার্শনিক মতবাদের ধারা নিজস্ব পদ্ধতিতে জগৎ বিমুখতার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছে। হিন্দু এবং বৌদ্ধ দর্শনের জগৎ-বিমুখতার স্বাভাবিক পরিণতি হয়েছিল সন্ন্যাস, অদৃষ্টবাদ, রাজনীতিতে অনীহা, কাব্যের ভাবাবেগ'[১৩০] ইত্যাদি। এই মতবাদের সমর্থনে তিনি মধ্যযুগের ইউরোপে সন্ন্যাসবাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে লেকির বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন।

তাঁর ইতিহাস চর্চার প্রধান সহায়ক ছিলেন বাক্‌ল এবং লেকি। প্রত্যেক দেশের ইতিহাসের উপর সে দেশের জলবায়ুর প্রভাব বিষয়ে তিনি বাক্‌ল-এর তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় সভ্যতার অবক্ষয় সম্বন্ধে ঐ তত্ত্ব বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। পরে দেখিয়েছি যে বঙ্কিম ঐ মতবাদকে যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের জন্য সুচিন্তিত কৌশলরূপে প্রয়োগ করেছেন। মানবসভ্যতার অগ্রগতি সম্পর্কে লেকির মতবাদের সঙ্গে ভারতের ধর্মাশ্রয়ী সামাজিক রীতিনীতির কুফল প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব মতামতের সমন্বয় করে ভারতের অবক্ষয়ের তিনি এক ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পুঁজিবাদে অবিচল আস্থাবশত সম্পদের আকাঙ্ক্ষাকেই লেকি মানব সভ্যতার অগ্রগতির প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ সন্তুষ্টি বা নিস্পৃহা তাঁর মতে প্রগতির পরিপন্থী। বঙ্কিমের মতে "ঐহিক সুখে নিস্পৃহতা হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম উভয় কর্তৃক অনুজ্ঞাত", সেই কারণেই ভারতের এই অবক্ষয়। নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ব্রাহ্মণশ্রেণী যে পূতিগন্ধময় কুসংস্কারগুলিকে প্রশ্রয় দিতেন, যে কথাগুলি প্রচার করতেন, ক্রমশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেরাও সেগুলি বিশ্বাস করতে শুরু করলেন। "যে জালে ব্রাহ্মণরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন।" সর্বত্র পরিব্যপ্ত বৈরাগ্য এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার অভাব রাষ্ট্রজীবনকেও প্রভাবিত করেছিল, কারণ লেকির কাছে তিনি শিখেছিলেন যে সংঘাতই রাষ্ট্রজীবনে শক্তির উৎস। জনসাধারণ নির্বীর্য এবং অবিরোধী হলেই রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ স্বৈরাচারী হবার সুযোগ পান।[১৩১] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভূদেব ইউরোপের রাজনীতিতে রাজা প্রজার সংঘাতের বিষময় ফল লক্ষ করে ভারতবাসীকে তা পরিহার করে চলতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

ভারতের দার্শনিক এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের সমালোচনার চেয়েও ভারতীয় ঐতিহ্যের নেতিবাচক মূল্যায়ন অনেক তীব্র হয়েছিল। এই উপমহাদেশে সভ্যতার সূচনাপর্বেই তিনি ভারতের জনসাধারণের, বিশেষত কৃষকশ্রেণীর দুর্দশার কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন। এক্ষেত্রেও তিনি বাক্‌ল্‌-এর মতের উপরই নির্ভর করেছিলেন। সেই মতানুসারে "জ্ঞানিক উন্নতি সভ্যতার কারণ" এবং সভ্যতা সৃষ্টির পক্ষে প্রথম প্রয়োজন যে সমাজে একটি অবসরপ্রাপ্ত শ্রেণী থাকবেন, যাঁরা শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত না থেকে জ্ঞান আহরণে নিযুক্ত থাকবেন, তাঁরাই সমাজের প্রগতির পথপ্রদর্শক হবেন। ভারতের ভূমির স্বাভাবিক উর্বরতার জন্য "শ্রমোপজীবীদের দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্তে' প্রতিপালিত শ্রেণী "জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইতে পারিয়াছিলেন।" শুরুতেই শ্রেণীবিভাগ হবার ফলে উপরের শ্রেণী, বিশেষত ব্রাহ্মণরা জ্ঞানালোচনা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কুক্ষিগত করে রেখে জনসাধারণের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব অব্যাহত রেখেছিলেন। ধন এবং জ্ঞানের অসম বণ্টনের ফলে সমাজে ক্ষমতা বিভাজনেও বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং স্মৃতির বিধানগুলি শূদ্রদের নিপীড়নের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। শ্রমজীবী জনতার ভাগ্যে তাই জুটেছিল "দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং দাসত্ব।" রাজনীতিতে তাদের উৎসাহের অভাব রাজনৈতিক জীবনের মান ক্ষুণ্ণ করেছিল, সেইসঙ্গে তাদের অজ্ঞতা ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কুসংস্কার সৃষ্টির বীজ বপন করেছিল। এদেশের উষ্ণ আবহাওয়ার দরুণ অধিক প্রচেষ্টা সম্ভব ছিল না (এখানে সভ্যতা সৃষ্টিতে আবহাওয়ার প্রভাব সম্বন্ধে লেকির মতবাদ উদ্ধৃত করা হয়েছে), তাছাড়া আবার ধর্মেও ইহলোকের প্রতি বৈরাগ্যের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। "...ধর্মশাস্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থা জন্য নিবৃত্তি আরও দৃঢ়ীভূত হইল।"[১৩২]

ভারতের এই অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধানের মধ্যে দেশপ্রেম ছাড়াও আরও কিছু ছিল। নানাভাবে সমাজের অবিচারের প্রতি গভীর ঘৃণাবোধ তাঁকে শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছিল। 'সাম্য' গ্রন্থে উপস্থাপিত সমতা বিষয়ক বিচার বোধে তিনি রুশো, লুই ব্লাঙ্ক, ফুরিয়ার, সালি, প্রুধোঁ এবং মিলের উত্তরাধিকার তত্ত্বের নজির দিয়েছেন। আন্তর্জাতিকতা এবং সাম্যবাদ তত্ত্ব তাঁর খুবই পছন্দসই হয়েছিল ; এগুলি রুশোর মতবাদের দার্শনিক ফলশ্রুতি বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। সাম্যবাদী দর্শন পাঠে তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন— এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হলেও নির্ভুল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর সুগভীর ক্ষোভ শুধুমাত্র সাম্যবাদী তত্ত্ব পাঠের প্রতিফলন বলে মনে হয় না। 'সাম্য' প্রবন্ধের ভূমিকায় ধনবৈষম্য তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : "যদু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যদু ছোটলোক ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং রাম বড়লোক।" তাঁর সমগ্র রচনায় সবচেয়ে আবেগধর্মী অনুচ্ছেদগুলি বাংলার কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে লেখা। "অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাঁর কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে। সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা ভূস্বামী, বণিক মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। ...ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে... জমিদার নামক বড় মানুষ কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।"[১৩৩] বাংলার জমিদারদের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ সমালোচনার কারণ তিনি বলেছেন : "যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্তের উপকারার্থে না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক।"[১৩৪] তাঁর প্রবন্ধের চরিত্র অসহায় পরান মণ্ডলের অশেষ দুঃখদুর্দশা, ছোটবড় সকলের কাছে লাঞ্ছিত হবার কাহিনী তার মতে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'কে তিনি বাংলার *Uncle Tom's Cabin* বলে প্রশংসা করেছিলেন। সম্ভবত তরুণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে বাংলার কৃষকদের দুর্দশার যে ছবি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার থেকেই তিনি সাম্যবাদী দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর এই মানসিকতা বহুদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। ১৮৭৩-৭৫ সালে লেখা 'সাম্য' প্রবন্ধ ১৮৭৯-তে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কৃষকদের দুরবস্থা নিয়ে লেখা অধ্যায়গুলি ১৮৯২-তে পুনঃপ্রকাশ করবার সময়, সাম্য বিষয়ক অধ্যায়টি ভুল মনে হওয়ায় তিনি ওটি বাদ দিয়েছিলেন। বৈষম্যের উৎপত্তি, স্বাভাবিক ও সামাজিক বৈষম্য এবং কৃত্রিম বৈষম্য কেন পরিহার করা উচিত— এ সব প্রশ্নের বিশ্লেষণে তিনি সাম্যবাদী লেখকদের রচনার উপর নির্ভর করেছিলেন।[১৩৫] অবশ্য যুক্তিগুলি তাঁর নিজস্ব আবেগের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যে বছর সাম্য প্রকাশিত হয়, সেই ১৮৯৭ পর্যন্ত অন্তত একদিকে নারী-পুরুষের বৈষম্য অন্যদিকে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব একই রকম কঠোর ছিল। হিন্দু সমাজে নারীদের প্রতি ব্যবহার তাঁর কাছে অসহ্য মনে হত। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে প্রগতির নেতা মিলের মতবাদ উল্লেখ করে তিনি নিজের দেশবাসীর প্রতি ধিক্কারকে জোরদার করেছিলেন। মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত করা, (তাদের অবরুদ্ধ রাখার প্রথাকে তিনি, "বন্য পশুর ন্যায় পিঞ্জরাবদ্ধ" বলে মন্তব্য করেছিলেন) এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা তাঁর মতে প্রচলিত সামাজিক বিধানের ঘৃণ্যতম অংশ। অসতী স্ত্রীকে স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার বিধানের জন্য তিনি ধর্মশাস্ত্রের সমালোচনা করেছেন, কারণ লম্পট স্বামীর জন্য অনুরূপ শাস্তির বিধান নেই। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন : "ইহা যদি ধর্মশাস্ত্র, তবে অধর্মশাস্ত্র কি ?"[১৩৬] স্ত্রী জাতিকে দাসত্বে অবরুদ্ধ রাখাই পুরুষ-প্রণীত সামাজিক বিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে তিনি মন্তব্য করেছেন, সক্ষোভে বলেছেন : "পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যও একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্ধেক অধিবাসী, স্ত্রী জাতি,— তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই।"[১৩৭]

পাশ্চাত্য সাম্যবাদী দর্শন তাঁর গভীর আবেগধর্মী চিন্তাধারাকে পুষ্ট করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের অন্য কয়েকটি ক্ষেত্র থেকে তিনি অনেক বেশি পরিমাণে ভাবনার ঋণ সংগ্রহ করেছিলেন। এক সময় মনে হয়েছে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লাসিকাল যুগের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি তিনি যুক্তি দিয়ে, হয়ত বা আবেগবশেও, পুরোপুরি মেনে নিয়েছেন। অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলে ভারতের কৃষিজ পণ্যের বাজার বৃদ্ধি পাওয়ায় তা দেশের সম্পদবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে বলে তাঁর ধারণা হয়েছিল। তাঁতশিল্প হ্রাস পেলেও সস্তা কাপড় পাওয়ায় অন্যদের সুবিধা হয়েছে এবং তাঁতিদেরও অন্যত্র শ্রম বিনিয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। "বিদেশীয় বণিকরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না,...বরং বিদেশীয় বাণিজ্যকারণ আমাদিগের দেশের ধনবৃদ্ধি হইতেছে।"[১৩৮] সংরক্ষণবাদের অযৌক্তিকতা এবং অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করার জন্য তিনি যথাক্রমে মিল ও বাক্‌লের বই পড়বার উপদেশ দিয়েছেন।[১৩৯] উৎপাদকের প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ধনবণ্টন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে অবশ্য তিনি ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদদের সর্বাংশে অনুসরণ করেননি। 'সাম্য' প্রবন্ধের সূচনায় তিনি এ বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং অবসরভোগী শ্রেণীর আয়ের সবটাই তিনি মুনাফা বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[১৪০] ১৮৯২ সালের সংস্করণে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তিনি স্বীকার করেছেন : "অর্থশাস্ত্রঘটিত ইহাতে কয়েকটা কথা আছে, তাহা আমি এক্ষণে ভ্রান্তি শূন্য মনে করি না। কিন্তু অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথা ভ্রান্তি আর কোন কথা ধ্রুব সত্য, ইহা নিশ্চিত করা দুঃসাধ্য।"[১৪১]

উপযোগবাদতত্ত্বের বহু সমালোচনা সত্ত্বেও, সমাজের প্রগতি বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারায় মিল এবং বেন্থামের প্রভাব সুস্পষ্ট।[১৪২] এমনকি পরবর্তীকালে লেখা তাঁর হিন্দু আদর্শের ব্যাখ্যারও অনেকখানি বেন্থামের কাছ থেকে নেওয়া।[১৪৩] আধুনিক ন্যায়শাস্ত্র এবং অর্থনীতি বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার জন্য তিনি মিলের কাছে ঋণী,[১৪৪] কিন্তু তাঁর কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল মিলের সামাজিক ন্যায় বিচার তত্ত্ব। 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত মিলের মরণোত্তর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে[১৪৫] তিনি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষাব্যবস্থা, ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব জনস্বার্থে ব্যয় এবং স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ে মিলের মতামতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 'সাম্য' প্রবন্ধে বারবার মিলের সাম্যতত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। যেকথা আগেই বলেছি, সম্ভবত অভিন্ন মানসিকতার জন্যই বঙ্কিম তাত্ত্বিক যুক্তি এবং বাস্তব কার্যসূচির জন্য মিলের সাম্যবাদী প্রবন্ধ থেকে উদাহরণ নিয়েছেন।

বঙ্কিমের চিন্তাধারায় সবচেয়ে গভীর এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল কোঁৎ-এর মানবিকতার ধর্ম এবং প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কিছু বাঙালি বুদ্ধিজীবী কোঁৎ-এর দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই 'বঙ্গদর্শন'-এ লিখতেন। বাংলায় প্রত্যক্ষবাদ ও মানবিকতাবাদী ধর্মের প্রধান প্রবক্তা এবং বঙ্কিমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষও এই দলে ছিলেন। এই আকর্ষণের অনেক কারণ ছিল। যে সব সমাজ-সংস্কারক প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদনের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষবাদী শৃঙ্খলার মাধ্যমে প্রগতির ধারাটি খুবই পছন্দসই হয়েছিল। কোঁৎ যে সমাজকে ব্যক্তির উপরে স্থান দিয়েছিলেন, তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য। মিলের মরণোত্তর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে বঙ্কিম এর উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। বিদেশীরা কুৎসা রটনা করছিল বলেই বোধহয় হিন্দু সমাজ ও ধর্মের প্রতি আনুগত্য নবোন্মেষিত জাতীয়তাবাদী আত্মসচেতনতার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা ছাড়া প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে মেনে নেওয়ার যথার্থ আপত্তি ছিল মাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকজনেরই, আবার তাঁদের মধ্যেও অল্প কয়েকজনই সত্যি সত্যি সব রীতিনীতি ত্যাগ করার কথা ভেবেছিলেন। খুবই সীমিত দু-একটি গোষ্ঠী এবং কয়েকজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি প্রকাশ্য বিরোধিতার সাহস দেখিয়েছিলেন। প্রধানত বিদেশী শাসকদের উপর নির্ভর করে যাদের বাঁচতে হত, সেই ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের পক্ষে সামাজিক বা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। জমিদারী প্রথা প্রবর্তনের ফলে কৃষকশ্রেণীর দুর্দশার রোমহর্ষক বিবরণ দিয়ে বঙ্কিম সামান্য সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করেছেন এবং সদাশয় জমিদারদের সদবিবেচনার জন্য অনুরোধ করেছেন, কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রত্যাহারে "ঘোরতর বিশৃঙ্খলা" এবং ব্রিটিশদের পক্ষে শর্তভঙ্গের অপরাধ হতে পারে।[১৪৬] এই পরিস্থিতিতে প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলাই যুক্তিযুক্ত। এই মতবাদের পক্ষে কোঁৎ বলিষ্ঠ দার্শনিক যুক্তির অবতারণা করেছেন। হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ বলে চিহ্নিত পুরোহিত শ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধাসূচক উল্লেখ থাকায় কোঁৎ-এর মতবাদ সাদরে গৃহীত হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদে আকৃষ্ট হয়ে যাঁরা অন্ধবিশ্বাস বা গোঁড়ামি-বিরোধী ছিলেন, ফলত কোনো বিশেষ ধর্মমতের গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিলেন না, তাঁদের কাছে মানবিকতার ধর্মের বিশেষ আবেদন ছিল। মননশীলতার দুই পৃথক পর্যায়ে বঙ্কিম মানবসমাজের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোঁৎ-এর আশাবাদী কার্যসূচির দুটি ভিন্নধর্মী উপাদান গ্রহণ করেছিলেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর নিজের আশা অবিসংবাদীরূপে মানবিকতার ধর্মে অনুপ্রাণিত : "...পরসুখবর্ধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল্য আছে কি ? নাই। ...এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, একদিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে।"[১৪৭] ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে মনুষ্যজাতির প্রতি ভালবাসায় বিশেষ কোনো দর্শনের প্রভাব নাও থাকতে পারে, কিন্তু কোনো তাত্ত্বিক আদর্শের উপস্থাপনার মধ্যে যদি লেখকের পছন্দসই দার্শনিকের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়, তাহলে প্রভাবের প্রশ্ন উঠতেই পারে। পরবর্তীকালে তাঁর উপদেশাত্মক রচনাবলীতে মানুষের সদ্বৃত্তিগুলির সুষম বিকাশের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক কোঁৎ-এর তত্ত্বের প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু বঙ্কিম-মানসে তাঁর মানবতাবাদী দর্শনের প্রভাব হয়েছিল চিরন্তন।[১৪৮] পছন্দের ব্যাপারে কোঁৎ-এর প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ধরা পড়ে যখন কোঁৎকে সমালোচনা করায় মিলকে তিনি "মানবজাতির প্রতি অপরিকল্পিত ক্ষতিসাধন" করেছেন বলে দোষারোপ করেছেন।

বঙ্কিমের যুক্তিবাদ কিন্তু তাঁর চিন্তা ও অনুভূতির একটি বিশেষ জায়গাকে স্পর্শ করতে পারেনি। অলৌকিকত্বে বিশ্বাস তাঁর মনোজগতে একটি চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছিল বলে মনে হয়। প্রতিটি উপন্যাসে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সন্ন্যাসীদের উপস্থিতি এবং সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মোকাবিলায় তাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের পরিবারে প্রচলিত ছিল যে তাঁর পিতার গুরুদেব তিব্বতে বাস করতেন এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি মৃত যুবক যাদবকে পুনর্জীবন দিয়েছিলেন। এই ধারণা লেখকের রোমান্টিক মানসিকতাকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু কালিনাথ দত্ত নামে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বঙ্কিমের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাসের কথা লিখেছেন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর মন্ত্রশক্তিতে আস্থা জন্মেছিল বলে জানিয়েছেন। জ্যোতিষেও তাঁর বিশ্বাস ছিল; অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতিতে ছোট মেয়ের মৃত্যুতে এই আধাবিজ্ঞানে তিনি আস্থা হারান। এই সামঞ্জস্যহীনতা তাঁর চরিত্র থেকে কখনোই মুছে যায়নি, এমন কি যখন তিনি ঘোরতর সংশয়বাদী, তখনও নয়।[১৪৯]

বঙ্কিমের সাহিত্যিক জীবনে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ এক সন্ধিক্ষণ। তখন তিনি যা লিখতেন তাতেই একটা উপদেশাত্মক সুর প্রচ্ছন্ন থাকত। এ সময়ে তার জীবনের উদ্দেশ্য হয়েছিল জাতীয় নবজাগরণের জন্য একটা সুবিন্যস্ত আদর্শ গড়ে তোলা। এই নব্যাদর্শকে তিনি মানুষের ধর্মবোধের চূড়ান্ত পরিণতি, মৌলিক হিন্দুধর্ম বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ১৮৮২ থেকে এই মনোভাব তাঁর সাহিত্য প্রতিফলিত হলেও অনেকদিন আগে থেকেই তাঁর লেখায় হিন্দুধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং ধর্মতত্ত্বের প্রতি আগ্রহ লক্ষ করা যায়। অনেক আগে, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে, সমগ্র হিন্দু দর্শনকে "ভুলের বোঝা" বলে বাতিল করার অল্পদিন পরেই সমসাময়িকদের হিন্দু ধর্মের বিনাশ সাধনের প্রয়াসকে তিনি ব্যঙ্গ করেছিলেন। পাশ্চাত্য হিতবাদের অন্ধ অনুকরণ এবং তার ফলে "যে ঐতিহ্যে জাতীয় ঐক্যবোধের ধারা নেই, সেখানে সামাজিক সংহতিই একমাত্র সূত্র"[১৫০] হিন্দু যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে বলে তাঁর ভয় হয়েছিল— এবং সেই ভীতি থেকেই এই বিদ্রূপের সৃষ্টি। দু বছর আগে হিন্দুধর্মের যে ত্রয়ী শক্তিকে তিনি আজগুবী বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, ১৮৭৫-এ তাকেই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অন্যান্য যে কোন কল্পনার তুলনায় ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্বের সবচেয়ে কাছাকাছি বলেছিলেন। একজন সর্বশক্তিমান, যিনি নিজেই নিজের সৃষ্টি ধ্বংস করেন, এই কল্পনার চেয়ে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য তিন পৃথক শক্তির অস্তিত্বকেই তাঁর বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল : "মহাবিজ্ঞান-কুশলী ইউরোপীয় জাতির অবলম্বিত খ্রিস্টধর্ম অপেক্ষা হিন্দুদিগের ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানসম্মত এবং নৈসর্গিক।" তিনি অবশ্য বলেননি যে হিন্দু ঋষিরা অনেক আগেই ডারউইনের তত্ত্ব জেনেছিলেন, হিন্দু ত্রিদেবের অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেবার চেষ্টাও করেননি, শুধুমাত্র বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধির মধ্যে ঋষিদের স্বতঃলব্ধ প্রগাঢ় জ্ঞান এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দৈবীশক্তির কল্পনার উপর জোর দিয়েছিলেন। গৌরবময় অতীতের প্রতি নবলব্ধ আস্থাকে তিনি অতি সন্তর্পণে দাঁড় করিয়েছিলেন। তবে যুক্তিবাদের সীমা লঙ্ঘন না করার বিষয়ে তিনি সর্বদাই সচেতন ছিলেন— সেটা তিনি কখনোই ভোলেননি।[১৫১]

তাঁর নতুন জীবনদর্শনের একটি বিশেষ উপাদান হল ভক্তি, যাকে কোনোমতেই পাশ্চাত্য গুরুদের কাছ থেকে পাওয়া বলা যায় না। তাঁর পূর্বজীবনের নাস্তিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত এই মনোভাব। কিন্তু এ প্রসঙ্গেও তাঁর মানসিকতার বৈপরীত্য লক্ষণীয়। কৃষ্ণের জীবনে প্রেমের ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর অহেতুক কৌতূহল সত্ত্বেও বলতে হয় যে, পরিবারের গভীর আবেগময় বৈষ্ণব ভাবধারার প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন না। 'আনন্দমঠে'-এ বারংবার উল্লিখিত সংস্কৃত স্তোত্র "হরে মুরারে" বাল্যকালে তাঁর প্রিয়, গান ছিল।[১৫২] 'বঙ্গদর্শন'-এর সংশয়বাদী সম্পাদক কিন্তু বৈষ্ণবদের ভক্তিগীতি কীর্তন শুনতে ভালবাসতেন, এমনকি একবার পত্রিকার টাকাকড়ি এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কীর্তনিয়াকে দিয়ে দিয়েছিলেন বলেও জানা যায়।[১৫৩] গৃহদেবতা রাধাবল্লভের প্রতি তাঁর অটুট বিশ্বাসের অন্তত তিনটি নিদর্শন দেখানো যেতে পারে, যদিও কৃষ্ণের জীবনের ঐতিহাসিক বিবরণে নেই বলে পরকীয়া প্রেমের ঘটনাটিকে তিনি রূপক কাহিনী বলে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছেন। জীবনের উত্তরকালে এক বিশেষ মানসিক পরিস্থিতিতে পূর্ণতা লাভ করলেও শৈশবের পারিবারিক প্রভাবে ভক্তিবাদ তাঁর হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। জীবনের উত্তরকালে তিনি যে সচেতনভাবে পাশ্চাত্য মূল্যবোধকে অস্বীকার করেছিলেন তার মূলে ছিল শৈশবের গভীর ভক্তিময় পরিবেশের প্রভাব-পুষ্ট তাঁর আবেগময় সত্তার বিকাশ। হিন্দু পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে রেভারেন্ড হেস্টি-র অমার্জিত উক্তিতে হয়ত তাঁর শৈশবের স্মৃতি-বিজড়িত পারিবারিক পূজার্চনার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।[১৫৪] হেস্টির মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রথমে ছদ্মনামে ও পরে লেখকের স্বাক্ষরে, কলকাতার 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজে প্রকাশিত তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তরের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থার প্রথম প্রকাশ। কোনও ব্যক্তি যতবড় পণ্ডিতই হোক না কেন, যে ধর্মে তাঁর আস্থা নেই, সেই ধর্মমতের যাথার্থ্য তিনি বিচার করতে পারেন কি না, বঙ্কিম সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। বেদকে তিনি নিষ্প্রাণ বলেছেন, কিন্তু হিন্দুধর্মে যে সব মূর্তির পূজা প্রচলিত সেগুলি দেবত্বের প্রতীক বলেই পৌত্তলিকতাকে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন।[১৫৫]

ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মতবাদের বিবর্তনের পরবর্তী অধ্যায় দেখতে পাওয়া যায় প্রত্যক্ষবাদী বন্ধু যোগেন ঘোষকে ইংরাজিতে লেখা একগুচ্ছ চিঠির মধ্যে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের এই চিঠিগুলি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় লেখাও শেষ হয়নি, প্রকাশিতও হয়নি। সর্বভারতীয় পাঠকদের উদ্দেশ্যে তিনি এই চিঠিগুলি লিখেছিলেন, কারণ প্রথম চিঠিতেই লিখেছেন : "সমস্ত হিন্দুর উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাইলে তা ইংরাজিতে লেখা প্রয়োজন।" জনৈক বন্ধুকে তিনি বলেছিলেন যে হেস্টির সঙ্গে তাঁর তর্কযুদ্ধ হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের নিজ ধর্মে কিছুটা আস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে।[১৫৬] এই মন্তব্যে তাঁর প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। ১৮৮৩-তে তিনি 'নবজীবন' পত্রিকায় 'ধর্মতত্ত্ব' প্রকাশ করতে শুরু করেন।[১৫৭] পরের বছর তাঁর স্বপ্রতিষ্ঠিত নতুন পত্রিকা 'প্রচার'-এ 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার নামের মধ্যেই তার উদ্দেশ্য নিহিত আছে। এই দুটি বৃহদাকার রচনা ছাড়াও— ১৮৯২-তে প্রকাশিত 'কৃষ্ণ চরিত্রে'-এর পরিমার্জিত সংস্করণ তাঁর সর্ববৃহৎ রচনা— প্রাসঙ্গিক অনেক প্রবন্ধ তিনি ঐ দুটি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই সব প্রবন্ধের কিছু কিছু আদর্শ তাঁর দেশাত্মবোধক উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এ আগেই গৃহীত হয়েছিল এবং পরে 'দেবী চৌধুরাণী'তে আরও বিশদ করা হয়েছিল। তাঁর শেষ উপন্যাস 'সীতারাম'কে নীতিসার বলা যায়— ধর্ম থেকে বিচ্যুত মানুষের পরিণতি কি হতে পারে তারই উদাহরণ।

বঙ্কিমের মানসিক এবং সাহিত্যিক বিকাশের চর্চা করতে গেলে তাঁর জীবনের অত্যন্ত সৃজনশীল দশকে তিনি যে বহুমুখী সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন তাতে আদর্শের পরিবর্তন এবং অর্থের বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হিসাবে দুটি কারণে তাঁর জগৎ-দর্শন এই শেষ পর্বে সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল বলে আমি মনে করি। প্রথমত, এই সময়ে তাঁর আদর্শবাদে একটা মৌলিক ঐক্য ছিল ; পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সঙ্গে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, তা স্পষ্ট, যদিও হিন্দুধর্মে তিনি নতুন করে আস্থা ফিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছিলেন বহুদিন আগে— ১৮৭৫-এ। দ্বিতীয়ত, আদর্শগত পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের প্রশস্তির বিরতি। বঙ্কিমের সাহিত্যজীবনের দুই পর্বে আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি যে ভিন্নধর্মী মানসিকতা সৃষ্টি করেছিল, এখানে তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' 'লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি।" 'ধর্মতত্ত্ব'-এর একাদশ অধ্যায়ে শিষ্যের প্রতি গুরুর এই উক্তির মধ্যে বঙ্কিমের আত্মদর্শনের নির্ভুল স্বাক্ষর আছে। সুদীর্ঘকালীন এই জিজ্ঞাসার যে উত্তর তিনি পেয়েছিলেন, পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত রচনাগুলিতে তিনি তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, এই আলোচনায় ব্যক্তিবিশেষের গভীর আধ্যাত্মিক প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ সুচিন্তিত প্রশ্ন : শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত ; আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যতখানি মিল, বেন্থাম, কোঁৎ এবং সীলির উপর নির্ভর করেছেন ততখানিই করেছেন শাণ্ডিল্য এবং গীতার উপর ; সেই সঙ্গে আছে দেশাত্মবোধ যাতে দেশমাতৃকা দেবীরূপে আরাধ্য। পূর্ববর্তীকালের রচনায় বঙ্কিম বলতে চেয়েছেন যে অন্ততপক্ষে আত্মমর্যাদা বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোনও কোনও বিষয়ে ভারতীয়দের নিজেদের পশ্চিমীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করা উচিত।[১৫৮] অবশ্য যুক্তিবাদী মূল্যায়নের দ্বারাই এই গৌরববোধ গড়ে তুলতে হবে, অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে শূন্যগর্ভ আস্ফালন করে নয়। ইতিপূর্বে ভারতীয়দের শ্রেষ্ঠত্বের কোনও নিদর্শন তিনি পাননি। যে সময়ে বঙ্কিম ধর্ম সম্বন্ধে লিখতে শুরু করেন, সেই সময়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক হিন্দুত্বের গর্ব দেখা দিয়েছিল। এই মতবাদের প্রবক্তাগণ, বিশেষত শশধর তর্কচূড়ামণি,[১৫৯] দাবি করতেন যে আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি সবই প্রাচীন ভারতের জানা ছিল, এবং আপাতদৃষ্টিতে যেগুলিকে কুসংস্কার মনে হয়, হিন্দুধর্মের সেই লোকাচারগুলি গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে উদ্ভূত। তাঁর কয়েকটি বক্তৃতা শুনে বঙ্কিম এই ধরনের সিদ্ধান্তকে অজ্ঞতাজনিত মূর্খতা বলে পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মতে কুসংস্কারগ্রস্ত আচারআচরণ সম্বলিত ধর্মমত পাশ্চাত্যধারায় শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের প্রয়োজন উন্নতমানের ধর্ম।[১৬০] প্রাচীন বৈদিক ধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য স্বামী দয়ানন্দের প্রচেষ্টাকেও তিনি সমর্থন জানাননি। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত আবর্জনার রাশি অপসারিত করে হিন্দুধর্মের অমলিন রূপটি উদ্ঘাটন করাই তখনকার প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন।[১৬১] এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, অলৌকিক তত্ত্ব, খ্রিস্টিয় আলোচনা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস পাঠকে কাজে লাগিয়েছিলেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি মনোমত সিদ্ধান্তকে দাঁড় করাবার জন্য বৈজ্ঞানিক মনোভাব বিসর্জন দিয়েছিলেন। পৌরাণিক কাহিনীর ব্যাখ্যায় যে সব ঘটনা তাঁর ভিক্টোরিয় মূল্যবোধকে আঘাত করেছিল (ইন্দ্র কর্তৃক অহল্যার সতীত্বহানির ঘটনাটি তিনি মেনে নিতে পারেননি, সেটি তাঁর কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য বলে মনে হয়েছিল) সেগুলি তিনি হয় প্রক্ষিপ্ত বলে পরিত্যাগ করেছিলেন, না হয় আক্ষরিক অর্থের পরিবর্তে নিজের মনগড়া ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এবং আক্ষরিক অর্থকে ভেজাল হিন্দুধর্ম বলে ধিক্কার জানিয়েছিলেন।[১৬২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিমের যুক্তিবাদী পদ্ধতি আরও ভাল করে গড়ে উঠেছে। উপাদানগুলিকে সময়ানুক্রমে সাজিয়ে তাদের মধ্য থেকে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে তিনি আলাদা করেছিলেন। মহাভারতে বিবৃত ঘটনাবলী এবং চরিত্রগুলিকে, বিশেষত কৃষ্ণকে তিনি ঐতিহাসিক বলে মেনে নিয়েছিলেন। অলৌকিক ঘটনাবলী তাঁর মতে ভেজাল এবং প্রক্ষিপ্ত। উত্তরকালে লেখা অধ্যায়গুলিতে বিবৃত ঘটনাবলীও তিনি একই কারণে বর্জন করেছিলেন। ফলত, প্রধানত মহাভারতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক চরিত্ররূপে উপস্থাপন করেছেন। গোপিনীদল এবং রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের লীলাখেলাকে তিনি উত্তরকালে সংযোজিত অনৈতিহাসিক আখ্যান বলেছেন। এর আগে তিনি দেখিয়েছেন যে এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে সাংখ্য-বর্ণিত পুরুষ ও প্রকৃতিতত্ত্বকে উপকথায় পরিণত করা হয়েছে, ঐতিহাসিক ব্যক্তি কৃষ্ণকে অবতাররূপে 'পুরুষ' বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বঙ্কিমের লেখনীতে কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষরূপে চিত্রিত হয়েছেন, সুতরাং মহাভারতে বর্ণিত যে সব ঘটনা তাঁর বিবেকসম্মত নয়, সেগুলি হয় মিথ্যা বলে বাদ দিয়েছেন, না হয় সাধারণ লোকের বোধগম্য নয়, এমন কোন উচ্চআদর্শযুক্ত বলে দেখিয়েছেন। কৃষ্ণকে তিনি ঈশ্বরের অবতার বলে বিশ্বাস করতেন। "পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।" —এ ছাড়া নিজের বিশ্বাসের আর কোনও ব্যাখ্যা তিনি দেননি।[১৬৩] বঙ্কিমের প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিণতি এই সৃষ্টি তাঁর দক্ষতার নির্দশন হয়ে আছে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের উপর এর কোন প্রভাব পড়েনি। হিন্দুধর্মের আদর্শ কৃষ্ণ নিখুঁৎ-চরিত্র বলেই এই ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব—তাঁর এই বিশ্বাস কিন্তু অনেকেই মেনে নেননি। তাঁর ব্যাখ্যার ত্রুটিগুলি তাঁর সমসাময়িকদের নজর এড়ায়নি।

পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তের সমর্থনে ঘটনার উপস্থাপনার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দুধর্মের স্বরূপটি জানবার আগ্রহের মধ্যে তাঁর যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের প্রবণতা অনস্বীকার্য। ঈশ্বর-সৃষ্ট-ধর্ম তত্ত্ব তিনি অস্বীকার করেছিলেন। এমনকি বেদও মনুষ্য-সৃষ্ট বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাঁর মতে প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। তাছাড়া, "ধর্মের যে নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, হিন্দু ধর্ম তাহার উপর স্থাপিত। তাই হিন্দু ধর্মের যাথার্থ্য ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা যাইতে পারে।"[১৬৪] হিন্দুয়ানির আচারের সঙ্গে হিন্দুধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই, কিন্তু সেগুলিকেই হিন্দুধর্ম বলে মনে করা হয়। দার্শনিক মতবাদ, সামাজিক রীতিনীতি, লোকাচারগত অনার্য বিশ্বাস এবং প্রথা পৃথিবীর সর্বত্রই আছে এবং "অপবিত্র, কলুষিত দেশাচার বা লোকাচার ছদ্মবেশে ধর্ম বলিয়া হিন্দুধর্মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে," সবকিছুই হিন্দুধর্ম বলে চলছে। যে বিশ্বাসের ফলে একই রকম ব্যবহার, এক মতবাদ এবং তার দরুন পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবোধ জন্মায়, তাকেই তিনি ধর্মমত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। হিন্দুধর্মের আপাতবৈচিত্র্যের মধ্যে পরিবর্তনাতীত এমন কতগুলি শাশ্বত সত্য আছে, যেগুলির মাধ্যমে হিন্দুধর্মের সংস্কার, পুনরুন্নয়ন ও পবিত্রকরণ সম্ভব। ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে ঐ ধর্মের যে নীতিগুলি অবান্তর আনুষঙ্গিকে পরিণত হয়েছে, অতীব ক্ষতিকর, জরাজীর্ণ সেই প্রথাগুলিকে অপ্রয়োজনীয় বলে পরিত্যাগ করতে হবে।[১৬৫] এসব সত্ত্বেও কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্যের গুরুত্ব কম নয়। বৈদিক ধর্মমতে প্রাকৃতিক শক্তির অর্চনা করে হিন্দুদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়েছে, তার দ্বারা তারা স্রষ্টার সৃষ্টি বিষয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্মোহিত হয়ে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, ইসলাম, ইহুদী ধর্ম প্রভৃতি কঠোর একেশ্বরবাদী ধর্মে যা সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেন।[১৬৬] বহু-ঈশ্বরবাদে তিনি লজ্জার কিছু পাননি। তিনি নিজে যদিও একেশ্বরবাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁর মতে বহু-ঈশ্বরবাদের পক্ষে যেমন, একেশ্বরবাদের পক্ষেও তেমনি কোনও যুক্তি নেই। তাছাড়া প্রকৃতিতেও এমন কোনও উদাহরণ নেই যা দিয়ে তার সৃষ্টিকর্তাকে সর্বশক্তিমান বলে প্রমাণ করা যায়। ধর্মবিশ্বাসের বিবর্তনে বহু-ঈশ্বরবাদ সৃষ্ট হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন— যে বিবর্তনের প্রারম্ভে প্রকৃতির নৈর্ব্যক্তিক আত্মা এবং ক্রমশ ত্রিদেব ইত্যাদির উপলব্ধি।[১৬৭] বৈদিক ধর্মের বীজ থেকে জন্ম নিয়েছে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের মহীরুহ। "বাঁদর পরিবৃত হলেও" গাছটি বীজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।[১৬৮] পৌত্তলিকতার সপক্ষে তিনি বহুপ্রচলিত যুক্তি ব্যবহার করেছেন : "যাহার জ্ঞান নাই তাহার পক্ষে নিরাকার ঈশ্বরের একটি রূপ কল্পনা করিয়া চিন্তা করা সহজ উপায়।"[১৬৯] কিন্তু ১৮৭৪-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে[১৭০] তিনি পৌত্তলিকতাকে অপ্রয়োজনীয় এবং অতীব ক্ষতিকর বলেছেন, কারণ, "সাকার ধর্ম বিজ্ঞান-বিরোধী, জ্ঞানোন্নতির কণ্টক এবং জ্ঞান এবং স্বানুবর্ত্তিতার গতিরোধ করিয়া সাকার পূজা সমাজের গতিরোধ করে।" এর একটি সুফল হল যে "ইহা কাব্য এবং সূক্ষ্ম শিল্পের অত্যন্ত পুষ্টিকারক।" কোনও কোনও সময়ে তিনি ধর্মশাস্ত্র এবং লোকাচারকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিয়েছেন, ধর্মশাস্ত্রই ভারতের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ বলেছেন। কতগুলি নিষ্প্রাণ আচার-আচরণের মাধ্যমে শুচিতা রক্ষার ধর্মকে একটা "পৈশাচিক কল্পনা" বলেছেন।[১৭১]

Letters on Hinduism প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন, "সর্বাপেক্ষা ব্যাপ্ত এবং উচিত অর্থে ধর্মই ঐতিহ্য।"[১৭২] ধর্মতত্ত্বে তিনি সিলির যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, এটি তারই সংক্ষিপ্তসার। "মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম"। "Culture হিন্দুধর্মের সারাংশ"— হিন্দুরা 'ধর্ম' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত করে। "ধর্ম কখন রিলিজনের প্রতি, কখন নীতির প্রতি, কখনও অভ্যস্ত ধর্মাত্মার প্রতি এবং কখনও পুণ্য কর্মের প্রতি" প্রযুক্ত হয়। এমনকি প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর মাধ্যমে বিজ্ঞানও ধর্ম শব্দটির অন্তর্গত।[১৭৩] তাছাড়া, সব ধর্মমতের অন্তঃস্থিত নিত্য পদার্থই হল ধর্ম।[১৭৪] মানুষের সমস্ত শারীরিক এবং মানসিক শক্তির সম্যক অনুশীলন ও পরিচালনই ধর্ম। এই মন্তব্যের সপক্ষে বঙ্কিম, সিলি, কোঁৎ এবং ম্যাথু আর্নল্ডের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন বটে কিন্তু হিন্দুধর্মের অনুশীলন তত্ত্বকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন। প্রাচীনকালে অনুসৃত চতুরাশ্রম সেই সংস্কৃতির সমৃদ্ধির পরিচায়ক। কোঁৎ-এর মানবিকতার ধর্ম তাঁর মতে ধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হলেও নিরীশ্বরবাদী বলে তা অসম্পূর্ণ।[১৭৫] একটি প্রবন্ধে তিনি মিলের মতবাদের সমর্থন করে বলেছেন : "আপনার উন্নতিসাধন, আপনার আনন্দবর্দ্ধনই ধর্ম।"[১৭৬] "বহুজনহিতায়"— উপযোগবাদীদের এই তত্ত্বকে তিনি ধর্মের অঙ্গ বলে স্বীকার করলেও একে তিনি পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন বলে মানতে পারেননি।[১৭৭] জীবনের প্রথম দিকে তিনি কোঁৎ-এর মানবিকতাবাদ গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু পরে হিন্দুধর্মের মধ্যেই তিনি মানবতাবাদ উপলব্ধি করেছিলেন : "মনুষ্যে প্রীতি হিন্দুশাস্ত্রের মতে ঈশ্বরে ভক্তির অন্তর্গত ; মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই ; ভক্তি ও প্রীতি হিন্দুধর্মে অভিন্ন, অভেদ্য...।" ইন্দ্রিয়সুখ অথবা আত্মতৃপ্তির পথের অনুসন্ধান তাঁর মতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বপ্রকার সন্ন্যাসের মতই ব্যবহারের অযোগ্য। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে অনুশীলন বা কৃষ্টি জগতের সঙ্গে একাত্মতা, তার প্রতি বিমুখতা নয়।[১৭৯] "এক্ষণে যাহাকে সমুদয় চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তি ও পরিণতি বলিতেছি, তাহার শেষ ফল পবিত্রতা— চিত্তশুদ্ধি। ...অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ। ...বৃত্তির অনুশীলনের চরম উদ্দেশ্য সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা।"[১৮০] আবার, "সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম বলি না— অন্তত সম্পূর্ণ ধর্ম বলি না। অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ, সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম, অনুশীলন কর্মাত্মক।" নির্লেপ বা নিস্পৃহা অনুশীলন তত্ত্বের পরিপূরক, হয়ত বা দ্বিতীয়টি প্রথমটির অনুগামী— সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা শক্ত হলেও অনুশীলনের উদ্দেশ্য যে "সমুদয় চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি ও পরিণতি", তা একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং তাঁর সৃষ্ট নিয়মাবলী— যা ধর্ম নামে পরিচিত, তার অনুসরণেই সম্ভব। উপসংহারে বলা যায় যে, দেবতাকে সমর্পণ করার উদ্দেশ্য "সমুদয় চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি"তেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হলেও, পরলোকে বিশ্বাস থাক বা না থাক, দেবতাকে বাদ দিয়ে ধর্ম সম্ভব নয়।[১৮১] বঙ্কিমের যুক্তিবাদী সত্তা এখানে তাঁর যুক্তিজালে কিছু অসতর্ক বিরুদ্ধ-যুক্তির অবতারণা করেছে। যে সময়ে তিনি 'ধর্মতত্ত্ব' লিখেছেন, প্রায় সেই একই সময়ে লেখা *Letters on Hinduism* প্রবন্ধে তিনি তর্ক তুলেছেন যে ঈশ্বর বা দেবতা— যাঁর অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নেই— তাঁর উপর বিশ্বাসই যে ধর্ম, একথা মানতে অন্তত তিনি রাজী নন, এবং অন্য কেউ বিশ্বাস করে কি না, তাতেও তাঁর কিছু এসে যায় না।[১৮২]

"ভক্তিবাদ" বা দেবতার প্রতি ভক্তি-প্রীতির মধ্যেই ধর্মের সব নির্দেশ গ্রথিত হলেও ভক্তির নিজস্ব কতগুলি উপলক্ষ বা উপাদান আছে। এই উপাদানগুলি ব্যাখ্যা করার সময় বঙ্কিম কোঁৎ-এর নির্দেশ অনুসরণ করেছেন। হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে পরিবারের গুরুজনরা শ্রদ্ধেয়। হিন্দু রীতি অনুসারে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তির পরিপূরক রূপে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠা উচিত বলে বঙ্কিম মনে করতেন, কারণ কোঁৎ-কথিত এই নীতি উচ্চতর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমাজকেও ভক্তি করা উচিত, কারণ সামাজিক সংগঠন ছাড়া সভ্য মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। একই কারণে রাজা এবং সমাজ-নেতাগণও ভক্তির পাত্র। সামাজিক সংহতি ও সমৃদ্ধির জন্য ব্যক্তি হিসাবে নয়, বরং সামাজিক ক্ষমতার মূর্ত প্রকাশ বলেই রাজার প্রতি আনুগত্য একান্ত প্রয়োজন। আনুগত্যবোধ জাগিয়ে তুলতে পারে এই আশায় তিনি লর্ড রিপনের প্রতি সাম্প্রতিক অভিনন্দনের ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন।

উচ্চপদাধিকারী তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীর তুলনায় নিম্নমানের ব্যক্তি হলেও কর্মক্ষেত্রে তাঁর প্রতি আনুগত্য সামাজিক প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনও কারণেই ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে থাকা উচিত নয়। ঔপনিবেশিক শাসনের অনিবার্যতা, হয়ত বা আবশ্যিকতাও, মেনে নিয়েই আত্মমর্যাদা রক্ষার উপায় হিসাবে বঙ্কিম নৈতিকতার উপর জোর দিয়েছেন। পাপাচারী রাজাকে অন্যায় থেকে নিরস্ত করার প্রচেষ্টা প্রজাদের আনুগত্যের অন্যতম লক্ষণ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। আগে দেখিয়েছি যে 'আনন্দমঠ'-এ তিনি উগ্রতর পন্থাগ্রহণ অনুমোদন করেছেন। 'সাম্য' এবং পূর্ববর্তী অন্যান্য প্রবন্ধের আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে 'ধর্মতত্ত্ব'-এ তিনি ব্রাহ্মণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেণীর প্রতি আনুগত্যের পক্ষে দীর্ঘ তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এক অনন্য সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার সমস্ত কৃতিত্ব তিনি ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে দিয়েছেন। মানবসমাজের প্রতি নিষ্কাম কর্মের আদর্শ উদাহরণ তাঁরা। এমনকি নিজেদের প্রতি অন্যান্যদের আনুগত্যের নির্দেশকেও তিনি সমাজের সংহতি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখবার জন্য ব্রাহ্মণশ্রেণীর নৈর্ব্যক্তিক প্রয়াস বলে দেখিয়েছেন। যারা এর অন্যরকম ব্যাখ্যা করে, তাদের তিনি "অর্ধশিক্ষিত বাঁদর" বলেছেন।[১৮৩] জাতিভেদ প্রথা জনসাধারণকে দাসত্বে আবদ্ধ করে রেখেছে— আগে এই মত পোষণ করলেও পরে তিনি এই ব্যবস্থাকে সমদর্শী এবং উন্নতিসাধক বলেছেন।[১৮৪] পুরুষ ও নারীর সাম্যবিষয়ক মতটিও অসম্ভব বলে পরিত্যক্ত হয়েছে, কারণ প্রকৃতিই দুইজনের জন্য দু ধরনের কাজ নির্দিষ্ট করে রেখেছে এবং ঐ বিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন করতে গেলে সমাজকেই আগে ধ্বংস করতে হবে।[১৮৫] সুতরাং 'সাম্য' প্রবন্ধের বক্তব্য ভুল বলে তিনি যে তার প্রচার বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিছুটা অপ্রত্যাশিত মন্তব্য দিয়ে তিনি 'ধর্মতত্ত্ব'-এর উপসংহার করেছেন। ঈশ্বরকে নিবেদন করবার জন্য "সকল বৃত্তির সম্যক স্ফূর্তি" এবং মানবজাতির সেবাই যদি মানুষের ব্রত হয়, তাহলে দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধ— আগে যাকে বঙ্কিমের চিন্তার প্রধান উদ্দেশ্য বলেছি— তার কোন গুরুত্ব থাকে না। কিন্তু 'ধর্মতত্ত্ব'-এ তিনি লিখেছেন : "স্বদেশপ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত"—গুরুশিষ্যের কথোপকথন-আকারে লিখিত এই গ্রন্থে শিষ্যের প্রতি গুরুর এই উপদেশ দিয়ে উপসংহার করেছেন। "স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম" (একবিংশতিতম অধ্যায়) বলে তিনি দেশের প্রতি কর্তব্যের ভূমিকা স্পষ্ট করেছেন। পরে মানবজাতির মঙ্গলের জন্য আত্মরক্ষার প্রয়োজন— হার্বার্ট স্পেন্সরের এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন (ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়)। ক্রমে ঐ দার্শনিকের আরও উক্তি তিনি উদ্ধৃত করেছেন : "আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম।" সম্পূর্ণ আক্ষরিক অনুবাদ না করে স্পেন্সরের বক্তব্যের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করে social organism-কে তিনি দেশ বলেছেন* (চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়)। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্যের আগ্রাসী নীতি পরিত্যাগ করে "দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতির" মধ্যে নতুন করে ভারসাম্য গঠন। কিন্তু স্বদেশরক্ষা তাঁর মতে অত্যাবশ্যক কর্তব্য। প্রাচীন ভারতীয়রা "দেশপ্রীতি সার্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন", তা ঠিক হয়নি। তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন যে বিশ্বহিতৈষণার আদর্শ যতই উচ্চ হোক তা দেশের প্রতি কর্তব্যের সমার্থক নয়। কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণতার সঙ্গে শরীরচর্চা এবং অস্ত্রচালনা শিক্ষার মাধ্যমে ওই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে— সুদীর্ঘকাল শিক্ষানবিশির ফলে দেবী চৌধুরানীর নিষ্কাম কর্মে দীক্ষালাভ এ বিষয়ে অন্যতম প্রধান উদাহরণ। প্রয়োজনমত ব্যবহারের জন্য শরীরকে তীক্ষ্ণ অস্ত্ররূপে গড়ে তুলতে হবে। হিন্দুমেলার প্রেরণায় ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল, তা নিঃশব্দে বঙ্কিমের ধর্মের নতুন ব্যাখ্যার মধ্যে প্রবেশ

* "The life of the social organism must, as an end, rank above the lives of its units." ধর্মতত্ত্ব, ৬৬০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল। শারীরিক শক্তির বিকাশকে তিনি অনুশীলনের অন্যতম অঙ্গ বলেছিলেন। এমনকি তাঁর নতুন আদর্শবাদের কেন্দ্রবিন্দু নবোন্মেষিত ঈশ্বর-প্রীতিও দেশাত্মবোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। বহুদিন আগে, ১৮৭৪-এ, তাঁর আত্মস্বরূপ কমলাকান্ত বাংলা-মাকে মাতৃদেবীরূপে বন্দনা করার স্বপ্ন দেখেছেন।[১৮৬] 'আনন্দমঠ'-এ এই আদর্শ পূর্ণ বিকশিত— দেশের মুক্তির জন্য নিবেদিত-প্রাণ দেশবৎস সন্ন্যাসীরা দেবতারূপে দেশমাতৃকার বন্দনা করেছেন। 'কৃষ্ণ চরিত্রের' কৃষ্ণ যে আদর্শপুরুষরূপে চিত্রিত হয়েছেন তার অনেকটাই নির্ভর করছে তাঁর সমগ্র ভারতকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার কৃতিত্বের উপর।[১৮৭] ধর্মযুদ্ধ বা উপযুক্ত কারণে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াকে তিনি নীতিসঙ্গত বলেছেন, 'আনন্দমঠ' এবং 'দেবীচৌধুরানী'—উভয়ই এই আদর্শের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবীগণ যে বঙ্কিমের রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

ঐতিহ্যগত জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধার পরিবর্তে হিন্দুধর্মের অনেক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অশ্রদ্ধাই জীবনসায়াহ্ন পর্যন্ত বঙ্কিমের দেশপ্রেমী চিন্তাভাবনার জন্ম দিয়েছিল। অবশ্য অল্পবয়সের কোনো কোনো রচনায় পরিবর্তিত মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়। আগেই বলেছি, এই পরিবর্তনের কারণ সঠিক অনুধাবন করা যায় না। তবে পরিবর্তিত মানসিকতায় তিনি তাঁর আজীবন খুঁজে বেড়ানো প্রশ্নগুলির অন্তত একটির উত্তর পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত একটি ক্ষেত্রে বিশ্বের সব সংস্কৃতির মধ্যে ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন তিনি খুঁজে পেয়েছেন। সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর নিজের ব্যাখ্যার কাছাকাছি কোঁৎ-এর একটি উক্তি তিনি 'ধর্মতত্ত্বে' উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন, "যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধর্ম সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম' (ক্রোড়পত্র-ক)। তর্কের খাতিরে অবশ্য বলা যায় যে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্যই তিনি ধর্মের সারমর্ম বিষয়ে কোঁৎ-এর ব্যাখ্যার প্রশংসা করেছেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের তিনটি পথ— জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি; গীতায় তিনটি পথের সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে, আর "সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই ইহাকে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে;[১৮৮] একমাত্র হিন্দুধর্মেই ঈশ্বর-ভক্তি এবং উপাসনা-পদ্ধতি ত্রুটিহীন, নির্ভুল। হিন্দুর কাছে কেবল ঈশ্বর ও পরকালই ধর্ম নয়, "ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ সকল লইয়া ধর্ম"।[১৮৯]

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে তিনি যে শুধু একটি বিশেষ ধর্মমতের প্রশস্তি রচনা করেছেন, তাই নয়, বরং সুদূর অতীত থেকে পাওয়া উন্নততর জ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য গর্ববোধ করেছেন। এই ঐতিহ্যের উদ্গাতা ব্রাহ্মণ শ্রেণী সকলের পূজ্য। কারণ একমাত্র তাঁরাই যে সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি করেছিলেন, সেখানে সংঘাত ও যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল না।[১৯০] এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে মাত্র একবারই উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রচলিত হিন্দু আধ্যাত্মিকতাবাদের উল্লেখ রয়েছে: "হিন্দুর সকল নীতির মূল আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক।"[১৯১] আড়ম্বর এবং ভণ্ডামির মধ্যে এই উন্নত ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে, তবে "শীঘ্রই বিশুদ্ধ ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া ক্রমওয়েলের সমকালিক ইংরেজের মত বা মহম্মদের সমকালিক আরবের মত অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিবে।"[১৯২] ধর্মের লৌকিক দিকটিকে বঙ্কিম কখনই উপেক্ষা করেননি। দেশাত্মবোধ উন্মেষের জন্য ধর্ম এবং ধর্মসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর মনোভাব সমসাময়িক যুগের প্রচলিত প্রধান মতবাদের অনুসারী ছিল। দয়ানন্দ, কেশব সেন এবং পরে বিবেকানন্দ এই একই মতের অনুগামী ছিলেন। যে রক্ষণশীলতা তাঁর পূর্বজীবনের সাম্যবাদী মতবাদের স্থান নিয়েছিল, তার মূলে ছিল শৃঙ্খলাবোধ— হিন্দু রীতিনীতির উপর অন্ধবিশ্বাস নয়, কারণ তখনও পর্যন্ত তিনি ঐ ধর্মের গোঁড়ামিগুলি মেনে নিতে পারেননি। কোঁৎ এবং হিন্দু ঐতিহ্যের নির্বাচিত অংশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিচরিত্র বিকাশের মিথস্ক্রিয়ায়। তাঁর ব্যক্তিচরিত্র বিকাশের কারণগুলি অবশ্য জানা যায় না, পরিণতিটাই জানা যায়। ইউরোপের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার উৎস ছিল তাঁর আজীবন গভীর জাতীয়তাবোধ। জীবনের প্রথমদিকে সাম্যবাদ, হিতবাদ এবং পরবর্তীকালে কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদী দর্শন প্রভৃতি জ্ঞানদীপ্ত্যোত্তর ইউরোপের কতগুলি বিশেষ আদর্শের মাধ্যমে তাঁর ভাবধারা রূপ পেয়েছিল। প্রত্যক্ষবাদের প্রভাব বোধহয় সবচেয়ে গভীর ছিল, কারণ, প্রথমত ক্রমবাদী মনোভাব এবং দ্বিতীয়ত তাঁর শ্রেণীগত স্বার্থের পক্ষে এই দর্শন বিশেষ উপযোগী ছিল। পূর্বযুগের এই আদর্শগুলিকে উপলক্ষ করেই পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর আস্থা গড়ে উঠেছিল। এই পরিবর্তিত মনোভাবের জন্য অবশ্য তাঁকে যুক্তিবাদের প্রতি আন্তরিক এবং অবিচল নিষ্ঠা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল— যে যুক্তিবাদের সাহায্যে একদিন তিনি ইউরোপীয় ও ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল্যায়ন করেছিলেন।

এই গ্রন্থে যাঁদের কথা আলোচনা করেছি, তাঁদের মধ্যে দুজন নিজেদের লেখা এক বা একাধিক গ্রন্থ এবং প্রবন্ধে ইউরোপীয় ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। বঙ্কিম এ বিষয়ে ব্যতিক্রম। পাশ্চাত্য দর্শন এবং ঐতিহ্য নিয়ে তিনি অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তা তুলনামূলক। তুলনা করার প্রবণতা যে অন্য দুজনের ছিল না তা নয়, কিন্তু বঙ্কিমের এ যেন একটা বাতিক। রাজনৈতিক পরাধীনতার জন্য মর্যাদার আসন থেকে পতন এবং তার ফলে আত্মমর্যাদাহানি, এই উপলব্ধি বিবেকানন্দরও ছিল যার জন্য তিনিও দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতিতে অসন্তোষ বোধ করতেন। ভূদেবের অস্বস্তির কারণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, ছিন্নমূল ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ। বঙ্কিমের ক্ষোভের কারণ ছিল আরও গভীর, কারণ ঊনবিংশ শতকে প্রচলিত পাশ্চাত্য মূল্যবোধে দীক্ষিত হয়ে তিনি ভারতের অবক্ষয়কে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে অন্তত অন্যান্য ঐতিহ্যের তুলনায় নিজের দেশের প্রাচীন ও বর্তমান শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি অবিচল আস্থা জেগে না ওঠা পর্যন্ত ভারতবর্ষের পুনরুন্নয়নের কোনও আশা নেই বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। অজ্ঞাতনামা লেখকের "ইউরোপে তিন বৎসর" শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনায় তিনি এই প্রয়োজন সম্পর্কে সক্ষোভ মন্তব্য করেছেন। "ইউরোপে কি কি আমাদের ভাল লাগে না, সেইটুকু শুনিবার জন্য আমাদের বিশেষ কৌতূহল আছে।...সেইটুকু আমরা কেন শুনিতে চাই? তাহা আমরা বুঝাইতে পারিব কি না বলিতে পারি না। আমরা বাঙালি, ইংরাজ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির তুলনায় আমরা অতি সামান্য জাতি বলিয়া গণ্য। ইংরাজের তুলনায় আমাদের কিছুই প্রশংসনীয় নহে। আমাদের কিছুই ভাল নহে, একথা সত্য কিনা তাহা আমরা ঠিক জানি না; কিন্তু প্রত্যহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনিতে শুনিতে আমাদের উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়া উঠিতেছে। সে বিশ্বাসটি ভাল নহে। ইহাতে আমাদের স্বদেশভক্তি, স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হইতেছে। আমরা যদি অন্য জাতির অপেক্ষা বাঙালি জাতির, অন্য দেশের অপেক্ষা বাংলা দেশের কোন বিশেষ গুণ না দেখি, তবে আমাদিগের দেশবাৎসল্যের অভাব হইবে। এই জন্য আমাদের সর্বদা ইচ্ছা করে যে সভ্যতম জাতি অপেক্ষা আমরা কোন অংশে ভাল কি না, তাহা শুনি। কিন্তু কোথাও তাহা শুনিতে পাই না। যাহা শুনি তাহা সত্যপ্রিয় সুবিবেচকের কথা নহে। যাহা শুনি তাহা শুদ্ধ স্বদেশপিঞ্জর মধ্যে পালিত মিথ্যাদম্ভপ্রিয় ব্যক্তিদের কথা— তাহাতে বিশ্বাস হয় না। বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না।... জন্মভূমি সম্বন্ধে আমরা যে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিবার অধিকারী নই (এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া) আমাদের সেই কথা মনে পড়িল। যে জাতি জন্মভূমিকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" মনে করিতে না পারে সে জাতি জাতিমধ্যে হতভাগ্য। আমরা সেই হতভাগ্য জাতি বলিয়া এ রোদন করিলাম।"[১৯৩]

"সত্য সম্বন্ধে আগ্রহী" ব্যক্তিরূপে তিনি সর্বত্রই তাঁর এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন, পরিণামও সর্বত্রই এক হয়েছে। জীবনের উত্তরভাগে হিন্দু ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্ব আবিষ্কার করার আগে পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন। সাম্য প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন: "আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ন্যায় লৌকিক উন্নতি পৃথিবীতে কখন হয় নাই বা হইবে এমত ভরসা পূর্বগামী মনুষ্যেরা কখন করেন নাই।"[১৯৪]

বাঙালির সঙ্গে ইংরাজের তুলনা প্রসঙ্গে তিনি এই মূল্যায়নেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাঁর মতে "স্ত্রী-পুরুষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরাজ বাঙালিতেও সেইরূপ। ইংরাজ বলবান, বাঙালি দুর্বল; ইংরাজ সাহসী, বাঙালি ভীরু; ইংরাজ ক্লেশসহিষ্ণু, বাঙালি কোমল।"[১৯৫] আরও লিখেছেন: "কোন একজন ইংরেজ অপেক্ষা কোন একজন বাঙালিকে শ্রেষ্ঠ দেখা যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণ ইংরাজ যে শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। ইংরাজরা আমাদের অপেক্ষা বলে, সভ্যতায়, জ্ঞানে এবং গৌরবে শ্রেষ্ঠ।"[১৯৬] এই নিকৃষ্টতা যে কেবলমাত্র বাঙালিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা নয়। বহু ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলেও অতীত ও বর্তমানের ভারতের ইতিহাস এক বন্ধ্যা, ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার প্রতীক। তুলনায় ইউরোপ এক নিখুঁত সভ্যতার ধারক ও বাহক। শারীরবিদ্যার সঙ্গে বিকারবিদ্যার যে সম্পর্ক, মননশীলতা বিকাশের ইতিহাসে ইউরোপের সঙ্গে ভারতেরও সেই সম্পর্ক।[১৯৭]

দুই দেশের সভ্যতা বিপরীতমুখী পথ ধরে কেন অগ্রসর হয়েছে, এ বিষয়ে তাঁর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মতামতগুলিকে জড়ো করলে বহুস্তরবিশিষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রথমত, ভারতের অকাট্য দার্শনিক মতবাদগুলি— বিশেষত সাংখ্য এবং বৌদ্ধ দর্শন— মানবজীবনে দুঃখের বিষয়টি নিয়েই অভিভূত ছিল; দুঃখ নিবৃত্তি থেকে জ্ঞান এবং শেষ পর্যন্ত জ্ঞানের আধার আত্মার নির্বাণই তাদের একমাত্র বিবেচ্য। এই কারণেই এদেশে সন্ন্যাসের এত মাহাত্ম্য। জ্ঞান হল মুক্তির প্রধান হাতিয়ার— ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংসারের মায়ার প্রতি ঔদাসীন্যই জ্ঞান। "হিন্দু সভ্যতার মূল কথা 'জ্ঞানেই মুক্তি', পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল 'জ্ঞানেই শক্তি'। দুই জাতি দুইটি পৃথক উদ্দেশ্যানুসন্ধানে এক পথেই যাত্রা করিলেন। পাশ্চাত্যেরা শক্তি পাইয়াছেন, আমরা কি মুক্তি পাইয়াছি?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বস্তুত এক যাত্রার যে পৃথক ফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইউরোপীয়েরা শক্তি অনুসারী, ইহাই তাঁহাদিগের উন্নতির মূল...ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য ঐহিক ; তাঁহারা ইহকালে জয়ী। আমাদিগের উদ্দেশ্য পারত্রিক— তাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না। পরকালে হইব কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।"[১৯৮] লেকিকে উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন মধ্যযুগে সন্ন্যাস এবং ব্রহ্মচর্যের জয়গানের কতদূর কুফল হয়েছিল।[১৯৯] "ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা লোপের পর সহস্র বৎসর মনুষ্যের ঐহিক অবস্থা অনুন্নত ছিল", ইউরোপের ধর্মযাজকদের "ঐহিক সুখে অনাদরতত্ত্ব" প্রচারই তার কারণ বলে তাঁর ধারণা। "কিন্তু যখন ইটালিতে প্রাচীন য়ুনানী দর্শনের পুনরুদয় হইল, তখন তৎপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন ঐহিকে বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে মন্দীভূত হইল।"[২০০] এই বিশেষ কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে তিনি সমগ্র মানবজাতির আশার আলোক দেখেছেন। মধ্যযুগের "ঐহিকসুখে অনাদরতত্ত্ব" প্রচারের ফলে যে ক্ষতি হয়েছিল, ধ্রুপদী যুগের সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়ে তা বিদূরিত হয়েছিল। "যদি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বা তৎপরে ইতালিতে গ্রীক সাহিত্যাদির আবিষ্ক্রিয়া না হইত, তবে এক্ষণকার অবস্থা হইতে ইউরোপের অবস্থা ভিন্ন হইত, সন্দেহ নাই।"[২০১]

ইউরোপের জয়যাত্রার দ্বিতীয় কারণ তিনি দেখেছেন সে দেশের চিন্তাশক্তির ঐতিহ্যের মধ্যে— পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার মাধ্যমে আরোহ পদ্ধতি অবলম্বনে আবিষ্কৃত সত্যকে বুদ্ধি এবং যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করার স্বাভাবিক প্রবণতার মধ্যে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বায়ুমণ্ডলের চাপ আবিষ্কারের ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। ফ্লোরেন্সের মালীরা লক্ষ করেছিল যে পাম্পের জল সর্বোচ্চ ৩২ ফুট ওঠে। এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তোরিচেলি তাঁর প্রজ্ঞানের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের চাপ তত্ত্বের প্রকল্প তৈরি করলেন। তারপরে তিনি দেখাতে চাইলেন যে ঐ চাপে পারাও একই ভাবে উত্তোলিত হবে। কাঁচের নলে পারা রেখে তিনি এই তত্ত্ব পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন।" ...ইউরোপীয় চিন্তাশক্তি এখানেই থেমে গেল না।" পাসকল ব্যারোমিটার নিয়ে Puy de Dome এ গিয়ে তার নিজস্ব তত্ত্ব যে, যদি বায়ুমণ্ডলের চাপে ঐ পারা উত্তোলিত হয়, তবে তার উর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি আনুপাতিক হবে, তা প্রমাণ করলেন। "তেরিচেলির জায়গায় একজন হিন্দু দার্শনিক শুধুমাত্র বাতাসের চাপ আছে, ধর্মসূত্রে এই কথা লিখেই ক্ষান্ত হতেন। চাপের কোন পরিমাণ তিনি নির্দেশ করতেন না। পারা নিয়ে কোন পরীক্ষাও হত না ; কোন হিন্দু পাসকল ব্যারোমিটারের কাঠি নিয়ে হিমালয়ে যেতেন না।" দুই সভ্যতার মানসিকতার প্রভেদ বোঝাবার জন্য বঙ্কিম আরও একটি উদাহরণ দিয়েছেন। পৃথিবীর আহ্নিক গতি, নক্ষত্ররাজির আপাত গতিহীনতা এবং সূর্যের বার্ষিক গতি সবকিছুই প্রাচীনকালে হিন্দুদের জানা ছিল। সৌরকেন্দ্রিকতা তত্ত্ব এবং সেই সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যই জানা থাকা সত্ত্বেও কখনই তা উপস্থাপন করা হয়নি অথবা যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ ও প্রমাণ করা হয়নি। এমনকি তা জনসমাজে গ্রাহ্যও হয়নি অথবা তা থেকে সৌরজগতের অন্যান্য নিয়মাবলী আবিষ্কারের কোন প্রচেষ্টাও হয়নি। তুলনায় কোপার্নিকাস-তত্ত্ব প্রচারিত হওয়ার ফলে কেপলারের তত্ত্বসমূহ আবিষ্কৃত হল এবং তার থেকে আবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার হল। "আর নতুন কিছু পাওয়া যাবে না।"—আর্যভট্টের এই উক্তিই এ দেশে শেষ কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরবর্তীকালে বঙ্কিম যে মতবাদ পরিত্যাগ করেছিলেন, সেই সাম্যবাদের প্রভাবে তিনি ইউরোপের জয়যাত্রার সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণ নির্দেশ করেছিলেন। বিভিন্ন সভ্যতার তুলনামূলক বিচার করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, যে কোন সভ্যতার অবক্ষয় বা বন্ধ্যাত্বের প্রধান কারণ হল বৈষম্য— প্রকৃতিতে যার কোন স্থান নেই, যা পুরোপুরিই মনুষ্যসৃষ্ট। ভারতবর্ষে, এই বৈষম্য চূড়ান্তরকম প্রকট হলেও "সকল দেশই বৈষম্যজালে আচ্ছন্ন।" "উন্নতিশীল সমাজে সামাজিকের পরস্পর সংঘৃষ্ট হইয়া সেই বৈষম্যকে অপনীত করিয়াছেন। রোম ইহার প্রধান উদাহরণ। রোমরাজ্যের প্রথমকালিক বৈষম্য— পেট্রিবীয় ও প্লিবীয়দিগের সম্প্রদায়ভেদ— তাহা একপ্রকার সামাজিক সামঞ্জস্যে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদ্রাজ্যের যে পশ্চাৎকালিক বৈষম্য-নাগরিকত্ব এবং অনাগরিকত্ব— তাহাও শাসনকর্তৃপক্ষের অলৌকিক রাজনীতিদক্ষতার গুণে অপনীত হইয়াছিল। সুতরাং রোম পৃথিবীশ্বরী হইয়াছিল।" অন্যান্য দেশ এ বিষয়ে অনেক পশ্চাদপদ এবং তাদের সামাজিক বৈষম্যের দুরারোগ্য ব্যাধি প্রশমিত করার জন্য সমাজদেহে অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন। "এই চিকিৎসার বড় ডাক্তার দাঁতো এবং রোব্‌স্পীর। আমেরিকার চিরদাসত্বের উচ্ছেদ জন্য সেদিন ঘোরতর আভ্যন্তরিক সমর হইয়া গেল— অস্ত্রাঘাতে ক্ষত চিকিৎসার ন্যায় সামাজিক অনিষ্টের দ্বারা সামাজিক ইষ্টসাধন করিতে হইল।"

এইভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে ইউরোপের ক্লাসিকাল সংস্কৃতির বিনাশের প্রধান কারণ মনুষ্য-সৃষ্ট বৈষম্য। সাম্রাজ্যবাদী রোমের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ভোগ-বিলাসের প্রবণতা সৃষ্টি করেছিল এবং তজ্জনিত আত্মতৃপ্তি মানুষের অন্যান্য গুণ বিকাশের অন্তরায় হয়েছিল। এই ব্যাখ্যা তিনি অনেকবার দিয়েছেন, কিন্তু সাম্রাজ্যের শেষের দিকে দাসত্বপ্রথার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকেই তিনি রোম সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ বলেছেন। সম্রাট, প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং সর্বোপরি প্রেটরিয়া সৈনিকদের স্বেচ্ছাচারিতায় এই বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। "যেখানে স্বেচ্ছাচার প্রবল, সেখানে বৈষম্যও প্রবল।" কিন্তু খ্রিস্টধর্মপ্রচারের ফলে সাম্যবাদী আদর্শ আবার জয়লাভ করল। "সকল মনুষ্যই ঈশ্বরসমক্ষে তুল্য... মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ"— খ্রিস্টের এইসব উক্তিই সাম্যতত্ত্বের মূল। তিনি ধনীর ক্ষমতাসম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে দাসের দাসত্বশৃঙ্খল মোচন করলেন। খ্রিস্টধর্মের প্রভাবে "রোমকে বর্বরে মিলিত হইয়া মহাতেজস্বী, উন্নতিশীল, যুদ্ধদুর্মদ জাতিসকল সঞ্জাত হইল, তাহারাই আধুনিক ইউরোপীয়দিগের পূর্বপুরুষ।" ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্রগতির অনেক কারণ থাকলেও বঙ্কিমের মতে "প্রধান কারণ খ্রিস্টিয় নীতি এবং গ্রীক সাহিত্য এবং দর্শন।" সাম্যবাদী নীতির উপর দৃঢ় আস্থাবশত খ্রিস্টিয়ধর্মের কুফলগুলিও তাঁর নজর এড়ায়নি— "খ্রিস্টধর্ম সাম্যাত্মক হইলেও পরিণামে তৎফলে একটি গুরুতর বৈষম্য জন্মিয়াছিল। ধর্মযাজকদিগের অত্যন্ত প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল। স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি ইউরোপীয় রাজ্যে এই বৈষম্য বড় গুরুতর হইয়াছিল।"[২০৩] প্রসঙ্গক্রমে তিনি ধর্মযাজকদের ভারতীয় সমাজের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। "পোপগণ ইউরোপের রাজা ছিলেন না, একবিন্দু ভূমির রাজা মাত্র, কিন্তু তাঁহারা সমগ্র ইউরোপের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন। গ্রেগরি বা ইনোসেন্ট, লিও বা আদ্রিয়ান ইউরোপে যতটা অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় ফিলিপ বা চতুর্দশ লুই, অষ্টম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেনরি বা প্রথম চার্লস্ ততদূর করিতে পারেন নাই।”[২০৪] ধর্মযাজকদের ক্ষমতার অপব্যবহার প্রসঙ্গে অবান্তরভাবে তিনি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক একটি মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে ক্ষমতার অপব্যবহার শুধু রাজপুরুষ বা ধর্মযাজকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেমন সমসাময়িক ইংলন্ডে— “এক্ষণে রাজা (রাজ্ঞী) কোন প্রকার অত্যাচারে ক্ষমতাশালী নহেন, শাসনশক্তি তাঁহার হস্তে নহে। এক্ষণে প্রকৃত শাসনশক্তি ইংলন্ডে সংবাদপত্র লেখকদিগের হস্তে। সুতরাং ইংলন্ডের সংবাদপত্রলেখকগণ অত্যাচারী। যেখানে সামাজিক শক্তি, সেখানেই সামাজিক অত্যাচার।”[২০৫] মনে হয়, ঔপনিবেশিক শাসন এবং বর্ণাশ্রম শাসিত সমাজ— এই দুটি ঘটনাই তাঁর মনে একটা হতাশার সৃষ্টি করেছিল— ক্ষমতার সঙ্গে ক্ষমতার অপব্যবহারের অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ তিনি লক্ষ করেছিলেন।

একই নীতিতে ইউরোপীয় সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাস তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। যখনই ক্ষমতা, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা এবং সুযোগলাভে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, তখনই সেই সমাজে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। আবার সাম্যবাদী নীতির প্রতিষ্ঠায় ভারসাম্য ফিরে এসেছে। আধুনিককালে ফরাসী বিপ্লবকে তিনি সেই যুগসন্ধিক্ষণরূপে দেখেছেন, যখন বৈষম্যের অবক্ষয় থেকে ইউরোপ রক্ষা পেল। অষ্টাদশ শতকে ফরাসী অভিজাতদের অত্যাচার ও শোষণের কাহিনী বঙ্কিম কার্লাইল এবং মিশেলের রচনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন—একদিকে সমাজের নিম্নবর্গের উপর অমানুষিক নিপীড়ন, তাদের দারিদ্র্য, দুর্দশা, অন্যদিকে পঞ্চদশ লুইয়ের রাজসভায় বিলাসের বাহুল্য, লাম্পট্য এবং দুর্নীতিপরায়ণতা। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দেশের অবস্থা বর্ণনায় তাঁর তীব্র মন্তব্য : “রাজকোষ শূন্য,— প্রজামধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার রব— তবে এ সভাপর্বের রাজসূয়, এ নন্দনকাননে ঐন্দ্রবিলাস— এ সকল অর্থসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন হয় কোথা হইতে ? সেই অন্নাভাবপীড়িত প্রজার জীবনোপায় অপহরণ করিয়া। পিষ্টকে পেষণ করিয়া, শুষ্ককে শোষণ করিয়া, দগ্ধকে দাহন করিয়া দুবারি কুলকলঙ্কিনীর অলকদাম রত্নরাজিতে শোভিত হয়। আর বড় মানুষেরা ? তাহারা এক কপর্দক রাজকোষে অর্পণ করে না— কেবল রাজপ্রসাদ ভোগ করে। বড় মানুষে কর দেয় না, ধর্মযাজকেরা কর দেয় না, রাজপুরুষেরা কর দেয় না—কেবল দীনদুঃখী কৃষকেরা কর দেয়। ...এই বৈষম্য কদর্য্য, অপরিশুদ্ধ রাজ্যশাসনপ্রণালীজনিত।” অতীতে খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা যেমন অবক্ষয়িত, নিষ্ঠুর রোম সম্রাটদের অপশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করেছিল, ঠিক তেমনি “রুশোর গুরুতর প্রহারে সেই রাজ্য ও রাজ্যশাসনপ্রণালী ভগ্নমূল হইল। তাঁহার মানস শিষ্যেরা তাহা চূর্ণীকৃত করিল।” অর্থাৎ, ফরাসী বিপ্লবের ফলে যা ঘটল, তার মূলে ছিল *Le Contrat Social*। বিপ্লবের ফলাফল বঙ্কিমের ভাষায় : “ফরাসী বিপ্লবে রাজা গেল, রাজকুল গেল, রাজপদ গেল, রাজনাম লুপ্ত হইল ; সম্ভ্রান্ত লোকের সম্প্রদায় লুপ্ত হইল ; পুরাতন খ্রিস্টীয় ধর্ম গেল, ধর্মযাজক সম্প্রদায় গেল ; মাস, বার প্রভৃতির নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইল— অনন্ত প্রবাহিত শোণিতস্রোতে সকল ধুইয়া গেল। কালে আবার সকলই হইল, কিন্তু যাহা ছিল, তাহা আর হইল না, ফ্রান্স নূতন কলেবর প্রাপ্ত হইল। ইউরোপে নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হইল— মনুষ্যজাতির স্থায়ী মঙ্গল সিদ্ধ হইল। রুশোর ভ্রান্তবাক্যে অনন্তকালস্থায়িনী কীর্তি সংস্থাপিতা হইল। কেননা সেই ভ্রান্ত বাক্য সাম্যাত্মক— সেই ভ্রান্তির কায়া অর্ধেক সত্যে নির্মিত।”[২০৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে দেখিয়েছি যে, ভারতীয় সভ্যতার বন্ধ্যাত্ব এবং অবক্ষয় প্রসঙ্গে বঙ্কিমের মতামত বাক্‌ল এবং লেকির বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ঐ একই তত্ত্ব অনুসারে তিনি বন্ধ্যাত্বের বিপরীত ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্রগতিরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন, উপরন্তু ম্যালথাসের তত্ত্বকেও কাজে লাগিয়েছেন। "ভারতবর্ষ উষ্ণ দেশ এবং তথায় ভূমিও উর্বরা। সুতরাং ভারতবর্ষে অতি শীঘ্র ধনসঞ্চয় হওয়াই সম্ভব। এইজন্য ভারতবর্ষে অতি পূর্বকালেই সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। ...যে যে নিয়মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক উন্নতি কোনকালেই হইতে পারিল না।" ইউরোপের ইতিহাসের গতি সম্পূর্ণ বিপরীত। বাক্‌লের অনুসরণে বঙ্কিম লিখেছেন, "যে দেশ শীতল, সে দেশে শারীরিক তাপজনক খাদ্য অধিক আবশ্যক। ...শীতপ্রধান দেশের লোকের মাংসাদির বিশেষ প্রয়োজন।" সভ্যতার প্রথম যুগে শিকার করে মাংস জোগাড় করতে হত। তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যম, সাহসিকতা, শারীরিক শক্তি এবং তৎপরতা ইউরোপের জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষে এবং মধ্যযুগের ইউরোপে "সন্তুষ্টি" মহৎ গুণ কিন্তু বঙ্কিমের মতে তা স্বাভাবিক আলস্য এবং উদ্যমহীনতার নামান্তর। সভ্যতার অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় দুটি শর্ত— জ্ঞানতৃষ্ণা এবং অর্থলিপ্সা— এদের মধ্যে দ্বিতীয়টিই "সভ্যতা বৃদ্ধির নিত্য কারণ" এবং সেই জন্যই মানবসমাজের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নতুন নতুন উৎস খুঁজে বার করবার প্রচেষ্টাই ইউরোপের অগ্রগতির চাবিকাঠি: "পূর্বে যাহা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইত পরে তাহা আবশ্যক বোধ হয়। তাহা পাইলে আবার অন্য সামগ্রী আবশ্যক বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা এবং চেষ্টায় সফলতা জন্মে। ...অতএব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি সভ্যতা বৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাহ্য সুখের আশা পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা, তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপত্তি হয়।"[২০৭]

AMARBOI.COM

ভারতের দীর্ঘ পরাধীনতার কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে তিনি ইউরোপীয়দের স্বাধীনতাস্পৃহার কারণও তাদের দেশের জলবায়ুর প্রভাব বলে দেখিয়েছেন।[২০৮] তবে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর আগ্রহের অভাবকে তিনি তাদের কাপুরুষতা অথবা সুদীর্ঘ পরাধীনতার ফল বলতে রাজি নন। তিনি দেখিয়েছেন যে ব্রিটিশ আমলেও ভারতীয়দের সামরিক শক্তির কোনও অভাব ছিল না, কিন্তু তারা "সাধারণত স্বাধীনতা লাভে অভিলাষী বা যত্নবান নহে।" এর কারণ তিনি বলেছেন ভারতবর্ষের ভূমির উর্বরতাশক্তি এবং বায়ুর তাপাতিশয্য..."ভূমি উর্বরা, দেশ সর্বসামগ্রীপরিপূর্ণ, অল্পায়াসে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়," তার পরিণতি "বাহ্য সুখে অনাস্থা।" "শারীরিক পরিশ্রম হইতে অধিক অবকাশ হইলে সহজেই মনের গতি আভ্যন্তরিক হয়... তাহার এক ফল কবিত্ব, জগত্তত্ত্বে পাণ্ডিত্য। এইজন্য হিন্দুরা অল্পকালে অদ্বিতীয় কবি এবং দার্শনিক হইয়াছিলেন।" কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতাবিষয়ে তারা উদাসীন— "স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা...হিন্দুজাতির চিরস্বভাব বোধ হয়।" তুলনায় ইউরোপের ঐতিহ্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। অন্যরকম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বঙ্কিম ইউরোপীয়দের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়ার সঙ্কল্পের কারণ খুঁজে পেয়েছেন। বিদেশী বা "ভিন্নজাতীয় রাজা" সম্বন্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দুদের ঔদাসীন্য যুক্তিযুক্ত না হলেও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে তা সম্ভব হয়েছে বলেই এতে লজ্জার কিছু নেই।

বাক্‌ল-এর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব এবং লেকির ঐহিক সুখের আগ্রহ তত্ত্বের সঙ্গে বঙ্কিম ম্যালথাসের ব্যাখ্যা যোগ করেছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে ধনবৃদ্ধি এবং আয়বৃদ্ধি না হলে শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। ইংলন্ড ও আমেরিকায় জনসংখ্যার তুলনায় ধনবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় তারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলে পরিগণিত হয়েছে। জনসংখ্যা এবং ধনের তারতম্য দূরীকরণের একটি উপায় হল বাড়তি জনসংখ্যার দেশান্তরে গমন। যে সব দেশে লোকসংখ্যা নিতান্তই কম, সেই সব উপনিবেশে ইংলন্ডের লোক যাওয়ায় দু দেশেরই উপকার হয়েছে। "যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দতা লোকের অভ্যস্ত, যেখানে জীবিকানির্বাহের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক, এবং কষ্টে আহরণীয়, সেখানকার লোকে বিবাহপ্রবৃত্তি দমন করে। পরিবার প্রতিপালনের উপায় না দেখিলে বিবাহ করে না।" জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সীমিত রাখায় এবং অন্যান্য কার্যকারণের প্রভাবে এসব দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।[২০৯]

ঐতিহাসিক এবং জনসংখ্যাবিষয়ক তত্ত্বের সঙ্গে সাম্যবাদ তত্ত্বের গুরুত্ব জুড়ে দিয়ে বঙ্কিম ইউরোপের সমৃদ্ধির ব্যাখ্যা করেছেন। "সুপ্তোত্থিত ইউরোপীয় প্রজাগণ ঐহিক সুখে রত হইয়া সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে চেষ্টিত হইল।" ধনবান প্রজা রাজার স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করে, অসন্তোষের ভয়ে রাজা সতর্ক থাকেন। নিঃশঙ্ক এবং পক্ষপাতহীন সমালোচনায় নাগরিকদের উৎকর্ষও বৃদ্ধি পায়, তাতে দু পক্ষেরই মঙ্গল। "রোমে প্লিবিয়ানদিগের বিবাদে, ইংলন্ডের কমন্সদিগের বিবাদে প্রভুদিগের স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল।" ফলে সভ্যতার উন্নতি এবং মানুষের সুখ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তুলনায় ভারত দরিদ্র, পরিতৃপ্ত এবং হীনবীর্য বিশাল জনসংখ্যার ভারে অবনতির দিকে ধাবিত হয়েছে।[২১০]

পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা গড়ে ওঠার আগেও বঙ্কিম ইউরোপের অতীত সম্বন্ধে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছেন। এইসব মন্তব্যের মধ্যে ভারতীয়দের— বিশেষত তথাকথিত দুর্বল বাঙালিদের তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে তাদের অতীত সম্বন্ধে লজ্জার কিছুই নেই। যেমন, তিনি দেখিয়েছেন যে ইউরোপের বর্তমান সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রতিককালে। এমনকি পঞ্চদশ শতক পর্যন্তও ইউরোপ ঊনবিংশ শতকের ভারতের তুলনায় অনেক পশ্চাদপদ ছিল। রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ফলে পট পরিবর্তন হয় এবং ইউরোপে সর্বক্ষেত্রে নতুন নতুন সৃষ্টির জোয়ার আসে।[২১১] সমকালীন জাতিতত্ত্বের প্রভাব থেকে বঙ্কিম নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেননি এবং সমসাময়িক আরও অনেকের মতই বাঙালির শিরায় আর্যরক্ত প্রবাহিত হচ্ছে বলে গৌরববোধ করেছিলেন। যদিও যে প্রসঙ্গে তিনি একথা বলেছেন, সেখানে তিনি ইউরোপীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছেন: "যে রক্তের তেজে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিসকল শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, বাঙালির শরীরেও সেই রক্ত বহিতেছে।"[২১২]

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর দুটি ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধে তিনি ইউরোপের আগ্রাসী নীতির সমালোচনা করেছে। এক কথায় বলতে গেলে, ইউরোপের আন্তর্জাতিক আইনের মূলমন্ত্র তাঁর মতে জবর দখলের অধিকার। "যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে," কারণ পৃথিবী তস্করভোগ্যা। "Right of Conquest যদি একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

right হয়, তবে Right of Theft কি একটা right নয় ?"[২১৩] আফিমখোরের সঙ্গে শ্বেতপক্ষীর কথোপকথনের মাধ্যমে তিনি কমলাকান্তের অকাট্য যুক্তিজালের অবতারণা করেছেন। "যেখানে উত্তম আহারের সম্ভাবনা দেখিলাম, সেইখানে বাসা নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলাম।" পাখির পরিচয়ও এখানে স্পষ্ট। "যে প্রতিবাদী হইল, তাহাকে মারিয়া ফেলিলাম অথবা তাড়াইয়া দিলাম।"[২১৪] ইউরোপের উপনিবেশ বিস্তার সম্বন্ধে এ ধরনের স্বচ্ছ রূপক উনবিংশ শতকের বাঙালি লেখকদের রচনায় অপ্রতুল ছিল না।

উনবিংশ শতকের ইউরোপীয় ভাবধারা, যা ভারতীয়দের জীবনচর্যায় ধীরে ধীরে স্থান করে নিয়েছিল, বঙ্কিম সেই মূল্যবোধেরও মৌলিক সমালোচনা করেছিলেন। ঐ ভাবধারায় ঐহিক সুখভোগই মানুষের জীবনের প্রধান ও পরম কাম্য বলে বিবেচিত হত— শৈশব থেকেই অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও সম্মানকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলে শেখানো হত। "আরাম এবং মর্যাদা— দুই ভাই— ইংরাজি সংস্কৃতির আরাধ্য দেবতা।"[২১৫] পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং তার প্রতিভূ ঔপনিবেশিকদের প্রচারিত ত্রিমুখী লক্ষ্যের উদ্দেশ্য একটিই এবং তা হল অর্থ। অসাধারণ আবেগময় ভাষায় বঙ্কিমের কমলাকান্ত এই অপ্রতিরোধ্য অর্থতৃষ্ণাকে ব্যঙ্গ করেছে: "হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল। টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা নতি, টাকা গতি! টাকা ধর্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ!"[২১৬] ওপথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে, ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে! বম্ বম্ হর হর! টাকা বাড়াও, টাকা বাড়াও। রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থ-প্রসূতি ও মন্দিরে প্রণাম কর। যাতে টাকা বাড়ে, এমন কর; শূন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক!...মন, মন আবার কি ? টাকা ছাড়া মন কি ? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই। টাকাই বাহ্য সম্পদ। হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরাজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত; এডাম স্মিথ পুরাণ এবং মিলতন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি।"[২১৭]

এই সর্বগ্রাসী বাহ্য সম্পদের তৃষ্ণা শুধু ইউরোপের জনসাধারণকেই নয়, সেখানকার বিশিষ্ট জ্ঞানী এবং রাজনীতিজ্ঞদেরও অভিভূত করেছে বলে বঙ্কিম দুঃখপ্রকাশ করেছেন। জীবনকে অস্বীকার করা হয় বলে যে সন্ন্যাসধর্মকে তিনি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছেন, মানবেতিহাসে তার প্রভাব আর পরিতৃপ্তিহীন অর্থলিপ্সার প্রভাব তাঁর মতে ভিন্ন নয়। এই বন্ধ্যা তৃষ্ণা মানুষকে কোনদিন কোনও সুখের সন্ধান দিতে পারবে না বলে তিনি একেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। সমমর্মিতা এবং সদ্বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশই মানুষের সুখলাভের একমাত্র পথ— তাঁর এই ধারণার গুরু ছিলেন বোধহয় কোঁৎ এবং সাম্যবাদী দার্শনিকরা। ধর্মতত্ত্বের দিকে ঝোঁকার আগে তাঁর মতবাদ অনুশীলন তত্ত্বকে নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল। তখন উনবিংশ শতকে বস্তুবাদের নগ্ন প্রকাশ এবং ক্রমবর্ধমান সম্পদের অপরিমিত আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে তিনি "কার্যকারিণী বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধি এবং সম্পদাদিতে উপযুক্ত ঘৃণা" বোধ মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য বলে ব্যাখ্যা করেন। যে সব মনীষী এই মানসিকতা অর্জন করতে পেরেছেন, ইতিহাসে তাদের সংখ্যা কম হলেও নেই তা নয়। নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির তুলনায় তাঁদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনাদর্শ মানবজাতির শিক্ষার পক্ষে অনেক বেশি কার্যকরী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের জীবনের গূঢ় তত্ত্ব রহস্যাচ্ছাদিত। বঙ্কিমের মতে মাত্র দুজন— গ্যোটে এবং মিল— তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত রেখে গেছেন। বঙ্কিমের পরিবর্তনশীল মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে বোধহয় এটাই পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রশস্তি।[২১৮]

পাশ্চাত্য সম্বন্ধে তাঁর মানসিক সংশয়ের কয়েকটি সূক্ষ্ম কারণও ছিল। পাশ্চাত্য সমাজের কয়েকটি রীতিনীতি আপাতদৃষ্টিতে নিরপরাধ মনে হলেও তারা অগোচরে উচ্চ আদর্শগুলিকে অকার্যকর করে দেয়। যে সব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন, সেই তালিকার শীর্ষে আছে ভণ্ডামি। ইংরাজি ভাষার সাহিত্যিক গুণমানের প্রশংসা করলেও এই ভাষাকে তিনি 'অসাধু' বলেছেন।[২১৯] ভারত সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের বিকৃত ধারণাকে উপলক্ষ করে "ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল" নামক বিখ্যাত ব্যঙ্গ রচনায় তিনি কৌতুক করেছেন— শ্রোতৃমণ্ডলী থেকে একজন তরুণ বাঘ সভাপতি- ব্যাঘ্র প্রদত্ত মানবসমাজের বর্ণনার তীব্র প্রতিবাদ করায় সভাপতি বলেন: "আপনি শান্ত হউন। সভ্যজাতীয়েরা অত স্পষ্ট করিয়া গালি দেয় না। প্রচ্ছন্নভাবে আপনি আরও গুরুতর গালি দিতে পারেন।"[২২০] সত্যবাদিতা সম্পর্কে পাশ্চাত্য মতবাদ যে বঙ্কিম একেবারেই মানতে পারেননি তা জানা যায় তরুণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বাদপ্রতিবাদে। 'মহাভারতের' একটি উপাখ্যান প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলেছিলেন যে ঐ গ্রন্থের অনেক উপাখ্যানেই সত্য থেকে বিচ্যুতিকে 'ধর্ম' বলা হয়েছে। সংস্কৃতে অবশ্য 'সত্য' বলতে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতিও বোঝায়। এই মন্তব্যে ব্রাহ্ম বিচারবোধে আঘাত লাগে এবং আরও অনেকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমের এই অসত্যকে মেনে নেওয়াকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেন। উত্তরে বঙ্কিম লেখেন: "আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহারকালে ইংরাজির অনুবাদ করি নাই। এই অনুবাদপরায়ণতাই আমার বিবেচনায় আমাদের মৌলিকতা, স্বাধীন চিন্তা ও উন্নতির এক বিঘ্ন হইয়া আসিতেছে।" নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি 'সত্য' শব্দের খুব কাছাকাছি হলেও দুটি পৃথক অর্থের উল্লেখ করেন। তারপরেও আবার স্পষ্ট মিথ্যা বা গুরুত্বহীন অনৃতভাষণ এবং অন্তরে মিথ্যাকে লুকিয়ে রেখে আপাত সত্যকথন বা ভণ্ডামির মধ্যে তুলনা করেন: "যাঁহারা নেড়া বৈরাগীর হরিনামের মত মুখে সত্য সত্য বলে, কিন্তু হৃদয় অসত্যে পরিপূর্ণ, তাহাদের সত্যানুরাগকেই সত্যের ভান বলিতেছি। এ জিনিস, এ দেশে বড় ছিল না,— এখন বিলাত হইতে ইংরেজির সঙ্গে বড় বেশি পরিমাণে আমদানি হইয়াছে। সামগ্রীটা বড় কদর্য্য। মৌখিক Lie direct সম্বন্ধে তাঁহাদের যত আপত্তি— কার্যত সমুদ্রপ্রমাণ মহাপাপেও আপত্তি নাই। সেকালের হিন্দুর এই দোষ ছিল বটে যে, Lie direct সম্বন্ধে তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু ততটা কপটতা ছিল না। দুইটিই মহাপাপ। এখন ইংরেজি শিক্ষার গুণে হিন্দু পাপটা হইতে অনেক অংশে উদ্ধার পাওয়া যাইতেছে কিন্তু, ইংরেজি পাপটা বড় বাড়িয়া উঠিতেছে।" ..."সত্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে গিয়া কেবল মৌখিক সত্যের প্রচার আন্তরিক সত্যের প্রতি অপেক্ষাকৃত অমনোযোগ" ঘটাতে পারে বলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।[২২১]

দুই সংস্কৃতির মধ্যে আচারগত অনেক প্রভেদ ছিল, মূল্যবোধের মানদণ্ডে যার বিচার চলে না বলে তিনি মেনে নিয়েছিলেন। যদিও তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের অনেকটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিক্টোরিয় যুগের মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিত ছিল, তবুও অশ্লীলতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষত যৌন প্রসঙ্গের প্রকাশ্য আলোচনার ক্ষেত্রে, তিনি পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি। "যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্নপ্রকার। এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজরা করেন না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরেজরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। ইংরেজের কাছে প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল— ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। কিন্তু আমরা ঐ শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না...পক্ষান্তরে স্ত্রী-পুরুষে মুখচুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার," কিন্তু ইউরোপে তা একটি সামাজিক প্রথা বলে স্বীকৃত। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অশ্লীলতার ধারণা কেবলমাত্র ব্যবহারগত নয়। যেমন, কালিদাস পর্বতকে ধরিত্রীর স্তন্যরূপে যে উপমা ব্যবহার করেছেন, বঙ্কিমের মতে ইউরোপীয় সাহিত্যে তা সম্ভব ছিল না, কারণ নারীদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা সেখানে নিষিদ্ধ। কিন্তু ধরিত্রীকে জীবজগতের জননীরূপে কল্পনা করা হয় বলে, তাঁর মতে, কালিদাসের এই উপমা পবিত্র এবং নির্দোষ। হীন প্রকৃতির ব্যক্তিই কেবল এর মধ্যে যৌনতার গন্ধ পাবে বলে তাঁর ধারণা। এরই উদাহরণ, ইউরোপীয় বিচারবোধে যে এমিল জোলা প্রমুখের উপন্যাসগুলিকে মেনে নেওয়া হয় অথচ ভারতীয় সাহিত্যিকে নয়, তা ঠিক নয়। পাশ্চাত্য মূল্যবোধ এবং রীতিনীতিকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে তাঁর যে সব আপত্তি ছিল, এই আলোচনা তারই অংশবিশেষ।

সাম্যবাদী আদর্শ পরিত্যাগের আগে পর্যন্ত তিনি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে পাশ্চাত্য সমাজে সকলের সমান সুযোগ পাওয়ার সুবিধার কথা লিখেছেন। ভারতে শিক্ষার অধিকার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত থাকার সঙ্গে ইউরোপে জ্ঞানলাভে সকলের সমান সুযোগের তুলনা করেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইউরোপে যদি উচ্চশিক্ষার অধিকার শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে শুধু বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্যই নয়, ইউরোপের বিরাট শিল্পবিপ্লবও সম্ভব হত না।[২২৩] পাশ্চাত্য দেশে নারী-পুরুষের অধিকারের বৈষম্য অনেক কম, ভারতের মেয়েদের তুলনায় ওদেশের মেয়েরা অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে, এবং এই সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সে দেশের সমাজে অনেক দুরতিক্রম্য বৈষম্যের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে কুক্ষিগত হলে যে সব অবশ্যম্ভাবী অন্যায় দেখা দেয়, তা ইউরোপেও দেখা দিয়েছিল এবং এমন সব বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল যার সঙ্গে প্রকৃতিগত ক্ষমতার তারতম্যের কোনও সম্পর্কই ছিল না। অবশ্য স্বাভাবিক বৈষম্য সত্ত্বেও অধিকারের বৈষম্য থাকা উচিত নয়। ইউরোপে সামাজিক বৈষম্যের চূড়ান্ত নিদর্শন হল স্ত্রী-পুরুষের অধিকারভেদে। সে দেশের উত্তরাধিকার আইনে মেয়েদের একেবারেই বঞ্চিত করা হয়েছে। তার তুলনায় হিন্দু আইন এবং তার চেয়েও মুসলিম শরিয়ৎ অনেক ভাল। এদেশে অনেকে মনে করেন যে ইউরোপে মেয়েদের অবাধ মেলামেশার সুযোগে তাদের চারিত্রিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। বঙ্কিমের মতে চরিত্রস্খলনের ইঙ্গিত নারীত্বের অপমান। ইউরোপে মেয়েদের সমানাধিকার অর্জনের জন্য যে সব আন্দোলন চলছিল সে সবের প্রতি তাঁর সমর্থন তো ছিলই, উপরন্তু অদূর ভবিষ্যতে অন্তত এর দরুন কিছু সুফল পাওয়া যেতে পারে বলে তাঁর আশা ছিল।[২২৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের বহু ক্ষেত্রে তিনি ঔদার্য এবং মানবিকতাবোধের অভাব লক্ষ করেছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং প্রভাবশালিতার মাধ্যমে যে সামাজিক নিপীড়ন হয়ে থাকে, তা ঐ সমাজে নেই এমন কথা বলা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, "মিল জন্মাবচ্ছিন্নে আপনার অভক্তি ব্যক্ত করিতে পারিলেন না ; ব্যক্ত না করিয়াও, কেবল সন্দেহের পাত্র হইয়াও, পার্লামেন্টে অভিষেককালে অনেক বিঘ্ন-বিব্রত হইয়াছিলেন। ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার।" সাম্প্রতিককালেও লঘু অপরাধে প্রাণদণ্ড প্রভৃতি বর্বরোচিত শাস্তিদানের রীতিও সামাজিক বৈষম্যেরই নিদর্শন।[২২৫]

পশ্চিমের কয়েকটি অন্ধ সংস্কারকেও তিনি একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। ভারতকে কোম্পানীর শাসন থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে হস্তান্তরিত করার প্রতিবাদে এক স্মারকলিপি রচিত হয়, শোনা যায় যে মিল সেটি রচনা করেছিলেন। বঙ্কিম এই স্মারকলিপির প্রশংসা করেছেন। "উক্ত আবেদনে লিখিত ছিল যে ভারতবর্ষের ন্যায় রাজ্য পার্লামেন্টের অধীন না হইয়া কোম্পানীর অধীন থাকিলে ভারতবাসীর মঙ্গল হইবেক, নতুবা তাহারা ইংলণ্ডের দলাদলির আক্রোশে পড়িয়া নিতান্ত উৎপীড়িত হইবেক। তৎকালে এই কথার প্রতি কেহই তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই ; কিন্তু এখন ইহাকে তুচ্ছ করিতে পারে এমন লোক কে আছে ?"[২২৬] মিলের পাণ্ডিত্যের চেয়ে গ্ল্যাডস্টোনের বাক্‌সর্বস্বতার বেশি কদর ছিল বলে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের উপর তাঁর খুব একটা ভরসা ছিল না।[২২৭] ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের গৌরবেই তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না।[২২৮] ভারতে ব্রিটিশ প্রবর্তিত জুরি দ্বারা বিচার প্রথাকে তিনি অমঙ্গলসর্বস্ব, লুপ্তপ্রায় মধ্যযুগীয় প্রথা বলেছেন। এই প্রথা যখন প্রথম চালু হয়, তখন বিচারবিভাগের ক্ষমতাসীন প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হাত থেকে দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীকে রক্ষা করার জন্য তার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ জাতির চারিত্রিক রক্ষণশীলতার জন্যই ঐ ব্যবস্থা টিকে আছে এবং তার ফলে বিচার-ব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। আইনের সূক্ষ্মবিচারের দায়িত্ব পড়েছে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকের হাতে।[২২৮] কঠোরতম সমালোচনা অবশ্য বর্ষিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদের প্রতি, যদিও দেশবাসীকে তিনি সেই আদর্শ গ্রহণ করতে বলেছিলেন। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদের পাপ হল এই যে নিজের জাতির স্বার্থে অন্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করা, এমনকি দুঃখদুর্দশারও সৃষ্টি করা হয়। নিজের দেশের বাইরের জগৎ সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কখনওই সমর্থন করা যায় না। জীবনের উত্তরকালে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদকে যে তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন তার ইঙ্গিত পূর্বজীবনের এইসব মন্তব্যে লুকিয়েছিল।[২৩০]

পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের মধ্যে ইউরোপের প্রধান ধর্মমত— খ্রিস্টধর্মের মূল্যায়নে তাঁর মতের গুরুতর পরিবর্তন হয়েছে। যদিও মুক্তিদাতা ধর্মরূপে খ্রিস্টধর্মের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর প্রথম জীবনের অভিমতের পরিবর্তন কোনদিনই হয়নি, তা সত্ত্বেও পরবর্তী জীবনে ইউরোপের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের তুলনায় হিন্দু ধর্মের মহত্ত্ব উপলব্ধি করার পর একদিন যে ধর্মকে সমাদর করেছিলেন তার প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। আগেই দেখিয়েছি যে খ্রিস্টধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কারণ ছিল পরস্পর সম্পৃক্ত দুটি বিশ্বাস, প্রথমত মানুষের সামনে উদ্‌ঘাটিত শ্রেষ্ঠ সত্যের অন্যতম সাম্যতত্ত্ব যীশুর বাণীতে রূপ পেয়েছে, আর দ্বিতীয়ত সেই বার্তা গ্রহণ করেই ইউরোপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবসভ্যতার তুঙ্গে উঠতে পেরেছে। "সকল মনুষ্যই ঈশ্বরসমক্ষে তুল্য, বরং যে পীড়িত, দুঃখী, কাতর সেই ঈশ্বরের অধিক প্রিয়"—এই বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্যের জন্যই তা প্রচার লাভ করেছে। "যে ব্যবহার তুমি অন্যের কাছে আশা কর, তুমি নিজে সেই ব্যবহার কর"— যীশুর এই শিক্ষা বঙ্কিমের মতে নৈতিকতার বীজমন্ত্র। সাম্যতত্ত্বেরও মূলমন্ত্র এই। "...পৃথিবীতে দুইবার দুইটি বাক্য উক্ত হইয়াছে— তাহাই নীতিশাস্ত্রের সার তদতিরিক্ত নীতি আর কিছুই নাই। একবার আর্য্যবংশীয় ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে বলিয়াছিলেন, 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ'।" আর একবার জেরুসালেমের পর্বতশিখরে দাঁড়াইয়া যীশু বলিলেন: "অন্যের নিকট তুমি যে ব্যবহারের কামনা কর, অন্যের প্রতি তুমি সেই ব্যবহার করিও। এই বাক্য সাম্যতত্ত্বের মূল। ...এই মহাবাক্যে বড় মানুষের গর্ব খর্ব হইল— প্রভুর গর্ব খর্ব হইল— অঙ্গহীন ভিক্ষুকও সম্রাটের অপেক্ষা বড় হইল।" এইসব উক্তির মধ্যে খ্রিস্টানদের ভগবদভক্তি বা ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের কোনও উল্লেখ নেই। যীশুকে তিনি 'সাম্যাবতার' বলেছেন— তিনি যেন সাম্যনীতির মূর্ত প্রকাশ। যীশুর সাম্যবাদের বার্তায় ইউরোপের সব বৈষম্য দূরীভূত হয়েছে বলেই সেখানে এত উন্নতি সম্ভব হয়েছে। ক্রমে ধর্মযাজকরা নিজেদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এক নতুন রকম বৈষম্য সৃষ্টি করলেন, অন্যদিকে খ্রিস্টিয় সন্ন্যাসবাদের আতিশয্যে লৌকিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হল, তখন থেকে ইউরোপের অবক্ষয় সূচিত হল।[২৩১] সাম্যবাদ ছাড়া খ্রিস্টধর্মের আর এক আদর্শ মানবতাবাদ, যে আদর্শের অন্যতম প্রবক্তা বঙ্কিমের প্রিয় দার্শনিক কোঁৎ। অন্যত্র যে সব আদর্শ তাঁর মনোগ্রাহী হয়েছিল, খ্রিস্টধর্মে তাদের সমাবেশ অবশ্যই ওই ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কারণ, কিন্তু তাছাড়াও সম্পূর্ণ অভাবিত একটি কারণেও তিনি খ্রিস্টধর্মকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। তাঁর প্রথমদিকের রচনায় আধ্যাত্মিকতার স্থান ছিল না। পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে হিন্দু দর্শন বুঝতে গিয়ে একটি অনুচ্ছেদে তিনি এমন একটি মন্তব্য করেছেন, যার মধ্যে খ্রিস্টধর্মের সুর ধ্বনিত হয়েছে। হিন্দু সন্ন্যাসবাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সজ্ঞানে অনুতাপ করার মত মানসিক উৎকর্ষতায় না পৌঁছতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মনিগ্রহের মাধ্যমেই তার অনুতাপ।[২৩২] আবার এই প্রচ্ছন্ন প্রশস্তির পরই যুক্তিবাদের প্রবণতা হিন্দু দর্শনের তুলনায় খ্রিস্টধর্মে কম বলে তুল্যমূল্য করেছেন। উনবিংশ শতকের বিজ্ঞান চিন্তায় প্রমাণিত হয়েছে যে খ্রিস্টধর্মের একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের চেয়ে বিশ্বপ্রকৃতিতে 'স্রষ্টা' ও 'পাতা' ভিন্ন একজন 'হর্তা'—হিন্দুদের এই ত্রিদেবের কল্পনা 'বিজ্ঞানসঙ্গত এবং নৈসর্গিক'।[২৩৩] আচারনিষ্ঠা এবং মানবিক মূল্যবোধ ক্ষুণ্ণ করার বিরুদ্ধে বঙ্কিমের যে আপত্তি তা শুধু হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, "রবিবারে কার্যত্যাগ, গির্জায় বসিয়া নয়ন নিমীলন, এবং খ্রিস্টধর্ম ভিন্ন ধর্মান্তরে বিদ্বেষ" তাঁর মতে পুণ্যকর্মের মধ্যে পড়ে না।[২৩৪]

যত আকর্ষণীয় হোক না কেন, যাচাই না করে কোনও মত বা আদর্শ গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না বলেই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব দার্শনিক মতবাদ আয়ত্ত করেছিলেন। নিজের সৃষ্ট মত বা ধারণা ছাড়া তিনি কোনও কিছুই নির্বিচারে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। যে সব পাশ্চাত্য দার্শনিকের দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, তাঁদের মতবাদও তিনি সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখেছেন। সাম্যবাদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানসিকতার পর্বে তিনি 'সাম্যাবতার' বলে রুশোকে বুদ্ধ এবং যীশুর সঙ্গে এক আসনে বসিয়েছেন, কিন্তু সেইসঙ্গে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে মানবজাতির পরম উপদেষ্টা ঐ দুজনের সঙ্গে রুশোর তুলনা চলে না, কারণ তিনি যা বলেছেন তা অবিমিশ্র পূর্ণ সত্য নয়। "তিনি মহিমাময় লোকহিতকর নৈতিক সত্যের সহিত অনিষ্টকারক মিথ্যা মিশাইয়া সেই মিশ্র পদার্থকে আপনার অদ্ভুত বাগিন্দ্রজালের গুণে লোকবিমোহিনী শক্তি দিয়া, ফরাসীদিগের হৃদয়াধিকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।" বঙ্কিম রুশোর সাম্যবাদ তত্ত্বের একটি নিখুঁত সারাংশ রচনা করেছেন : "সাম্য প্রাকৃতিক নিয়ম। ...মনুষ্যে মনুষ্যে নৈসর্গিক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেও সভ্যতার দোষে"— নিষ্পাপ আদিম অবস্থা থেকে পতনের ফলে ; জমি সকলের, কিন্তু শঠতার ফলে জমিস্বত্ব চিহ্নিত হয়েছে, এবং আইন বলবৎ করে সেই শঠতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে *Le Contrat Social*-এ রুশো তাঁর পূর্বেকার মতের কিছু পরিবর্তন করে বলেছিলেন, যে, নিষ্পাপ আদিম মানুষের স্বাভাবিক প্রজ্ঞার স্থান নিয়েছিল সভ্য মানুষের বিচারবোধ, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানা ন্যায়সঙ্গত। বঙ্কিমের বক্তব্য হল যে সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটি ভ্রমাত্মক, কিন্তু যে সাম্যবাদী নীতির উপর তা প্রতিষ্ঠিত, তা সত্য। "ভূমি সাধারণের— এই কথা বলিয়া রুশো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্যনতুন ফল ফলিতে লাগিল। কম্যুনিজম সেই বৃক্ষের ফল, ইণ্টারন্যাশনাল সেই বৃক্ষের ফল।" জমির সামাজিক স্বত্বতত্ত্ব বঙ্কিমের মতে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন "বিজ্ঞ, বিবেচক পণ্ডিতদের" সৃষ্টি। জমি এবং মূলধন— উৎপাদনের দুটি অঙ্গের যৌথ স্বত্ব স্বীকার করে ওয়েন, লুই ব্লাঙ্ক এবং ক্যাবে বলেছেন "শ্রমানুসারে ধনের ভাগ হওয়া কর্তব্য।" এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সাঁসিমোঁর বক্তব্যের মিল আছে। সাম্যবাদ-তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ফুরিয়ের এবং মিলের উত্তরাধিকার-তত্ত্বেরও আলোচনা করেছেন। মিলের ঐ তত্ত্ব তাঁর মতে "সাম্য-তত্ত্বের অন্তর্গত"। বঙ্কিম বলেছেন : "উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে ন্যায়ানুযায়ী ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন রাজ্যে এ পর্যন্ত হয় নাই। ...এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য, এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীর সর্বত্র চলিবে।" পাশ্চাত্যের যে সব দার্শনিক মতবাদের তিনি প্রশংসা করেছেন, মনে হয়, সেগুলির মধ্যে সাম্যবাদ তত্ত্বকেই সাময়িকভাবে হলেও তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেছিলেন। নৈসর্গিক বৈষম্যের জন্যও অধিকারের বৈষম্যকে তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেননি : "তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণে নহে ; অন্য যে নীচ কুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। ...মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই—তোমার সমকক্ষ।" মিলের উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন : "এক্ষণকার যত সুব্যবস্থা, তাহা পূর্বতন কুব্যবহার সংশোধক মাত্র... কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ।" তাঁর আশা ছিল যে "ধন গোময়ের মত, এক স্থানে অধিক জমা হইলে দুর্গন্ধ এবং অনিষ্টকারক হয়, মাঠময় ছড়াইলে উর্বরতা জনক, সুতরাং মঙ্গলকারক হয়।"[২৩৫] পরে যে তিনি সাম্যতত্ত্বকে ভুল বলে কেন পরিত্যাগ করেছিলেন, তার কারণ কোথাও দেখাননি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভূদেবও 'সামাজিক প্রবন্ধে' এই তত্ত্বের আলোচনা করেছেন ; কিন্তু তাঁর মতে এ এক অবাস্তব আদর্শ, যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিত্তি হল হিংসা এবং এক অন্যায় দিয়ে আর এক অন্যায়ের প্রতিবিধানের চেষ্টা। যুবক বঙ্কিমের অবশ্য এই ধরনের কোন সংশয় ছিল না। বাংলার জমি-বন্দোবস্ত তাঁর কাছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং পরিহারযোগ্য মনে হলেও সেখানে সাম্যবাদী নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি উপযুক্ত সাবধনতা এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। যৌবনের চিন্তাধারা পরিত্যাগের কারণ বোধহয় ক্রমিক প্রগতিতে তাঁর দৃঢ় আস্থার পরিণাম। কোঁৎ, সীলি এবং গী-তাকে তিনি রুশো এবং অন্যান্য সমাজতন্ত্রবাদীদের চেয়ে যোগ্যতর পথপ্রদর্শক বলেছেন। শুধুমাত্র বাংলার কৃষকদের দুর্দশার ছবি তাঁর সামনে উন্মুক্ত হওয়াতেই তাঁর মনে এইসব বৈপ্লবিক চিন্তাধারার উদয় হয়েছিল। ঐতিহ্যগত সমাজ ও আদর্শে দৃঢ় আস্থা থাকার ফলে পাশ্চাত্য সাম্যবাদ ভূদেবের মনে কোন ঢেউ তোলেনি।

বঙ্কিমের উপর উপযোগবাদী এবং প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের প্রভাব সম্পর্কে পূর্বে সামান্য কিছু আলোচনা করেছি। তাঁর বহু রচনার মধ্যে এদের প্রভাব অনুভব করা গেলেও এইসব মতবাদের মূল্যায়ন পাওয়া যায় বিক্ষিপ্ত কয়েকটি মন্তব্যে এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর দু-একটি প্রহসনে। উপযোগবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা মিলের প্রতি বঙ্কিমের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে মিলের মরণোত্তর প্রশাস্তিতে:[২৩৬] "আমরা কখন তাঁহাকে চক্ষে দেখি নাই। তথাপি আমাদিগের মনে হইতেছে যেন আমাদিগের কোন পরমাত্মীয়ের সহিত চিরবিচ্ছেদ হইয়াছে।" তিনি লিখেছেন, মিল "সমস্ত মানবজাতিকে ঋণী করিয়াছেন।" দার্শনিকের মতবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার সময় অবশ্য তাঁর উপযোগ তত্ত্বের উল্লেখ খুবই সামান্য। যেসব ক্ষেত্রে তিনি মিলের অবদানের গুরুত্ব দিয়েছেন, তা হল অর্থব্যবহারশাস্ত্র (Political economy), ন্যায়শাস্ত্র, স্বৈরাচার-বিরোধী তত্ত্ব (anti-abslulist theory) এবং সাম্য তত্ত্ব। কোঁৎ-এর সঙ্গে তাঁর মতবৈষম্য একটি মৌলিক প্রশ্নকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে বলে বঙ্কিম লিখেছেন। মিলের মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই সমাজের উন্নতি সম্ভব, আর কোঁৎ-এর মতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে গেলে সমাজের উন্নতি কখনওই সম্ভব নয়, কারণ মানুষের পরহিতৈষণা কখনই তার স্বার্থপরায়ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারবে না, সুতরাং সমাজের উন্নতিকল্পে স্বার্থ প্রবৃত্তিকে দমন করতেই হবে। নারীজাতির অধিকার অস্বীকার করা, ধর্মের আচারপ্রিয়তা এবং কর্তৃত্বপরায়ণতা, স্বাস্থ্যবিষয়ক হাস্যকর ব্যবস্থা, সর্বপ্রকার উদার চিন্তা বিসর্জন দেওয়া প্রভৃতি[২৩৭] কোঁৎ-এর যেসব মতবাদের সমালোচনা মিল করেছেন এবং যেগুলি মিল-কোঁৎ দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু, সেগুলি বঙ্কিমের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্থান পায়নি। তিনি সবিনয়ে জানিয়েছেন যে এই দুজন মহাপণ্ডিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করা তাঁর সাধ্যাতীত, তবে তাঁর সহানুভূতি কোনদিকে তা বোঝা কারও পক্ষেই অসম্ভব নয়। মিল কর্তৃক কোঁৎ-এর সমালোচনায় "জনসমাজের কথঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু তাহা মিলের অভিপ্রেত নয়" বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে "যেমন...খৃষ্টান মহাশয়েরা সকল কথা না বুঝিয়া কেবল হিন্দুধর্মের প্রতি ব্যঙ্গ করিতেই পটু হইতেন, মিলকৃত কোমৎভাষ্যের পাঠকমহাশয়েরাও তদ্রূপ কেবল ব্যঙ্গ করিবার ক্ষমতা লাভ করেন।" বঙ্কিম ভূদেবের মত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অপকৃষ্টতা কখনই সরাসরি প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি বটে, তবে তিনিও বৃহত্তর সামাজিক মঙ্গল তত্ত্বকেই উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছিলেন। সেই কারণেই দার্শনিক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তার দুই সীমান্তে অবস্থিত দুটি আদর্শ— সাম্যবাদ এবং প্রত্যক্ষবাদ তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কোনদিনই পারেনি। হিতবাদের (উপযোগিতাবাদের) অন্তর্নিহিত স্বার্থপরায়ণতাকে তিনি নানাভাবে উপহাস করেছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর একটি প্রহসনের নাম দিয়েছেন 'ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন'।[২৩৮] অবশ্য তত্ত্বের চেয়ে মিলের দেশবাসী কর্তৃক তার অপপ্রয়োগই তাঁর রচনায় ব্যঙ্গের প্রধান বিষয়। "জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর বিশেষকে উদর বলে" এবং সেই উদরপূর্তিই হিতবাদের আদর্শ বলে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। হিতবাদতত্ত্ব এবং বাহ্যসম্পদভোগের পরিতৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তিনি একটি কার্যকারণ সম্পর্ক লক্ষ করেছেন। "কোথা ভাই ইউটিলিটেরিয়ান কামার! পাঁটা (মানুষের মন) হাড়িকাটে ফেলিয়াছি এককোপে পাচার কর।"[২৩৯] একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে তিনি হিতবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ উভয়েরই সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী সমালোচনা করেছিলেন, পরবর্তীকালে অধ্যাত্মবিষয়ক 'ধর্মতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধে তা বিশ্লেষণ করেছেন। মানব সমাজে উৎপীড়নের কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখেছেন যে "সে সকলের ভিত্তিমূল মনুষ্যের প্রয়োজনে," এবং একটি প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে অত্যাচার এবং উৎপীড়ন "শক্তির স্বভাবসিদ্ধ"। মানুষের বুদ্ধিও অত্যাচারের প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। "যদি ধর্মের অত্যাচার শমতায় সক্ষম কোন শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার উদাহরণ, হিতবাদ এবং প্রত্যক্ষবাদ। এতদুভয়ের বেগে মনুষ্যহৃদয়সাগরে অল্পভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে। বোধহয় জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের অত্যাচার শাসনের জন্য অন্য কোন শক্তি যে মনুষ্য কর্তৃক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না।"[২৪০]

ইউরোপীয় সংস্কৃতির একটি দিকের মূল্যায়নকে বঙ্কিমের আদর্শবাদ বা জাতীয়তাবাদ স্পর্শ করতে পারেনি, তা হল ইউরোপীয় সাহিত্য। সেখানেও তুলনামূলক বিচারের প্রবণতা আছে বটে, তবে সাহিত্যের বিচারে সার্বজনীন সৌন্দর্যতত্ত্ব তাঁর দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণার উর্ধ্বে স্থান লাভ করেছে। তিনি বলেছেন, "মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে...দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র"[২৪১] মহান সাহিত্যের উদ্দেশ্য সর্বত্রই এক— মানুষের মনকে রুচিসম্পন্ন করে তার মাধ্যমে নৈতিক উন্নতিসাধন: "তাঁহারা (কবি) সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।"[২৪২] সমস্ত সৃজনশীল সাহিত্য বোঝানোর জন্য বঙ্কিম 'কাব্য' শব্দটি ব্যবহার করেছেন— ইংরাজিতে যাকে Poetry বলা হয়। সংস্কৃত এবং ইউরোপীয় উভয় সাহিত্যেই কাব্যের বিভাগ যথাযথ হয়নি বলে তিনি নতুনভাবে শ্রেণীবিভাগ করবার কথা ভেবেছেন। তাঁর মতে কাব্যের তিনটি বিভাগ— দৃশ্যকাব্য বা নাটকাদি, আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য, এবং অবশিষ্ট সব রচনাই খণ্ডকাব্য। কাব্যের রূপগত বৈষম্যকে তিনি প্রকৃত বৈষম্য মনে করেননি। *Comus, Manfred* এবং *Faust* নাটকের আকারে কথোপকথনে গ্রন্থিত হলেও এগুলি কাব্য, আবার *Bride of Lammermoor* কাব্যের আকারে রচিত হলেও তাকে নাটক বললে অন্যায় হয় না। এইরকম শ্রেণীবিভাগের কারণও তিনি স্পষ্টভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন: "যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক। কিন্তু যেখানে বস্তুগুলি পৃথক, সেখানে নামও পৃথক হওয়া আবশ্যক।"[২৪৩] শ্রেণীবিচারে ভুল থাকলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যিক বিচারেও ভুল হওয়া স্বাভাবিক, তাই সঠিক শ্রেণীবিচার আবশ্যিক। নাটকহিসাবে বিচার করলে গ্যেটের Faust রসোত্তীর্ণ নয়, কিন্তু আখ্যানকাব্যরূপে তা অতুলনীয়। সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারে তিনি দেশাচারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে এক উদাত্ত সাহিত্যিক রসজ্ঞানের পরিচয় রেখেছেন। এইসব আলোচনায় তিনি সেক্সপীয়রকে প্রায়শই উদ্ধৃত করেছেন। পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্যবিচারের একটি ধারা গ্রহণ করে তিনি ভবভূতির 'উত্তররামচরিতের' সমালোচনায় বলেছেন, "নাটকবর্ণিত ক্রিয়াসকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই", আবার এও বলেছেন যে "এই সম্বন্ধে উইন্টার্স টেল নামক সেক্সপীয়রকৃত বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে।"[২৪৪] দৈর্ঘ্যের তুলনায় এ নাটকের গতি স্তিমিত। বঙ্কিম এর সঙ্গে 'ম্যাকবেথ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তুলনা করে দেখিয়েছেন অভিনয়, গতি এবং ঘটনাপরম্পরায় কি অনবদ্য সাহিত্যিক উৎকর্ষ সৃষ্টি হয়েছে। অন্য একটি রচনায় কণ্বমুনির তপোবনে প্রতিপালিত অপ্সরাকন্যা শকুন্তলার সঙ্গে প্রথমে মিরান্দা এবং পরে দেসদিমোনার তুলনা করেছেন।[২৪৫] তাঁর মতে শকুন্তলা ও মিরান্দা একই কবির তুলিতে চিত্রিত হতে পারত। লোকালয়ের সংস্রববিহীন পরিবেশে প্রতিপালিত হওয়ায় দুজনের মধ্যেই মোহময় সারল্য। "যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন তাহা হইলে...তিনি বুঝিতেন যে, শকুন্তলা, সমাজপ্রদত্ত সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি, তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে।" দ্বীপবাসিনী মিরান্দার তুলনায় তপোবনবাসিনী শকুন্তলার চরিত্র যদি অসম্পূর্ণ মনে হয়, তবে শিল্পরীতির প্রয়োজনেই তা হয়েছে। জাহাজ-ডুবিতে বিপর্যস্ত ফার্দিনান্দ ক্ষুদ্র ব্যক্তি, মিরান্দার সমযোগ্য। "কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুষ্যন্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া শকুন্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে...মত্তমাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনী-কোরককে শূন্যে তুলিয়া বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন।" ছলনাময়ী বলে পরিত্যক্তা শকুন্তলার ব্যক্তিত্ব রাজদরবারে পূর্ণ প্রকাশিত, কারণ "তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী। মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী।" এখানে কবি পূর্ণবিকশিত নারীত্বের রঙে শকুন্তলার ছবি এঁকেছেন। "শকুন্তলার কবি যে টেম্পেস্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম"—এই উক্তির মধ্যে বঙ্কিমের উদ্দেশ্য নিহিত আছে। এরপর তিনি শকুন্তলা চরিত্রের সঙ্গে দেসদিমোনার তুলনা করেছেন— "উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন...উভয়েই স্বামিকর্তৃক বিসর্জিতা হইয়াছিলেন।...কিন্তু শকুন্তলা দেসদিমোনার সহিত তুলনীয়া এবং তুলনীয়াও নহে— কেন না, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্সপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না।" কেন যে তুলনা হয় না, তার একটি বিশেষ কারণও বঙ্কিম দেখিয়েছেন। 'ওথেলো' একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক, শকুন্তলা আখ্যানকাব্য। কিন্তু তাঁর এই যুক্তি নিতান্তই বাহ্য। 'ওথেলো' নাটকে তিনি মহাসমুদ্রের অতলান্ত গভীরতা ও ভয়ঙ্কর রূপ দেখেছেন— "হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ; দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ষাদি বাত্যায় সন্তাড়িত... আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণপ্রক্ষেপ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহার মৃদুগীতি— সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।" যখনই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভারের কোনও রত্ন উদ্ধৃত করেছেন, তখনই বলেছেন যে তার তুলনা পাওয়া যাবে "বিশ্বজনীন মানবচরিত্রের অমর কবি" একমাত্র সেক্সপীয়রের রচনায়।[২৪৬] তাঁর রচনা বঙ্কিমের বিচারে "শ্রেষ্ঠ কাব্য"।[২৪৭] অন্যত্রও তিনি ইংরাজি সাহিত্যের 'অপরিমেয়' শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন, তবে সেখানে তুলনীয় বিষয় হল আধুনিক ভারতের সাহিত্য, প্রধানত বঙ্গসাহিত্য।[২৪৮] "সংস্কৃত গ্রন্থগুলির তুলনায়, অন্তত আকারে, ইউরোপীয় গ্রন্থগুলিকে গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা করে না" বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। "যেমন হস্তীর তুলনায় টেরিয়র, যেমন বটবৃক্ষের তুলনায় উইলো কি সাইপ্রেস যেমন গঙ্গা-সিন্ধু-গোদাবরী তুলনায় পার্বতী নির্ঝরিণী, মহাভারত বা রামায়ণের তুলনায় একখানি ইউরোপীয় কাব্য সেইরূপ গ্রন্থ।" বলা বাহুল্য, এখানে একমাত্র আয়তনই তাঁর বক্তব্য নয়।[২৪৯]

বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিম পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিচার করেছেন। একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে তিনি *Paradise Lost*-এর সঙ্গে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-এর তুলনা করেছেন। এই মহাকাব্যে হিমালয়-কন্যা উমার সঙ্গে শিবের বিবাহ এবং কার্ত্তিকেয়র জন্মকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দুই মহাকাব্যের তুলনীয় বিষয় হল অতিপ্রাকৃত চরিত্র— দুটিরই প্রধান চরিত্রগুলি অতিমানবীয়। কালিদাসের কাব্যে একটিও মনুষ্যচরিত্র নেই। মিলটনের শ্রেষ্ঠ রচনাকে তিনি "আনুপূর্বিক পাঠ কষ্টকর" বলেছেন, কারণ তার মতে "মনুষ্যচরিত্রের অননুকারী দৈবচরিত্রে মনুষ্যের সহৃদয়তা হয় না।" এমনকি আদম ও ইভ "পার্থিব সুখদুঃখের অনধীন, নিষ্পাপী বলে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যচরিত্র নয়।" মিলটনের মত প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা বলেই এটি পাঠযোগ্য হয়েছে। তুলনায় "কুমারসম্ভব আদ্যোপান্ত পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না। ইহার কারণ এই যে, কালিদাস কয়েকটি দেবচরিত্র মনুষ্যচরিত্রানুকৃত করিয়া অশেষ মাধুর্য্যবিশিষ্ট করিয়াছেন।" জনমানসের উপর প্রভাবের মাপকাঠিতে যদি সাহিত্যের বিচার করতে হয়, তবে, বঙ্কিমের বিচারে, কালিদাসের কাব্যই শ্রেষ্ঠ।[২৫০] এই সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টির জন্যই তিনি টমসন, সাদি প্রমুখ অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের কবিদের পছন্দ করতেন, সর্বোপরি ওয়েবার্লির উপন্যাসগুলিকে উত্তম সাহিত্যগুণসম্পন্ন বলে মন্তব্য করেছিলেন।[২৫১] জেন অস্টেন এবং জর্জ এলিয়ট তাঁর বিচারে নিম্নমানের ঔপন্যাসিক।[২৫২] তাঁরই মত স্কটের একজন গুণগ্রাহী বলে তিনি গ্লাডস্টোনের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ঊনবিংশ শতকের বাঙালি মানসে স্কটের চেয়েও বেশি সম্মানিত বোধহয় একজনই ছিলেন, তিনি স্বয়ং শেক্সপীয়র।[২৫৩]

বঙ্কিমের রচনায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে ইংরাজি ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্য পাঠেও তিনি আনন্দ পেতেন, যদিও, খুব সম্ভবত, তিনি সেগুলির ইংরাজি অনুবাদই পড়েছিলেন।[২৫৪] কোনও কোনও ক্ষেত্রে রসসৃষ্টির বিচারে নৈতিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কৌতুক ও প্রহসনের চরিত্র প্রসঙ্গে দুটি রচনায় নৈতিকতার প্রশ্ন তিনি স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছেন। একটি প্রবন্ধে তিনি মানুষের মধ্যে দৈবী ও পশু শক্তির সহাবস্থানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন : "কাব্যের বিষয় মনুষ্যচরিত্র ; যে কাব্য সম্পূর্ণ, তাহাতে এই দুই ভাগই প্রতিবিম্বিত হইবে।" তিনি আরও বলেছেন যে সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ কেউ মানবচরিত্রের ভাল দিকটিই শুধু গ্রহণ করেছেন। যেমন ভিক্টোর য়ুগো। ঐ প্রবন্ধেই তিনি অন্য একটি প্রসঙ্গের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবতারণা করেছেন যার প্রাসঙ্গিকতা খুব স্পষ্ট নয়, তা হল অস্বাভাবিকত্ব— যারা মানবচরিত্রের অস্বাভাবিকত্ব নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই উপলক্ষ কৌতুক, যেমন সারবন্টিস।[২৫৫] "হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ এবং পরশ্রীকাতরতা পরিপূর্ণ' পাশ্চাত্য ধরনের প্রহসন তাঁর পছন্দসই ছিল না। — "পড়িয়া বোধ হয় ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে— দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া।"[২৫৬] কঠোরতর নৈতিকতার ধ্বজা ধরে, জোলার উপন্যাসগুলিকে উন্নতমানের সাহিত্য বলে গ্রহণ করায় তিনি ইউরোপের রুচিবিকৃতিকে ধিক্কার জানিয়েছেন এবং সাহিত্যে বিশুদ্ধ রুচির প্রয়োগ ব্যাপারে অন্তত আমাদের ইউরোপের কাছে শেখার কিছু নেই বলে মন্তব্য করেছেন।[২৫৭]

ইউরোপীয় সাহিত্য চর্চার আনন্দ শুধু আনন্দই, সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সেখানে অবান্তর। কিন্তু জাতীয়তাবাদী চিন্তা কখনই তাঁর মন থেকে মুছে যায়নি। সেটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ সাহিত্যের নবজাগরণের মাধ্যমেই জাতীয় পুনর্জাগরণ ঘটবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুকরণ-পদ্ধতির কার্যকারিতায় তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল, কারণ একমাত্র গ্রীক সাহিত্য ছাড়া আর কোনটিই প্রথম থেকেই স্বাধীন এবং মৌলিক অস্তিত্বের দাবি করতে পারে না। "বিশুদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত" ল্যাটিন কবি হোরেস গ্রীক সাহিত্য থেকে এক নতুন ধরনের কাব্যশৈলী আমদানী করাকেই মৌলিকত্ব বলেছিলেন, কারণ সে যুগে গ্রীসের অনুকরণ প্রগতির সমার্থক ছিল। গ্রীসের ক্লাসিকাল সাহিত্যের চর্চা এবং অনুকরণ ইউরোপের রেনেসাঁসের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এমনকি দাঁতের মধ্যেও কিছুটা অনুকরণ-প্রবৃত্তি ছিল, এবং "অবক্ষয়িত ল্যাটিন চার্চের অবশিষ্ট জ্ঞানটুকুর" সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের চর্চা যুক্ত হয়ে যদি আধুনিক কেল্টিক এবং টিউটনিক জাতির উন্নত সভ্যতা সৃষ্টি করতে পারে, তা হলে বোধহয় বাঙালিদেরও কিছু আশা আছে। হয়ত তারা কোনদিনই ইউরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেদের সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটাতে পারবে না, বড়জোর একটা নকল জৌলুষ সৃষ্টি করবে। ঠিক এই মুহূর্তে তাদের কাজে বা চিন্তায় বড় কিছু করার মত যোগ্যতা দেখা যাচ্ছে না। তবে ইউরোপে নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নমনীয় ও পরিবর্তনমুখী ইতালিয়দের মধ্যে। বাঙালিরা— "এশিয়ার ইতালিয়গণ" হয়ত একইভাবে পশ্চিমী চিন্তাধারার প্রথম মাধ্যম হবে এবং "আরো খাঁটি ও অনমনীয় উত্তর ভারতীয়রা" পরে তাদের থেকে শিখবে।[২৫৮]

ইউরোপের ইতিহাস পৃথিবীর দুর্ভাগা জাতিগুলির সামনে এক শিক্ষামূলক উদাহরণ বলে বার বার উল্লেখ করলেও, পাশ্চাত্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলিকে বঙ্কিম পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি। "যে জাতির পূর্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্য রক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিনকুরের স্মৃতির ফল ব্লেনহিম ও ওয়াটার্লু। ইতালি অধঃপতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে।"[২৫৯] কিন্তু অহঙ্কারী ইউরোপীয়দের ইতিহাস রচনা একটা বাতিক হয়ে গিয়েছিল। "সাহেবরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়"— তারা যা করে সবই তাদের কাছে অক্ষয় কীর্তি। "আমরা যদি হাই তুলি, তাহাও বিশ্বসংসারে অক্ষয় কীর্তিস্বরূপ চিরকাল আখ্যাত হওয়া কর্তব্য, অতএব তাহাও লিখিয়া রাখা যাউক।"[২৬০] কিন্তু এরকম আত্মাভিমান-প্রসূত ইতিহাসে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। "যে সকল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসবেত্তা আত্মজাতির লাঘব স্বীকার করিয়া, সত্যের অনুরোধে শত্রুপক্ষের যশকীর্তন করেন, তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক।" এমনকি, কৃতবিদ্য, সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইতিহাসবিদরাও মিথ্যাচারী হন।[২৬১] ভারতের ইতিহাস-প্রণেতা ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের রচনাকে বঙ্কিম কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। "মেকলে ক্লাইবের জীবনচরিত নামক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন" বলে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্য তাঁর মতে সত্যের অপভ্রংশ।[২৬২] মার্সম্যান প্রমুখ ঐতিহাসিক ভারতের অতীত গৌরব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত।[২৬৩] ইংরেজদের লেখা ইতিহাসে নেপোলিয়ঁর কালিমালিপ্ত চরিত্রও বিশ্বাসযোগ্য নয়।[২৬৪] পাশ্চাত্য, বিশেষত ইংরেজ ঐতিহাসিকদের রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমের যে নিরন্তর সংশয় তার কিছুটা যথার্থ পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা হলেও, তাঁর ব্যবহৃত ভাষায় তাঁর স্বাজাত্যাভিমান প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মসচেতন জাতীয়তাবাদী পটভূমিকায় ভারতবাসীকে নিজেদের অতীত গৌরব সম্বন্ধে সচেতন হবার আহ্বানের যুক্তি হিসাবে এইসব মন্তব্য ব্যবহৃত হয়েছে।

ইউরোপীয় সভ্যতার যে কীর্তিগুলি ভারতীয়দের, বিশেষত বাঙালিদের তিনি অনুকরণ করতে বলেছেন, তা হল সুকুমার কলা, প্রধানত ভাস্কর্য। যদিও 'সীতারাম' উপন্যাসের একটি অনুচ্ছেদে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের গুণকীর্তন করেছেন, তা সত্ত্বেও, তিনি সাধারণভাবে মনে করতেন যে ভারতীয়দের ভাস্কর্যের কোনও ঐতিহ্য নেই এবং ইউরোপীয়দের কাছে তাদের এ বিষয়ে শিক্ষা নেওয়া উচিত। অতুলনীয় পাশ্চাত্য শিল্পশৈলী দেখলে শিল্পরসবোধ গভীর হয়। হেস্টির সঙ্গে তর্কযুদ্ধে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে হিন্দুদের উপাস্য দেবদেবীদের মূর্তিগুলি ইতালিতে তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। তাঁর মতে ইউরোপীয়দের শিল্পানুভূতি ভারতীয়দের তুলনায় অনেক বেশি রুচিসম্মত। এমনকি, যে কোনও দরিদ্র ফিরিঙ্গির গৃহসজ্জায় তার সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দুঃখ করে বলেছেন: "সৌন্দর্যবিচারশক্তি, সৌন্দর্যরসাস্বাদনসুখ বুঝি বিধাতা বাঙালির কপালে লিখেন নাই।"[২৬৫] সুচিন্তিত অনুকরণের দ্বারা যে বাঙালির রুচির মান উন্নত হবে, এমন ভরসাও তিনি করতে পারেননি।

ইউরোপীয়দের একটি বুদ্ধিগম্য প্রচেষ্টাকে বঙ্কিম পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি, কখনও ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কখনও বা সতর্কভাবে প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে ইংরেজরা "একশত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াও ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না।"[২৬৬] অজ্ঞ ইউরোপীয়দের লেখা ভারতীয় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সমালোচনার বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা বাংলা ভাষায় কয়েকটি বিখ্যাত প্রহসনে ব্যক্ত হয়েছে। 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল' এই রকম একটি উদাহরণ। ব্যাঘ্রাচার্য্য একবার কিছুদিন লোকালয়ে খাঁচার মধ্যে বাস করেছিলেন। খাঁচাটিকে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে নির্মিত মন্দির মনে করেছিলেন, কারণ মানুষ তাঁর মতে "সকল পশুর ভৃত্য"। সেই অবধি তিনি "মনুষ্যচরিত্র সবিশেষ অবগত"। ব্যাঘ্রাচার্য্যের মুখে বিবর্তনবাদের এক অপরূপ ব্যাখ্যা শোনা যায়: "পণ্ডিতেরা বলেন যে কালক্রমে পশুদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে; এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য উৎকৃষ্টতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের ভরসা আছে যে মনুষ্যপশুও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালপ্রভাবে লাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে।" অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুভক্ষ্য মনুষ্যপশু অত্যন্ত দুর্বল এবং "সচরাচর অনায়াসেই মারা পড়ে" (বলা বাহুল্য, ইংরেজ লেখকদের লেখায় বাঙালির মত), বোধহয় ঈশ্বরের প্রিয়তম জীব ব্যাঘ্র জাতির সুখের জন্যই ঈশ্বর এদের সৃষ্টি করেছেন,—"ব্যাঘ্র জাতির সেবা ভিন্ন ইহাদিগের জীবনে কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না।" এই দুর্বল জীব তাদের নরম মাংসের জন্য বাঘেদের বড়ই প্রিয়। ব্যাঘ্রাচার্য্যের মতে মানুষদের সম্বন্ধে প্রচলিত অনেক ধারণাই ভুল, যেমন, তারা যে বাড়িতে থাকে, তা তাদের তৈরি নয়, কারণ, "তাহাদিগকে ঐরূপ গৃহনির্মাণ করিতে আমি চক্ষে দেখি নাই...সুতরাং ইহার প্রমাণাভাব।" পাদটীকায় এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা দেখান হয়েছে এই কথা বলে যে, "এইরূপ তর্কে জেমস্ স্টুয়ার্ট মিল স্থির করিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অসভ্য জাতি, এবং সংস্কৃত ভাষা অসত্য ভাষা।"

ম্যাক্সমুলারের সিদ্ধান্ত যে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লিখতে জানত না ব্যাঘ্রাচার্য্যের যুক্তির অকাট্যতা প্রমাণ করার জন্য বঙ্কিম তাও উল্লেখ করেছেন।[২৬৭] ইংরেজ যুবরাজের সঙ্গে ভারতভ্রমণে যে সব বিশেষ সংবাদদাতা এসেছিলেন, তাঁদের একজনের নাম করে লেখা বঙ্কিমের কাল্পনিক চিঠির বিষয়বস্তু ছিল ইংরেজদের ভারতকে সুসভ্য করার ব্রত।[২৬৮] এই চিঠির শুরুতেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে ভারতবাসী তাদের নিজেদের দেশ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। যেমন, তারা এটুকুও জানে না যে বেঞ্জামিন গল নামে কোন ইংরেজ এই দেশ আবিষ্কার এবং অধিকার করে নিজের নামে এর নাম রেখেছিলেন বেঙ্গল। যেহেতু অধিকাংশ বাঙালি ম্যাঞ্চেস্টারে প্রস্তুত কাপড় ব্যবহার করে, অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করলেন : "ব্রিটিশ রাজ্য বেঙ্গল দেশে একশত বৎসর বুড়া হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যেই অসভ্য জাতিকে বস্ত্র পরিধান করিতে শিখাইয়াছে।" হাইকোর্ট, রেল, ডিক্রী প্রভৃতি বহু ইংরাজি শব্দ বাংলায় ব্যবহার হওয়ায় "স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে বাঙালা ভাষা ইংরেজির একটি শাখা মাত্র।" যাইহোক ডঃ লরিঞ্জার প্রভৃতি পণ্ডিত প্রমাণ করেছেন যে ভারতীয়দের প্রধান দেবতা কৃষ্ণের নাম খ্রিস্টের অপভ্রংশ এবং ভগবদ্গীতা বাইবেলের অনুবাদ বৈ কিছুই নয়। সংস্কৃত নামে এদেশের যে ভাষার কথা উইলিয়ম জোন্স বলেছেন, তা তাঁদের "কারসাজি, তাঁহারা পশারের জন্য এ ভাষাটি সৃষ্টি করিয়াছেন।" এ প্রসঙ্গে ডুগালড় স্টুয়ার্ট-এর মত দ্রষ্টব্য। "কোন বিলাতি সমালোচক প্রণীত রামায়ণের সমালোচনা"[২৬৯] প্রবন্ধের প্রবন্ধকার সবিস্ময়ে লক্ষ করেছেন যে "রামায়ণ গ্রন্থখানি...প্রায় নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয় কবিদিগের তুল্য, হিন্দু কবির পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।" বানরদের মাহাত্ম্যবর্ণন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এক অসভ্য বহুপত্নীক রাজার সন্তান রাম "ভারতবর্ষীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ আলস্যবশত আপন স্বত্বাধিকার বজায় রাখিবার কোন যত্ন না করিয়া বুড়া বাপের কথায় বনে গেল।...ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক যে স্বভাবতই অসতী...রামের যুবতী ভার্যা সীতা অমনই রামকে ত্যাগ করিয়া রাবণের সঙ্গে লঙ্কায় রাজ্যভোগ করিতে গেল"...ইত্যাদি ইত্যাদি। ইউরোপীয়দের জাতিবৈষম্যের নমুনা বঙ্কিম স্পষ্ট ভাষায় দেখিয়েছেন : "কোন কোন তাম্রশ্মশ্রুধারী ঋষির মত এই যে, যেমন বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগ্রহপূর্বক এই অপূর্ব নব্য বাঙালিচরিত্র সৃজন করিয়াছেন।" ব্রিটিশ জাতির আত্মম্ভরি এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধের অজ্ঞতা, অথচ এই দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পাণ্ডিত্যপূর্ণ মতামত দেওয়ার ভণিতাকে তিনি যে ব্যঙ্গ করেছেন, তা প্রাচ্যতত্ত্ব এবং ব্রিটিশদের ভারত সম্বন্ধে ধারণা বিষয়ে বঙ্কিমের সুচিন্তিত বক্তব্যের অতিরঞ্জিত বিবরণ।

অথচ ইউরোপীয়দের প্রাচ্যতত্ত্বের গ্রহণযোগ্য অংশটি সম্বন্ধে বঙ্কিমের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল : "সবরকম কল্পিত ধারণা পরিত্যাগ করে ইউরোপীয় পণ্ডিত যখন গভীরভাবে কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে বিষয়ের সকল রহস্যই তাঁর সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়।" জীবনের প্রথম দিকে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের যা কিছু তাঁর ভাল লেগেছিল, শেষ পর্বে যখন সেগুলি বর্জন করছিলেন, সেই সময়েই তিনি ভেবেচিন্তে এই মন্তব্য করেছিলেন। বিশেষত বেদের বহু ঈশ্বরবাদ নিয়ে ইউরোপে প্রভূত গবেষণা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[২৭০] বৈদিক ও পৌরাণিক কাহিনীগুলি নিয়ে তাদের আলোচনাও তাঁর মতে প্রশংসনীয়, কারণ তার ফলে 'দুর্বোধ্য অর্থহীন' কাহিনীগুলি বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার বিষয় হয়েছে।[২৭১] এর বেশ কিছুদিন আগে লেখা হিন্দু দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের পুনর্বিন্যাসের জন্য "অন্য দেশীয় বিদগ্ধ পণ্ডিতদের কাছে" তিনি ঋণ স্বীকার করেছেন। ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রস্তুত এই বিরাট কাঠামোয় ভারতীয়দের অবদান খুবই সামান্য।[২৭২] ম্যাক্সম্যুলার-এর যথার্থ এবং কল্পিত ভুলের প্রতি অজস্র শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন বটে, তা সত্ত্বেও ঐ জার্মান পণ্ডিতের প্রতি বঙ্কিম নানাভাবে শ্রদ্ধাও জ্ঞাপন করেছেন।

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর একটি পরিচ্ছেদে একটি কল্পিত বাজারে কয়েকটি নারকেলের দোকানের বর্ণনা দিয়েছেন। দোকানগুলির মালিক বড় বড় টিকিধারী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা। দোকানে দা নেই, তাই নারকোল ছোলা হয় না, পণ্ডিতেরা কামড়িয়ে ছোবড়া খাচ্ছেন। ইউরোপীয় দোকানদাররা ব্রাহ্মণদের দোকানে হানা দিয়ে নানাবিধ "বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া" নারকেলের শাঁস "সুখে আহার করিতে লাগিলেন"। এই পাশ্চাত্য উদ্যোগকে তিনি Asiatic researches আখ্যা দিয়েছেন। ইউরোপীয়দের প্রাচীন ভারত নিয়ে গবেষণার প্রচেষ্টা তাঁর ভীতির উদ্রেক করেছিল, তাই "আত্মশরীরে কোন প্রকার Anatomical Reasearches আশঙ্কা করিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।"[২৭৩]

বিভিন্ন স্তরে অর্থবহ এই শ্লেষ ভারত সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং বিভিন্ন ধরনের অল্পবিদ্যা মূল্যায়নের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া। অনেক জায়গা তিনি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন "বিলাতী অস্ত্রে" ভারতীয় ঐতিহ্যের ছোবড়া চেঁছে শাঁস বের করা সম্ভব হয়েছে বলে তিনি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা সেগুলি নিয়ে অনর্থক কচকচি সৃষ্টি করেছেন। অতি সাবধানে এই আক্রমণের মোকাবিলা করতে হবে। প্রথমত, পাশ্চাত্যের ভারততত্ত্ব থেকে জ্ঞান অর্জন করতে হলে নিজের স্বাধীন বিচারবোধ অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন। বঙ্কিমের মতে এই বিষয়ের বিদগ্ধ পণ্ডিতরাও প্রায়ই না ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত করেন। এই বিষয়ে বহু প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণার সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। যেমন ঋক-সংহিতাকে প্রাচীনতম রচনা বলার তিনি কোনও যুক্তি পাননি। গ্রীক প্রভৃতি আর্যজাতির দেবতাদের আখ্যান অধিকাংশই সৌরোপন্যাস বা সূর্যরূপক বলে যে ম্যাক্সমূলার প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মত প্রকাশ করেছেন, তাও বঙ্কিমের মতে "কিছু বাড়াবাড়ি।" বেদ বহু-ঈশ্বরবাদী— পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই মত তিনি মানতে রাজি ছিলেন না, কারণ যাস্ক থেকে সত্যব্রত সামাশ্রমী পর্যন্ত সব টীকাকারই বলেছেন যে অনির্বচনীয়ত্বের জন্যই এক ঈশ্বরকে বহুরূপে ভজনা করা হয়। এইসব সমালোচনার মধ্যে তাঁর নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। এসব বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতদের মতামত তিনি শিক্ষিত ভারতীয়দের খতিয়ে দেখতে বলেছেন।[২৭৪]

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের যথার্থ জ্ঞানলাভের পথে অনেকগুলি অন্তরায় ছিল বলে তাঁর মনে হয়েছে। প্রথমত তাঁরা যে ভারতীয়দের চেয়ে ভাল সংস্কৃত শিখেছেন, এই ধারণাই ভুল। তাঁর মতে, প্রত্যেক ভাষাই গড়ে উঠেছে একটি দেশের জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়ে, এ জন্য যে কোনও বিদেশী বিদগ্ধ পণ্ডিতের তুলনায় একজন সাধারণ দেশবাসীরও স্বদেশীয় ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে এক ধরনের সহজাত সুবিধা থাকে। দ্বিতীয়ত, হিন্দু দর্শন সঠিক ভাবে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় আগ্রহ বা একাত্মতাবোধ, কোনটিই ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ছিল না।[২৭৫] এইসব অসুবিধার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভুল বোঝা, পুরোমাত্রার অজ্ঞতা এবং জাতিগত ঔদ্ধত্য ও সংস্কার-প্রসূত ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত বিকৃত ব্যাখ্যা। প্রাচীন যুগে অনুসৃত বহু-ঈশ্বরবাদে লজ্জা পাওয়ার মত কিছুই নেই, তবুও তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বেদ বহু-ঈশ্বরবাদী নয়, শুধুই আস্তিক্যবাদী, এই সত্য বোঝার মত সংবেদনশীল মনোভাব ও দৃষ্টির প্রসারতা কোনটিই ইউরোপীয়দের ছিল না বলেই তারা বোঝেনি। বৈদিক ধর্ম ব্যাখ্যা করার জন্য ম্যাক্সম্যুলার অকারণেই গ্রীক শব্দভাণ্ডার খুঁজে Henotheism, Kakenotheism প্রভৃতি নতুন নতুন শব্দ চয়ন করেছেন। হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর *Principles of Sociology* গ্রন্থে লিখেছেন যে হিন্দুরা তাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্রকে "পূজা" করে— "যেমন হিন্দু ছুতার কুড়ালি পূজা করে, কামার হাতুড়ি পূজা করে, লেখক লেখনী পূজা করে।" স্যার আলফ্রেড লায়াল আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন যে কৃষক তার লাঙ্গলের কাছে প্রার্থনা করে। এই জাতীয় ভুল বোঝার উপযুক্ত একটি উদাহরণ দেওয়া যায়, যেমন, খাবার টেবিলে বসে ইংরেজ প্রভু যে 'গ্রেস' শব্দ উচ্চারণ করে, ভারতীয় ভৃত্য তাকে প্রভুর 'খাবার পূজো' মনে করে। "এখানে উপাসনা বলিতে কি বোঝায়?"[২৭৬] —ম্যাক্সম্যুলারের হিবার্ট বক্তৃতামালার এই উদ্ধৃতির মধ্যেই ভুল ধারণার চরিত্রটি ধরা পড়েছে। বড় বড় ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকটা আবার সত্যিকারের না জানাও আছে, বিশেষত আধুনিক ভারতের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে। ম্যাক্সম্যুলার স্পেন্সার এবং লায়ালের ভুল ধরেছেন বটে কিন্তু নিজে আবার হিন্দুরা বানর এবং গরুর পূজা করে বলে খুঁত ধরেছেন। গোল্ডস্টাকার রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে হিন্দু এবং ম্যাক্সম্যুলার কায়স্থ পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন করেছেন। কলকাতার 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার জনৈক বিজ্ঞ সংবাদদাতা প্রথম লেখেন যে গরু হিন্দুদের মাতা, পরে কিছুটা সংশোধন করে লিখেছেন যে কেবলমাত্র হিন্দু দেবদেবীরাই গোমাতার সন্তান। বঙ্কিম সবিনয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তা ঠিক নয়, গোবৎসই গোমাতার সন্তান। পাশ্চাত্যের শিক্ষিত মানসে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নানারকম ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছিল। হিন্দুধর্ম কী— এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বড়জোর এইটুকুই বলতে পারে যে তা হল হিন্দুদের ধর্ম, এবং যারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করে, তারাই হিন্দু। ১৮৮১ সালের লোকগণনায় মাত্র এটুকুই লেখা হয়েছিল। কোর্ট-কাছারিতে যাদের দেখা যেত তাদের দেখেই সাধারণ ইংরাজ বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে ধারণা পেয়েছিলেন।[২৭৭] জীবনের শেষের দিকে বঙ্কিম বুঝে নিয়েছিলেন যে অতি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া সব ইউরোপীয় পণ্ডিতরাই ভারত সম্বন্ধে সংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন এবং তাদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে জাতিগত ঔদ্ধত্য মিশে যেত। বহু যত্নে ও আয়াসে তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে একমাত্র হিন্দু-বিরোধী বৌদ্ধধর্মগ্রন্থগুলিতেই কিছু সত্য নিহিত আছে। এ ছাড়া ভারতের সাহিত্য-সম্পদের সবটাই হয় ভুল না হয় অন্যদের থেকে ধার করা। এঁদের কাছে রামায়ণ হল ইলিয়াড-এর অনুকরণ মাত্র, গীতা বাইবেলের রূপান্তর, হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞান চৈনিক এবং গ্রীকদের কাছে ধার করা, এবং তাদের লিপিও কোনও সেমিটিক জাতির কাছে শেখা। এইসব সিদ্ধান্তের পিছনে একটি সুস্পষ্ট নীতি আছে এবং তা হল, ভারতীয় সাহিত্যের যা কিছু ভারতবাসীর অনুকূল, তা হয় মিথ্যা না হয় প্রক্ষিপ্ত। পঞ্চপাণ্ডবের বীরত্ব কবির কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু দ্রৌপদীর পঞ্চপতির ঘটনাটি সত্য, কারণ তা দিয়ে প্রমাণ হয় যে নারীর বহু বিবাহ-স্বীকৃত অসভ্য সমাজ-ব্যবস্থা ভারতে প্রচলিত ছিল।

"ফর্গুসন সাহেব অট্টালিকার ভগ্নাবশেষে কতকগুলো বিবস্ত্রা স্ত্রীমূর্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না ; এদিকে মথুরা প্রভৃতি স্থানের অপূর্ব ভাস্কর্য দেখিয়া বিলাতী পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, এ শিল্প গ্রীক মিস্ত্রির। বেবর (Weber) সাহেব, কোন মতে হিন্দুদিগের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাচীনতা উড়াইয়া দিতে না পারিয়া স্থির করিলেন, হিন্দুরা চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছে। বাবিলনীয়দিগের যে চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল আদৌ কখনও ছিল না, তাহা চাপিয়া গেলেন। প্রমাণের অভাবেও Whitney সাহেব বলিলেন, তাহা হইতে পারে, কেন না, হিন্দুদের মানসিক স্বভাব তেমন তেজস্বী নয় যে, তাহারা নিজবুদ্ধিতে এত করে।" এইসব লেখকের মতে অলীক ও অনৈতিহাসিক ঘটনায় পূর্ণ কোন গ্রন্থ ইতিহাসপদবাচ্য নয়, এই কারণেই ইতিহাসের আকর গ্রন্থরূপে মহাভারত তাঁদের কাছে মূল্যহীন। অথচ "রাশি রাশি অদ্ভুত, অলীক, অনৈসর্গিক" কাহিনীপূর্ণ মেগাস্থিনিসের বিবরণ "অতিশয় বিশ্বাসযোগ্য"। ওয়েবার-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে খ্রিষ্টপূর্ব যুগে মহাভারতের অস্তিত্ব ছিল না এবং খ্রিস্টিয় যুগের প্রথম দিকে ক্রিসোস্টোম (Chrysostom) নামক জনৈক ইউরোপীয় পর্যটক ভারতের মাঝিমাল্লাদের মুখে মহাভারতের কথা শুনেছিলেন বলেই সেই সময়ে এর অস্তিত্ব ওয়েবার মেনে নিয়েছিলেন। সংযম হারানোর এক বিরল মুহূর্তে বঙ্কিম মন্তব্য করেছেন : "প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক ইহা প্রমাণ করিতে তিনি (Weber) সর্বদা যত্নশীল," কারণ, "ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার জর্মনির অরণ্যনিবাসী বর্বরদিগের বংশধরের পক্ষে অসহ্য"।[২৭৮]

ইউরোপীয় পণ্ডিত এবং অর্ধশিক্ষিত পাদ্রীরা দুরকম মাপকাঠিতে ভারত ও ইউরোপের তুলনা করেছেন এবং তার ফলে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত তথ্যগত ভুল সৃষ্টি হয়েছে বলে বঙ্কিম অভিযোগ করেছেন। যাঁরা হিন্দুধর্মকে বহু-ঈশ্বরবাদী বলে সমালোচনা করেছেন, তাঁরা কিন্তু ঐ বিশ্বাস যে খ্রিস্টানদের দেবদূত, সাধু-সন্ত এবং শয়তানে বিশ্বাসের থেকে আলাদাও নয়, অযৌক্তিকও নয়, এই সত্যটি গ্রাহ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেননি। বহু ধর্মীয় লোকাচার এবং আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত অশরীরি আত্মার পূজা প্রভৃতি কুসংস্কারের উদাহরণ দিয়ে তাঁরা হিন্দুধর্মের বর্বরোচিত চরিত্র প্রমাণ করেছেন। কিন্তু ঠিক এই সব ধরনেরই বহু আচার-অনুষ্ঠান যে খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকে বাহিত হয়ে খ্রিস্টধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে স্থানলাভ করেছে, সেগুলিকে তাঁদের খ্রিস্টধর্মের অথবা ইউরোপের বর্বরতার উদাহরণ বলে মনে হয়নি। যে সব কাহিনী স্পষ্টতই রূপক, এবং প্রাচীন টীকাকারদের ব্যাখ্যাতেও সেরকমই বলা হয়েছে, যেমন ইন্দ্র কর্তৃক অহল্যার ধর্মনাশের কাহিনী— কেতাবী আলোচনায় পর্যন্ত সেগুলিকে উদাহরণরূপে ব্যবহার করে প্রাচীন কালের হিন্দুদের মধ্যে ব্যভিচারের প্রবণতা প্রমাণ করা হয়েছে। একটি অতি ভাবাবেগপূর্ণ রচনায় ম্যাক্সমুলার তথাকথিত "দুর্নীতিপরায়ণ পুরোহিতশ্রেণী" কর্তৃক বর্বরোচিত সতীপ্রথাকে সমর্থন করার জন্য ধর্মগ্রন্থের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। ঐ মহামহোপাধ্যায়ের কিন্তু একথা মনে হয়নি যে, ঐ গ্রন্থ অলিখিত, শুধুমাত্র কথিত হওয়ার ফলে শ্রবণে বিভ্রান্তি ঘটতেই পারে। তাছাড়া ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে রক্তপিপাসু আইন রচিত হয়নি, বরং সারা পৃথিবীর লিখিত ইতিহাসে দেখা যায় যে একমাত্র ঐ ব্রাহ্মণরাই সবরকম হত্যাপরাধের মধ্যে নারীহত্যাকে সবচেয়ে জঘন্য বলেছেন। এই প্রবন্ধের উপসংহারে পাশ্চাত্যের ভারততাত্ত্বিকদের বিশিষ্ট মনোভাব সম্বন্ধে গভীর উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে : "যে সম্প্রদায়ের উপর ঘৃণা বর্ষণ করা হয়েছে, একজন ব্রাহ্মণ হিসাবে— সেই সম্প্রদায়ের একজন নগণ্য সদস্য হিসাবে, যে পুরোহিত সম্প্রদায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল, তাদের অযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে আমি মহামহোপাধ্যায় জার্মাণ পণ্ডিতকে প্রশ্ন করতে চাই : ইনকুইজিশনের অপরাধী সংখ্যার সঙ্গে সেন্ট বার্থোলোমিউজ ডে এবং সিসিলির ভেস্পারস্-এ সহস্রাধিক নিহতের সংখ্যা যোগ করে, তার সঙ্গে আবার ধর্মযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ অজ্ঞাতনামা নিহতের সংখ্যা যোগ করে, তারপরে নিজের বুকে হাত রেখে তিনি বলুন যে পুরোহিত শ্রেণীর নিষ্ঠুরতার উদাহরণ ভারতের ব্রাহ্মণ শ্রেণীর চেয়ে বেশি তাঁর আর জানা নেই।" যে সব মানসিক প্রতিক্রিয়ায় পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব গড়ে উঠেছিল এই আবেগ-আপ্লুত অনুচ্ছেদে তার অনেকটাই ধরা পড়েছে। বহুগুণবিশিষ্ট সে যুগের প্রধান সংস্কৃতি, নানাদিক থেকে যা ভারতীয় ঐতিহ্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বলে পরিগণিত হত, তার একটি অপরিহার্য নৈতিক গুণের অভাব অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তা হল নিস্পৃহ আত্মসমালোচনা এবং বিজিত জাতির সংস্কৃতির মূল্যায়নে ন্যূনতম বিচারবোধ। পশ্চিমের মহত্তম ব্যক্তিত্ব পরাজিত জাতির ঐতিহ্যের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করতে ছাড়েন না। সব যুগেই পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের এই নৈতিকতার অভাবের প্রতি কটাক্ষ ঐ ঘৃণা বর্ষণের প্রত্যুত্তরের প্রচেষ্টা।[২৭]

বঙ্কিম-কৃত ব্রিটিশ শাসনের মূল্যায়ন আরও অনেক বেশি জটিল। একটি বিষয়ে অবশ্য সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই, তা হল রাজনৈতিক পরাধীনতা বিষয়ে তাঁর বিরূপ প্রতিক্রিয়া, এবং স্বাধীনতা লাভের যদি কোনও সংক্ষিপ্ত পথ তাঁর জানা থাকত, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি তাই অবলম্বন করার কথা দেশবাসীকে বলতেন। 'ধর্মতত্ত্বে' এবং পরোক্ষভাবে 'দেবী চৌধুরানী'তে তিনি যে দেশের সেবার জন্য সুদীর্ঘকালের প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছেন, তা তাঁর হতাশার নিদর্শন বলা যায়। দুটি গ্রন্থেই শারীরিক ক্ষমতা বিকাশের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যদিও তা মানসিক বৃত্তির সুষম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ফূর্তির উপায় বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাতে মনে হয় যে 'আনন্দমঠ'-এ উপন্যাসের আকারে যে ধরনের সংগ্রামের ছবি তিনি এঁকেছেন, সুদূর ভবিষ্যতে সেই রকম সংগ্রামই তিনি আশা করেছিলেন। 'ধর্মতত্ত্বে' প্রদত্ত নীতিসারের মূল উপজীব্য স্বদেশরক্ষা।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্তব্য এবং শ্লেষাত্মক রচনাগুলি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নানা কুফলের প্রতি তাঁর কটাক্ষপাত। আবার সুফলগুলি নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, যা তাঁর সুচিন্তিত অভিমত বলেই মনে হয়। 'আনন্দমঠ' এবং 'দেবী চৌধুরানী'— এই দুটি উপন্যাসে ব্রিটিশদের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রসঙ্গে আবার অন্য একরকম মন্তব্য করেছেন। সেখানে ভারতের নবজীবনায়ণের জন্য ব্রিটিশ শাসনকে দৈবোদ্দিষ্ট বলেছেন। মননশীল প্রবন্ধগুলিতে কিন্তু এই মনোভাব কোথাও দেখা যায়নি। তাই মনে হয় যে এই উক্তি নিতান্তই মন-ভোলানো— উপন্যাসগুলির অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন রাজদ্রোহকে অন্তরালে রাখার জন্যই তিনি ওই কৌশল করেছিলেন। বঙ্কিম যখন ওই উপন্যাস দুটি লিখেছিলেন, ততদিনে সাহিত্যে প্রচ্ছন্ন রাজদ্রোহিতার প্রতি সরকারি মনোভাব তিনি ভালমতই বুঝে নিয়েছিলেন। 'আনন্দমঠ'-এর পরবর্তী সংস্করণগুলি থেকে ব্রিটিশ-বিরোধী মন্তব্য সব তাঁকে বাদ দিতে হয়েছিল। হয়ত ঐ উপন্যাস প্রথম প্রকাশের সময়ও তাঁর মনে সরকারি বিরূপতার ভয় ছিল এবং 'আনন্দমঠ' নিয়ে মুশকিলে পড়ার পর 'দেবী চৌধুরানী' প্রকাশিত হয়েছিল।

'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে বঙ্কিমের সবচেয়ে সুচিন্তিত অভিমত পাওয়া যায়। স্বাধীনতার সুফল কী কী হতে পারে তাই নিয়ে এখানে নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার মধ্যে তিনি প্রথমে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে শাসনকর্তা বিজাতীয় হলেই কোনও দেশকে পরাধীন বলা যায় না। প্রথম জর্জের আমলে ইংলন্ড অথবা বর্বর সম্রাটদের আমলে রোম পরাধীন ছিল না। আবার অন্যদিকে, ব্রিটেনের মার্কিন উপনিবেশগুলি ব্রিটিশরাই শাসন করত, কিন্তু তাদের স্বাধীন বলা যায় না। কোনও বিজাতীয় শাসক যদি বাইরে থেকে অপর একটি দেশকে শাসন করেন, তবেই সেই দেশকে পরাধীন বলা যায়। এই পরিস্থিতির একটি সম্ভাব্য কুফল হল, "যাঁহারা রাজার স্বজাতি, দেশীয় লোকাপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রাধান্য ঘটে।" আর যাই হোক, এই অন্যায়টি না ঘটলে, বিদেশী শাসনে থাকলেও দেশ কার্যত স্বাধীন। এই যুক্তিতে নর্মান রাজাদের আমলে ইংলন্ড, এবং তুর্কী সুলতানদের আমলে ভারত স্বাধীন ছিল না। আকবরের শাসনকালে সর্ববিষয়ে ভারতের স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল। এইভাবে বিচার করলে বিদেশী শাসনের দুটি কুফল দেখা দিতে পারে, "প্রথম, রাজা দূরে থাকিলে সুশাসনের বিঘ্ন হয়; দ্বিতীয়, রাজা যে দেশে অধিষ্ঠান করেন, সেই দেশের প্রতি তাঁহার অধিক আদর হয়। তাহার মঙ্গলার্থ দূরস্থ রাজ্যের অমঙ্গলও করিয়া থাকেন।" ব্রিটিশ শাসিত ভারতে দুটি কুফলই প্রকট। "মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন দিল্লী বা কলিকাতায় স্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্টতর হইত, তাহার সন্দেহ নাই।" পক্ষান্তরে, স্বৈরাচারী শাসকের অপশাসনের কুফল ভারতকে সইতে হচ্ছে না। কিন্তু ইংলন্ডের স্বার্থে ভারতকে অনেকরকম ক্ষতিস্বীকার করতে হচ্ছে। "হোমচার্জেস", অ্যাবিসিনিয়ার যুদ্ধের জন্য ব্যয়, ইত্যাদি ভারতের ক্ষতির উদাহরণ। অবশ্য ভারত যখন স্বাধীন ছিল, তখন অনেক সময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশবাসীকে অযোগ্য শাসকের উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। তাছাড়া, ব্রিটিশ যুগে যেমন ব্রিটিশ জাতির স্বার্থে ভারতের স্বার্থহানি ঘটছে, প্রাচীন ভারতে তেমন বর্ণ-বৈষম্য ছিল, ব্রিটিশ এবং ভারতীয়ের যে বৈষম্য, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের বৈষম্য তার চেয়ে কম ছিল না। "রাজা ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিপীড়া জন্মে, তাহা দুই প্রকারে ঘটে। এক, ব্যবস্থাজনিত ; আইনে বিধি থাকে যে, রাজার স্বজাতীয়গণের পক্ষে এই এইরূপ ঘটিবেক, দেশীয় লোকের পক্ষে অন্যপ্রকার ঘটিবেক। দ্বিতীয়, স্বজাতিপক্ষপাতী রাজার ইচ্ছাজনিত ; রাজপ্রসাদ রাজা স্বজাতিকে দিয়া থাকেন এবং রাজ্যের কার্যে স্বজাতিকেই নিযুক্ত করিয়া থাকেন।" ভারতে ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রজার জন্য আলাদা আলাদা বিচারালয় ছিল, এবং ইউরোপীয় বিচারক ভারতীয় অপরাধীর বিচার করতে পারতেন কিন্তু ভারতীয় বিচারকের পক্ষে ইংরাজের বিচার করার ক্ষমতা ছিল না। অথচ একই আইন দুজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। প্রাচীন ভারতে শুধু যে শূদ্র কখনই ব্রাহ্মণের বিচার করতে পারত না, তাই নয় হত্যাপরাধের জন্য ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের দণ্ডও আলাদা ছিল। ব্রিটিশ ভারতে সরকারি উচ্চপদগুলি ব্রিটিশদের একচেটিয়া ছিল ঠিকই, কিন্তু ভারতীয়েরা অন্তত নিম্নতন পদগুলি পেত। প্রাচীন ভারতে শূদ্র রাজার নাম জানা গেলেও, রাজকর্মচারীর সমস্ত পদগুলিই ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কবলিত ছিল। সে যুগে অন্তত রাজা এই দেশেরই লোক ছিলেন, এই যুক্তির কোনও অর্থ হয় না। "স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না।" সংক্ষেপে বলা যায় যে দেশের রাজার অধীনে জনসাধারণের অবস্থা কিছুই ভাল ছিল না। তবে ব্রিটিশ যুগে সমাজের উচ্চবর্গের ব্যক্তিরাও কষ্ট পাচ্ছে— তাদের বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির সমাদর হচ্ছে না। তাছাড়া সমস্ত উচ্চপদগুলি ব্রিটিশদের অধিকারে থাকায় স্বদেশের পরিচালন ব্যবস্থায় ভারতবাসী তাদের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার সুযোগ পাচ্ছে না। পরাধীনতা এইভাবে প্রগতির পথ রুদ্ধ করে রেখেছে বটে, তবে ইউরোপীয় শাসনে পাশ্চাত্যের সাহিত্য এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অমূল্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়েছে। এই প্রবন্ধের উপসংহারে একটি মন্তব্যে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে : "তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা তুল্য ?... আমরা পরাধীন জাতি— অনেক কাল পরাধীন থাকিব— সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই।"

যে অবস্থার পরিবর্তন সাধ্যাতীত, সেই অবস্থার গুণাগুণ বিচারের প্রশ্নে তাঁর ভাবনা যুক্তিজালের সীমানা অতিক্রম করেছে। তিনি এর মধ্যে মঙ্গলের চিহ্ন খুঁজতে চেয়েছেন— অদূর ভবিষ্যতে যে অবস্থার পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা ছিল না, তার মধ্যে কিছু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেছেন। উপরিউক্ত প্রবন্ধের সূচনাতে তা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে : "মানুষের এমন দুরবস্থা কখন হইতে পারে না যে, তাহাতে শুভ কিছুই দেখা যায় না। আমাদিগের গুরুতর দুর্ভাগ্যেও কিছু না কিছু মঙ্গল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যে অশুভের মধ্যে শুভের অনুসন্ধান করিয়া তাহার আলোচনা করে, সেই বিজ্ঞ। দুঃখও যে কেবল দুঃখ নহে, দুঃখের দিনে এ কথার আলোচনায় কিছু সুখ আছে।" যদিও যে "মঙ্গল" তিনি খুঁজে পেয়েছেন, তার উল্লেখ কদাচিৎ শ্লেষবিহীন। ভারতে ইংলণ্ডের সৎকাজের বিবরণসম্পন্ন একটি বিখ্যাত অনুচ্ছেদ তিনি ব্যাঙ্গোক্তি দিয়েই শুরু করেছেন : "আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এতকাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসনকৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি।" পরবর্তী অনুচ্ছেদের সালঙ্কার বর্ণনা সহজার্থে গ্রহণ করা কঠিন। তিনি ব্রিটিশ শাসনের সুফলগুলিব তালিকা দিয়েছেন : "ঐ দেখ, লৌহবর্ম্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া একমাসের পথ একদিনে যাইতেছে।" রেল ও বাষ্পীয় জাহাজে দ্রুত পরিবহন, টেলিগ্রাফ, আধুনিক চিকিৎসা, সুসজ্জিত আধুনিক নগরীসমূহ, পাশ্চাত্য জীবনধারার আরাম, কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকধারায় উত্তরণ প্রভৃতি ব্রিটিশ শাসনের গুণে ভারতবাসী লাভ করেছে। কিন্তু এরপরেই একটি আলঙ্কারিক প্রশ্ন রেখেছেন : "এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল ?" প্রশ্নের যে উত্তর তিনি দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় যে ইংরেজ-শাসনের গুণে তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না।[২৮১] এমনকি, যেসব জায়গায় আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে তিনি ব্রিটিশ শাসনের প্রশংসাই করেছেন, সেখানেও ব্যবহৃত শব্দের নিগূঢ়ার্থে বোধ হয় যে ভাল ফলগুলি শাসকশ্রেণীর অভিপ্রেত ছিল না। 'ভারতকলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে অন্তিম অনুচ্ছেদে লিখেছেন : "ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরাজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে...যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। ...যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি তাহার মধ্যে দুইটি—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে হিন্দু জানিত না।" বলা বাহুল্য, এই "অমূল্য শিক্ষা" ব্রিটিশ শাসনের ফলে নয়, বরং তার প্রতি প্রতিক্রিয়ায় এবং সার্বভৌম জাতিসমূহের, বিশেষত ব্রিটিশদের, উদাহরণে সৃষ্ট হয়েছে। পূর্ববর্তী আলোচনার মধ্যে এই অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে। ব্রিটিশ শাসনের আগেই কিছুটা জাতীয়তাবাদী সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে খালসার অভ্যুত্থানের উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন : "যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পরিত ?" এই শিক্ষা যদি শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশদের থেকেই নেওয়া হয়ে থাকে, তবে বলা বাহুল্য যে শাসনব্যবস্থার গুণে তা হয়নি।[২৮২]

ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে প্রকট সমালোচনা রয়েছে কোম্পানির শাসনের প্রথম যুগের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাসগুলিতে। এইসব গ্রন্থে লেখক স্পষ্টভাষায় "ইংলন্ডের দৈব কর্তব্য সাধনের" প্রতিবাদ জানিয়েছেন। যেখানে সমালোচনা অত্যন্ত তীব্র, সেখানে "সেসব বিশৃঙ্খলার যুগ এবং কেহই নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না"— এই কথা বলে তা চাপা দেবার চেষ্টা করেছেন। "ইংরেজ যে ভারতবর্ষের উদ্ধার সাধন জন্য আসিয়াছিল...সমসাময়িক ইংরেজরাও তাহা জানিতেন না। তখন কেবল বিধাতার মনে মনেই এ কথা ছিল।"[২৮৩]

ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্কের একটি ফলই মাত্র তাঁর অবিমিশ্র আশীর্বাদ বলে মনে হয়েছে, তা হল পাশ্চাত্য শিক্ষা। "অনন্তরত্নপ্রসূতি ইংরাজিভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল। ...ঐ ভাষার রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে...কেননা সংস্কৃত এখন লুপ্ত হইয়াছে।" তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ব্রিটিশ শাসন ব্যতীত পাশ্চাত্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষার সুফল পাওয়া যেত না।

একথা ঠিক যে, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি বঙ্কিমের মানসিক বিরূপতা, পরাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর গভীর আন্তরিক ক্ষোভ, সবই প্রকাশ পেয়েছে কোম্পানির শাসনের পটভূমিকায় লেখা তিনটি উপন্যাসে। এই তিনটির মধ্যে সর্বপ্রথম 'চন্দ্রশেখর' লিখেছেন মীর কাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের পটভূমিতে। এই উপন্যাসে বঙ্কিম লিখেছেন : "এই সময়ে যে সকল ইংরেজ বাঙ্গালায় বাস করিতেন তাঁহারা দুইটি মাত্র কার্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভ সম্বরণে অক্ষম, এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম...তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্যে অধর্ম আছে, অতএব অকর্তব্য। যাহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীয় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য সম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখন দেখা দেয় নাই।... তখন বাঙ্গালার বাতাসে ইংরেজাদিগের অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত...বঙ্গীয় ইংরেজদিগের মধ্যে তখন ধর্মশব্দ লুপ্ত হইয়াছিল।"[২৮৫] এই উপন্যাসে বহু দুর্বৃত্তের চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুর্বৃত্ত ইংরেজ 'ফ্যাক্টর' বা কুঠিয়াল লরেন্স ফস্টার, সে নায়িকা শৈবলিনীর অপহরণকারী। এই ঘটনার পূর্বাভাস রয়েছে স্বপ্নে শ্বেত শূকররূপে লরেন্সের আগমনে। প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নায়ক প্রতাপ ইংরেজদের বিতাড়ন করে অসংখ্য ফস্টারের কবল থেকে বাংলাকে মুক্ত করার শপথ গ্রহণ করে 'বাংলার শেষ রাজা' মীর কাসিমের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যায় ; মীর কাসিমকে লেখক ঐ অভিধা দিয়েছেন কারণ, তাঁর পরে যাঁরা নবাব হয়েছিলেন তাঁরা শুধু রাজত্বই করেছিলেন, শাসন করেননি। 'চন্দ্রশেখর'-এ অবশ্য ব্রিটেনের ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্তব্যের কোনও উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র সন্ন্যাসী রামানন্দ স্বামীর ধারণা হয়েছিল যে "এই ইংরেজ জাতি অতিশয় ভাগ্যবান, বলশালী এবং কৌশলময়..., বোধহয় ইহারা একদিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবে।"[২৮৬] 'দেবী চৌধুরাণী' এবং 'আনন্দমঠ'— দুটি উপন্যাসেই কোম্পানীর শাসনের প্রথম যুগে দেশবাসীর দুর্দশার ভয়াবহ বিবরণ আছে। কিন্তু লেখক কৌশলে ইংরেজের প্রত্যক্ষ সমালোচনা এড়িয়ে গেছেন। প্রথমটিতে পরোপকারী সন্ন্যাসী দস্যু ভবানী পাঠক নিজের কাজের যুক্তি দেখিয়েছেন এই বলে যে দেশে সেসময় কোনও নিয়মসম্মত রাজা ছিলেন না। "এ দেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ পাইয়াছে। ইংরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে— তাহারা রাজ্য শাসন করিতে জানেও না, করেও না।" এরপর তিনি জমিদারদের দুর্বিবহ অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছেন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আসল দুর্বৃত্ত দেবী সিংহ এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নাম উল্লেখ করেছেন এবং দেবী সিংহের পৃষ্ঠপোষক যে স্বয়ং হেস্টিংস তা অতি স্বাভাবিকভাবে এবং মাত্র আধখানা বাক্যে জানিয়ে দিয়েছেন।[২৮৭] আবার 'আনন্দমঠ' পড়ে জানা যায় যে দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় কোম্পানি দেওয়ানরূপে রাজস্ব আদায় করেছিল কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ না করে অপদার্থ মীরজাফরের হাতে অর্পণ করেছিল। বঙ্কিম কি না জেনে একথা লিখেছিলেন ?— মনে হয় না, কারণ কিছুদিন আগে যে তিনি লিখেছিলেন, "বাংলার শেষ রাজা মীরকাশিম", সেই মন্তব্যের তাহলে কোনও অর্থ হয় না। যাই হোক, অনুবর্তী শ্লিষ্ট বাক্যগুলি পড়ে সেই সময় ব্রিটিশদের সম্বন্ধে বঙ্কিমের আসল মনোভাব সহজেই বুঝে নেওয়া যায় : "মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেসপ্যাচ লেখে। বাঙালি কাঁদে আর উৎসন্ন যায়। বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য...লোকে না খাইয়া মরুক, খাজানা আদায় বন্ধ হয় না।" "পাপিষ্ঠ, নরাধম, বিশ্বাসহন্তা, মনুষ্যকুলকলঙ্ক"[২৮৮] মীরজাফরের প্রতি তিনি সবচেয়ে বেশি ঘৃণাবর্ষণ করেছেন। সিংহাসনের জন্য প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা অষ্টাদশ শতকে প্রায় নিয়মিত ঘটনা, সুতরাং তা তাঁর উষ্মার যথার্থ কারণ নয়। এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশে বর্ণিত একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই রাগের অভিব্যক্তির কারণ বোঝা যায়। পলাশীর যুদ্ধকে বঙ্কিম জাতীয় বিপর্যয়ের গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এবং ব্রিটিশের দেওয়া এই যুদ্ধের বিবরণকে তিনি এতটুকুও বিশ্বাস করেননি।

তাহলে, পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনের নানাবিধ মঙ্গলের যে উল্লেখ আছে এ দুটি উপন্যাসে, তার ব্যাখ্যা কি ভাবে দেওয়া যাবে? দুর্ভিক্ষের সময়কে তিনি বিশৃঙ্খলার যুগ বলেছেন— "তখন ইংরেজের বিচার ছিল না। আজ নিয়মের দিন, তখন অনিয়মের দিন। নিয়মের দিনে আর অনিয়মের দিনে তুলনা কর।"[২৮৯] ব্রিটিশ শাসনের তুঙ্গকালে তাদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বঙ্কিমের যথার্থ মূল্যায়ন পরে আলোচনা করেছি। ব্রিটিশ রাজত্বের সংক্ষিপ্ত প্রশস্তি দিয়ে 'দেবী চৌধুরানী' শেষ করেছেন: "ইংরেজ রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল।"[২৯০] জনসাধারণের উপর এই সুশাসনের ফল কি হয়েছিল বলে বঙ্কিমের ধারণা, তাও পরে আলোচনা করেছি। এবং সবশেষে, 'আনন্দমঠ'-এর কতগুলি অনুচ্ছেদে ব্রিটিশবিজয়কে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট বলেছেন। "কলিকাতায় বসিয়া লোহার শিকল গড়িয়া...ভারতীয় ইংরাজকুলের প্রাতঃসূর্য ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব... মনে মনে বিচার করিলেন যে, এই শিকলে আমি সদ্বীপা, সসাগরা ভারতভূমিকে বাঁধিব। একদিন জগদীশ্বর সিংহাসনে বসিয়া নিঃসন্দেহে বলিয়াছিলেন, 'তথাস্তু'।"[২৯১] ভবানন্দ ক্যাপ্টেন টমাসকে বলেছিলেন: "কাপ্তেন সাহেব, তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ?" অর্থাৎ মুসলমানই সন্তানদের আসল শত্রু। তারপর 'আনন্দমঠ'-এর শেষ অধ্যায়ে বঙ্কিম সন্ন্যাসীবিদ্রোহের ঈশ্বরোদ্দিষ্ট তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন: "ইংরেজ এক্ষণে বণিক,— অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্যশাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তানবিদ্রোহের কারণে তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে।...এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই...ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত...সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনাআপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যতদিন না তা হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে...শত্রু আর নাই, ইংরেজ মিত্র রাজ্য। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।"[২৯২] 'আনন্দমঠ' ধারাবাহিকরূপে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকেই এই অংশটি আছে, কাজেই এই মনোভাব যে তাঁর পরবর্তীকালের সুচিন্তিত, সাবধানী অভিমত, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কয়েকটি দিককে বঙ্কিম নিঃসন্দেহে প্রশংসার চোখে দেখেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন বহুকালের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ঘটনা বলে তাঁর ধারণা হয়েছিল এবং এই "অমূল্য উপহারের" জন্য তিনি ব্রিটিশদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। আগেই দেখিয়েছি যে নানা ত্রুটি সত্ত্বেও ব্রিটিশ প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি পূর্বতন ব্যবস্থার তুলনায় অনেক ভাল বলে মনে করতেন। জনস্বার্থমূলক কাজগুলিরও তিনি প্রশংসা করেছেন। 'আনন্দমঠ'-এ একটি বিক্ষিপ্ত মন্তব্যে "মুসলমান সম্রাট নির্মিত অপূর্ব বর্ত্ম" সমূহের সঙ্গে ব্রিটিশের তৈরি রাজপথের তুলনা করেছেন।[২৯৩] সমসাময়িক আরও অনেকের মতই তিনিও ভারতে মুসলিম রাজবংশের সুদীর্ঘ শাসনকালকে অত্যাচারী বিদেশী শাসনের যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য এই সাধারণ মূল্যায়নের বহু ব্যতিক্রমও তিনি লক্ষ করেছিলেন। তাঁর বিচারে "পাঠানশাসনকালে বাঙ্গালির মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল।" এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, "রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না।"[২৯৪] বাংলায় মোগল শাসন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : "বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে... বাঙ্গালার ঐশ্বর্য দিল্লীর পথে গিয়াছে।" কিন্তু মোগল বাদশাহগণ বাংলায় একটি সৌধও তৈরি করেননি।[২৯৫] অন্যত্র আবার তিনি আকবর বাদশাহের রাজত্বকালকে ভারতের পরাধীনতা বলতে নারাজ, এবং আকবর যে "সর্বদা এতদ্দেশীয়, বিশেষত রাজপুতগণকে গুরুতর রাজকার্যে নিযুক্ত করিতেন,"[২৯৬] তার জন্য তাঁর প্রশংসাও করেছেন। এতৎসত্ত্বেও ভারতে সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনকাল সম্বন্ধে তাঁর মূল্যায়ন পুরোপুরি নেতিবাচক। "স্বৈরাচারী মুসলিম শাসকের লৌহকঠিন পদচিহ্ন ভারতবাসীর স্কন্ধে অঙ্কিত রহিয়াছে"[২৯৭] —এই মন্তব্যকে তাঁর সুচিন্তিত মনোভাবের প্রতীক বলা যেতে পারে। পলাশীর যুদ্ধ প্রসঙ্গে তাঁর বেদনাময় অভিব্যক্তি সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসনকে তিনি পূর্বযুগের তুলনায় শ্রেয় ভেবেছিলেন। জনকয়েক ইংরেজ, বিশেষত ওয়ারেন হেস্টিংস সম্পর্কে তাঁর সপ্রশংস মনোভাব ওই পছন্দের কারণ। হেস্টিংস সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : "ইতিহাসে ওয়ারেন হেস্টিংস পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।... কর্মঠ লোক কর্তব্যানুরোধে অনেক সময় পরপীড়ক হইয়া উঠে।...যাঁহার প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরতা নাই— তাঁহার দ্বারা রাজ্যস্থাপনাদি মহৎ কার্য হইতে পারে না।" ওয়ারেন হেস্টিংস এইরকমই একজন মানুষ।[২৯৮] তাঁর অনুচরদের, এমনকি দুর্বৃত্ত ফস্টারেরও অদম্য সাহস ও দেশপ্রেমের তিনি প্রশংসা করেছেন।[২৯৯] তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হবে না এবং সেই কারণেই দুর্বিষহ পরাধীনতার মধ্যে থেকে যতটুকু ভাল হয়, তা আদায় করে নিতে হবে। কোম্পানির শাসনের প্রথম যুগে পরাধীনতার যে দুঃখদুর্দশার আবেগাপ্লুত বিবরণ তিনি দিয়েছেন, পরবর্তী যুগের প্রবন্ধ এবং প্রহসনেও তার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পরবর্তী যুগের গুণপনা সম্বন্ধে তাঁর মোটেই পুরোপুরি ভরসা ছিল না, তবুও তার মহিমা কীর্তন করে তিনি বিপ্লবীদের সম্বন্ধে নিজের সপ্রশংস মনোভাবকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। 'আনন্দমঠ'-এর শেষ অধ্যায়ে বিদ্রোহীনেতা সত্যানন্দ এক সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে দৈবাজ্ঞা বলে অস্ত্রত্যাগ করেছেন। কিন্তু তখন "সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল, তিনি বলিতে লাগিলেন : "হায় মা। কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না।" লেখক যদি ব্রিটিশ শাসনকে সত্যি সত্যিই দৈবোদ্দিষ্ট বলে মনে করতেন, তাহলে অস্ত্রত্যাগের আদেশের সঙ্গে কঠোর শাস্তিরও বিধান থাকত।

যথাযথ এবং যুক্তিগ্রাহী বিচারের মানসিকতায় বঙ্কিম বুঝেছিলেন যে সব প্রশ্নেরই দুটি দিক থাকে। বাংলার কৃষকদের সম্বন্ধে লেখা প্রবন্ধে তিনি ব্রিটিশ শাসনের চূড়ান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিন্দা করেছেন, আবার ঐ প্রবন্ধেই ব্রিটিশ-শাসনের ফলে লব্ধ অগ্রগতিরও একটি সুচিন্তিত মূল্যায়ন করেছেন। নিরাপত্তা বৃদ্ধি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবশালী রাজকর্মচারীদের অর্থের জন্য যথেচ্ছ উৎপীড়ন বন্ধ হওয়ার ফলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উত্তরপুরুষরা তা নির্ঝঞ্ঝাটে ভোগ করতে পারছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। নিরাপত্তা বৃদ্ধির ফলে বংশবৃদ্ধি হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজমির পরিমাণও বেড়েছে। ব্রিটিশ বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কৃষিপণ্যেরও চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং এইভাবে নিয়মিত বাণিজ্যবৃদ্ধির ফলে কৃষি এবং তার ফলশ্রুতি সামগ্রিকভাবে দেশের ধনবৃদ্ধি হয়েছে।[৩০০] মূল্যবৃদ্ধি অনেকের অসন্তোষের কারণ হলেও আসলে কিন্তু টাকার মূল্য কমে গেছে এবং কৃষিতে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের ফলে বাংলার দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে, একথা যাঁরা বলেন তাঁদের বক্তব্য ভিত্তিহীন। প্রচলিত মতবাদের বিপরীতে বলা যায় যে ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের ক্ষতি তো হয়নি, বরং লাভ হয়েছে। আমদানি হওয়ার ফলে কাপড়ের দাম কমেছে। যোগ্যতার অভাবেই তাঁতি নিজের জীবিকা অর্জন করতে পারছে না। মিল এবং বাকল পড়লেই বোঝা যাবে যে সংরক্ষণ একটি ভ্রান্ত নীতি। তাঁতি যদি তাঁত বুনে জীবিকা নির্বাহ করতে না পারে, তাহলে পরিবর্তরূপে সে কৃষিকাজ করতে পারে, কারণ "সকল ব্যবসায়ের পরিণাম সমান লাভ।" এ প্রসঙ্গে মিল ও বাকলের সংরক্ষণ-নীতির বিরোধিতা দ্রষ্টব্য। এইভাবে বৃত্তি পরিবর্তনের ফলে কৃষির উপর চাপসৃষ্টি হয় বলে যে মতবাদ, তার বিরুদ্ধে তিনি একটি শাশ্বত অর্থনৈতিক তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। "আমরা যদি ইংল্যান্ডের বস্ত্রাদি লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু সামগ্রী ইংল্যান্ডে পাঠাইতে হইবে।...অধিকাংশের বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত দ্রব্যসকল পাঠাই।...ইহা বলা বাহুল্য যে, যে পরিমাণে বাণিজ্যবৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে এই সকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিক্য আবশ্যক হইবে। সুতরাং দেশে চাষও বাড়িবে।" অর্থাৎ বাজারে ধনবন্টন যথাযথই হয়। "আমাদের দেশের লোক জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া সহজে অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে চাহে না। ইহা তাঁতিদের দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের ধনক্ষতি নাই; কেননা, ধানের পরিবর্তে যে চাউল যায়। তদুৎপাদন জন্য যে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি, তাহা হইবেই হইবে। তবে তাঁতি সেই ধন না পাইয়া, অন্য লোকে পাইবে।" ধননিষ্কাশন তত্ত্ব তিনি অস্বীকার করেছেন, কারণ, প্রথমত, নগদ টাকা যতটা বাইরে যাচ্ছে, তার থেকে বেশি আমদানি হচ্ছে। "বিদেশীয় বাণিজ্যকারণ আমাদিগের দেশের ধনবৃদ্ধি হইতেছে।" বিদেশি মূলধন, বিশেষত রেলপথে লগ্নীকৃত বিদেশি পুঁজি এই মতের সপক্ষে প্রধান উদাহরণ। যে পরিমাণ অর্থ বাণিজ্যবাবদ আমদানি হচ্ছে তার তুলনায় 'হোমচার্জ' বলে যে অর্থ বিদেশে যাচ্ছে, তা নগণ্য। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণে এই প্রবন্ধের ভূমিকায় তিনি স্বীকার করেছেন, "অর্থশাস্ত্রঘটিত ইহাতে কয়েকটা কথা আছে, তাহা আমি এক্ষণে ভ্রান্তিশূন্য মনে করি না।" তার পর আবার লিখেছেন : "কিন্তু অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথা ভ্রান্তি, আর কোন কথা ধ্রুব সত্য, ইহা নিশ্চিত করা দুঃসাধ্য, অতএব কোন প্রকার সংশোধনের চেষ্টা করিলাম না।" কেবলমাত্র একটি পাদটীকায় হোমচার্জ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন : "এই কথাটাই বড় বেশি ভুল।"[৩০১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষকসম্প্রদায়ের দুর্গতি সম্বন্ধে তাঁর যে মূল বক্তব্য সেখানে কোন ভুল হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেননি। ব্রিটিশ শাসনের সুফলগুলির স্বীকৃতিতে যদি সমাজতত্ত্বের ঠাণ্ডা প্রলেপ পড়েও থাকে, কৃষকদের অবস্থা বর্ণনার ভাষায় কিন্তু তার কোন রেশ নেই : "হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে ? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দম পান করিতেছে ; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ি গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাত্রে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে, তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে— উহাদের মশা লাগে না। তাহারা পরদিন প্রাতে আবার সেই একহাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে— যাইবার সময় হয় জমিদার, নয় মহাজন পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়ত চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে ? উপবাস— সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চশমা-নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে ? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদের কি মঙ্গল সাধিয়াছ ? আর তুমি, ইংরাজ বাহাদুর! তুমি যে মেজের উপর এক হাতে হংসপুচ্ছ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপরহস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডূয়িত করিতেছ—তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে ? আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না।"[৩০২]

এর পরে তিনি এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার কারণগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার পর কৃষিজাত আয় তিন-চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে কৃষকসম্প্রদায়ের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এই বর্ধিত আয়ের কিছু অংশ রাজস্ববাবদ রাজকোষে যায়, কিন্তু বেশির ভাগটাই যায় জমিদারের হাতে। আইন যাই হোক, জমিদার ইচ্ছা করলেই কৃষকদের উচ্ছেদ করতে পারেন, এবং জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় উচ্ছেদের সুযোগও বেড়ে গেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় খাজনার যে হার নির্দিষ্ট হয়েছিল তা বেড়ে তিন-চারগুণ হয়েছে, কোথাও কোথাও দশগুণ বেড়েছে। আইনের সাহায্য নেওয়ার প্রশ্ন এক্ষেত্রে বিড়ম্বনা— "বড় মানুষেই খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে।" এরপর তিনি পুলিশের সহায়তায় জমিদার এবং তাঁর কর্মচারিদিগের অমানুষিক অত্যাচারের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন আর দেখিয়েছেন যে পুলিশও জমিদারের টাকার বশ।[৩০৩] কাহিনীর উপসংহারে দেখা যায় যে কৃষক ভূমিহীন, সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে।[৩০৪]

এই অবস্থার জন্য তিনি সরকারি ব্যবস্থাকে চূড়ান্তভাবে দায়ী করেছেন। মুসলমান রাজত্বকালে চুক্তিবদ্ধ করসংগ্রহকারীরূপে জমিদার শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছিল : "রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশি যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের লাভ থাকিবে। ...ইহাতেই জমিদারির সৃষ্টি এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের সৃষ্টি।" কর্ণওয়ালিশ এই "রাজস্বের কন্ট্রাক্টরদিগকে ভূস্বামী করিলেন,"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে প্রজাদের আরও সর্বনাশ হল। "প্রজাদের চিরকালের স্বত্ব একেবারে লোপ হইল," এবং প্রজাদের মঙ্গলের জন্য যে সব আইন প্রণয়ন করবেন বলে কর্নওয়ালিশ আশ্বাস দিয়েছিলেন, তার কোনোটিই করলেন না। বরং নতুন নতুন আইন দ্বারা জমিদারের "দস্যুবৃত্তিকে আইনসঙ্গত" করা হল। ১৮৫৯ থেকে এ অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টায় বিশেষ ফল হয়নি। ইচ্ছামত খাজনা বৃদ্ধি এবং খাজনা অনাদায়ে প্রজার সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার অধিকার জমিদারের পক্ষে বলবৎ রইল। এইসব ব্যবস্থা বিদেশী সরকারের অভিপ্রেত না বলে ত্রুটি বলাই ভাল। কিন্তু কারণ যাই হোক, 'প্রজাপীড়ন হইলেই রাজার দোষ দিতে হয়।" উপরন্তু, "ইংরেজের দোর্দণ্ডপ্রতাপ—সে প্রতাপে সমগ্র আসিয়াখণ্ড সঙ্কুচিত; বহুদূরবাসী আবিসিনিয়ার রাজা জনকয়েক ইংরেজকে পীড়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজ্য লোপ হইল,...তবে ক্ষুদ্রজীবী জমিদারের দৌরাত্ম্য নিবারণ হয় না কেন ? আইন আছে— সে আইনে অপরাধী জমিদার দণ্ডনীয় হয় না কেন ? আদালত আছে— সে আদালতে দোষী জমিদার চিরজয়ী কেন ? শাসনদক্ষ ইংরাজেরা কি ইহার কিছু সুবিধা করিতে পারেন না ? যদি না পারেন, তবে কেন শাসনক্ষমতার গর্ব করেন ? যদি পারেন, তবে মুখ্য কর্তব্য সাধনে অবহেলা করেন কেন ?"[৩০৫]

দেশের আইন-আদালতে কৃষকের কোনও উপকার নেই। কৃষকের পর্ণকুটির থেকে আদালত বহু দূর এবং "জমীদার ধনী, আদালতের খেলা তিনি খেলিতে পারেন"। সেখানে দরিদ্র কৃষকের কোনও আশা নেই, বরং মামলার কবলে পড়লে সে সর্বস্বান্ত হয়। আদালত এবং বিচারকের সংখ্যাল্পতার জন্য মামলার নিষ্পত্তি হতে দেরী হয়, আবার, "বিচারের বিলম্ব হয়, তাহাও স্বীকার—অবিচার হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি কলিকাতার তৈয়ারী আইন ঘুণাক্ষরে লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। ইংরাজি আইনের মর্ম এই।"

জমিদারের কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনও মামলা দায়ের করা হলে, অজ্ঞ এবং অযোগ্য জুরী ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে "সন্দেহের ফল" প্রতিবাদীকেই দেওয়া হয়।"[৩০৬] "গোমস্তা মহাশয় খালাস হইয়া আবার কাছারিতে গিয়া জমকিয়া বসিলেন। ভয়ে বাদী সবংশে ফেরার হইল। যাহারা দোষীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিল, গোমস্তা তাহাদের ভিটেমাটি লোপ করিলেন।" ইংরেজ বিচারকগণ সুশিক্ষিত এবং সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত, কিন্তু স্থানীয় অবস্থা এবং ভাষা আয়ত্ত না থাকায়, এবং দেশীয় লোকের প্রতি সহানুভূতিশীল না হওয়ায় তাঁরা সুবিচার করতে পারেন না। বিলেত থেকে ভাল আইন আমদানি করে ভারতের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে বলে বঙ্কিম কটাক্ষ করেছেন: "আমরা যে সভ্য হইতেছি, দিন দিন যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে— তাহার একটি পরিচয়...বিলাত হইতে এখন ভাল আইন আসিয়াছে।...তাহাতে ওকালতি, হাকিমি, আমলাগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি আধুনিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।... আর কেহ বেআইনি করিয়া সুবিচার করিতে পারে না। তাহাতে দীনদুঃখী লোকের একটু কষ্ট, তাহারা আইনের গৌরব বুঝে না, সুবিচার চায়। সে কেবল তাহাদিগের মূর্খতাজনিত ভ্রম মাত্র।"[৩০৭] অন্যত্র ব্রিটিশের আইনকে তিনি দুষ্ট ও শিষ্ট উভয়ের দমন এবং একের অপরাধে অন্যের শাস্তিবিধানের যন্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন।[৩০৮] কমলাকান্ত আফিঙের ঘোরে আদালতকে কসাইখানা বলেছেন, বিচারকরা সেখানকার কসাই। বড় জন্তুরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনক্রমে তাদের হাত থেকে পালাতে পারে কিন্তু ছোটদের নিস্তার নেই।[৩০৯] অন্য একটি স্বপ্নে বিচারালয়কে তিনি সর্বশক্তিমান বলেছেন, কেউ তার হাত থেকে রেহাই পায় না, ধনীরা সর্বস্বান্ত হয় এবং সজ্জন ব্যক্তি কারাগারে জীবন অতিবাহিত করে।[৩১০] তৃতীয় প্রশ্নে তিনি কৃষককে ঋণদানের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। বঙ্কিমের মতে ইংরেজ শাসনে কৃষিঋণদানের ব্যবস্থা না থাকার জন্যই কৃষককে সুদখোর মহাজনের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকতে হয়।[৩১১]

সমস্ত শাসনব্যবস্থাটিকেই তিনি একইরকম সংশয়বাদীর দৃষ্টিতে দেখেছেন। এ ধারণার পিছনে জেলাশাসকরূপে নিজের অভিজ্ঞতা তো ছিলই তার ওপর তিনি আবার লিখিত প্রমাণও দেখিয়েছেন। তাঁর মতে অধিকাংশ সময়েই শাসনকাজ চলে যান্ত্রিকভাবে, কোনরকম ভাবনাচিন্তার বালাই থাকে না, কিন্তু দেখানো হয় যেন কতই ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে। অধিকাংশ সরকারি কর্মচারী ওই যাঁতাকলে বাঁধা। খুব সম্ভব সম্পূর্ণ কল্পিত নয় এমন একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি এই 'কলে শাসনের' কার্যবিধি বুঝিয়েছেন। ছোটলাট বাঁধের অবস্থা জানতে চেয়ে একটি রিপোর্ট তলব করলেন। হুকুম পেয়ে সেক্রেটারি বোর্ডে চিঠি লিখলেন। তাঁর চিঠির এগারোটি অতি পরিষ্কার অনুলিপি এগারোজন কমিশনারের কাছে গেল। তাঁরা চিঠির কোণে প্রাপ্তির তারিখ লিখে রেখে কর্তব্য করলেন। তাঁদের কেরানিরা আরও অনুলিপি প্রস্তুত করে জেলা-কালেক্টরদের কাছে পাঠালেন। তাঁরা আবার দেশী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে পাঠালেন, তাঁরা সাব-ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট তলব করলেন। সাব-ইন্সপেক্টর রিপোর্টের জন্য কনস্টেবল পাঠালেন গ্রামের চৌকিদারের কাছে। চৌকিদার জানাল যে জমিদার বাঁধ মেরামত করে না। সেই রিপোর্ট শাসনযন্ত্রের সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ ঘুরে যথাস্থানে পৌঁছল। এই গভীর তদন্তের ভিত্তিতে বোর্ড অফ রেভিনিউ-এর আলোচনাসাপেক্ষে এক রেজলিউশনে ছোটলাট দস্তখৎ করলেন। "আজ্ঞা দেশে প্রচারিত হইল ; লেঃ গভর্নর বাহাদুরের যশ দেশবিদেশে ঘোষিল।" স্যার উইলিয়ম গ্রে-র মত যেসব আমলা "এইরূপ কলে শাসন করেন", তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ শোনা যায় না, যাঁরা নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে শাসন করেন, তাঁরাই সমালোচনার পাত্র হন। স্যার জর্জ ক্যাম্বেল উচ্চশিক্ষার প্রসার সীমিত করতে গিয়ে বাংলা সংবাদপত্রের চোখের বালি হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ঐ দ্বিতীয় দলের শাসক। অন্য আর এক দিক থেকেও এই দুই ব্যক্তি দুই ভিন্ন পথের পথিক ছিলেন। স্যার উইলিয়ম সাংবাদিকতাকে ভয় করতেন, তাছাড়া তিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসনের কাছে সুনাম আশা করতেন। স্যার জর্জ শুধু নিজের বিচারবুদ্ধিকেই ভরসা করে চলতেন। ভারতীয়দের তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন, অযথা কটু মন্তব্য করে আনন্দ পেতেন এবং যে দেশ তিনি শাসন করতেন, তার সম্বন্ধে কিছুই জানবার চেষ্টা করতেন না। বলা বাহুল্য, এই মনোভাবের ফলে তিনি নানারকম ভুলও করেছেন আবার সকলের কাছেই অপ্রিয় হয়েছিলেন।[৩১২]

সাহিত্যের কল্পিত চরিত্র মুচিরাম গুড়। যে দুর্বৃত্ত সামান্য কেরানিরূপে জীবন শুরু করে রাজপদে উন্নীত হয়েছিল, তার জীবন আলেখ্যর মধ্য দিয়ে বঙ্কিম সে যুগের ইঙ্গ-ভারতীয় রাজকর্মচারী মহলের পরিচয় দিয়েছেন। মুচিরাম প্রায় নিরক্ষর, কিন্তু ব্রিটিশ কর্মচারীদের মনোভাব সম্পর্কে গভীর অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ; সেই মূল্যবান জ্ঞানকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজে লাগিয়ে সে নিজের পদোন্নতি ঘটিয়েছে। প্রথমত, ইংরেজ জেলাশাসক যে বিচারের সময় সাক্ষ্যপ্রমাণ নিজে লিখে রাখেন না, মুচিরাম সেই ত্রুটিটুকু নিজের কাজে লাগাত। যে পক্ষ তাকে যেরকম টাকা দিত, সেই অনুসারে সে মামলার তথ্য সাজাত। নিজের পদে সে একেবারেই অযোগ্য। সাহেব খিটখিটে কিন্তু দয়ালু, না হলে মুচিরামবাবুর চাকরি থাকত না। পরবর্তী সাহেব মুচির "আভূমিপ্রণত ডবল সেলাম" দেখে সিদ্ধান্ত করলেন মুচিই আপিসের সবচেয়ে উপযুক্ত লোক। তিনি নিজে কোনকিছুরই খবর রাখতেন না, তাই মুচির উপর আস্থা হারানোরও কোন কারণ ছিল না এবং যথাকালে তার পদোন্নতিও হল। এরপর মুচি কালেক্টরীর পেস্কারের পদের জন্য আবেদন করল। নিজের ইংরাজির দৌড় যথেষ্ট না হওয়ায় সে অন্য একজনকে দিয়ে দরখাস্ত লেখাল। লেখককে সে বলে দিয়েছিল, "দেখিও, যেন ভাল ইংরেজি না হয়," কারণ সাহেবরা শিক্ষিত বাঙালিদের মোটেই পছন্দ করে না। "আর যা হৌক না হৌক, দরখাস্তের ভিতর যেন গোটা-কুড়ি 'মাই লর্ড' আর 'ইওর লর্ডশিপ' থাকে"। তারপর উদ্ভট বেশবাসে সজ্জিত হয়ে, উপরওয়ালা সাহেবের সুপারিশপত্র নিয়ে সে হাজির হল। চোস্ত সাহেবী সজ্জায় সজ্জিত হয়ে অনেক ডিগ্রীধারীও ওই পদের প্রার্থী ছিলেন। সাহেব তাদের বেশবাস দেখেই বিদায় দিলেন এবং ডিগ্রীধারীদের জানিয়ে দিলেন যে এই চাকরিতে সেক্সপীয়রের জ্ঞানের কোনও প্রয়োজন নেই। বলা বাহুল্য চাকরিটি মুচিই পেল। নতুন ওপরওয়ালা হোম সাহেব মুচির দরখাস্ত পড়ে তাঁকে লর্ড সম্বোধন করা হয়েছে কেন তা জানতে চাইলেন। মুচিরাম সবিনয়ে জানাল যে সে সাহেবের "লার্ড ঘরাণার" কথা শুনেছেন। বংশমর্যাদার গর্বে সাহেব উৎফুল্ল হলেন। "হোম সাহেব একজন সুদক্ষ, সুবিজ্ঞ লোক। মূর্খ মুচিরামও তাঁহাকে ভুলাইতে পারিল— কেবল মিষ্ট কথার বলে।" 'মাই লার্ড' এবং 'ইওর অনার' সম্বোধনে মুচির সমৃদ্ধি উথলে উঠল। হোম সাহেব বদলি হলেন, তাঁর জায়গায় এলেন রীড। তিনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং অল্পদিনেই বুঝে নিলেন যে "মুচিরাম একটি বৃক্ষভ্রষ্ট বানর"। কিন্তু "সেকালে হেলিবেরির সিভিলিয়ান সাহেবরা বাঙ্গালিদিগকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন," তিনি দয়া করলেন। "মুচিরাম যে মূর্খ তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না ; সেরূপ অনেক ডিপুটি আছে...অতএব রীড সাহেব লোকহিতার্থ মুচিরামকে ডিপুটি করিবার জন্য রিপোর্ট করিয়াছিলেন।" কিন্তু ডিপুটিগিরিতে ঘুষ নেই, এবং যে চাকরিতে ঘুষ নেই সেখানে থাকা অসম্ভব বলে মুচিরাম চাকরি ছেড়ে জমিদারী কিনে কলকাতায় বাস করতে গেল এবং সেখানকার বড় বড় লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগল। ছোটলাট তাঁকে কাউন্সিলের সভ্যপদের জন্য মনোনীত করলেন। সাংসদ-জমিদার মুচিরামের ভাগ্যে আরও উন্নতি ছিল। জমিদারীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার ফলে তার চূড়ান্ত সৌভাগ্যের রাজপথ উন্মুক্ত হল। ন্যায়পরায়ণ, প্রজাহিতৈষী এবং পরিশ্রমী ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর মীনওয়েল সাহেব মহারানীর প্রজাদের মঙ্গলবিধানের উদ্দেশ্যে দুর্ভিক্ষ তদারকে মুচিরামের গ্রামে উপস্থিত হলেন। "একদিন অনেক দূর হইতে প্রায় একশত প্রজা আসিয়াছে— নিকাশ প্রকাশে তাহাদের বেলা গেল, তাহারা বাড়ি ফিরিতে পারিল না। বাগানে রাঁধাবাড়া করিতে লাগিল। তাহারা যখন খাইতে বসিল" তখন মীনওয়েল সাহেব তাদের দেখলেন। কথাবার্তায় তাঁর ধারণা হল যে দয়ার অবতার জমিদার মুচিরাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের জন্য অন্নসত্র খুলেছেন। "সাহেব উত্তম বাঙ্গালা জানেন, পরীক্ষা দিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন," কিন্তু ভাষাজ্ঞান তাঁর মঙ্গলেচ্ছার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না। যাইহোক, মুচিরাম শেষ পর্যন্ত তার বাঞ্ছিত পুরস্কার— রাজা এবং রায়বাহাদুর উপাধি পেল। গল্পের শেষে লেখকের ঠাট্টা : "পাঠক একবার হরি হরি বল।"

রাজা মুচিরামের জীবনেতিহাসে যে সব ব্রিটিশ আমলার পরিচয় পাওয়া যায় তারা কেউই দুর্বৃত্ত বা স্বৈরাচারী নয়। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে খারাপ, সে শুধু কাজে অবহেলা করে। কিন্তু প্রায় সকলেই খোসামোদ-প্রিয়। সবচেয়ে ভাল যাঁরা তাঁরাও ভারতীয় আমলাদের বিশ্বাস করে না। এ দেশ সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই জানেন না, তাই তাঁদের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতায় মুচিরামদের মত দুর্বৃত্ত চাটুকারদের উন্নতি হয় এবং সরকারি কাজে অসাধুতা বৃদ্ধি পায়। ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদায়ের ইলবার্ট বিল আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা 'ব্র্যানসনিজম্'[৩১৪] নামক ব্যঙ্গাত্মক রচনায় বঙ্কিম আরও তীব্র কটাক্ষপাত করেছেন। ইংরেজি নামধারী এক কৃষ্ণকায় বাঙালি খ্রিস্টান বাঙালি হাকিমের এক্তিয়ার ("সাহেব" অবশ্য জুরিসডিক্সান উচ্চারণ করতে পারেন না, জুষ্টিকেশন বলেন) মানতে নারাজ। হাকিম তার আপত্তি নামঞ্জুর করে মাছচুরির অপরাধে দণ্ডবিধান করলেন। একটি ইংরেজি দৈনিক এই ঘটনাটিকে "স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির চক্রান্ত" বলে বর্ণনা করে সুবিচার দাবি করল। ব্রিটিশ প্রভু বাঙালি ডেপুটিকে তলব করলেন এবং ডেপুটি স্বীকার করলেন যে একজন "ইংরেজকে" দণ্ড দিয়ে তিনি ভুল করেছেন, কারণ নিম্নমানের ভারতীয়দের পক্ষে উচ্চমানের ইংরাজের বিচার করার ধৃষ্টতা থাকা উচিত নয়। 'দুটো মন রাখা কথায়' সেই হাকিমের পদোন্নতি নিশ্চিত হল। ব্রিটিশ ওপরওয়ালা তার পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করলেন, কারণ লোকটি ধূর্ত এবং খোসামুদে বটে, কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালিদের মত আত্মগর্বী নয়। ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের প্রতি যে কোনও কোনও ইংরেজ আমলার সমর্থন ছিল, সেটা জানা ছিল বলেই বোধহয় বঙ্কিম তাঁদের ওপর অতিপ্রকট জাতিবৈষম্যের দোষারোপ করেছেন। সমসাময়িক সাহিত্যে ইঙ্গবঙ্গ আমলাদের খোসামোদপ্রিয়তা এবং শিক্ষিত বাঙালিদের প্রতি বিদ্বেষ নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ইলবার্ট-বিল-বিরোধী আন্দোলন তখনকার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সম্বন্ধে সাধারণ দেশবাসীর ধারণাকে আরও জোরদার করেছিল। বঙ্কিমের 'ব্র্যানসনিজম' প্রহসন তারই প্রতিফলন।

ইংরেজ-ভারতীয় সম্পর্কের অনিবার্য অঙ্গ বিদ্বেষ বঙ্কিমের মতে আবশ্যিকও। ইংরাজি পত্র-পত্রিকাগুলিতে ভারতীয়দের সম্পর্কে অহেতুক কটুকাটব্য যেমন নিয়মিত ঘটনা, দেশি পত্রিকাগুলিতে তার প্রত্যুত্তরও তেমনি নিয়মিত। উভয়পক্ষের এই গালিবর্ষণ বহুকাল যাবৎ চলছিল। কিন্তু এ দেশকে যাঁরা ভালবেসেছিলেন সেইসব ইংরেজদের কাছে এটা বড়ই দুঃখের ব্যাপার হয়েছিল। তাঁরা সভাসমিতি করে, কাগজে চিঠিপত্র লিখে এই বিশ্রী ব্যাপার বন্ধ করবার বৃথা চেষ্টা করতেন। ইংরেজরা যে অনেক কিছুতেই শ্রেষ্ঠ সেটা স্বীকার করে নিয়েই বলতে হয় যে, তারা যদি একটু নিস্পৃহ, সংযত এবং হিতাকাঙ্ক্ষীর মত ব্যবহার করতে পারত, এবং ভারতীয়রা একটু বিনীত এবং অনুগত হয়ে থাকত, তাহলেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকত। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটাও ঠিক যে বিজিত এবং বিজেতার মধ্যে সেরকম সম্পর্ক আশা করা যায় না। বিজিত জাতি কখনই বিজেতার নিঃস্বার্থ ভাল ব্যবহারকে বিশ্বাস করতে পারে না, তাদের প্রতি প্রীতি বা সম্ভ্রম বোধ করতেও পারে না। বিজেতার পক্ষেও যথাযথ সংযম রক্ষা করে চলা প্রায় অসম্ভব। বঙ্কিম লিখেছেন : "আজ্ঞাকারী আমরা বটে, কিন্তু বিনীত নহি এবং হইতেও পারিব না।" যতদিন ভারতবাসী তার প্রাচীন ঐতিহ্যে গৌরববোধ করবে, "ততদিন বিনীত হইতে পারিব না, মুখে বিনয় করিব, অন্তরে নহে।" তবে তিনি "কায়মনোবাক্যে" প্রার্থনা করেছেন, "যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। ...ইংরেজদের নিকট অপমানগ্রস্ত উপহাসিত হইলে" তাদের সমতুল্য হবার যতটা প্রচেষ্টা থাকবে, বন্ধুত্বের মাধ্যমে ততটা হবে না, কারণ, "বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নহে"।[৩১৫] তবে, "জাতিবৈরের ফলে প্রতিযোগিতা ভিন্ন বিদ্বেষ ও অনিষ্টকামনা না ঘটে"—এই সাবধানবাণী যখন তিনি উচ্চারণ করেছেন, তখন এরকমটা হওয়া যে প্রায় অসম্ভব তা বোধহয় তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।

উপরে উদ্ধৃত প্রবন্ধে তিনি বাঙালিদের উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব বিষয়ে কিছুটা আশা প্রকাশ করেছেন, যদিও সেই সুফলটুকু পাওয়া গেছে জাতিবৈর-সৃষ্ট প্রতিযোগিতার মনোভাব থেকে। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কিন্তু প্রধানত বিদেশীপ্রভাবের নেতিবাচক দিকটিই ধরা পড়েছে। ব্রিটিশ শাসনকালের সীমানা ছাড়িয়ে ইতিহাসের বৃহত্তর পটভূমিতে তিনি বাঙালি চরিত্র এবং ঐতিহ্যের যে মূল্যায়ন করেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বিভিন্ন গৌরবোজ্জ্বল যুগের এবং উচ্চমানের সাংস্কৃতিক গৌরবের কথা উল্লেখ করেছেন, এমনকি, ঐতিহাসিক যুগের বাঙালিকে দুর্বল জাতি বলা যায় কিনা বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন,[৩১৬] তা সত্ত্বেও সমকালীন বাঙালিরা যে একেবারেই অপদার্থ, ইংরেজদের এই অভিমত তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে বাংলার জলবায়ুর প্রভাবে এবং তুর্কী শাসনের ফলে বাঙালিদের মধ্যে অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছিল, কালে কালে তা বাঙালির আত্মমর্যাদাবোধসহ অন্যান্য অনেক গুণ ধ্বংস করলেও তাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অক্ষুণ্ণ ছিল।[৩১৭] আগের দিকে তারা বুদ্ধিতেও অন্যান্য ভারতবাসীর তুলনায় নিকৃষ্ট ছিল। ভারতের সামরিক সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে ইংরাজদের মতেরই প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেছেন যে উত্তর ভারতের বাসিন্দারা বাঙালিদের তুলনায় অসঙ্কর এবং অনেক বেশি বলশালী।[৩১৮] তুলনায় তারা যে ইংরেজদের চেয়ে নিকৃষ্ট তার উপরই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা' প্রবন্ধে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন : "বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না।... যদি এই তিনকোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিনকোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র।"[৩১৯]

তুলনার কথা বাদ দিলেও, বাঙালিদের, বিশেষত ইংরেজি শিক্ষিত বাবুদের সম্বন্ধে তাদের সবচেয়ে বড় সমালোচক ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীদের মতটাই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে অবক্ষয়িত, বিধ্বস্ত এবং নির্জ্জীব এক জাতির পরিণতি এরা।[৩২০] 'ধর্মতত্ত্বে' শিষ্য বলছেন : "এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালি হয় ভণ্ড ও শঠ, নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশুবৎ”, এবং গুরু তাতে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়েছেন।[৩২১] ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল্যায়নের সময় এই দীর্ঘকালব্যাপী অবক্ষয়ের ধারণার প্রভাব তিনি এড়াতে পারেননি। বিদেশী শাসনের ফলেই বাঙালির মনুষ্যত্বনাশ হয়েছে এবং ব্রিটিশ শাসনের আমলে তা অপকর্ষের শেষ বিন্দুতে পৌঁছিয়েছে। সেই কাপুরুষ, অর্ধশিক্ষিত, আত্মমর্যাদাহীন এবং বুদ্ধিবিবেচনাহীন বাঙালি এখন ইংরেজের জীবনযাত্রার অন্ধ অনুকরণে মত্ত।[৩২২] ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে উন্নততর সংস্কৃতির অনুকরণ প্রগতির সহায়ক হয়। রোমকরা গ্রীকদের অনুকরণ করেছিল ; আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার সূচনা হয়েছে প্রাচীন সভ্যতার অনুকরণ করে। এমনকি এখনও ইংরেজরা অশনে-বসনে ফরাসীদের অনুকরণ করে। বাঙালি যে ইংরেজের অনুকরণ করছে তা আশাপ্রদ বটে, তবে দুঃখের বিষয় “তাঁহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অণুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়।”[৩২৩] আরও দুঃখের বিষয় হল যে পরাধীনতায় তাদের কোন লজ্জা নেই। “বাঙ্গালাদেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নির্ণীত হয়— কে কত বড় বাঁদর, তার লেজ মাপিয়া ঠিক করিতে হয়। ...বন্দী চরণ-শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া বড়াই করে।”[৩২৪] ‘ইংরাজ-স্তোত্র’ নামক ব্যঙ্গ রচনায় বঙ্কিম বাঙালি বাবুর কাপুরুষোচিত মনোভাবকে ধিক্কার দিয়েছেন : “আমি যাহা কিছু করি, তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া পরোপকার করি ; তুমি বিদ্বান বলিবে বলিয়া আমি লেখাপড়া করি। অতএব হে ইংরাজ ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি।”[৩২৫] একটি ছোট্ট তিক্ত মন্তব্যে তিনি বাঙালি মানসিকতার উপর ব্রিটিশ প্রভাব সম্পর্কে নিজের ধারণা ব্যক্ত করেছেন : “যাঁহাদের রসনেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র, তাঁহারাই বাবু।”[৩২৬]

এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার চূড়ান্ত কুফল শিক্ষিত, সুবিধাভোগী সমাজের উচ্চবর্গীয়দের থেকে জনসাধারণের দূরত্ব এবং দুই শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে একাত্মতাবোধের অভাব। ‘বাবুরা’ নিজেদের মাতৃভাষাকে ঘৃণা করেন তাই তাঁদের বিদ্যালব্ধ তর্কযুদ্ধের ভাষা অশিক্ষিত শ্রেণীর কাছে দুর্বোধ্য ; ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক পাকাপাকি বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা ক্রমে শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত পরিবাহিত হবে— মেকলের এই ‘ফিল্টার ডাউন’ তত্ত্ব বঙ্কিম নিজস্ব ভঙ্গিতেই খণ্ডন করেছিলেন : “এতকাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা দেশ উৎসন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন (ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না)—কেননা, তাঁহাদিগের ছিদ্রগুণে ইতর লোক পর্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে।”[৩২৭]

মতাদর্শ বিকাশের শেষ পর্যায়ে এসে যখন বঙ্কিম নিজের হিন্দুত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন এবং গভীর ভগবৎ বিশ্বাসী, সে সময় তাঁর বক্তব্যের সুর একেবারেই বদলে গেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি বহুবিষয়েই ইউরোপের তুলনায় ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব খুঁজে পেয়েছেন, এবং এ সময়ে তিনি যা লিখেছেন তাতে পাশ্চাত্যের গৌরবের চেয়ে সমালোচনাই বেশি স্থান পেয়েছে। বাঙালিদের সম্বন্ধে অবশ্য তাঁর মনোভাব খুব একটা পালটায়নি, তবে পাশ্চাত্যের অনুকরণেই যে তাদের মঙ্গল, এই তত্ত্ব আর প্রচার করেননি। হিন্দু ধর্মকে যে তিনি নতুনভাবে বুঝেছেন, তা অবশ্য কিছুটা খামখেয়ালিপনার তুল্য, তবে নিজের দেশ ও জাতিকে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের সঙ্গে সমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌরবের আসনে বসাবার জন্য তিনি যে হিন্দু ঐতিহ্য হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন, হিন্দুত্বের গর্বে সেই জাতীয়তাবাদী প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছিল।

বলা বাহুল্য, এই গৌরবের কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাঁর নিজের ব্যাখ্যায় হিন্দুধর্মতত্ত্ব। অনুশীলন তত্ত্বের ধারণা অবশ্য তিনি পেয়েছিলেন পাশ্চাত্যের উদাহরণ থেকে, কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে হিন্দু ঐতিহ্যে তা এমন এক অনির্বচনীয় পরিণতি লাভ করেছিল যা "Mathcw Arnold প্রভৃতি বিলাতী অনুশীলনবাদীদিগের বুঝিবার সাধ্য আছে কিনা সন্দেহ।"[৩২৮] খ্রিস্টানদের তুলনায় হিন্দু সাধনার রীতি অনেক গভীর। যে সব মহাপুরুষকে মানুষ যুগে যুগে ঈশ্বরের অবতার বলে পূজা করেছে, হিন্দু ঐতিহ্যে তাঁরা "সর্বগুণবিশিষ্ট— ইহাদিগতেই সর্ববৃত্তি সর্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্তি পাইয়াছে," অন্যান্য ঐতিহ্যে কিন্তু তা হয়নি। যীশুখ্রিস্ট "খ্রিস্টিয়ানের আদর্শ— কেবল উদাসীন কৌপীনধারী নির্মম ধর্মবেত্তা"। হিন্দুর আদর্শ— স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার কৃষ্ণ— একাধারে রাজা, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ এবং যোদ্ধা।[৩২৯] হিন্দু ধর্মের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে কোঁৎ-এর মতের কোথাও কোথাও মিল আছে, এবং "হর্বর্ট স্পেন্সর কোমৎ মত প্রতিবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মর্মতঃ বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ। স্পিনোজার মতের সঙ্গেও বেদান্তমতের সাদৃশ্য আছে।" এইসব "ইউরোপীয় হিন্দুরা...হিন্দুধর্মের যাহা স্থূলভাগ, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহার একটু আধটু ছুঁইতে পারিতেছেন," কারণ একমাত্র হিন্দুধর্মে "মনুষ্যজীবনের সর্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত।"[৩৩০] বৈদিক হিন্দুদের যে চৈতন্য স্ফূরিত হয়েছিল তার অনেকটাই এখনও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে অজ্ঞাত। সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের মর্মার্থ নিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এখনও হিমসিম খাচ্ছেন।[৩৩১] খ্রিস্টধর্মেও ঈশ্বরভক্তি এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের কথা আছে, কিন্তু একমাত্র হিন্দুধর্মে ঐ তত্ত্বের যুক্তিসম্মত পরিণতি। "মনুষ্যমাত্রেই— মূর্খ ও জ্ঞানী, ধনী ও দরিদ্র, পুরুষ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক,— সকল জাতি, সকলেই যে তুল্যরূপে পরিত্রাণের অধিকারী, এ সাম্যবাদ শাক্যসিংহের ধর্মে ও খৃষ্টধর্মেই আছে," আবার গীতাতেও স্পষ্টভাষাতেই বলা আছে।[৩৩২] "বিদ্যালয়ে পড়ায় মেকলে প্রণীত ক্লাইভ ও হেস্টিংস সম্বন্ধীয় পাপপূর্ণ উপন্যাস— আর সেই উচ্চশিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী উন্মত্ত হয়ে নিজেদের ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়েছেন।[৩৩৩] ভারতের পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে যে ভক্তিবাদ এবং উচ্চমানের নৈতিকতা শেখানো হয়েছে, ইউরোপের ঢাক পেটানো সাহিত্যে তার সঙ্গে তুলনীয় কিছুই নেই।[৩৩৪] প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণশ্রেণী "যে সমাজ ও যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন...ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে।"[৩৩৫] বঙ্কিমের জীবনের এই পর্যায়ে লেখা 'রজনী' উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী এক সন্ন্যাসী বলেছেন: "ইংরেজরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিতেন না; ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারে নাই।"[৩৩৬]

হিন্দুধর্ম তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সুতরাং ইউরোপের ধর্ম— খ্রিস্টধর্ম, অবধারিতভাবে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। এই পর্যায়েও নিরপেক্ষ সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি খ্রিস্টধর্মের মূল্যায়ন করেছেন। ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রচারিত অন্যান্য ধর্মের মতই এ ধর্মের প্রধান নীতিলক্ষণগুলি খুবই স্পষ্ট, যে কোন লোকের পক্ষেই তা বোঝা অত্যন্ত সহজ। তাঁর মতে, শুরুতে এইসব ধর্মের মৌলিক নীতিগুলি ছাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুই ছিল না ; কিংবদন্তী, আচার-অনুষ্ঠান, পৌরাণিক কাহিনী, কুসংস্কার ইত্যাদি আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে।[৩৩৭] সবকটি খ্রিস্টিয় সম্প্রদায়ের ভিত্তি হল কয়েকটি মৌলিক আদর্শ এবং সেগুলির ভিত্তিতেই খ্রিস্টধর্মের মূল্যায়ণ হওয়া উচিত। সাধু-ভজনা, প্রেতাত্মায় বিশ্বাস অথবা লোকায়ত কিংবদন্তী এবং উৎসবাদি ইউরোপের ধর্মীয় জীবনের অংশ হলেও খ্রিস্টধর্মের আনুষঙ্গিক নয়। নিরপেক্ষভাবে খ্রিস্টধর্মকে বুঝতে চেয়েছিলেন বলেই তিনি দেবদূত, শয়তান, সন্ন্যাসী এ সবে বিশ্বাসের মধ্যে খ্রিস্টধর্মে প্রচ্ছন্ন বহু ঈশ্বরবাদের প্রবণতা দেখেছিলেন।[৩৩৮]

খ্রিস্টধর্ম প্রসঙ্গে তিনি যে কয়েকটি অত্যন্ত কঠোর মন্তব্য করেছেন, সেখানে তাঁর নিরপেক্ষতার যুক্তি চলে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর সমালোচনা যুক্তিসিদ্ধ, তবুও এ সব জায়গায় তাঁর একদেশদর্শী মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট— হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা, সেইসঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতির দুর্বলতাগুলি উদঘাটিত করার চিরন্তন প্রচেষ্টা। প্রথমত, সমগ্র প্রকৃতিতে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করার মত কল্পনাশক্তি একেশ্বরবাদের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নেই, তাই প্রকৃতির উপাসনাকে একেশ্বরবাদীরা ধর্মচিন্তার অমার্জিত রূপ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে খ্রিস্টধর্মেও প্রকৃতি উপাসনা আছে, তা বঙ্কিমের মতে ইহুদীধর্মের প্রভাব, আবার ঐ প্রভাবের ফলেই খ্রিস্টধর্মে অসহিষ্ণুতার সৃষ্টি হয়েছে। ইহুদিদের কাছে জিহোবা একমাত্র উপাস্য হলেও বঙ্কিম তাঁকে ঈশ্বর বলতে রাজি নন, কারণ তিনি 'রাগদ্বেষপরতন্ত্র পক্ষপাতী মনুষ্যপ্রকৃত দেবতামাত্র। পক্ষান্তরে সুশিক্ষিত গ্রীকরা ইহার অপেক্ষা উন্নত ঈশ্বরজ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ...খ্রিস্টধর্মের যথার্থ প্রণেতা সেন্টপল। তিনি গ্রীকদিগের শাস্ত্রে অত্যন্ত সুশিক্ষিত ছিলেন।'[৩৩৯] ভূদেবের মতই বঙ্কিমও খ্রিস্টানদের ঐশ্বরিক ধারণার তীব্র সমালোচনা করেছেন : "খ্রিস্টানদের পরমেশ্বর এই পবিত্র নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তিনি বিশ্বসংসারের রাজা, কিন্তু এমন প্রজাপীড়ক, বিচারশূন্য রাজা কোন নরপিশাচেও হইতে পারে না। তিনি ক্ষণকৃত অপরাধে মনুষ্যকে অনন্তকালস্থায়ী দণ্ডের বিধান করেন— নিষ্পাপেরও অনন্ত নরক— যদি সে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ না করে। ...যে খ্রিস্টের পূর্বে জন্মিয়াছে বলিয়াই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে নাই, তাহারও অনন্ত নরক। এই অত্যাচারকারী বিশ্বেশ্বরের একটি কাজ এই যে, ইনি রাত্রিদিন প্রজাবর্গের মনের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন, কে কি পাপ সঙ্কল্প করিল।" এই 'পৈশাচিক ধর্মকে' তিনি ধর্ম বলতে নারাজ।[৩৪০] এখানে যে ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন তা হেস্টিংসকৃত হিন্দুধর্মের সমালোচনার ভাষার সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য অন্যত্র তিনি খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে আর একটু উদার মনোভাবের পরিচয় রেখেছেন। এক জায়গায় তাঁর এক প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য : বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় "বাইবেলের...অনুবাদে ইউরোপ উপধর্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির পথ অনর্গল হইল।"[৩৪১] হিন্দুধর্ম যেমন নিষ্পাপ কর্মের আদর্শ পরিত্যাগ করেছে তেমনি খ্রিস্টধর্ম একালে প্রেম ও শান্তির আদর্শ পরিত্যাগ করেছে বলে তিনি সমালোচনা করেছেন। তাছাড়া "বিজ্ঞানময় উনবিংশ শতাব্দীতে" খ্রিস্টানরা পরকালে বিশ্বাস হারিয়েছে, এবং বৈজ্ঞানিকদের কুসংস্কারের ফলেই পরকালতত্ত্বের যথাযথ মীমাংসা হতে পারছে না।[৩৪২]

একসময়ে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতাকে তিনি প্রগতির একমাত্র পথ বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর মনোভাব বদলে গিয়েছিল। সেই সময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞানকে তিনি যেমন দেখেছিলেন : "রক্তমাংস-পূতিগন্ধশালিনী, কামান-গোলা-বারুদ-ষ্টীমচলোডার-টর্পীডো প্রভৃতিতে শোভিতা রাক্ষসী— এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাঁটা ধরিয়া যাহা প্রাচীন, যাহা পবিত্র, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের যত্নের ধন, তাহা ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে।"[৩৪৩] এবং "যে পাশ্চাত্যগণ হিন্দুদের জড়োপাসক বলেন প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই জড়োপাসক। পাশ্চাত্যগণ আজকাল নানাপ্রকার প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য অবলম্বন করিয়া নানাবিধ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; কিন্তু ঐ সকল শক্তি যে চৈতন্যময়ের চেতনাযুক্ত, ইহা একবারও ভাবেন না। জগতে ঐ সকল শক্তিদ্বারা চৈতন্যময়ের কি প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে পাশ্চাত্যগণ তাহা একবার অনুসন্ধান করেন না।" এসব না জেনে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ে খেলা করা ভয়াবহ পাপ— "আমার বোধ হয় যেদিন হইতে ডিনামাইট সৃষ্টি হইয়াছে সেই দিন হইতে পাশ্চাত্যগণের উক্ত পাপের ফল ফলিবার সূত্রপাত হইয়াছে।"[৩৪৪] উনবিংশ শতকের ইউরোপের উৎকট হিতবাদের কাছে বিজ্ঞান যেন মানুষের সেবাদাসী, সে এক "সাঙ্ঘাতিক নৈতিক বিষ।"[৩৪৫]

ইউরোপের দেশগুলির আগ্রাসী মনোভাব ও তাদের পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহকে বঙ্কিম আগের দিকের রচনাতেও সমালোচনা করেছেন। আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত জিগীষাকে তাঁর কমলাকান্ত চৌর্য্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৩৪৬] 'ধর্মতত্ত্বে' আবার জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্ঘর্ষের অন্যরকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আগ্রাসী মনোভাব ইউরোপের একারই নয়,— "বিবিধ সমাজের উপরে কেহ একজন রাজা না থাকাতে, যে সমাজ বলবান, সে দুর্বল সমাজের কাড়িয়া খায়।" ঠিক যেমন, "যে সমাজে রাজশাসন নাই, সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে যার পারে সে তার কাড়িয়া খায়।" ইউরোপের আগ্রাসী নীতি ও আত্মকলহ এই বৃহত্তর সত্যের অংশবিশেষ। যে ভাষায় তিনি এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন তাতেই তাঁর মনোভাবের পরিচয় : "যেমন হাটের কুকুররা যে যার পায়, সে তার কাড়িয়া খায়, কি সভ্য কি অসভ্য জাতি তেমনি পরের পাইলেই কাড়িয়া খায়।" যুদ্ধ এবং আক্রমণের প্রতিটি উদাহরণই তিনি দিয়েছেন আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস থেকে। এই প্রবন্ধে তিনি ইউরোপের মূল্যায়ন করতে চাননি,—আত্মরক্ষা যে মানুষের অবশ্য কর্তব্য, সেটা বলাই এখানে তাঁর উদ্দেশ্য।[৩৪৭]

ইউরোপীয় দেশপ্রেমকে তিনি আগ্রাসী যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ বলেছেন, সুতরাং "ইউরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ"।[৩৪৮] দেশপ্রেম, তজ্জনিত আগ্রাসী মনোভাব এবং এরকম সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেম সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ভূদেবের ব্যাখ্যার সমতুল। "প্রীতিবৃত্তি অনুশীলিত হইতে থাকিলেই ইহা গৃহের ক্ষুদ্র সীমা ছাপাইয়া বাহির হইতে চাহিবে। যখন নিখিল জন্মভূমির উপর এই প্রীতি বিস্তৃত হয়, তখন ইহা সচরাচর দেশবাৎসল্য নাম প্রাপ্ত হয়।" ইউরোপীয়দের "প্রীতিবৃত্তি" সেখানেই শেষ হয়ে গেছে। তারা তাদের নিজেদের জাতিকে ভালবাসে, বাকিদের সহ্য করতে পারে না। এর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে ইউরোপীয় সভ্যতার আদিযুগে— গ্রীসে ও রোমে। "প্রাচীন গ্রীস ও রোমে কোন উন্নত ধর্ম ছিল না, যে পৌত্তলিকতা সুন্দরের এবং শক্তিমানের পূজা মাত্র, তাহার উপর আর কোন উন্নত ধর্ম ছিল না। জগতের লোক কেন ভালবাসিব, তাহার কোন উত্তর ছিল না।" এই দুই জাতির স্বাভাবিক মহত্ত্বগুণে তাদের দেশপ্রেম জাগরিত হয়েছিল এবং সেই দেশপ্রেম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার তাদের উন্নতির সহায়ক হয়েছিল। তৃতীয় যে ঐতিহ্যের প্রভাব পড়েছিল, তা ইহুদি, তারাও "বিশিষ্টরূপে দেশবৎসল, লোকবৎসল নহে"। খ্রিস্টধর্ম এক মহান আদর্শ প্রচার করেছিল বটে, কিন্তু গ্রীস, রোম ও ইহুদি, এই তিন দিক থেকে প্রবাহিত ত্রিস্রোতের আবর্তে ইউরোপীয় মানসিকতা গড়ে উঠেছে, খ্রিস্টের লোকবাৎসল্যের শিক্ষা কার্যকর হতে পারেনি : "খ্রিস্টধর্ম এই তিনের সমবায় অপেক্ষা ক্ষীণবল বলিয়া কেবল মুখেই রহিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়েরা মুখে লোকবৎসল, অন্তরে ও কার্য্যে দেশবৎসলমাত্র।" তাছাড়া খ্রিস্টানদের ঈশ্বর জগতের ঈশ্বর হলেও "জগৎ হইতে স্বতন্ত্র" তাই খ্রিস্টানদের মধ্যে ঈশ্বর-প্রীতি আর ঈশ্বর-সৃষ্ট জগৎ-প্রীতি এক হয়ে যেতে পারেনি।[৩৪৯] এই সব কিছুর শেষ পরিণতি হল দেশপ্রেম, যাতে নিজের দেশের স্বার্থে অন্যকে আঘাত করাকে অন্যায় মনে হয় না।

একসময়ে ইউরোপীয় দেশপ্রেম বঙ্কিমের আদর্শ ছিল, কিন্তু পরে আর তা ছিল না, তা সত্ত্বেও 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি দেশপ্রেমকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আখ্যা দিয়েছেন ; জীবনের এই পর্যায়েও কিন্তু তিনি পূর্বজীবনে অনুসৃত হিতবাদী এবং প্রত্যক্ষবাদী দর্শনকে পুরোপুরি বর্জন করেননি। আগেই দেখিয়েছি যে তাঁর নব্য হিন্দুত্ব এই দুই মতবাদ এবং অনুশীলন তত্ত্বের উপর গড়ে উঠেছিল। এই পর্যায়ে হিতবাদতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনার তীব্রতা আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছিল, বরং হিতবাদতত্ত্বকে তিনি মঙ্গলের সাধনা হিসাবে দেখেছেন এবং সেই কারণেই একে ধর্মমত (religion) বলেছেন। কিন্তু সেই ধর্ম অসম্পূর্ণ, কারণ তাতে সত্য ও সুন্দরের আরাধনা নেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে "বহুজনহিতায়" ও "greatest good of the greatest number" আদর্শটিকে তিনি একটা নৈতিক অর্থ দিতে চেয়েছেন। 'ধর্মতত্ত্বে' এ বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনায় হিতবাদী দর্শনের প্রায় সবটুকুই তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছেন যে এই দর্শন অসম্পূর্ণ সুতরাং অনুশীলনতত্ত্বের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে একে বুঝতে হবে।[৩৫০] কোঁৎ সম্বন্ধে তিনি 'ধর্মতত্ত্বে' বলেছেন যে এই দার্শনিকের অনেক আদর্শই হিন্দুধর্মের সঙ্গে তুলনীয়, এবং ধর্ম কি, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি কোঁৎ-এর সংজ্ঞাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করেছেন।[৩৫১]

একদিন সমকালীন ইউরোপের সভ্যতাকে তিনি মানবজাতির ইতিহাসে অগ্রগতির সর্বোচ্চ স্তর বলে বিশ্বাস করতেন, শেষকালে সে মত পালটে লিখলেন : "আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণত অবস্থা বলিতেছি।"[৩৫৩] জীবনের পূর্ব পর্যায়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে ভারতবাসীর পক্ষে ব্রিটিশদের অনুকরণ করা উচিত, শেষের দিকে সে মতও পালটেছিলেন, কারণ "ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ" এবং তাদের দেওয়া "জ্ঞান পীড়াদায়ক"। "ক্ষুদ্র বাঙ্গালী" হয়েও তাঁর মনে হয়েছে, "আমি গোষ্পদ বলিয়া যে ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে পারে না।"[৩৫৪] ইংরেজদের 'বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ' বলার কারণ যে একশ কুড়ি বছর এ দেশে বাস করেও তারা কিছুই বুঝল না। তা সত্ত্বেও, ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেই দেশপ্রেম নামক যে মহৎ গুণের কথা তিনি বলেছেন, তার চর্চা করতে হবে। অস্ত্র আইন প্রণয়ন করা অন্যায় হয়েছে, কিন্তু অন্যায় বলে নয়, সেই আইন প্রত্যাহার করবার কথা তিনি বলেছেন, যাতে সম্রাজ্ঞীর রাজভক্ত প্রজারা তাঁর সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারে। "বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র", বিলেতে এখন আর রাজভক্তির স্থান নেই বটে, কিন্তু স্বদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঙ্গলের জন্য ভারতীয়দের পক্ষে রাজভক্তির অনুশীলন করা উচিত, কারণ রাজভক্তির অর্থ কোনও ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আনুগত্য নয়, সেই আনুগত্য হল সমাজ বিধায়কের মূর্ত প্রতীকের প্রতি। "রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজপুরুষগণও যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র। ...কিন্তু বেশি মাত্রায় কিছুই ভাল নহে।"[৩৫৫] এইসব বক্তব্যের মধ্যে কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের সুফলপ্রসূ রূপটিই ধরা পড়েছে। আমি এর আগে দেখাতে চেয়েছি যে এইসব প্রকাশ্য রাজভক্তি সব সময়ে লেখকের মনের কথা নয়। অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব নয় জেনেই তিনি হতাশার প্রতিষেধকরূপে রাজভক্তির বিধান দিয়েছেন এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরূপ মূল্যায়ন বিবিধ অর্থবহ ভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন।

জীবনের প্রথমদিকের একটি রচনায় বঙ্কিম নিজেকে 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের সভ্য বলে পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে ঐ নামটি হিন্দু কলেজের প্রথম স্নাতকদল, বিশেষত ব্যতিক্রমী শিক্ষক ডিরোজিওর ছাত্রদলকে বোঝাত। 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের সভ্যরা পাশ্চাত্যের সবকিছুর প্রশংসা এবং হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি অসীম ঘৃণার জন্য নাম কিনেছিলেন। যৌবনে এবং মধ্যবয়সের শুরুতে বঙ্কিমের মানসিকতাও এই রকমই ছিল, তাঁর প্রথমদিকের রচনাবলীতে তা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর নান্দনিক, নৈতিক এবং জাতীয়তাবাদী প্রত্যাশা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য ও জীবন দর্শন গড়ে তোলবার জন্য সমকালীন ইউরোপের যুক্তিবাদী-মানবিকতাবাদী সংস্কৃতির রূপরেখার মধ্যে সন্তোষজনক ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিল। অতীত এবং বর্তমানের ভারতবর্ষের সব কিছুর থেকেই ইউরোপকে তাঁর বহুগুণে শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছিল। তাঁর শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব, এবং সর্বোপরি, মনে হয় তাঁর আমলাতান্ত্রিক পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবেই তিনি এই রকম মূল্যায়ন করেছিলেন। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে তাঁর সমকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর নেতৃস্থানীয়দের, বিশেষত যে গোষ্ঠী তাঁর সৃষ্ট 'বঙ্গদর্শন'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মানসিকতা এবং মূল্যবোধও এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

সে যুগের নবজাগরিত জাতীয়তাবাদের পক্ষে অবশ্য পাশ্চাত্যের অবিমিশ্র জয়গান গাওয়া সম্ভব ছিল না। ভারতীয় ঐতিহ্যে নবসৃষ্ট আস্থার ফলে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রকট জাতিবৈষম্য এবং ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদায় কর্তৃক ভারতের, বিশেষত বাঙালিদের সবকিছুকেই তাচ্ছিল্য করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জোরদার হয়ে উঠেছিল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইউরোপের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব না হোক, অন্তত সমতা বোধ করার মানসিক প্রয়োজনের কথা বঙ্কিম খোলাখুলি বলেছেন। অবশ্য বেদের মধ্যে তড়িৎ-শক্তি রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা অথবা স্কুলপাঠ্য পদার্থ-বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্রাহ্মণের টিকির ব্যাখ্যা করার মত মূর্খতা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শবাদের পরিবর্তনে—কোনও অজ্ঞাত কারণে তাঁর আস্তিক্যবাদে উত্তরণ এবং পুরুষানুক্রমিক ধর্মমতে প্রত্যাবর্তনের ফলে তিনি সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন। অন্তত একটি ক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহ্যে ইউরোপীয় জীবনধারার শ্রেষ্ঠ আদর্শের চেয়েও উচ্চতর আদর্শ আবিষ্কার করতে পেরে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। সৃজনশীল জীবনের শেষ দিকে এই নতুন আদর্শবাদের আলোকে তিনি ইউরোপের বিচার করেছেন এবং এক সময়ে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের যে সম্পদগুলিকে তাঁর প্রশংসনীয় মনে হয়েছিল, একান্ত ক্ষতিকর না হলেও নকল চাকচিক্যের জন্যই সেগুলিকে তিনি পরিহার করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)

উনবিংশ শতকের বাংলা সম্বন্ধে লেখা বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দর অবদান এবং ব্যক্তিত্বের একটি সুস্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়নি। ভারতবর্ষে যুগে যুগে সমাজের সর্বস্তরের লোক আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণায় প্রাচীন রীতি অনুসারে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস অবলম্বন করেছেন। হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর বিশেষ শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু উনবিংশ শতকের নবোন্মেষিত ধর্মভাবের বহিঃপ্রকাশ ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনচর্যার মধ্যেই সীমিত ছিল।

যাঁরা রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য হয়েছিলেন এবং পরে যথাবিহিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, বিবেকানন্দর নেতৃত্বাধীন এইসব যুবকের পারিবারিক পটভূমিকা নতুন জ্ঞানদীপ্তির প্রবক্তা অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিদের থেকে কিছুমাত্র আলাদা ছিল না।* আমলা, শিক্ষিত-বৃত্তিজীবী অথবা জমিদার শ্রেণীর সন্তান—এঁরা সকলেই বাংলার স্কুল কলেজে প্রদত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। প্রাচীন ঐতিহ্যের অন্তর্গত চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক চৈতন্যলাভের প্রেরণায় পিতা-পিতামহ অনুসৃত আরামপ্রদ পেশা পরিত্যাগ করে তাঁরা পূর্বপুরুষ ও সমকালীনদের থেকে আলাদা বলে প্রতিপন্ন হয়েছেন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে অভিজ্ঞ গুরুর অধীনে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুসরণ করলে চৈতন্যোদয় হবেই। পরমহংসের শ্রেষ্ঠ শিষ্যগণ ঐ প্রচলিত বিশ্বাসে পুরো আস্থা রেখে এক চূড়ান্ত বঞ্চনার জীবন বরণ করেছিলেন।

তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্যই তাঁদের অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে রেখেছিল। উনবিংশ শতকের বাংলার ধর্মজিজ্ঞাসা গড়ে উঠেছিল ধর্মপ্রাণতা, পার্থিব নীতিবোধ এবং সাংস্কৃতিক আত্মসচেতনতার সংমিশ্রণে। এদের মধ্যে শেষেরটির কারণ ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ইউরোপীয়দের হিন্দু ঐতিহ্যের সমালোচনা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেনের মত স্বল্প কয়েকজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বাদে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে জীবদ্দশায় ঈশ্বরের দর্শনলাভের কোন বাসনা ছিল না। এমনকি যে দুজন মনীষীর নাম করলাম, তাঁদেরও উদ্দেশ্য মধ্যবিত্ত জীবনের চার দেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাছাড়া তাঁদের ধর্মবোধ মানবিকতাবাদ এবং

* লাটু মহারাজ এঁদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম, পূর্বজীবনে তিনি বিহার থেকে আগত গৃহভৃত্য ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৎসংলগ্ন খ্রিস্টধর্মের উদার অংশেরই নামান্তর। বিবেকানন্দ এবং তাঁর সতীর্থদের সম্বন্ধে অবশ্য এই মন্তব্য একেবারেই অচল। আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণাতেই তাঁরা প্রাচীন ধর্মীয় রীতি গ্রহণ করেছিলেন সাংস্কৃতিক আত্মসচেতনতা অথবা সামাজিক-নৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্য বলেও তাঁদের এই প্রাচীন পন্থা অনুসরণকে ব্যাখ্যা করা যায় না। পাশ্চাত্যের জ্ঞানদীপ্তি তাঁদের প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারত না, তাঁরাও সে পথে যাননি। তাই বিবেকানন্দর মধ্যে আমরা এমন এক অবিসংবাদী দেশপ্রেমী ভারতীয়কে দেখি, যাঁর জীবনচর্যার মূল সুরটি হিন্দু ঐতিহ্যের তারে বাঁধা ছিল, সেখানে সমাজ বা রাজনীতির কোনও স্থান ছিল না। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাঁর ধারণা হয়েছিল যে সে যুগের প্রবল প্রতাপান্বিত পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের মধ্যে তাঁর উদ্দিষ্ট আধ্যাত্মিকতার পথে শিক্ষণীয় কিছুই নেই, বরং পাশ্চাত্যেরই তাঁর কাছে শেখা উচিত, এবং এই দৃঢ় প্রত্যয়ের পটভূমিকায় তিনি পাশ্চাত্য প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। দেশবাসীকে তিনি বলেছিলেন যে, আধুনিক যুগে ভারত যে সব ক্ষেত্রে স্পষ্টতই পিছিয়ে আছে, পাশ্চাত্যের কাছ থেকে শুধুমাত্র সেগুলিই শেখা উচিত। এখন যা একটি অর্থহীন বাগাড়ম্বরমাত্র, সেই "ভারতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের" দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি ইউরোপ এবং মার্কিন দেশের সভ্যতার মূল্যায়ন করেছিলেন। দেশে এবং বিদেশে, উভয়ত, সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠা তাঁর প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সে যুগের ইউরোপের আফ্রো-এশিয় সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে যে হীনম্মন্যতার সমস্যা দেখা দিয়েছিল, বিবেকানন্দর মধ্যে তার এতটুকু রেশ ছিল না, এবং হিন্দু আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের, বিশেষত যোগ এবং বৈদান্তিক দর্শনের শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর যে গভীর আস্থা তার মধ্যে ক্ষেত্রান্তরের দুর্বলতা পরিপূরণের কোন প্রচেষ্টা ছিল না। ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রায় পরিপূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে ভূদেব সাংস্কৃতিক আত্ম-প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছিলেন, আর বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন এক রহস্যময়, মনোগ্রাহী ঐতিহ্যের অনুসরণে, যে ঐতিহ্যে তিনি তাঁর কিছুটা অস্বাভাবিক প্রশ্নাবলীর উত্তর পেয়েছিলেন।

যে প্রশ্ন করে বিবেকানন্দ দেবেন্দ্রনাথের মত আরও অনেককে বিমূঢ় করে দিয়েছিলেন, তার ভাষাটা ছিল এই : "আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" শেষ পর্যন্ত "হ্যাঁ", এই উত্তর এসেছিল প্রায় নিরক্ষর এক সাধুর কাছ থেকে, যাঁর আধ্যাত্মিকতার মূল ছিল হিন্দু ঐতিহ্যে। ঊনবিংশ শতকে এরকম উত্তর অন্য কোথাও থেকে আসা সম্ভব ছিল না, উদার মানবিকতা বা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের তো প্রশ্নই নেই।

ঈশ্বরের সন্ধানে রত হিন্দু সন্ন্যাসীর রূপ বিবেকানন্দর বহুমুখী ব্যক্তিত্বের একটি দিক মাত্র। তাঁদের পরিবার ছিল বর্ণে কায়স্থ, বহু পুরুষ যাবৎ মুসলিম শাসকদের অধীনে কর্মরত এবং ঔপনিবেশিক যুগে সৃষ্ট নতুন বৃত্তিগুলিতে প্রথমকালীন অংশগ্রহণকারী। কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম তৈরি হবারও আগে তাঁর এক পূর্বপুরুষ বর্ধমান জেলার গ্রামের আদিনিবাস ছেড়ে নতুন রাজধানীতে চলে আসেন এবং কোনও এক সময় এই পরিবার আইনজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করে। বিবেকানন্দর প্রপিতামহ রামমোহন দত্ত কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে ওকালতি করতেন সম্ভবত ফার্সী 'ভকিল' হিসাবে, কারণ তখন পর্যন্ত শুধুমাত্র ইংরেজরাই 'অ্যাটর্নি' হতে পারতেন। একজন ইংরেজ অ্যাটর্নির অফিসে তিনি সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন।[১] প্রচুর অর্থসঞ্চয় করে তিনি বোধহয় কলকাতার নব্য ধনীদের মত ঝাড়লণ্ঠন, তৈলচিত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপকরণ নিয়ে বিলাস-বহুল জীবন যাপন করতেন।[২] অন্যান্য পূর্বপুরুষদের মধ্যে রাজীবলোচন ঘোষ কারও কারও মতে আলিপুরে কোম্পানির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। রাজীবের এক নাতি এবং অন্য এক আত্মীয়, গোপাল দত্ত, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রভৃতি পত্রিকা (পরে গোপাল এর সম্পাদনাও করেছিলেন), বেথুন সোসাইটি—নতুন জ্ঞানদীপ্তির এইসব প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৩] ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের এক বক্তৃতায় গোপাল বাঙালিদের মধ্যে যুক্তিবাদী মানসিকতার অভাব, এবং বাল্যবিবাহের সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যায় শিক্ষিতদের পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের সঙ্গে সমান বলে ঘোষণা করেছিলেন। বিবেকানন্দর মায়ের নিকট-জ্ঞাতি-ভাই, কৈলাস বোস, বাংলার নবজাগরণের এক স্বল্পপ্রভ ব্যক্তিত্ব।[৪] স্বামীজীর পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ তাঁর পিতার মতই সম্ভবত একটি অ্যাটর্নি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৫] তিনিও সংস্কৃত এবং ফার্সিভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে শিক্ষায় এবং বৃত্তিতে দত্তপরিবার ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগের প্রত্যক্ষ পরিণতি। সে যুগের সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত পরিবেশ পুরনো আরবি-ফারসি এবং সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের কাঠামোর মধ্যেই ছিল—প্রথমটি শাসন ব্যাপারে সর্বদাই কাজে লাগত। কিন্তু কলকাতার সিমলাপাড়ার দত্তরা অবিসংবাদীরূপে ঔপনিবেশিক যুগের এলিট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন,—তাঁরা ইউরোপীয় বৃত্তিজীবীদের সহায়তা করতেন, আবার জীবনযাত্রার খুঁটিনাটিতেও তাদের অনুকরণ করতেন।

বিবেকানন্দর পিতা বিশ্বনাথের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক কৃষ্টির সম্মোহন অনেক গভীরে পৌঁছেছিল। পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ বোধহয় কোনও পারিবারিক অশান্তির কারণে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।[৬] অবশ্য তাঁর জন্য কিশোর বিশ্বনাথের লেখাপড়ায় কোনও বিঘ্ন হয়নি। তিনি গৌরমোহন আড্ডির বিদ্যালয়ে (পরবর্তীকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি) ভর্তি হয়ে কলেজে ঢোকার আগে পর্যন্ত সেখানেই পড়েছেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার পর, পরপর দুজন ইংরেজ অ্যাটর্নির প্রতিষ্ঠানে আর্টিক্‌ল্‌ড্‌ ক্লার্ক হয়ে কাজ করেন। এই পরিবারে পাশ্চাত্য প্রথায় উচ্চশিক্ষার রেওয়াজ আগে থেকেই ছিল। বিশবনাথের জ্ঞাতি ভাই তারকনাথ সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন।[৭] ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি বিশ্বনাথকে অ্যাটর্নি এবং প্রোক্টররূপে কাজ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং অল্পদিন পরে তিনি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এই বৃত্তিতে তিনি বিপুল সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং প্রচুর রোজগার করে বিলাসিতায় গা ঢেলে দিয়েছিলেন। সে যুগে যে সব কৃতী বাঙালি দিল্লি, লখনউ, লাহোর, ইন্দোর, রায়পুর প্রভৃতি ভারত-সাম্রাজ্যের দূর দূর অঞ্চলে কর্মরত ছিলেন, বিশ্বনাথ তাঁদের অন্যতম। তিনি ভ্রমণ-প্রিয় ছিলেন, মনে হয় তাঁর সব পুত্রই পিতার এই গুণটি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। পাঞ্জাব অধিগ্রহণের পর যে সব অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী সেখানে বিচারকের কাজ করতেন, উর্দু ভাষায় পণ্ডিত বিশ্বনাথ তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। সেই সাহায্যের জন্য সম্পত্তি ও পদাধিকার ছাড়াও তিনি নানাভাবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠপুত্র, মার্ক্সবাদী ভূপেন্দ্রনাথ পিতার ইউরোপীয় বন্ধুদের নাম সপ্রশংস চিত্তে উল্লেখ করেছেন এবং মধ্যমপুত্র মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে পাঞ্জাবের বিচারকগণ তাঁর পিতাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন।[৮] সংক্ষেপে বলা যায় যে ঔপনিবেশিক শাসনের যুগে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বনাথ একজন খ্যাতিমান কৃতী ব্যক্তি ছিলেন ; নিজের কৃতিত্বে তিনি গর্ববোধ করতেন এবং বিদেশী শাসকের অধীনে চাকরি করায় তাঁর কোন ক্ষোভ ছিল না। বিবেকানন্দ যে পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসনেই তার সমৃদ্ধি এবং ব্রিটিশদের তাঁরা বন্ধুই মনে করতেন।

শিল্প-সংস্কৃতির দুটি ধারা বিশ্বনাথ আয়ত্ত করেছিলেন। সে যুগের আরও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মত তিনিও বহু-ভাষাবিদ্ ছিলেন। নিজের মাতৃভাষার বাইরে তিনি ইংরাজি, উর্দু, হিন্দি, আরবি, ফারসি এবং বলা বাহুল্য সংস্কৃত, জানতেন ; শোনা যায় ফারসি এবং উর্দু, এ দুটি ভাষা তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। 'দেওয়ান-ই-হাফিজ' তাঁর অতি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। ভারতে ঐস্লামিক সংস্কৃতির উত্তরকালের পীঠস্থান লখনউতে তিনি ভারতের মার্গ সঙ্গীতে তালিম নেন এবং বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। একপুত্র মুসলমান পীরদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করেছেন। কলকাতায় তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন মুসলমান। মোগল যুগের উত্তরকালের যে সারবাদী সার্বজনীন ঐতিহ্যের ধারা হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের শহরবাসীদের মাধ্যমে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রবহমান ছিল তিনি ছিলেন সেই পথের পথিক। আবার আচার-আচরণে তিনি ছিলেন হিন্দু ; সুদূর লাহোরে তিনি বারোয়ারী দুর্গা পূজা চালু করেছিলেন এবং হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ব্রাহ্মণদের প্রতি দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।[৯] কেউ কেউ তাঁকে হিন্দু রীতিনীতিতে অজ্ঞ বলে দোষারোপ করলেও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের মতে, তিনি টোলে সংস্কৃত এবং জ্যোতিষ শিখেছিলেন এবং নিষ্ঠা সহকারে শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা পাঠ করতেন। আর এক পুত্র তাঁর সারবাদী মানসিকতার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন যে প্রতিদিন গীতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাইবেল ও কোরাণও পড়তেন।[১০]

বিশ্বনাথকে যে নবপ্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল বলে গণ্য করা হয়েছে, হিন্দু আধ্যাত্মিকতার চেয়ে নিজের এবং সকলের ঐহিক সুখেই তাঁর বেশি স্পৃহা ছিল বলে যে মনে করা হয় তা বোধহয় ঠিকই। ভারতীয় মুসলমান পরিবারে যে সব ব্যঞ্জনাদি প্রচলিত ছিল সেসব তাঁর খুব পছন্দ ছিল ফলত নৈষ্ঠিক শুদ্ধতার ব্যাপারটি তিনি গ্রাহ্যই করতেন না। দেশ ভ্রমণের ফলে তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বহুবিধ কুসংস্কার সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন এবং সে যুগের মানসিকতা অনুযায়ী ঐসব প্রথার সমালোচনা করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ করার আন্দোলনকে তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন যে সবকটি সারগর্ভ ধর্মই বাইবেলে নিহিত আছে—তা সত্যি হতেও পারে, নাও হতে পারে, তবে একথা ঠিক যে প্রতিদিন তিনি বাইবেলের কিছু অংশ পাঠ করতেন। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে বিবেকানন্দর বাল্যকালে "লোকে", অর্থাৎ সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি উপনিষদ বা অদ্বৈত সম্বন্ধে কিছুই জানত না।[১১] বলা বাহুল্য, দত্তবাড়িতে ধর্ম বা কৃষ্টি বলতে যা বোঝাত, প্রচলিত ধর্মবোধের আওতায় তা পড়ত না। বিশ্বনাথের পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল হিন্দু-মুসলিম ও নব্য হিন্দু-ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণে। তা সত্ত্বেও প্রচলিত রীতিনীতি এবং পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম ও তজ্জনিত সরল-সহজ ধার্মিকতা থেকে তাঁরা বিচ্যুত হননি।

যেমন হয়ে থাকে, হিন্দু ধার্মিকতার ঐতিহ্য পরিবারের মহিলাদের মধ্যেই বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবল ছিল। শোনা যায় বিবেকানন্দর এক প্রপিতামহী এবং তাঁর কন্যা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত পৌরাণিক কাহিনীগুলি চর্চা করে তাদের মর্মার্থ বোঝবার চেষ্টা করতেন। শৈশবে মায়ের কাছে শোনা গল্পের মাধ্যমে হিন্দু ভক্তিবাদ এবং নৈতিকতার সঙ্গে বিবেকানন্দর পরিচয় হয়েছিল। বিদেশে বক্তৃতা দেবার সময় তিনি বারবার এইসব সহজ-সরল জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে উদাহরণ দিয়েছেন। মনে হয় গুরু বিবেকানন্দর মুখে শোনা ঐ সব গল্পগুলি নিয়ে নিবেদিতা *Cradle Tales of Hinduism* লিখেছিলেন।[১২]

তবে নতুন যুগের উদারতার হাওয়া দত্ত পরিবারের মহিলাদেরও ছুঁয়েছিল। বিশ্বনাথের মা 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী' নামে বড়সড় একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন,[১৩] তাতেই বোঝা যায় যে তিনি কতটা শিক্ষিতা ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ভুবনেশ্বরী একজন পাদ্রী মহিলার কাছে ইংরাজি শিখেছিলেন এবং বালক নরেন্দ্রনাথ মায়ের কাছেই প্রথম ইংরাজির পাঠ নিয়েছিলেন।[১৪] নিজের মেয়েদের মধ্যে একজনকে তিনি বেথুন কলেজের স্কুল বিভাগে ভর্তি করেছিলেন, আর একজনকে রামবাগানের মিশন স্কুলে। পাড়ায় একটি বিধবা-বিবাহের ঘটনায় প্রতিবেশীরা আপত্তি জানালে স্বামীর সঙ্গে ভুবনেশ্বরীও সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। নবোন্মেষিত জাতীয়তাবাদের হাওয়াও দত্ত পরিবারের মহিলাদের স্পর্শ করেছিল ; "ন্যাশনাল নবগোপালের" হিন্দু মেলায় তাঁরা অংশ নিতেন।[১৫] আবার বলি, বিবেকানন্দর শৈশবে তাঁদের গৃহে নব্য উদারতার হাওয়া বইত। অবশ্য বাঙালি পরিবারে অনুষ্ঠিত হিন্দু-রীতি নীতি এবং ধার্মিকতার সঙ্গে এই উদার মনোভাবের সহাবস্থান ঘটেছিল।

রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত যুবক বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অন্যান্যদের মতই ছিলেন। শোনা যায় যে মানসিক বৃত্তির স্ফূরণে তাঁর পিতার গভীর প্রভাব ছিল। পুরুষানুক্রমে চলে আসছে বলেই বিশ্বনাথ যে কোনও আদর্শকে বিশ্বাস করতে রাজী ছিলেন না এবং নরেনকে তিনি সবকিছু সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে উৎসাহিত করতেন। পিতাপুত্রের মধ্যে প্রবল তর্কাতর্কি হত এবং দত্তবাড়িতে যাঁদের আনাগোনা ছিল, সেইসব সাহিত্যিকদের সঙ্গে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাতেও বালক নরেন অংশ নিতেন।[১৬] যতই ভীতিপ্রদ হোক না কেন, মানুষ সম্বন্ধে কোনও কিছুকেই সমীহ করা নরেনের চরিত্রে ছিল না। তাঁদের "সিমলে পাড়ার" যুবকদের ভয়ানক নির্ভীকতা[১৭] তাঁর মানসিক গঠনকেও প্রভাবিত করেছিল, দেশে-বিদেশে সর্বত্র তর্কযুদ্ধে তিনি তার প্রমাণ রেখেছেন। পিতার কাছে তিনি যে সৌজন্যের শিক্ষা পেয়েছিলেন তা তাঁর মর্মে গাঁথা ছিল। পাশ্চাত্যদেশে গিয়ে তাঁর চমকিত হবার কোনও ঘটনা যদি ঘটেও থাকে, তা তিনি কাউকেই বুঝতে দেননি।[১৮]

পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে অবিশ্বাস্য মনোবল নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। এই আত্মবিশ্বাসের অন্যতম কারণ তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য এবং ক্ষুরধার বুদ্ধি। রেভারেন্ড উইলিয়ম হেস্টি (হিন্দুদের পৌত্তলিকতা সম্পর্কে যিনি প্রতিপক্ষরূপে বঙ্কিমের সঙ্গে পত্রযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন) লিখেছিলেন : "নরেন্দ্রনাথ সত্যিই প্রতিভা। তার মত দর্শনের ছাত্র জার্মানি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও বিরল।"[১৯] স্কুলের দুর্দান্ত দুষ্টু ছেলে হলেও কিন্তু নরেন পড়তে খুবই ভালবাসতেন। সেই সময় যে সব বিষয় তাঁর প্রিয় ছিল তা হল সংস্কৃত, ইংরাজি, ইতিহাস, বিশেষত ভারতের ইতিহাস, এবং পরে গণিত। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়াশোনার পরিধি দেখে তাঁর পিতার এক বিশিষ্ট পণ্ডিত বন্ধু বিস্মিত হয়েছিলেন।[২০] আধুনিক কালের দ্রুতপঠনপ্রণালীর মত কোনো কৌশল তিনি আয়ত্ত করেছিলেন যার সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলতে পারতেন এবং বহু তথ্য ও ভাবধারা মনের মধ্যে গেঁথে নিতেন।[২১]

ষোল বছর বয়সে বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং পরে স্কটিশ জেনারেল মিশনারি বোর্ড প্রতিষ্ঠিত জেনারল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। এই সময়ে তাঁর জ্ঞানের আগ্রহ এবং গভীরতা অসাধারণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তিনি নানা বিষয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করেন।[২২] স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে দর্শন এবং প্রাচীন ও আধুনিক যুগের ইউরোপের ইতিহাস তাঁর বিশেষ পাঠ্য ছিল, কিন্তু তাঁর পড়াশোনা এই পাঠ্যক্রমের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। শেক্সপীয়র, মিলটন, ওয়র্ডসওয়র্থ এবং বায়রনের উপর জোর দিয়ে পাঠ্যক্রমের ইংরাজি সাহিত্যও যথেষ্ট গুরুভার ছিল। এইসব কবি, বিশেষত মিলটন এবং ওয়র্ডসওয়র্থ, সারাজীবনই তাঁর অতি প্রিয় কবি থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর অন্যান্য প্রিয় গ্রন্থের মধ্যে ছিল *Pickwick Papers*, কার্লাইল-এর *Sartor Resartes* এবং *Hero and Hero-Worship*, এমার্সনের *Representative Man* এবং মজার ব্যাপার, জুলভার্ন-এর বিজ্ঞান বিষয়ক উপন্যাস। বহুদিন আগে, এমনকি বেশ কয়েক বছর আগে পড়া এইসব বই থেকে বড় বড় অনুচ্ছেদ তিনি সম্পূর্ণ মুখস্থ বলতে পারতেন। তাঁর রচনা পড়ে বোঝা যায় যে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট গ্রন্থগুলিতে তাঁর অনায়াস দক্ষতা ছিল। তাঁর যুগের সাহিত্যিক মানসিকতার যে বৈশিষ্ট্য—অবসরকালে সংস্কৃত এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা—তা তিনিও ভালবাসতেন। তাঁর যৌবনকালে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ এবং কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের অভ্যুত্থানে বাংলা সাহিত্য বিশেষ সমাদরের আসন লাভ করেছিল। শৈশব থেকেই তিনি এই প্রস্ফুটিত সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত এবং ঔপন্যাসিক দীনবন্ধু মিত্র তাঁদের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। সমসাময়িক এবং প্রাক্-আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য নরেন্দ্রনাথ ভালমতই পড়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যপ্রীতির মধ্যে কিছুটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল, যাকে শুধুই মনের খেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বন্ধু গিরীশ ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' পড়ে তিনি যে আনন্দ পেতেন শেক্সপীয়র পড়ে তা পেতেন না বলে তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন। ঠাকুর পরিবার সম্বন্ধে তিনি যে নিবেদিতাকে সতর্ক করেছিলেন, "এই পরিবার ইন্দ্রিয়রসের বিষ বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দিয়েছে",[২৩] সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্যের বিচার করতে হবে। এক পাপীর সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রাচীন নীতিকথামূলক কাহিনীকে ঘিরে গড়ে ওঠা গিরীশ ঘোষের নাটকীয় উপাখ্যানের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল এই সাধুপুরুষ মানুষটির কাছে। সেই তুলনায় সমসাময়িক কবিবরের রোম্যান্টিক কবিতা তাঁর মনকে স্পর্শ করতে পারেনি এবং রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব তাঁর কাছে পৌরুষহীনতার নামান্তর। পৌরুষহীন জাতির পক্ষে এইগুলি আরও ক্ষতিকর বলে তিনি মনে করতেন। সারবাদী আদর্শ এবং বহুমুখী চিন্তা সত্ত্বেও, মূলত বিবেকানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী, ঈশ্বরের সাধনারত ব্যক্তি এবং নবজীবনপ্রাপ্ত ভারতের স্বপ্নদেখা এক আধ্যাত্মিক নেতা, পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের যে সব অবদানে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহিত হয়েছিলেন, এইসব মৌলিক চিন্তা প্রায়শই সেগুলিকে আচ্ছাদিত করে ফেলত।

কিন্তু তাঁর চিন্তার বিশাল জগৎ, জীবনের প্রতি আগ্রহের বিভিন্ন প্রকাশ—এগুলিকে তুচ্ছ করা যায় না। দর্শনের পরই তাঁর প্রিয় পাঠ্য বিষয় ছিল ইতিহাস, মনে হয় ইতিহাস-অনুরাগ তিনি পেয়েছিলেন পিতার কাছ থেকে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোগল যুগ সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল এবং ঐ সাম্রাজ্যের যুগে মহান স্থাপত্যশিল্পগুলি নিয়ে তিনি একধরনের রোম্যান্টিক গর্ববোধ করতেন। উনবিংশ শতকের বিভিন্ন দেশাত্মবোধক সাহিত্যের উপাদান টডের 'অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিক্যুইটিজ অফ রাজস্থান' *(Annals and Antiquities of Rajasthan)*-এর মত বিশাল বইয়ের অনেক অংশই তাঁর মুখস্থ ছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চা তখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। কিন্তু, সাহিত্য এবং ধর্মশাস্ত্রীয় উপাদান সমূহে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ফলে ভারতে আগমনকারীদের নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির আদর্শ ও বিবর্তনের ধারা প্রভৃতি বহু বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্য তাঁর বহু রচনায় ও বক্তৃতার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। ধ্রুপদী যুগের ইউরোপ, প্রাথমিক যুগের ইসলাম, আধুনিক ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস থেকে আশ্চর্যরকম বিচিত্র সব উদাহরণ দিয়ে তিনি ইতিহাসের গতি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন।

বিবেকানন্দর ইউরোপের ইতিহাস পঠন শুধুমাত্র জানার আগ্রহতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মহান সভ্যতার অবক্ষয়, সামাজিক বিপ্লব এবং বড় বড় বীরদের জীবনীতে তিনি বিশেষ আগ্রহ বোধ করতেন। গভীর আগ্রহ নিয়ে তিনি গিবনের রচনা পড়েছিলেন, বোধহয় তার মধ্যে তিনি নিজের দেশের ভুলত্রুটিগুলির ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। যে প্রাচীন সভ্যতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছিল, ম্যাসপেরোর লেখা সেই ইজিপ্টের ইতিহাসও তিনি বিশেষ আগ্রহসহকারে পড়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়ঁর যুগের ইতিহাস তিনি বিশদভাবে পড়েছিলেন। নেপোলিয়ঁ এবং তাঁর সেনাপতি মার্শাল নে তাঁর কাছে পুরুষোচিত গুণের মূর্ত প্রতীক আদর্শ পুরুষ ছিলেন এবং তিনি চাইতেন যে তাঁর দেশবাসী সেই গুণগুলি আয়ত্ত করুক। ভারতীয় জীবনের নির্জীবতায় তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন এবং কে জানে, ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের মধ্যে তিনি তাঁর নিজের দেশের সঙ্কটের মুক্তি খুঁজছিলেন কি না। সমকালীন আরও অনেকের মতই তিনিও নিঃসন্দেহে ইউরোপের ইতিহাসের মধ্যে ভারতের সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে চেয়েছিলেন। আমরা দেখব যে, পশ্চিম সম্বন্ধে তাঁর প্রশংসাবাণীগুলি অত্যন্ত সাবধানী, তবে এটাও ঠিক যে তিনিও পাশ্চাত্যের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে চেয়েছিলেন। সেইজন্যই পশ্চিমের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর নিরন্তর প্রশ্ন ছিল এবং বিভিন্ন দিক থেকে তিনি তা বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন। পাঠ্যতালিকায় গ্রীণের ইংরাজ জাতির ইতিহাস এবং অ্যালিসনের ইউরোপের ইতিহাসের মাধ্যমে তাঁর অতীতকালের ইউরোপ সম্বন্ধে ভালই ধারণা হয়েছিল। সারাজীবনের বিস্তৃত পড়াশোনার মাধ্যমে ঐ মৌলিক ধারণাগুলিকে তিনি সমৃদ্ধ করেছিলেন।

ঈশ্বরপ্রীতি, দেশপ্রেম অথবা চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সন্ধানের মধ্যে অবশ্য

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর সমস্ত বৌদ্ধিক এবং নান্দনিক চর্চার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তাঁর উচ্ছল প্রাণশক্তি তাঁকে নানাদিকে ধাবিত করেছিল। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সেই প্রাণশক্তির একটি প্রকাশ। যে সব বিষয় তিনি পড়তে ভালবাসতেন, তার মধ্যে ছিল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি এবং সমাজতত্ত্ব, একসময়ে আবার প্যাথোলজি, প্রাণিতত্ত্ব এবং শারীরতত্ত্ব। গণিত সম্বন্ধে অল্প বয়সের অপছন্দ তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন এবং স্নাতক শ্রেণীতে উচ্চতর গণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। ডেট্রয়েট-এর 'ইভনিং নিউজ' কাগজে নৈশ্যভোজের পর একটি প্রশ্নোত্তরের আসরের বিবরণে দেখা গেছে, কি কারণে বলা যায় না, যে, হিন্দু সন্ন্যাসীর কাছে রসায়ন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ্যতালিকা চাওয়া হয়েছিল। এই অস্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তরে বিবেকানন্দ সঙ্গে সঙ্গে দুটি দীর্ঘ তালিকা দিয়ে দেন।[২৪] ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে 'নিউ ইয়র্ক মেডিক্যাল টাইম্‌স্‌'-এ প্রকাশিত, অধুনা বর্জিত ইথারতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পরিচয়হীন রচনায় সমসাময়িক পদার্থবিদ্যা বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়ে গেছে।[২৫] সবসময়ে যে তিনি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়েই পড়তেন, তাও নয়। তিনি ভোজনরসিক ছিলেন এবং পিতার মতই নিজে খুব ভাল রাঁধতেও পারতেন। ভাই মহেন্দ্র একবার কলকাতার এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কেনা তাঁর বইয়ের তালিকা দিয়েছেন, তার মধ্যে ছিল 'সোলজার্স পকেট ড্রিল বুক' এবং একটি ফরাসী পাক প্রণালী। শেষেরটিকে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করাও হয়েছিল।[২৬] যখন তিনি সন্ন্যাসীর চিরাচরিত তৈজসপত্র—লোটা-কম্বল এবং ঝোলা নিয়ে পরিব্রাজক, সেই সময়ে বেলগাঁও-তে তাঁর সঙ্গে হরিপদ মিত্রের দেখা হয়েছিল। হরিপদবাবু ঝোলাতে একটিই মাত্র জিনিস দেখতে পেয়েছিলেন, তা হল ফরাসী সঙ্গীত বিষয়ক একটি বই।[২৭] দ্বিতীয়বার ইংলন্ড ভ্রমণের সময়ে ফরাসীদেশ সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল আরও বেড়ে গিয়েছিল। গৃহস্বামিনী কুমারী ম্যুলারের কাছে তিনি ফরাসী ভাষা শেখেন এবং ভাই মহেন্দ্রর মতে, ঐ ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলতে পারতেন।[২৮]

নরেন্দ্রনাথের আগ্রহ ভারতীয় সংস্কৃতির শুধুমাত্র ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সন্ন্যাসীর আদর্শে ব্রতী হওয়া সত্ত্বেও কালিদাসের আবেগধর্মীকাব্য তাঁকে মোহিত করত। কবির তিনটি প্রধান রচনা—'কুমারসম্ভবম্‌', 'মেঘদূতম্‌' এবং 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌' তাঁর মুখস্থ ছিল।[২৯] ভারতীয় ভক্তিসঙ্গীতে তাঁর দক্ষতার কথা সকলেই জানেন, কিন্তু সঙ্গীত-শিক্ষার আগ্রহের মধ্যে ধর্মের ছিটেফোঁটাও ছিল না। ভারতীয় শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের বিভিন্ন ঘরানার বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমান ওস্তাদের কাছে যন্ত্র এবং কণ্ঠসঙ্গীতে তিনি তালিম নিয়েছিলেন। মুসলিম পরবে গাওয়া হিন্দি, উর্দু এবং ফারসি গান তিনি মুসলমান ওস্তাদদের কাছে শিখেছিলেন। অন্য আরেকজনের সঙ্গে তিনি ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি বই লিখেছিলেন, সে বইটির অনেকগুলি সংস্করণ হয়েছিল। শোনা যায় যে তিনি খুব ভাল নাচতেও পারতেন, তবে কোন রীতিতে নাচতেন তা জানা যায় না। ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সারগ্রাহী বিষয় সঙ্গীতে দক্ষতার ফলে তাঁর ইউরোপ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়ার দু রকমের তাৎপর্য লক্ষ করা যায়। এদেশে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নান্দনিক মূল্যায়ন শুধুমাত্র সাহিত্যে, বিশেষত ইংরাজি সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। ভারতের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার আপেক্ষিক সঙ্কীর্ণতা এবং শহুরে বাঙালি মধ্যবিত্তের চিন্তার স্বল্পপরিসর জগৎ সাধারণ ভাবে কিছুটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরশ্রীকাতর মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল। এমন কি সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ বাঙালিরাও শুধুমাত্র নৈতিক বিচারবোধ, ইতিহাসের উদাহরণ এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি খুঁজে বার করতেই ব্যস্ত থাকতেন, নিছক আনন্দলাভের জন্য ইউরোপীয় সাহিত্যপাঠ করাটাই এই প্রচলিত ধারার একমাত্র ব্যতিক্রম বলা যায়। বিবেকানন্দর পাশ্চাত্য ঐতিহ্য মন্থনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল, সন্দেহ নেই, তবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা এবং রসাস্বাদনের ফলে যে বিচিত্র অনুভূতি হয়েছিল তা কেবলমাত্র উপদেশমূলক বা দেশাত্মবোধক নয়। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের বুননে সমৃদ্ধ, সৌভাগ্যক্রমে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতসাধকেরা নিজেদের অন্যান্য সংস্কৃতির সমতুল বা শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ করার ন্যক্কারজনক প্রচেষ্টা থেকে বিরত ছিলেন। বিবেকানন্দর দক্ষ শ্রবণেন্দ্রিয় পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মধ্যে এক উচ্চস্তরের অনুভূতির সন্ধান পেয়েছিল।[৩০] তাঁর আনন্দময়, প্রাণময় সত্তা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে যা পেয়েছিল, গভীরভাবে তার রসাস্বাদন করেছিল। পরাধীনতার গ্লানি এবং তজ্জনিত ছিদ্রান্বেষণের প্রবণতা সেই আনন্দকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি।

নরেনের কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলি নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে—একদিকে ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক ঐকান্তিকতা, অন্যদিকে যে পারিপার্শ্বিকে তিনি মানুষ হয়েছেন তার আনুষঙ্গিক পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা। স্নাতক হওয়ার পর তিনি পিতৃবন্ধু অ্যাটর্নি নিমাইচন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠানে আর্টিকল্‌ড ক্লার্করূপে যোগদান করেন। সেই সময়ে তিনি আইনের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রও ছিলেন। পিতা তাঁর বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হবার উচ্চাশার প্রেরণাদাতা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পারিবারিক সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় তিনি যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তাতে আইনজীবীরূপে তিনি যে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে পারতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ জীবনে সুযোগ লাভের জন্য তাঁর পিতা ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে ফ্রিম্যাশন সংস্থার সভ্য করে দেন। তখনকার দিনে জীবনে উন্নতি করার আশায় ভারতীয়রা অনেকেই ওই সংস্থায় যোগদান করতেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে তাঁদের পরিবার দারিদ্র্যকবলিত হয়ে পড়ায় নরেনকে অ্যাঙ্কর এবং হোপ লজের সদস্যপদ, এমনকি বিলেতে গিয়ে পড়াশোনার আশাও পরিত্যাগ করতে হয়।[৩১]

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সংসারজীবন পরিত্যাগ করার সঙ্কল্প নেওয়ার আগে পর্যন্ত নরেন তাঁর পিতা-পিতামহের অনুসৃত জীবনধারা গ্রহণ করতেই প্রস্তুত ছিলেন ; সত্যি কথা বলতে কি, ব্যারিস্টার হয়ে তিনি তাঁদের থেকেও বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। তা সত্ত্বেও তাঁর সমস্ত পার্থিব চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এমন একটি নিরন্তর জিজ্ঞাসা, যা একজন ভাবী বিশিষ্ট আইনজীবীর উপযুক্ত নয়। কলেজে তাঁর সবচেয়ে পছন্দসই বিষয় ছিল দর্শন ; কিন্তু তখন বা পরে, কোনসময়েই সেই ভালবাসা পরীক্ষায় ভাল করবার বাসনার সঙ্গে এক ছিল না। তাঁর প্রিয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের রচনার মধ্যে তিনি অস্তিত্বের মৌল সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজতেন।

নরেনের দর্শনচর্চার ভিত্তি ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য।[৩২] ভারতীয় দর্শন এবং ধর্মসাহিত্যের প্রধান প্রতিটি ধারা—হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন—সম্বন্ধে তাঁর কি গভীর জ্ঞান ছিল তা তাঁর রচনা পড়লেই বোঝা যায়। অবশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলেজে ছাত্রজীবনে জীবনের অনুক্ত রহস্যগুলির উত্তর তিনি খুঁজেছিলেন পাশ্চাত্য দর্শনে। যে সব দার্শনিকের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন, অথবা যাঁদের রচনা তিনি বারবার পড়েছেন, তাঁর জীবনীকারগণ সেই সব দার্শনিকের নামের দীর্ঘতালিকা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্লেটো, কান্ট, হেগেল, সোপেনহাওয়ার, লক, মিল, হিউম এবং স্পেন্সার। উবেরওয়েগ-এর 'হিস্ট্রি অফ ফিলজফি' এবং হ্যামিলটনের 'মেটাফিজিক্স'ও তাঁর পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর কোনও কোনও দার্শনিক রচনায় ডারউইনের বিবর্তনবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৩] বিবেকানন্দর পরিচয়প্রদান প্রসঙ্গে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসিক্স্ বিভাগের অধ্যাপক রাইট বলেছিলেন, "তাঁর পাণ্ডিত্য আমাদের সকলের মিলিত পাণ্ডিত্যের চেয়েও বেশি।"[৩৪] রাইটের সহকর্মীরাও স্বামীজীকে নিজেদের তুল্যই মনে করেছিলেন, কারণ তাঁকে তাঁরা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অধ্যাপকের পদ প্রদান করতে চেয়েছিলেন।

বিবেকানন্দর আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ এবং দর্শন চর্চা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তাঁর সমসাময়িক দার্শনিক এবং বহুদর্শী পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দেখিয়েছেন "একটি প্রচণ্ড গতিশীল তরুণকে—দর্শন যাঁকে তৃপ্ত করতে পারছে না, জ্বালাময় আকাঙ্ক্ষায় যিনি জীবনপ্রশ্নের সমাধান চাইছেন, উর্ধ্বশ্বাস ধাবিত সন্ধানে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন পদে পদে, যাঁর আপসহীন প্রতিজ্ঞা—সত্যকে জানব তত্ত্বে নয়, প্রত্যক্ষে, এই দেহে, অনস্বীকার্য আগ্নেয় অস্তিত্বে।"[৩৪] ধর্মজীবনে বিবেকানন্দ যৌবনের প্রারম্ভে বাড়ির সাধন-ভজনের পরিবেশ থেকে শুরু করে প্রচলিত রীতি-বিরোধী গোঁড়া ব্রাহ্ম মত পর্যন্ত চর্চা করেছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতকের যুক্তিবাদে দীক্ষিত হওয়ায় ব্রাহ্মসমাজের বহির্বৃত্ত থেকে শেখা বাল-সুলভ আস্তিক্যবাদ এবং সরল আশাবাদ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং মঙ্গলময় ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃতির অমঙ্গল এবং মানুষের পাপের সমন্বয়ের অভাব এবং কার্যকারণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় যুক্তির অসারতা তাঁর সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মিলের 'থ্রি এসেজ অন রিলিজন' পড়ে। হিউম এবং কিছুদিন পরে স্পেন্সার-এর 'দ্য সায়েন্স অফ দ্য ফার্স্ট প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্'-এর অজ্ঞেয় তত্ত্ব পড়ে তাঁর অবিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ়তর হয়েছিল এবং সেই অবিশ্বাস ক্রমশ দার্শনিক সংশয়বাদে পরিণত হয়েছিল। পুরোহিততন্ত্রে তাঁর ঘোরতর অবিশ্বাস এবং ভারতের ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে আপত্তিও হয়ত স্পেন্সারেই প্রভাবেই সৃষ্ট হয়েছিল। বৌদ্ধিক বিকাশের এই পর্বে যদিও তিনি মিল ছাড়াও হেগেল এবং সোপেনহাওয়ারের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, তথাপি স্পেন্সারকেই তিনি গুরু বলে মেনেছিলেন। ওই দার্শনিকের রচনা 'এডুকেশন' গ্রন্থটির তিনি অনুবাদ করেন এবং শোনা যায় যে একটি চিঠিতে লেখা তাঁর কয়েকটি প্রশ্নও স্পেন্সার মেনে নিয়েছিলেন।[৩৬] পরম সত্তায় বিশ্বাস ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ায় নরেন প্রচলিত নৈতিকতার উপর বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেন। কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদ তাঁর অস্থিরতায় সাময়িক স্বস্তি দিয়েছিল বটে, তবে তাঁর মত গভীর ভাবাবেগপূর্ণ এবং আস্তিক্যবাদী পরিবেশে গড়ে ওঠা যুবকের কাছে সংশয়বাদ নিতান্তই দুর্বল একটি তত্ত্ব।[৩৭] সমসাময়িক পণ্ডিতপ্রবর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কাছে তিনি আস্তিক্যবাদী দর্শনের একটি পাঠ্যতালিকা চেয়েছিলেন। শীল তাঁকে স্বজ্ঞাবাদী (Intuitionists) এবং স্কটিশ 'কমন সেন্স স্কুলের' রচনাবলী পড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এদের চলনসই যুক্তিতে নরেন সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তা ছাড়া শীলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতে, বৌদ্ধিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেতাবী বিদ্যায় নরেনের আপত্তি ছিল। যুক্তি-পরম্পরা এবং তর্কের পরিবর্তে অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি নিজের বিশ্বাস গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। শীল তখন তাঁকে শেলী পড়তে বলেন। কবির সর্বেশ্বরবাদ এবং 'মানবিকতার সহস্রাব্দের স্বপ্ন' নরেনের কাছে আধ্যাত্মিক ঐক্যের নীতিরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। কবির *Hymn to the Spirit of Intellectual Beauty* তাঁকে যেরকম অনুপ্রাণিত করেছিল, কোনও দার্শনিক গ্রন্থই তা পারেনি। তাঁর নবীন শিক্ষাগুরু নরেনকে তাঁর নিজস্ব দার্শনিক মতবাদে সাময়িকভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। এই মতবাদ যুক্তির বিশ্বজনীন প্রভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ; যার ফলে ব্যক্তির নিজস্ব নৈতিক বোধ বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ বিশ্বের এক এবং অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তু ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বৌদ্ধিক চেতনা। এই মতবাদ সংশয়বাদ এবং জড়বাদ থেকে পরিত্রাণ পাইয়ে দিলেও কিন্তু যুক্তিবাদের জয়যাত্রায় তাঁর অন্তরের মূল দ্বন্দ্বগুলির সমাধান হয়নি।

এই পরিচ্ছেদের সূচনায় যে বলেছি, বিবেকানন্দর ব্যক্তিত্বের একটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে আলোচনা করা হয়নি, তার পুনরুক্তি করে আবার বলছি, সবকিছুর উপরে তিনি ছিলেন ভারতীয় ঐতিহ্যের এক বিশেষ পথ ধরে পরম সত্তার সন্ধানরত এক রহস্যময় পুরুষ। এই অন্বেষণকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবন আবর্তিত হয়েছিল এবং এর থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও কিছুই করার কথা তিনি ভাবেননি। ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের কাছে এ এক নিদারুণ সমস্যা। ফিশার যে বলেছেন যে ইতিহাস ঈশ্বরের আলোচনার স্থান নয়, সেই মতবাদ এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, কারণ এই আলোচনার নায়ক দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন যে তাঁর গুরু ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং যে কোনও সাধারণ মানুষও সেই অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। 'রাজযোগ' প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেবার সময় বিবেকানন্দ যে অপার্থিব অনুভূতির কথা বলতেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-প্রসূত। এইসব বিষয়ে প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে জড়িত অতিপ্রাকৃতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যাক্সমূলার যে "dialogic process"-এর কথা বলেছেন, যার মাধ্যমে যে কোনও বস্তুগত সত্তা বা অভিজ্ঞতাকে অতিপ্রাকৃত বিষয়ে রূপান্তরিত করা যায়, তাঁর মতে "আমরা এমন কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার কথা জানিনা যা এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে আসেনি।"[৩৮] কিন্তু বিবেকানন্দর নিজের এবং তাঁর গুরুর অভিজ্ঞতার অর্ধোক্ত বিবরণ এই দ্বিযৌক্তিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার বিবেকানন্দর অভিজ্ঞতাকে অমূলক বলে উড়িয়ে দেবার ইচ্ছা শেগেলের অত্যধিক হোমার প্রীতি সম্পর্কে গ্যোটের মন্তব্যের সমতুল্য। বিবেকানন্দর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর অনুভূতিতে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের প্রতিক্রিয়া বোঝবার জন্য বিবেকানন্দর নিজের এবং তাঁর গুরুর ধর্মজীবন সম্বন্ধে তাঁর যা বিশ্বাস, এই অধ্যায়ে আলোচনার জন্য সেটুকু জানাই যথেষ্ট। সংগৃহীত উপাদান থেকে তখনকার সামাজিক পটভূমিকা এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ যা তাঁর ধর্ম সম্বন্ধীয় অনুসন্ধিৎসাকে বুঝতে সাহায্য করে, তাও নীচে আলোচনা করা হল।

তরুণ নরেন্দ্রনাথের সন্ন্যাস নেবার পিছনে তাঁর বাল্য এবং কৈশোরের কোনও কোনও ঘটনার প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে, তবে শেষকালে একমাত্র রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রভাবেই তিনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদের কাঠামোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে বাঙালি বুদ্ধিজীবী মানসিকতার উপর এই প্রায়-নিরক্ষর সন্ন্যাসীর প্রভাবের নানা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাঁর মত ও প্রভাব সম্বন্ধে একটি সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধের লেখক[৩৯] বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে ব্রিটিশ শাসনে দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা ও পরবর্তী পর্যায়ে উগ্র জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানের মধ্যেকার অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অনিশ্চিতের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরমহংসের রহস্যময় বাণীর মধ্যে কিছুটা শান্তির আশ্বাস পেয়েছিল, নিজেদের ঐতিহ্যগত ধর্মবিশ্বাসে কিছুটা আস্থাও ফিরে পেয়েছিল। শিষ্য সারদানন্দ গুরু রামকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলে মানতেন এবং যে সব পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ভারতীয় যুবক যুক্তিভিত্তিক সংশয়বাদ এবং ধন-মান-প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষার অলিগলিতে পথ হারিয়েছিলেন, তাঁদের হিন্দু অধ্যাত্ম-ধর্মপথে ফিরিয়ে আনার বিশেষ উদ্দেশ্যেই তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করতেন।[৪০] সত্যিই যদি পথভ্রষ্ট ভারতীয় যুবককে পাশ্চাত্য-দর্শন এবং ঐহিকতাবাদের মোহ থেকে ফিরিয়ে আনা রামকৃষ্ণদেবের সচেতন অথবা অচেতন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে বলা বাহুল্য যে পাশ্চাত্য ঐতিহ্য সম্বন্ধে স্বামীজীর প্রতিক্রিয়া বুঝতে গেলে তাঁর উপর রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবের প্রসঙ্গটি খুবই জরুরি।

ঊনবিংশ শতকের বাংলা সমাজ নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনবৃত্তান্ত তাঁদের সকলেরই জানা আছে। বিবেকানন্দর নির্দেশনায় সারদানন্দের লেখা একটি খসড়ার[৪১] উপর নির্ভর করে ম্যাক্সমূলার সাহেব পাশ্চাত্যের পাঠকদের জন্য প্রথম *Nincteenth Century* পত্রিকায় একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের আকারে এবং পরে অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে রামকৃষ্ণদেবের জীবনী প্রকাশ করেন।[৪২] শিষ্য এবং বন্ধুদের দ্বারা উদ্ধৃত রামকৃষ্ণদেবের অনেক বাণী তো আছেই, তা ছাড়া, তাঁর গুরুদেবের জীবন সম্বন্ধে বিবেকানন্দের যা ধারণা ছিল, ম্যাক্সমূলার-কৃত পরমহংসের জীবনীকে তারই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যায়। ঐ বইতে পাওয়া তাঁর অধ্যাত্মসাধনার বিকাশের বিবরণ তৎসহ তাঁর জীবনের অকাট্য ঘটনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া এখানে দিচ্ছি।[৪৩]

১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার অনতিদূরে একটি গ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়; তিনিই পরে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর একটি টোল ছিল। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে গদাধর তাঁর সঙ্গে কলকাতায় আসেন। কোনরকম "কার্যকরী শিক্ষা" গ্রহণ করা গদাধরের ধাতে ছিল না। ফলে তাঁর লেখাপড়া শেখা অক্ষর পরিচয় পর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। রামকুমার যখন তাঁর জন্য রানি রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পূজারীর পদ ঠিক করেন, নৈষ্ঠিক গদাধর তাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন, কারণ রানি ছিলেন নিম্নবর্ণজাতা এবং তাঁর অধীনে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা অনাচার বলে গণ্য হত। শেষ পর্যন্ত তিনি মত পালটিয়ে রাজী হন এবং ১৮৫৫-৬ খ্রিস্টাব্দে "মা" কালীর মন্দিরের পুরোহিত হন। অনতিকালের মধ্যেই "মায়ের" সঙ্গে তাঁর নিয়মিত কথাবার্তা চলতে থাকে। তাঁর আত্মসংশয়কে পাগলামীর লক্ষণ মনে করে কিছুদিন চিকিৎসা করানোর পর পাঁচ বছরের বালিকা সারদার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। তাঁকে রামকৃষ্ণ যৌনসম্পর্ক বিরহিত জীবনের অংশীদার করে নিয়েছিলেন। ১৮৬১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার পাগলামির লক্ষণ দেখা দেওয়ার পর জনৈকা রহস্যময়ী সন্ন্যাসিনী-ভৈরবী রামকৃষ্ণকে খুঁজে বার করে তান্ত্রিক রীতিতে দীক্ষা দেন। পরে রামকৃষ্ণ তন্ত্রসাধনাকে পরম ব্রহ্মজ্ঞানের এক অপরিচ্ছন্ন পথ বলেছেন। ১৮৬৪-৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সন্ন্যাসী তোতাপুরীর দর্শন লাভ করে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর রহস্যময় আচরণ এসময়ে এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে—ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম সমেত সমস্ত দেশী ও বিদেশী ধর্মের বিশ্বাস অনুসারে তিনি ঈশ্বরের সন্ধান করেন। মাঝে মাঝেই তাঁর সমাধি হয় এবং তিনি অলৌকিক দৃশ্য দেখতে থাকেন। অদ্ভুতভাবে তিনি সাধু-সন্ন্যাসী এবং দেবদেবীদের দেখতে পেতেন। খ্রিস্ট বা মহম্মদ বা চৈতন্য—যাঁর জ্যোতির্ময় মূর্তি তিনি দেখতে পেতেন, সেই মূর্তি ক্রমশ তাঁর দেহে বিলীন হয়ে যেত। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি জুড়ে বিরাজ করছে ব্রহ্মের পরম অখণ্ড সত্তা, তিনি যে বেদান্তের এই মর্মবাণী উপলব্ধি করেছিলেন এই 'দর্শনে'র মধ্যে তা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র পড়ে বেদান্তের জ্ঞান অর্জন করেননি, যে সব সাধু-সন্ন্যাসীকে তিনি দেখেছিলেন, তাদের মুখ থেকে শুনে শুনেই শিখেছিলেন। মধ্যযুগের সাধুদের দ্বারা প্রবর্তিত উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলন সম্বন্ধেও তাঁর পরিষ্কার ধারণা ছিল, তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাস ছিল যে সবকটি প্রধান ধর্মমত নির্দেশিত রহস্যময় পথ পরিক্রমা করেই তিনি পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করেছিলেন। সব ধর্মমতেরই উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে পাওয়া এবং সেই কারণে পথ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সব ধর্মেরই উদ্দেশ্য এক—নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় পরমহংসদেব এই প্রাচীন নীতিসূত্রে অন্তর্নিহিত সত্যটি উপলব্ধি করে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

১৮৫৫-৬ থেকে ১৮৭৪—প্রায় দুই দশক ধরে ঈশ্বরের অবতার রূপে রামকৃষ্ণের খ্যাতি দক্ষিণেশ্বর এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। শহুরে বুদ্ধিজীবীরা তখন বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলনে আন্দোলিত হচ্ছিলেন, দক্ষিণেশ্বরের সন্ন্যাসীর খবর রাখার সময় তাঁদের ছিল না। রামকৃষ্ণের পরিচিতদের মধ্যেও তাঁকে নিয়ে মতবিরোধ ছিল। অনেকেই তাঁকে পাগলাটে, এমনকি একেবারেই বিকৃতমস্তিষ্ক বলে মনে করতেন। এমনকি পরেও তাঁর শিষ্যদের অনেক সময়েই এইসব অবিশ্বাসীদের মোকাবিলা করতে হয়েছে।

১৮৭৫-এ রামকৃষ্ণ ব্রাহ্ম নেতা কেশব সেনের সঙ্গে দেখা করেন। কেশব তখন কলকাতার পাশ্চাত্য-শিক্ষিত যুবকদের, বিশেষত যাদের একটু ধর্মঘেঁষা মনোভাব, তাদের আদর্শ ছিলেন। প্রথমে কিছুটা অবিশ্বাসের মনোভাব থাকলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি রামকৃষ্ণের দিব্যভাব উপলব্ধি করেন এবং তারপর দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় হৃদ্যতা জন্মায়। ব্রাহ্ম পত্র-পত্রিকায় রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কেশবের রচনা কলকাতায় অনেকের মনেই কৌতূহল সৃষ্টি করে এবং অচিরেই দক্ষিণেশ্বরে দর্শনপ্রার্থীর ভিড় জমতে থাকে। অনেকেই হয়ত নিছক কৌতূহলবশে, অনেকে আবার তাচ্ছিল্যের মনোভাব নিয়ে যেতেন, কিন্তু বেশিরভাগই যেতেন তাঁকে ভজনা করতে। শেষোক্তদের মধ্যে একদল আদর্শবাদী যুবক ছিলেন, নরেন্দ্রর নেতৃত্বে তাঁরা পরে রামকৃষ্ণের শিষ্য হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর দীক্ষিত সন্ন্যাসীরূপে তাঁরা ঈশ্বরের সন্ধানে নিরত হলেন এবং পরে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরূপে তাঁর আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। জীবিতকালেই রামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার বলে পূজিত হন এবং

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৮৬-তে তাঁর মৃত্যুর কদিন আগেকার একটি ঘটনায় বোঝা যায় যে বিবেকানন্দও সেইরকমই বিশ্বাস করতেন।[৪৪] হিন্দুধর্ম ও রামকৃষ্ণ বিষয়ক একটি প্রবন্ধে[৪৫] তিনি স্পষ্টভাষায় লিখেছেন যে রামকৃষ্ণ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অবতার এবং কালপ্রবাহে ভারতের যে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়েছে, মানবজাতির পক্ষে তা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব,—নিজের জীবনে এই সত্য প্রমাণ করবার জন্যই তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

অন্যান্য অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবকের মত কেশব সেনের অনুগামী, তরুণ, ব্রাহ্ম নরেনের রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ এমন একটি সামাজিক পরিস্থিতি নির্দেশ করে যার মাধ্যমে তাঁর ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রকৃত কারণটি বোঝা যায়। হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং রীতিনীতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের কাছে একটি বিশেষ পর্যায়ে রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। রহস্যময় পদ্ধতিতে পরম সত্তার জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করে সিদ্ধপুরুষ হওয়া হিন্দু ঐতিহ্যের সুপরিচিত অঙ্গ। এইসব সাধু-সন্ন্যাসীরা বলেন, এবং সাধারণ লোকেও বিশ্বাস করে যে তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন, অর্থাৎ বিশেষ শক্তির বলে তাঁরা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারেন। অবশ্য এইসব ক্ষমতাকে সাধারণ লোকেও বিশেষ মর্যাদা দেয় না, বরং আধ্যাত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে সিদ্ধি নিম্নস্তরের বলেই গণ্য হয়। ভারতের "মধ্য যুগে" কবীর, নানক, রুইদাস প্রভৃতি দরিদ্র এবং নিম্নবর্গ থেকে উদ্ভূত সাধু-সন্ন্যাসীরা সিদ্ধদের সম্বন্ধে নতুন ধারণা সৃষ্টি করেন। সাধারণ লোকের কথ্য ভাষায় তাঁরা ভক্তিবাদ প্রচার করেন এবং সর্বধর্মের, বিশেষত ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মৌলিক ঐক্যের কথা ঘোষণা করেন। হিন্দুর রাম এবং মুসলমানের দয়াময় ঈশ্বর রহিম তাঁদের কাছে অভিন্ন ছিলেন। ঈশ্বরের সন্ধানরত সন্ন্যাসীকে সম্মান জানানো সে যুগের হিন্দু ঐতিহ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। অজ্ঞাত, অখ্যাত পরিব্রাজক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতের সর্বত্র শিক্ষিত, এমনকি পাশ্চাত্য-শিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র, নিরক্ষর সর্বস্তরের লোকের শ্রদ্ধালাভ করেছেন। উত্তর ভারতে রামকৃষ্ণের সমসাময়িক অন্তত তিনজন যোগী ছিলেন—ত্রৈলঙ্গ স্বামী, পওহারী বাবা এবং রঘুনাথ দাস। উচ্চবর্গের শিক্ষিত প্রবাসী বাঙালি সমেত সকলের কাছেই তাঁরা সম্মানিত ছিলেন।[৪৬] অলৌকিক মার্গে রামকৃষ্ণকে দীক্ষিত না হোক, অন্তত পক্ষে উৎসাহিত করেছিলেন দুজন সন্ন্যাসী—ভৈরবী এবং তোতাপুরী। এঁরা দুজনেই ভারতের সর্বত্র শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করেছিলেন। কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে পরিচিত হবার আগে প্রায় কুড়ি বছর রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত সাধক হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে পাগল মনে করলেও স্থানীয় লোকজন তাঁকে সাধু বলেই মনে করত এবং কলকাতাতেও অনেকেই তাঁর নাম জানত। লোকে মনে করত যে তিনি বিভূতি, সিদ্ধি প্রভৃতি অলৌকিক গুণসম্পন্ন ছিলেন এবং এ সব ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে—অনেকেই রোগমুক্তি বা বৈষয়িক সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর কাছে আসত।[৪৭]

আমাদের দেশে যিনি সাধুপুরুষ বলে খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁর প্রতি যদি লোকে ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখায় তাতে চমকিত হবার কিছু নেই। রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে যেটা অস্বাভাবিক তা হল বাঙালি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর উপর তাঁর প্রভাব—যুক্তিবাদী চিন্তায় প্রভাবান্বিত যে গোষ্ঠী তখন আত্মসচেতন হয়ে নিজেদের ঐতিহ্যে গর্ববোধ করার মত উপাদান হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। তবে এ ব্যাপারটিকে একটু বাড়িয়ে দেখা হয়। কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দুধর্মের প্রচলিত রীতিনীতি থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালির জীবনধারা কখনওই পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়নি। রামকৃষ্ণের শিষ্যদের জীবনবৃত্তান্ত থেকেই দেখা যায় যে নব্য জ্ঞানদীপ্তি তাঁদের অভিজ্ঞতার মাত্র একটি, তাও কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ।[৪৮] ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ক্রিয়া-কলাপ, দেবদেবীর আরাধনা এবং ভক্তি, অবতারবাদ এবং অলৌকিকত্বে বিশ্বাস প্রভৃতি তাঁদের গার্হস্থ্য তথা ধর্মজীবনে যথারীতি চলে আসছিল। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত হিন্দুদের অধিকাংশ এইসব প্রচলিত বিশ্বাস এবং রীতিনীতি থেকে কখনই পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়েছিল বলে মনে হয় না। একজন খ্যাতনামা সাধুপুরুষের প্রতি তাঁদের সশ্রদ্ধ মনোভাবই স্বাভাবিক। রামকৃষ্ণের মত বিখ্যাত লোকের সম্বন্ধে অন্ততপক্ষে কৌতূহলটুকু ছিল সার্বজনীন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে তাঁর অগণিত দর্শকমণ্ডলীর একাংশই মাত্র তাঁর মতামত নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পেরেছিল।[৪৯] বিবেকানন্দসহ তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই প্রথম দর্শনে কিছুটা বিমূঢ় বোধ করেছিলেন। এইসব ঘটনা থেকে মনে হয় যে কেশব সেনের লেখা সাধক রামকৃষ্ণের জীবনী পড়ে কলকাতার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ওই পরিস্থিতিতে যেমনটি হওয়া স্বাভাবিক, তেমনই হয়েছিল।

উনবিংশ শতকের শেষদিকে বাংলায় হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদ এক বিচিত্র জগাখিচুড়ি ব্যাপার হয়েছিল। রামমোহনের সময় থেকে পাশ্চাত্য দেশীয়দের, প্রধানত খ্রিস্টিয় ধর্মযাজকদের হিন্দু ধর্মের সমালোচনার উত্তরে বিদ্বিষ্ট এবং যুক্তিবাদী, দু ধরনের প্রতিবাদই শোনা যাচ্ছিল। সাধারণভাবে বলতে গেলে এই সব প্রতিবাদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল, তা হল, পাশ্চাত্য দেশীয় সমালোচকরা যে মানদণ্ডে হিন্দু ধর্ম এবং রীতিনীতির বিচার করতেন, প্রতিবাদীরাও তাই অবলীলাক্রমে মেনে নিয়েছিলেন। সেই কারণেই তাঁরা হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদ এবং পৌত্তলিকতার প্রতীকধর্মিতা প্রমাণ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পরিক্রমাকালে ব্রাহ্ম এবং নব্যহিন্দু মতবাদের মধ্যে পাশ্চাত্যের উদার দর্শন, এমনকি খ্রিস্টিয় মূল্যবোধও অনেকখানি ঢুকে পড়েছিল। কেশবের বক্তৃতার মধ্যে একজন "প্রাচ্য খ্রিস্ট"কে দেখি, যিনি ভক্তিবাদ এবং একেশ্বরবাদের মধ্যে সমন্বয়ের সূত্র খুঁজছিলেন। ব্যাপকভাবে প্রচলিত হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে ওইসব প্রতিবাদীদের মনে একটা লজ্জাবোধ ছিল বলে সেগুলিকে পরিহার করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। যাইহোক, নবোন্মেষিত জাতীয়তাবোধ এবং বিদেশী শাসনের প্রতি অসন্তোষবশত অনেকে আবার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সমালোচনা মেনে নিতে পারছিলেন না। দেশের প্রয়োজন ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে যুক্তির অবতারণা করে ভূদেব প্রচলিত রীতিনীতিগুলিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ দক্ষতায় বঙ্কিম তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে 'ধর্মতত্ত্ব' এবং 'কৃষ্ণচরিত্রে' পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের সব কিছুর থেকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। জনগণের কাছে অবশ্য এইসব কেতাবী ব্যাখ্যার আবেদন নিতান্তই সামান্য, এবং বিদেশী শাসনে লাঞ্ছিত, অপমানিত, হীনম্মন্যতায় জর্জরিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আত্মাভিমানও এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সত্যি বলতে, বঙ্কিম এই হীনম্মন্যতার কথাই বারবার বলেছেন। শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণবিহারী সেন এবং তাঁদের অনুগামীগণ যে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদ প্রচার করতেন, তারও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ্চাত্যের তুলনায় হিন্দু ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। পাশ্চাত্যের সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি সবই প্রাচীন কালের হিন্দুদের জানা ছিল বলে তাঁরা দাবি করতেন, অন্যান্য সব ধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্মের অপরিমেয় শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করতেন এবং প্রচলিত সংস্কারগুলির মধ্যে গভীর বৈজ্ঞানিক এবং নৈতিক অর্থ আছে বলে বিশ্বাস করতেন। হিন্দু আধ্যাত্মিকতার মহিমা কীর্তন করে থিওসফি-পন্থীরা ঔপনিবেশিক যুগের উচ্চবর্গীয়দের আহত আত্মাভিমানকে শমিত করেছিল।

রামকৃষ্ণের যে সব শিষ্য তাঁর জীবনে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রতিরোধ করার সচেতন প্রয়াস দেখেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পুনরভ্যুত্থানবাদী মানসিকতার মিল ছিল। বিবেকানন্দ অবশ্য সম্পূর্ণ অন্যভাবে তাঁর গুরুদেবের বাণীগুলির ব্যাখ্যা করেছিলেন। খ্রিস্ট এবং ইসলাম ধর্ম সহ সব ধর্ম, এমনকি কেশব সেনের খ্রিস্টিয় ভক্তিবাদের প্রতি রামকৃষ্ণদেবের ঐকান্তিক শ্রদ্ধার ফলে তাঁকে ঊনবিংশ শতকের হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীদের দলে না ফেলে ভারতের মধ্যযুগীয় সর্বধর্মবাদী ভক্তিবাদের দলে গণ্য করাই উচিত। মনে রাখতে হবে যে একবার তান্ত্রিক মতের সমালোচনা করার জন্য অত্যন্ত শান্ত-নম্র এই মানুষটি বিবেকানন্দকে তিরস্কার করেছিলেন,[৫০] কারণ তিনি মনে করতেন সে পথও ঈশ্বরের সাধনার পথ। শুধুমাত্র শশধর[৫১] এবং থিওসফিপন্থীগণ তাঁর মৃদু সমালোচনার পাত্র ছিলেন। মাত্রাতিরিক্ত ঐহিকতার দুঃখ লাঘব করা, এবং সম্ভবত ভক্তিবাদের পথে উত্তরণের প্রাথমিক পর্বে বিনয়াবনত হওয়ার শিক্ষা দেওয়া বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের একটি সচেতন উদ্দেশ্য বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।[৫২] নরেন্দ্রর নেতৃত্বে একদল নিবেদিত-প্রাণ যুবক-সন্ন্যাসীর দল সৃষ্টি করা তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তাঁদের কর্তব্য তিনি নির্দেশ করেননি।[৫৩] পরে বিবেকানন্দ যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন তাই যদি তাঁর অব্যক্ত নির্দেশ হয়ে থাকে, তাহলে অন্তত দেশে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই ছিল না। পাশ্চাত্য দেশে বেদান্তের প্রচারে হয়ত ঔপনিবেশিক এলিট গোষ্ঠীর আহত আত্মাভিমান কিছুটা তৃপ্তি লাভ করেছিল, কিন্তু বিবেকানন্দর উদ্দেশ্য তা ছিল না।

সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার বিঘ্ন কিংবা সামাজিক-রাজনৈতিক উচ্চাশার পথে অন্তরায় নিয়ে শহুরে বুদ্ধিজীবীদের অনতিক্রম্য দুঃখবোধ তো ছিলই, তবে তার বাইরেও তাঁদের কিছু মানসিক প্রয়োজন ছিল এবং রামকৃষ্ণদেব সেই প্রয়োজন চরিতার্থ করেছিলেন। যে সব তর্ক এবং আন্দোলন ঊনবিংশ শতকের বাংলায় ঝড় তুলেছিল, সেগুলির মূলে ছিল ধর্মবিশ্বাসের প্রশ্ন। খ্রিস্টধর্মী, প্রাচীনপন্থী হিন্দু, ব্রাহ্ম এবং নব্য হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বাক্-বিতণ্ডা, তা শুধুই সমাজ সংস্কার অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে নয়। ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্নটি রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব এবং তাঁর বিচ্ছিন্ন শিষ্যদল, বঙ্কিম এবং আরো অনেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে সামাজিক সংস্কার বিষয়ক তর্কটি ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও অনেকের কাছে কিন্তু ধর্মের মূল তত্ত্বই প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল। শোনা যায় ১৮৭০ এবং ৮০-র দশকে বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও ঈশ্বরের আকৃতি আছে কি নেই তা নিয়ে তর্কাতর্কি করত। কেশব, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং উত্তরজীবনে বঙ্কিম আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভের আশায় যে ভাবে সকাতরে উদগ্রীব হবে ছিলেন, সে যুগের অনেক আদর্শবাদী যুবকেরই একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল।[৫৪] সাধারণ ব্রাহ্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজের সংস্কার-বিরোধী ধার্মিকতা অথবা কেশবের ক্রমবর্ধমান ভক্তিবাদের মধ্যে অনেকের চাহিদা মিটে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজীদের অন্তর্বিরোধের ফলে ব্রাহ্মমতের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তর্কচূড়ামণি ঢঙের নব্যহিন্দুমতে আধ্যাত্মিকতার লেশও ছিল না। বিবেকানন্দর মেজো ভাই মহেন্দ্রনাথ এ সময়ে শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত হিন্দু ধর্মবোধের বিবরণ দিয়েছেন।[৫৫] তাঁর মতে, সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি গীতা-উপনিষদের নামই শোনেনি, তাদের জানা ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ছিল খ্রিস্টিয় পাদ্রীদের দেওয়া বাইবেল এবং ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধীয় কিছু বই। গোঁড়া শাক্ত এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে পারস্পারিক বিদ্বেষ ছিল কিন্তু সাধারণ মানুষ চৈতন্যদেব এবং বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিল। কলকাতা এবং তার আশেপাশে ভৈরবী-চক্র বেশ প্রচলিত ছিল যৌনতন্ত্র যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রামকৃষ্ণের ভাগ্নে হৃদয় যৌবনে আলমবাজার অঞ্চলে এক রাত্রে ছটি চক্রে পর্যন্ত যোগ দিতেন বলে জানা যায়। ভিক্টোরিয় যুগের নীতিবোধে উদ্দীপ্ত কলেজের ছাত্ররা এইসব প্রক্রিয়াকে ঘৃণা করত। অযৌক্তিক আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রচলিত পূজা পদ্ধতিতে তাদের কোনও আস্থা ছিল না। এমনকি গুরুজনকে সম্মান দেখানোর জন্য প্রণাম করার রীতিটিও উঠে যাচ্ছিল। নিজেদের ধর্মে সংশয়াচ্ছন্ন যুবকদের কাছে হিন্দু-বিদ্বেষী, অল্পবিদ্যা পাদ্রীদের প্রচারিত খ্রিস্টধর্মেরও কোনও আবেদন ছিল না। নতুন সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলির ফলে ধর্মের প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল, তার ফলে একদিকে যেমন অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে ভাবনা-চিন্তারও সূচনা হয়েছিল, কিন্তু এইসব আন্দোলনের মাধ্যমে সকলের গ্রহণযোগ্য কোনও সমাধান পাওয়া যায়নি। ধর্মজীবনের এই অনিশ্চয়তা দূর করবার উদ্দেশ্যেই কেশব কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করছিলেন। লোকে তা মন দিয়ে শুনতও। যে সব যুবক পরে রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই প্রথমে কেশবের শিষ্য ছিলেন। ওজস্বী বাগ্মী কেশব ছিলেন ঈশ্বরান্বেষী। তিনিই বলেছেন যে রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ধার্মিকতা সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু সংশয়বাদে অব্যবস্থিতচিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অনেকেই এ কথাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে মনে শান্তি পেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেব যে সর্বধর্মসমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক ছিলেন সেটা তাঁদের ভাল লাগার আর একটি কারণ।[৫৬] তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁরা সব যন্ত্রণাদায়ক মতবিরোধ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। আর, রামকৃষ্ণদেবের গ্রাম্য সারল্য তাঁর অসাধারণ সম্মোহনী শক্তিকে বাড়িয়ে তুলেছিল, একথা সর্ববাদিসম্মত।

উপসংহারে বলা যায় যে, বেশ কয়েক দশক ধরে যে ধর্মবিষয়ক বাদ-বিতণ্ডা চলছিল, তার ফলে একটি সন্তোষজনক আধ্যাত্মিক আদর্শের মানসিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তারই তাগিদে শহুরে বুদ্ধিজীবীদের একাংশ রামকৃষ্ণের ভক্ত হয়েছিলেন। ধর্মের বিচিত্র প্রকাশ এবং নবোন্মেষিত জাতীয়তাবাদের বাড়াবাড়ি সেই প্রয়োজন এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব দুইই বাড়িয়ে তুলেছিল।[৫৭] বোধহয় খ্যাতনামা বিদেশী পণ্ডিতেরা তাঁর মাহাত্ম্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলেই পরমহংসদেবের প্রতিফলিত মাহাত্ম্যের মধ্যে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীরা কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেবকে তাঁরা হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনরূপে ব্যবহার করতেন বটে, তবে তাঁর অসীম সহিষ্ণুতা এবং সাম্প্রদায়িকতাহীন আধ্যাত্মিকতার ধার তাঁরা ধারতেন না। সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিরকালীন রীতি এদেশে এতটুকু শিথিল হয়নি, তাই শহুরে বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশের কাছে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে একজন মহান সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাব ভগবানের আশীর্বাদ এবং সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে পরিগণিত হয়েছিল এবং তাঁরা তা সানন্দে ও সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। রামকৃষ্ণকে ঘিরে যে ধর্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল, তার উত্তেজনা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গিয়েছিল এবং ধর্মের পরিবর্তে রাজনৈতিক উত্তেজনা বাঙালি বুদ্ধিজীবীর ভাবনার প্রধান স্থানটি দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু সেই উত্তরণে রামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য এবং তাঁর কৃত গুরুবাক্যের ব্যাখ্যা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

আগেই দেখিয়েছি যে প্রথমে পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ তাঁর আধ্যাত্মিক অস্থিরতার নিরসন করতে চেয়েছিলেন। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় যে রামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়াটা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক এবং একান্তই আকস্মিক। তাঁর সংশয়বাদ থেকে দৃঢ় আস্তিক্যবাদে উত্তরণের কারণগুলি অংশত পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচিত সে যুগের পাশ্চাত্য-শিক্ষিত বাঙালিদের জীবন ধারা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু তাঁর কাহিনীর অন্য আর একটি দিকও আছে। সিমলার দত্ত পরিবার তিন পুরুষে নতুন জ্ঞানদীপ্তির দ্বারা প্রভাবিত এবং ধর্মসম্বন্ধে উদার মনোভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত বাঙালি-হিন্দু সংস্কার থেকে মোটেই মুক্ত ছিলেন না। যার জন্য বিবেকানন্দ পরে হিন্দু দর্শনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মৌলিক চিন্তাধারা এবং ধর্মবোধ গড়ে উঠেছিল শৈশবের পরিবেশের প্রভাবে। দার্শনিক সংশয়বাদ তাঁর ক্ষেত্রে একটা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। জীবনের প্রারম্ভে যে স্থিরবিশ্বাস জন্মেছিল, সংশয়বাদ তার ভিত্তি শিথিল করতে পারেনি। ভূদেবের থেকে ভিন্ন রীতিতে, বিবেকানন্দ শৈশবের শেখা মূল্যবোধ দিয়ে উত্তরকালে পাশ্চাত্য জীবনের নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মূল্যায়ন করেছিলেন। ধার্মিকতার অন্তর্নিহিত যে মূল্যবোধ শৈশবের মাতৃদুগ্ধের সঙ্গেই তা তাঁর মনেপ্রাণে মিশে গিয়েছিল, রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং জ্ঞানগর্ভ পঠন-পাঠনে তা আরও বিশদ এবং সুদৃঢ় হয়েছিল।

নরেন্দ্রর ঠাকুর্দা দুর্গাপ্রসাদ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তাঁর সন্ন্যাসজীবনের বিভিন্ন ঘটনা পরিবারে সবসময়েই গল্প করা হত। দুর্গাপ্রসাদের দিদি নবজাতক নরেন্দ্রর সঙ্গে তাঁর ঠাকুর্দার আশ্চর্যজনক মিল দেখেছিলেন। ওই বৃদ্ধাই প্রথম বলেন : "এ যে ঠিক সেই দুর্গাপ্রসাদ, মায়া কাটাতে পারেনি, তাই আবার নাতি হয়ে জন্মেছে।" পরে পরিবারের অনেকেই তা পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন। সুতরাং বালক নরেন্দ্র যে নিজের মাথায় সন্ন্যাসীর জটা গজাবার আশা পোষণ করতেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। শিবের কাছে মানত করে নরেন্দ্রর জন্ম হয়েছিল, তাই অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে নরেন্দ্র স্বয়ং শিবেরই অবতার। অনেক সময়েই শিবের নাম করে দুরন্ত শিশুকে শান্ত করা হত। তাঁর অতি প্রিয় খেলা ছিল দেবদেবীর মৃণ্ময় মূর্তির সামনে বসে পূজা ও ধ্যান করা। বাল্যাবস্থাতেই তিনি ব্রহ্মচর্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তাই প্রথমে রামকে দেবতা বলে গণ্য করলেও পরে, সীতাকে বিবাহ করার গর্হিত অপরাধের জন্য তিনি তাঁকে ভক্তির অযোগ্য বলে মনে করেন। তখন থেকে তাঁর মনে বিষ্ণুর রামাবতারের স্থান নিয়েছিলেন শিব। শিবকে তিনি ছোট থেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভক্তি করতে শিখেছিলেন, সারাজীবন বিবেকানন্দ শিবকেই স্মরণ করেছেন। "শিব আমার ঈশ্বর, আমার চৈতন্য"— এই ছিল তাঁর অদ্বৈতবাদ। ছোটবেলায় তাঁর যে আশা ছিল যে বড় হয়ে তিনি ঠাকুর্দার মত সন্ন্যাসী হবেন, তা দৈববাণীর মত ফলেছিল।[৫৮]

মানবতাবাদী, দেশহিতব্রতী প্রভৃতি বহুমুখী চিন্তাধারা সত্ত্বেও নিজের আধ্যাত্মিকতার প্রশ্নটি ছিল তাঁর সমস্ত ভাবনা-চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত একটি ভাষণে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন : "যে সময়ে আমি অন্য কিছু ভাবি, তার প্রতিটি মুহূর্তই আমার কাছে অপচয়।"[৫৯] ধর্মপ্রচার এবং সংগঠনের জন্য নানা কাজ করতে হত বলে তিনি বারবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।[৬০] সমসাময়িক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতে আস্তিক্যবাদে বিশ্বাস হারানো বিবেকানন্দর জীবনের এক অতি সাময়িক বিচ্ছেদপর্ব মাত্র। এবং সেই ঘটনাকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস না বলে বরং অবিসংবাদী প্রমাণ খুঁজে দেখার প্রচেষ্টা বলাই সঙ্গত। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েও তিনি বাল্যকালের ধ্যানস্থ হওয়ার অভ্যাসটি বজায় রেখেছিলেন। তবে তখন ব্রহ্মচর্য এবং অন্যান্য শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করে তিনি এক অতি কঠোর আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রেরণায় মেতেছিলেন। তখনও তাঁর সন্ন্যাসের প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হয়নি। পার্থিব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সুখী গৃহীজীবনের স্বপ্ন তখনও তাঁকে আকর্ষণ করত। আবার একই সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সন্ন্যাসীর জীবনধারার প্রতিও তিনি গভীর আকর্ষণ বোধ করতেন।[৬১] রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পরই কেবল ঐহিক সুখের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তিলাভ করে তিনি তাঁর চির-আকাঙ্ক্ষিত পথ গ্রহণ করেন।

এক প্রতিবেশীর গৃহে নরেন প্রথম রহস্যময় সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণদেবকে দেখেন। তাঁর আধ্যাত্মিকতার প্রতি হেস্টির সশ্রদ্ধ বিমূঢ় ভাবের কথা কেশব ইতিমধ্যেই প্রচার করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য, নরেনের আত্মীয় রামচন্দ্র দত্ত বহু চেষ্টায় নরেনকে নিয়ে নিজের গুরু সন্দর্শনে গিয়েছিলেন। নিয়ে যাবার প্রস্তাবে নরেন যা উত্তর দিয়েছিলেন তাতে ভক্তির লেশও ছিল না : "তিনি তো একজন নির্বোধ, নিরক্ষর!"[৬২] একদিন পরমহংসদেব স্পর্শ করা মাত্র নরেন্দ্রর মনে সমাধির ভাব সৃষ্টি হয়, সেই থেকেই তাঁর সংশয় দূর হয়। এই অভিজ্ঞতার কথা তিনি পরে অনেকবার তাঁর সতীর্থ এবং শিষ্যদের কাছে বলেছিলেন : "দেখলুম ঘরবাড়ি, দোর দালান, গাছপালা, চন্দ্রসূর্য্য—সব যেন আকাশে লয় পেয়ে যাচ্ছে। ক্রমে আকাশও যেন কোথায় লয় পেয়ে গেল—তারপর কি যে প্রত্যক্ষ হয়েছিল, কিছুই স্মরণ নেই। তবে মনে আছে, ওইরূপ দেখে বড় ভয় হয়েছিল।"[৬৩] পরে গুরুদেব তাঁর মধ্যে অনেকবারই ওই আধ্যাত্মিক অনুভূতি সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু শিষ্য আর কখনও ভয় পাননি। রামকৃষ্ণ যে বলতেন, যে কোনও মানুষের মতই ঈশ্বরকে দেখা এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়, সে কথায় আর তাঁর সন্দেহ ছিল না।[৬৪]

রামকৃষ্ণের এবং বিবেকানন্দর বিবিধ জীবনীগ্রন্থে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের ঘটনাবলী পাওয়া যায়। শোনা যায় যে, একদল নিষ্পাপ যুবক যে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর কাজ সম্পন্ন করবেন, একথা রামকৃষ্ণ আগে থেকেই জানতেন। যে সব তরুণ ভক্ত তাঁর কাছে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নরেন সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন যে সে এক বিশুদ্ধ-আত্মা, মানুষের দুঃখনিবৃত্তির জন্য প্রাচীন কোনও ঋষি তার রূপ পরিগ্রহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে ; সে মুক্তপুরুষ, নিজের প্রকৃতসত্তার উপলব্ধি হলেই দেহত্যাগ করবে।[৬৫] নরেনের সন্ন্যাস গ্রহণের আগ্রহকে তিনি উৎসাহিত করেছিলেন। নরেনকে তিনি যে মতে দীক্ষা দিয়েছিলেন, ব্রহ্মচর্য ছিল তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। স্বকৃত অনুশীলনের ফলে আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-সংযম প্রয়োজন বলে যে তাঁর স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল, নরেনকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দিয়ে তিনি সেই ধারণার কার্যকরী প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে, সুদীর্ঘকালের সংযম সাধনায় চৈতন্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি আয়ত্ত করা যায় এবং এইভাবে চৈতন্যের সংস্কারের মাধ্যমেই ঈশ্বরকে জানা সম্ভব।[৬৬]

ঈশ্বরের সন্ধানে পার্থিব ভোগ-সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগের প্রাচীন আদর্শ নরেন বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও রামকৃষ্ণদেব তাঁর গৃহী শিষ্যদের জন্য আদর্শ দিয়েছিলেন—রাজর্ষি জনকের আদর্শ, ঈশ্বরকে মনপ্রাণ সমর্পণ করে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করার আদর্শ। নরেন প্রভৃতি বিশেষ কয়েকজনকে তিনি নিজের আদর্শ প্রচার করার জন্য নির্বাচন করেছিলেন, তাঁদের জন্য এই আদর্শ নয়। যুবক নরেন সন্ন্যাসগ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু গুরুর জীবন এবং উপদেশাবলীর অনেক কিছুই সহজে মেনে নিতে পারেননি। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সর্বদা যোগাযোগকে নরেন ভক্তের মনের অভিলাষ বলে ধরে নিয়েছিলেন। অদ্বৈত, অর্থাৎ ভূমণ্ডলের যাবতীয় প্রাণী, সচেতন-অচেতন পদার্থ, সবই ব্রহ্মেরই নানা অভিব্যক্তি—এই মত তাঁর মতে যুক্তি এবং সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে মেনে নেওয়া যায় না। প্রায়-নিরক্ষর গুরুর কাছে তাঁর দর্শন সম্বন্ধে কিছু শেখার আছে বলে তিনি মানতে চাইতেন না। বহু পরীক্ষা এবং গুরুর কৃপায় বহুবার সমাধির অভিজ্ঞতা হওয়ার পরই তিনি তাঁর ইচ্ছার কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছিলেন। জীবনের শেষ বছরে রামকৃষ্ণদেব তাঁর ক্ষুদ্র যুবক-ভক্তমণ্ডলীকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করে নরেনের নেতৃত্বাধীনে তাঁদের সমর্পণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এঁরা নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে কঠোর আধ্যাত্মিক আচরণের অনুশীলন করতে থাকেন। পরে এই অনুশীলন ভারতের সন্ন্যাসীদের চিরাচরিত জীবনধারা—পরিব্রজ্যা এবং ভিক্ষান্নে জীবনধারণের রীতিতে পর্যবসিত হয়েছিল।[৬৭]

পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁর মনোভাব এবং সেদেশে শিক্ষকরূপে বিবেকানন্দর ভূমিকার মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক আছে, এবং তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার বেশিরভাগই রামকৃষ্ণের কাছে শেখা, তাই আলোচনায় রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব এবং ভূমিকা সম্বন্ধে বিবেকানন্দর মূল্যায়ন বিশেষ রকম প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে তাঁর গুরু নারায়ণের অবতার, প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ অবতার। তাঁর কাছে অবতার এবং মহাপুরুষ শব্দদুটি সমার্থক ; তাঁরা পৃথিবীতে ধর্মসংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হন। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু এবং পৃথিবীর ইতিহাসে সব মহাত্মাই এই শ্রেণীভুক্ত। "ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞে কিছুমাত্র তফাৎ নেই"—তাই আত্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই অবতার। এঁরা অন্যদের মনের অন্ধকারও দূর করতে পারেন।[৬৮] মৃত্যুর কয়েকদিন আগে রামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হয়ে বিবেকানন্দর দিকে ফিরে বসেছিলেন এবং নিজের দেহে কেমন বিদ্যুৎপ্রবাহের মত শক্তি অনুভব করেছিলেন, বিবেকানন্দ তার বর্ণনা দিয়েছেন। গুরুদেব তাঁকে বলেছিলেন, "আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করে তবে ফিরে যাবি।" পাশ্চাত্য জগতে তাঁর প্রচার এবং নিজের জীবনে তিনি যা কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন, সবই বিবেকানন্দ গুরুর নির্দেশ এবং আশীর্বাদ বলে অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করতেন।[৬৯] পরে গুরুর বাণী বলে তিনি যা প্রচার করেছেন তার মৌলিক বিষয়বস্তু ছিল দুটি—আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য প্রথম প্রয়োজন নিবৃত্তি এবং মুমুক্ষত্ব ; এবং অন্যটি, "জগতের ধর্মগুলো পরস্পরবিরোধী নয়। এগুলো এক সনাতন ধর্মেরই বিভিন্ন ভাবমাত্র।"[৭০] এই অর্থে রামকৃষ্ণের মতাদর্শে নতুন কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে না।[৭১] বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে যাতে অহেতুক কোনও সংশয় না দেখা দেয় সেইজন্য পাশ্চাত্যদেশে গুরুর জীবন এবং ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যায় তিনি ভেবেচিন্তে যুক্তির অতীত বিশ্বাসগুলির উল্লেখ করেননি।

নিজের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে বিবেকানন্দ নীরব থাকতে চাইতেন। "সামান্য প্রশ্ন করলেও তিনি জ্বলে উঠতেন, যেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অন্তরঙ্গ সমস্ত খুঁটিনাটি জানতে চাওয়া হয়েছে।"[৭২] বিনয় তাঁর ধাতে ছিল না, কিন্তু নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতির সম্বন্ধে আলোচনা করতেন অসাধারণ বিনয়াবনত হয়ে। গুরুর জীবনপ্রসঙ্গ তিনি আলোচনা করতে চাইতেন না কেননা তিনি মনে করতেন যে তাঁর সম্বন্ধে তিনি কিছুই বোঝেননি।[৭৩] তা সত্ত্বেও, প্রতিরাত্রে ঘুমোবার আগে যে তিনি এক উজ্জ্বল আলোর ছটা দেখতে পেতেন, যে আলোক বিকীর্ণ হয়ে চারিদিক পরিব্যাপ্ত করত, সেই অভিজ্ঞতার কথা তিনি সতীর্থদের বলতেন।[৭৪] ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আশায় যে যুবক সন্ন্যাসীর দলটি সমবেত হয়েছিলেন, গুরুর মৃত্যুর পর তাঁদের ঐকান্তিক আধ্যাত্মিক সাধনা এবং জাগতিক সুখ-দুঃখের প্রতি তাঁদের চূড়ান্ত নির্লিপ্ততার কথা বিবেকানন্দর ভাই মহেন্দ্রনাথ সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, এক এক সময়ে বিবেকানন্দ অনুভূতির অতলে ডুবে যেতেন, সে সময়ে তাঁর সাড়া পাওয়া যেত না।[৭৫] একবার লন্ডনে মহেন্দ্র দেখেছিলেন যে, যে আনন্দ সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই আনন্দের অনুভূতিতে উল্লসিত হয়ে তিনি নৃত্য করছেন এবং তাঁর অদ্বৈতের উপলব্ধি হয়েছে।[৭৬] বিবেকানন্দ বলতেন যে তিনি তাঁর পূর্ব জন্মগুলির কথা স্মরণ করতে পারেন এবং মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তিনি বলেছিলেন যে রামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আপনার স্বরূপ তিনি চিনতে পেরেছেন।[৭৭] আবার, তাঁর মত একজন বিশাল মোটা মানুষ ঈশ্বরের দেখা পেতে পারেন, এই কথায় হাসতেন।[৭৮] প্রথম পাশ্চাত্য ভ্রমণের কিছুদিন আগে এবং সারা ভারত পরিক্রমার পরে তিনি তাঁর সতীর্থ তুরীয়ানন্দকে বলেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরকে খুঁজে পাননি।[৭৯] আমাদের এই আলোচনায় তাঁর অলৌকিকের সন্ধানের প্রশ্নটি একটি কারণে প্রাসঙ্গিক। ভারতের প্রচলিত অলৌকিকতত্ত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন। অলৌকিকতত্ত্বের মধ্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির যে প্রতিশ্রুতি আছে চূড়ান্ত বিচারে তাই মানুষের পরমার্থ হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। সর্বদাই তিনি ঐ উপলব্ধির মানদণ্ডে পাশ্চাত্যবাসীর মূল্যায়ন করেছেন এবং তারা কি করতে পারত আর বাস্তবে কি করে, তার ব্যবধানটা অনুভব করেছেন।

বিবেকানন্দর ধারণায় মানবসভ্যতায় ভারতের মহত্তম অবদান হল তার আধ্যাত্মিকতা। তাঁর অভীপ্সার অন্যতম ছিল এই আধ্যাত্মিকতার অনুভূতি পাশ্চাত্যজগতে সঞ্চারিত করে ওই প্রাণবন্ত ঐতিহ্যের একটি নতুন উদ্দেশ্য সৃষ্টি করা। ভারতীয় ঐতিহ্যের এই পরম গর্বের বিষয়টিই মানবসভ্যতার অগ্রগতির একমাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাপকাঠি হওয়া উচিত।

বিবেকানন্দর মতে উপনিষৎ এবং তার টীকা-টিপ্পনী সহ সমগ্র দার্শনিক সাহিত্য ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বেদান্তের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে গ্রথিত আছে।[৮০] এমনকি বৌদ্ধ ও জৈনধর্মেও বেদান্তের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে, এবং ব্যাস সাংখ্য ও ন্যায়ের সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। ভারতের সমস্ত ধর্মমতেরই উৎস বেদান্ত বলে তিনি মনে করতেন, কারণ দ্বৈত, বিশিষ্টা দ্বৈত এবং অদ্বৈত, এই তিনটির যে কোনও একটিকে অবলম্বন করে ভারতের ধর্মমতগুলি সৃষ্ট হয়েছে, আবার এই তিনটি হল বেদান্তের ব্যাখ্যা।[৮১] এই তিনটি ব্যাখ্যা মানুষের আধ্যাত্মিক অগ্রগতির ক্রম অনুসারে সজ্জিত। আত্মার চূড়ান্ত অভিলাষ হল অদ্বৈতর উপলব্ধি—মায়া বা অজ্ঞানতা এবং অধ্যাসবশত যে পরম সত্তাকে নানাভাবে প্রকাশিত বলে মনে হয়, তার সঙ্গে একাত্মতার উপলব্ধি।[৮২] মানুষের যত দুঃখের কারণ দ্বৈতবোধ থেকে সৃষ্ট তার অহং বোধ, অর্থাৎ বিশ্বসংসারে নানাভাবে প্রকাশিত পরম সত্তার থেকে বিচ্ছিন্ন নিজের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি। ওই ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে উত্তরণ হলেই মায়াজাল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এবং সেই মুক্তিই হল বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত চূড়ান্ত, চিরন্তন এবং শাশ্বত পরম সত্যের উপলব্ধি, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। বিবেকানন্দর মতে এই দার্শনিক প্রত্যয়ই মানুষের নৈতিকতার ভিত্তি : "সব মানুষকে বেদান্ত এই শিক্ষাই দেয়—সে এই বিশ্বসত্তার সঙ্গে এক ও অভিন্ন।... অন্যের ক্ষতি করলে নিজেরই ক্ষতি করা হয়। অন্যকে ভালবাসলে নিজেকেই ভালোবাসা হয়।"[৮৩] উপরন্তু, যেহেতু অহং বোধই মানুষের যত দুঃখের মূল, সেহেতু আত্মত্যাগ বা নিবৃত্তিই মোহজাল ভেদ করে মুক্তির পথ।

অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ সঙ্গত কারণেই পাশ্চাত্য দর্শনের কোনও কিছুতেই মনের মিল পাননি। কিন্তু তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্মিক মতবাদ এবং গুরুর জীবনচর্যায় তিনি ঈশ্বরকে পাওয়ার এক সম্পূর্ণ নতুন পথের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা হল ভক্তিবাদ। তাঁর শৈশবের সাদাসিধে ধার্মিকতার পরিবেশ, অল্প বয়সে ব্রাহ্মমতে নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান ও তাঁর কাছে প্রার্থনা, এবং ঈশ্বরকে মাতৃরূপে কল্পনা করে আবেগাপ্লুত হওয়া—সবকিছুই প্রচলিত হিন্দুধর্মের ভক্তিবাদের অন্তর্ভুক্ত। বারবার সমাধির মাধ্যমে দ্বৈতের অনুভূতি লোপ পাওয়া সত্ত্বেও "মা"য়ের প্রতি রামকৃষ্ণ সর্বদাই ভক্তিবিহ্বল হয়ে থাকতেন। তাঁর মায়ের প্রতি ভক্তি এবং অদ্বৈতর অনুভূতি একই সঙ্গে প্রবাহিত ছিল। তাঁর খ্যাতনামা শিষ্যেরও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে মনোভাব এই রকমই ছিল। বিদেশে তাঁর কর্তব্য সাধনকে তিনি বারবার দৈবোদ্দিষ্ট বলেছেন। তবে ওই দেবতা অবাঙমানসগোচর ব্রহ্ম নন, তিনি সাকার। ধর্মচিন্তায় ভক্তিবাদের প্রাবল্য হেতু খ্রিস্টধর্ম প্রমুখ আস্তিক্যবাদী ধর্মের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয়েছিল।[৮৪] দ্বৈতবাদকে (অদ্বৈত) বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত করায় ভারতের দর্শনের সঙ্গে প্রচলিত আস্তিক্যবাদী ধর্মমতগুলির একটা সঙ্গতি পাওয়া যায় এবং বেদান্তই যে সব ধর্মমতের উৎস, তাঁর এই দাবিরও একটা ভিত্তি পাওয়া যায়।

তাঁর এবং সমসাময়িক অনেকের মতেই রামকৃষ্ণের জীবনে ধর্মসমন্বয়ের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে। সব ধর্মমতের সারমর্মই যে এক,—ঈশ্বরকে জানা—ভারতের এই চিরপ্রচলিত বিশ্বাস রামকৃষ্ণদেবের সামঞ্জস্যময় প্রশ্নাবলীর মধ্যে দিয়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে। নিজের পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে নরেন একরকমের সারবাদী সহিষ্ণুতার মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। স্পর্শমণি রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সেই শিক্ষা গভীর এবং সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে পরিণতি লাভ করেছিল। অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর মনোভাব শ্রদ্ধা এবং সহিষ্ণুতার উর্ধ্বে উঠে গিয়েছিল এবং ধর্মান্ধতা-মুক্তির মাপকাঠিতে তিনি সব ঐতিহ্যের মূল্যায়ন করেছিলেন।

সব ধর্মের উপযোগিতায় যে তাঁর বিশ্বাস ছিল, তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ বোধহয় ইসলামের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। ঐস্লামিক ভারতের ঐতিহ্য বিষয়ে তিনিও উনবিংশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীর দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের অংশীদার ছিলেন।[৮৫] তবে তাঁর ক্ষেত্রে তা দ্বিধাই, পূর্ব-প্রজন্মের মত পুরোপুরি বর্জনের মনোভাব নয়, কারণ তাঁর সময়ে ভারতের সচেতন জাতীয়তাবাদ সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের পরিবর্তে সংহতির আদর্শকে গ্রহণ করেছিল। তাঁর ছোট ভাই তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্যে ঐস্লামিক অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। শিষ্যদের সম্পাদনায় বিবেকানন্দর নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থে মুসলিমদের সঙ্গে তাঁর নানাভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের উল্লেখ আছে। তাঁর মুসলিম বন্ধু এবং গুণগ্রাহীদের মধ্যে যেমন আলোয়ারের একজন সামান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, তেমনি আবার নিজামের উচ্চপদস্থ মন্ত্রী এবং কাবুলের একজন আমীরও ছিলেন।[৮৬] খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সামাজিক নিষেধাজ্ঞা তিনি একেবারেই মানতেন না। বরং কাশ্মীরে একজন মুসলিম মিঠাইওয়ালার মিষ্টিই নিয়মিত খেতেন।[৮৭] মোগল যুগের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে তিনি কত গর্ববোধ করতেন তা নিবেদিতা লিখে রেখে গেছেন : "সেই মহান জাতীয় প্রতিভায় মুসলিম পিতা এবং হিন্দু মাতার সন্তানরূপে ভারতের অধিপতির জন্ম ঘোষিত হয়েছিল।"[৮৮] এইসব শাসককে তিনি কোনোমতেই বিদেশি বলতে রাজি ছিলেন না। হিন্দু ও মুসলিম আদর্শের পার্থক্য তাঁর মতে নিতান্তই আপাত, প্রকৃত নয়, এবং মুসলিমদের তিনি "এক উদার জাতি, মনে প্রাণে হিন্দুদের মতই ভারতীয়" বলে মনে করতেন।[৮৯] মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা ছিল যেন এদেশে "ইসলামের দেহে বেদান্তের আত্মার" দ্বৈত আদর্শ উন্মোচিত হয়।[৯০]

শুধুমাত্র দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই যে তিনি ইসলামকে ভালবেসেছিলেন, তা নয়। আরবের নবীর কাছে উন্মীলিত সত্যের সঙ্গে তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গতি ছিল। তাঁর গুরুর মধ্যে সুফীবাদ এবং অদ্বৈত বেদান্তের সামঞ্জস্য দেখা গেছে। কিন্তু তাঁর কাছে এ ধর্মের সহজ, সরল ও সরাসরি আবেদনই সবচেয়ে বেশি ছিল : "ঈশ্বর ঈশ্বরই ; এখানে কোনও দার্শনিকতা বা নীতিশাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব নেই...আল্লার নামে মহম্মদের ধর্মজগৎ আচ্ছন্ন করল...সঙ্গীত, চিত্র ও প্রতিকৃতি এখানে নিষিদ্ধ... কোনও পুরোহিত, যাজক বা বিশপ নেই।" অবশ্য এর সঙ্গে সাম্যবাদের আদর্শও যুক্ত ছিল : "এ দেশীয় একজন রেড ইন্ডিয়ান যদি মুসলমান হয় তাহলে তুরস্কের বাদশাও তাঁর সঙ্গে একত্রে ভোজন করতে কুণ্ঠিত হবে না।" এই বাস্তবায়িত ভ্রাতৃত্ববোধকে তিনি "ইসলাম ধর্মের বিশেষ মহত্ত্ব"[৯১] বলে মনে করতেন। নবী যে ঈশ্বর-প্রেরিত তাঁর মহানুভবতাই তার বড় প্রমাণ। মহম্মদের বহুবিবাহ প্রসঙ্গে তিনি জোর গলায় বলেছিলেন যে সাধারণ মানুষের আচরণ এবং নীতি দিয়ে মহাপুরুষদের বিচার চলে না।[৯২]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধ এবং বুদ্ধের উপদেশ সম্বন্ধে বিবেকানন্দর যা বক্তব্য তারই মধ্যে তাঁর নিজের মূল্যবোধ এবং জীবনদর্শন প্রতিভাত হয়েছে। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে নরেন ও তাঁর সতীর্থগণ বৌদ্ধধর্মের নিয়ম-নীতি এবং দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।[৯৩] নিবেদিতার মতে অত্যন্ত সুচিন্তিত আবেগসহকারে তিনি বুদ্ধকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। তাঁর মতে মানব-ইতিহাসে বুদ্ধই একমাত্র "মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তি", "যুক্তিতে নির্ভুল" এবং "আশ্চর্যরকম সংবেদনশীল।" একমাত্র তিনিই "ধর্মকে অতিপ্রাকৃতের যুক্তি থেকে মুক্ত করেছেন।"[৯৪] ওই সন্ন্যাসীর প্রচণ্ড মানসিক শক্তি, এবং আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা, যেখানে কোনও দেবতাকে ডাকবার প্রয়োজন হয়নি—তাঁকে অভিভূত করেছিল। বুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনায় অন্য যে দিকটির উপর তিনি বারবার জোর দিয়েছেন, তা হল তাঁর 'বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য এবং মানুষের দুঃখনিবৃত্তির জন্য একান্ত নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা।[৯৫] বৌদ্ধধর্মই যে একমাত্র ধর্ম যা রক্তপাত ব্যতীতই প্রচার লাভ করেছে, এই ঘটনায় তিনি নিজের দেশ সম্বন্ধে এক রকমের গৌরব বোধ করতেন।[৯৬] বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে তাঁর খ্রিস্টধর্মের প্রতি ভালবাসা জন্মেছিল কারণ খ্রিস্টের আদর্শগুলি বুদ্ধের বাণী থেকে উদ্ভূত বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।[৯৭] এবং বলা বাহুল্য, ভারতের সব কিছুর মতই বৌদ্ধ ধর্মের উৎসও হল বেদান্ত। তবে তাঁর মতে অদ্বৈতবাদ অনেকাংশে বৌদ্ধধর্মের কাছে, প্রধানত মহাযান মতের কাছে ঋণী।[৯৮] তাঁর কাছে ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা এবং দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন পরস্পরের পরিপূরক। বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে সমকালীন ভারততাত্ত্বিকদের মতবাদ এ বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর মতে বৌদ্ধযুগই অতীতের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ভারতের প্রতিভার স্ফুরণের জন্য তিনি পরস্পর সম্পৃক্ত দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন :—"বৌদ্ধোপপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের শক্তির ক্ষয় ও রাজন্যবর্গের শক্তির বিকাশ।" পূর্ব যুগের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী সম্রাটগণ সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। "এই সময়ে ব্রাহ্মণশক্তির পুনরভ্যুত্থান রাজশক্তির সহিত সহকারিভাবে উদযুক্ত হইয়াছিল।"[৯৯] কিন্তু আবার বৌদ্ধধর্মই সামাজিক পরিস্থিতি, মানসিকতা নির্বিশেষে একই নীতি সব মানুষের উপর প্রয়োগ করতে গিয়ে, এক "অহিন্দু" ভ্রান্তির ফলে পতনের বীজ বপন করেছিল। বৈরাগ্য সকলেরই আদর্শ বলে প্রচারিত হওয়ায় ভারতীয় সভ্যতার পতন সূচিত হয়েছিল।[১০০] আবার বলি, সংবেদনশীলতা, মানবজাতির কল্যাণে আত্মত্যাগ, শক্তিমানের পক্ষে নিবৃত্তির পথ গ্রহণের মাহাত্ম্য প্রভৃতি যেগুলি তাঁর নৈতিক ও সামাজিক চিন্তার মৌলিক আদর্শ ছিল, তারই বৃহত্তর কাঠামোয় তিনি বৌদ্ধধর্মকে বুঝেছিলেন। পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্যে অস্বীকৃতি তাঁর এই উপলব্ধির অন্যদিক। তা ছাড়া এর মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জাতির ছবিও ফুটে উঠেছে, যে জাতি বিনা রক্তপাতে নিজের ধর্ম প্রচার করতে পারে। তিনি চেয়েছিলেন দেশবাসী এইসব আদর্শ অনুসরণ করুক। আশ্চর্য এই যে বুদ্ধের মাহাত্ম্যবর্ণন প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য নির্বাণ সম্বন্ধে তাঁর এতটুকুও মাথাব্যথা ছিল না, তার কারণ বোধহয় দুর্বল, দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে নির্বাণের চিন্তা অর্থহীন বলেই তাঁর মনে হয়েছিল। শক্তিশালী এবং জগৎ-মুখী পাশ্চাত্যদেশবাসীর মঙ্গলের জন্য তিনি যে আধ্যাত্মিকতা প্রচার করেছিলেন তার উৎস বেদান্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে দেখিয়েছি যে তাঁর সময়ে পাশ্চাত্য অনুসৃত খ্রিস্টধর্মের অনেক কিছুকেই তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। খ্রিস্ট এবং খ্রিস্টিয় জীবনধারার প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা বোধ করতেন, তার সঙ্গে এই নেতিবাচক মূল্যায়নকে মেলানো যায় না। রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর তিনি নিজে এবং তাঁর নির্দেশে তাঁর সতীর্থরা অনেকটা খ্রিস্টিয় রীতিতে কঠোর সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যেরা যেভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন, শোনা যায় সেই আদর্শ অনুসরণ করেই নরেনের নেতৃত্বে পরমহংসের শিষ্যরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন। বিবেকানন্দর লেখা প্রথম বইটি বোধহয় টমাস, এ. কেম্পিস-এর বাংলা অনুবাদ। প্রথম যে মঠ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে যীশু এবং সেন্ট পল-এর তৈলচিত্র সাজানো ছিল। মঠের সন্ন্যাসীরা বড়দিনের উৎসব পালন করতেন এবং প্রতিদিন বাইবেল পড়তেন। নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে বাইবেল পড়ে নরেন সান্ত্বনা পেতেন।[১০১] হিন্দু এবং খ্রিস্টিয় ধার্মিকতার মধ্যে একটা সাদৃশ্যের কথা তিনি প্রায়শই বলতেন। বৈষ্ণবদের পৌরাণিক কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু কৃষ্ণের শৈশবের সঙ্গে শিশু যীশুর প্রতি ভক্তি-ভাবের মধ্যে তিনি একটা সাদৃশ্য লক্ষ করেছিলেন। গোপীবল্লভের প্রতি গোপিনীদের ভালবাসা আর যীশুর প্রতি সন্ন্যাসিনী ক্যাথারিনের অনুরাগ একে অপরের প্রতিচ্ছবি বলে তাঁর মনে হয়েছিল। খ্রিস্টিয় ঐতিহ্য থেকে উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে গীতার মতই সেখানেও ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা বলা হয়েছে।[১০২] খ্রিস্টধর্ম অবশ্য দ্বৈতবাদীরূপেই পরিচিত এবং সেই হিসাবে তিনি যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে সাদৃশ্য থাকাটাই সঙ্গত। অবশ্য নীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অন্যান্য অ-হিন্দু ধর্ম অপেক্ষা খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে বিবেকানন্দর সংশয় বেশি ছিল। পাশ্চাত্যের প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের সমালোচনায় তিনি ঔপনিবেশিকতা বিরোধী ক্ষুরধার মন্তব্য করেছেন। উপরন্তু, ওই ধর্ম তাঁর মতে ইতিহাসের বিচারে পাশ্চাত্য দেশেরই ধর্ম। অন্যান্য জাতি, রাষ্ট্র ও ধর্মের কোনও কিছুকে সমালোচনা করবেন না মনস্থ করলেও[১০৩] "আমরা ও তাহারা"র দ্বৈতবাদ ইউরোপ সম্বন্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ। তিনি যা কিছু করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। পাশ্চাত্য ভ্রমণের উদ্দেশ্যই ছিল ধর্মকেন্দ্রিক, তাই খ্রিস্টধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রচেষ্টাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে হিন্দুমতের সঙ্গে বাইবেলে সুনির্দিষ্ট উৎপত্তিকালের তুলনা করে তিনি দুই ধর্মের মৌলিক পার্থক্যের উপর জোর দিয়েছেন।[১০৪] হিন্দুধর্ম তাঁর মতে মানবজাতির ধর্ম, খ্রিস্টধর্মসহ অন্যান্য প্রসারমান ধর্মের মত "প্রচারের" সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।[১০৫] দুটি মন্তব্যের মধ্যেই কিন্তু তুলনা ছাড়াও আরও কিছু বলা আছে। এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি খ্রিস্টধর্মের আদর্শগুলির তীব্র সমালোচনা করতেও ছাড়েননি। নিজের মুক্তির জন্য প্রার্থনাকে তিনি একজায়গায় "একধরণের স্বার্থপরতা" বলেছেন, এবং "অন্যের কাছে যে ব্যবহার আশা কর নিজে তাহাই কর"—এই উপদেশের অন্তর্নিহিত আত্মকেন্দ্রিকতাকে "ভয়ঙ্কর, বর্বর এবং অসত্য" বলেছেন।[১০৬] খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে তাঁর যে সংশয় তা যথার্থই সংশয়, শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার মানসিক প্রয়োজনে তা সৃষ্ট হয়নি। বাইবেলে উল্লিখিত মানুষের বন্দীদশা এবং ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর ক্রোধ সম্বন্ধীয় বিশ্বাসে তাঁর অশ্রদ্ধার কথা ভাই মহেন্দ্র লিখেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইবেল "সাধারণ ভক্তের" উপযুক্ত, আধ্যাত্মিক জ্ঞানসমৃদ্ধ ব্যক্তির জন্যে বেদান্ত।[১০৭]

বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুসন্ধানের সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব যুক্ত হওয়ায় তাঁর এই মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। বিবেকানন্দর ব্যাখ্যা অনুসারে বৈদান্তিক আদর্শে বিশ্বাস এবং সত্য দর্শন কারও একচেটিয়া অধিকার নয়, এই তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে। গুরুদেবের সর্বধর্মসমন্বয় তিনি যেভাবে বুঝেছিলেন তা থেকে তাঁর মনে এক বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ জন্মগ্রহণ করেছিল। এই বিশ্বজনীন ধর্মকে বুঝতে গেলে নতুন কোনও ধর্মমত প্রবর্তনের প্রয়োজন নেই, বরং সব ধর্মকে সজ্ঞানে সত্য বলে মেনে নিয়ে তাদের মৌলিক পার্থক্যগুলির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে হবে।[১০৮] পরধর্মসহিষ্ণুতার থেকে তা ভিন্নজাতের। মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব মাহাত্ম্য আছে। সারবত্তার দিক থেকে তাদের কোনও পার্থক্য নেই, বরং একে অন্যের পরিপূরক, কারণ মানুষ তো ভুল থেকে সত্যে নয়, বরং এক সত্য থেকে আরেক সত্যে উপনীত হয়েছে। এই বিশ্বজনীন ধর্মের কষ্টিপাথরে সব সভ্যতাকে বিচার করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই বিবেকানন্দর সব রচনা ও বক্তৃতায় সর্বপ্রকার গোঁড়ামির প্রতি ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে।[১০৯] বাস্তবে অবশ্য তিনি সর্বপ্রকার ধর্মীয় আচারের প্রতি সমমনোভাবাপন্ন ছিলেন না। নিবেদিতার সঙ্গে কথোপকথনে একবার তিনি তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপগুলিকে পৈশাচিক বলেছিলেন।[১১০] হিন্দুধর্মের অনেক আঙ্গিকেরও তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন, বিশেষত খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এবং প্রচলিত সংস্কারগুলিকে দৈবাজ্ঞা বলার প্রবণতাকে।[১১১] নব্য হিন্দুদের নিয়ে তিনি কৌতুক করতেন, যাঁরা "না জানেন এমন জিনিসটি নাই, বিশেষ টিকি হতে আরম্ভ করে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বকশক্তির গতিবিধি বিষয়ে সর্বজ্ঞ" এবং "দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতে অদ্বিতীয়।" ঠাট্টা করে বলতেন যে সৎ হিন্দু আবার এগুলি গভীরভাবে বিশ্বাসও করে।[১১২] বহুল-প্রচলিত হিন্দু লোকাচার-জনশ্রুতি ইত্যাদি নিয়েও ঠাট্টা করতে তিনি ভয় পাননি। এক বন্ধুর কাছে লিখেছিলেন: "জানকী বনে গিয়েছিলেন, রাম একা অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন—শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম বাবা!" কারণ "তদনন্তরং মহিষীং অশ্বসন্নিধৌ পাতয়েৎ"—মহিষীকে যজ্ঞের ঘোড়ার সঙ্গে সহবাস করতে হবে।[১১৩] পরাজিত বৌদ্ধ পণ্ডিতদের তুষানলে দগ্ধে মারার বিধান দিয়েছিলেন বলে বেদান্তে প্রগাঢ় আস্থা থাকা সত্ত্বেও তিনি শঙ্করাচার্যকে হৃদয়হীন, সঙ্কীর্ণমনা বলেছেন। যে সব বৌদ্ধ পণ্ডিত ওই সর্তে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাঁরা তাঁর মতে মূর্খ।[১১৪] আধুনিককালের অতিপ্রাকৃতবাদকেও তিনি ঘৃণা করতেন এবং কর্ণেল অলকট যে সব আচার-অনুষ্ঠান করতেন, তার জন্য তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন।[১১৫] বিবেকানন্দর ব্যক্তিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সংস্কারবিরোধী যুক্তিবাদ। যা কিছু যুক্তির উর্ধ্বে, একমাত্র অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝলে তবেই তিনি তা মেনে নিতেন। অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলীকে তিনি যে বিভ্রান্তি বলে মানতেন না, তা নয়, কারণ তাঁর নিজেরই এমন অনেক কিছুর অভিজ্ঞতা হয়েছিল যা তিনি বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধানে অতিপ্রাকৃতকে তিনি অবান্তর মনে করতেন, কারণ তা দিয়ে সত্যের উপলব্ধি হয় না।[১১৬]

বিবেকানন্দর চিন্তা এবং কাজের দুটি মৌলিক সূত্র ছিল। আধ্যাত্মিকতা এবং তার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি যে ধর্ম তাই তাঁর ব্যক্তিজীবনের এবং বিদেশ যাত্রার প্রধান উপলক্ষ। দ্বিতীয়টি হল গভীর জাতীয়তাবাদী মানসিকতা-প্রসূত দেশবাৎসল্য। দুটি সূত্র এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে তাঁর চেতনায় এদের পৃথক অস্তিত্ব খুঁজে বার করা শক্ত। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সেবার্থে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্য তিনি পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন। বেদান্তের যে বাণী এক বিশ্বজনীন ধর্মের ভিত্তি হতে পারে, তা প্রচারের জন্য তিনি বছরের পর বছর সেখানে বাস করেছিলেন। তাঁর আশা ছিল যে পাশ্চাত্য দেশবাসীর আধ্যাত্মিক মুক্তি মানবসমাজে নব অরুণোদয়ের সূচনা করবে। তবে সেই মুক্তি আসবে পাশ্চাত্যের উপর ভারতের আধ্যাত্মিক বিজয়ের মাধ্যমে। এর ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলির আনুগত্য এবং সামগ্রিক সাহায্য লাভ করে ভারতের দারিদ্র্য-মোচন হবে। দেশে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাবিস্তার এবং সমাজসেবার মাধ্যমে দরিদ্রের মঙ্গলবিধান। ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি একদল নিবেদিত-প্রাণ সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীকে বেছে নিয়েছিলেন: অদ্বৈতমতে বিশ্বাসী এই সেবকদলের নামকরণ করেছিলেন রামকৃষ্ণদেবের নামানুসারে। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'-এর সন্ন্যাসীদের মতই বিবেকানন্দও বিশ্বাস করতেন যে দেশের সেবার জন্য সন্ন্যাসগ্রহণ একান্ত আবশ্যিক। আধ্যাত্মিকতা এবং দেশপ্রেম তাঁর চেতনায় একই ধারায় প্রবাহিত ছিল। এক-আধবারই মাত্র জনসেবায় বিরক্ত বোধ করে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন হতে চেয়েছিলেন।

জাতীয়তাবাদ তথা বিদেশীদের প্রতি ঘৃণার মানসিকতা নরেনের বাল্যকালীন পরিবেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মনে হয় বালক নরেন বাল্যাবস্থাতেই এই মানসিকতা অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন। মাত্র আট বছর বয়সে বিদেশী শাসকের ভাষা বলে তিনি ইংরাজি শিখবেন না বলে জেদ ধরেছিলেন, শেষ পর্যন্ত অবশ্য মায়ের প্রচেষ্টায় সেই জেদ ছাড়েন।[১১৭] জাতীয় পুনর্জাগরণের জন্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা তিনি স্কুলজীবনেই উপলব্ধি করেছিলেন। "ন্যাশনাল" নবগোপালের ব্যায়ামাগারে কঠিন শরীরচর্চার মাধ্যমে দৌর্বল্য মোচন করার জন্য বাঙালি ছেলেদের উৎসাহ দেওয়া হত, নরেন সেখানকার একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। জিমনাস্টিক, কুস্তি, ছোরাখেলা ও লাঠিখেলায় নরেন অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।[১১৮] তাঁর চরিত্রের সহজাত বলিষ্ঠতা এবং পৌরুষ পুরুষের অপৌরুষোচিত ব্যবহার অথবা নারীসুলভ নমনীয়তাকে বরদাস্ত করতে পারেনি। পুরুষের এইসব লক্ষণকে তিনি জাতীয় পুনর্জাগরণের বিঘ্ন মনে করতেন।[১১৯]

তাঁর উগ্র জাতীয়তাবোধ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার মানসিকতা জীবনের বহু ঘটনায় প্রতিফলিত হয়েছে। রাস্তার মোড়ে অজ্ঞ খ্রিস্টান পাদ্রীর হিন্দুধর্মের সমালোচনাকে যৌবনে তিনি প্রত্যাঘাত করতে ছাড়েননি।[১২০] পাদ্রীদের এই অপপ্রচার তাঁর মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল, এবং খ্রিস্টধর্মের মূল্যায়নে তার প্রভাবটি ধরা পড়েছে। "পরাজিত জাতির প্রতি অবিশ্রান্ত গালিবর্ষণের" প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তিনি।[১২১] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীতে তিনি সতী, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কদর্য প্রথাগুলিকে হয় অস্বীকার করেন, না হয় যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেন। বিদেশীদের গালিবর্ষণের বিরুদ্ধে তিনি যে দেশকে রক্ষা করার মত সাহস দেখাতে পেরেছেন, এরজন্য তিনি গর্ববোধ করতেন।[১২২] "যা কিছু ভারতীয় তার জন্য তাঁর শ্লেষাত্মক মার্জনাভিক্ষা"র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা উল্লেখ করে নিবেদিতা লিখেছেন, "জাতির মানরক্ষা অযৌক্তিক এবং অশোভন হলেও তা অসাধারণ সুন্দর এবং পুরুষোচিত।"[১২৩] ভারতে সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তিনি বলতেন যে রামকৃষ্ণের পরই তিনি সংস্কারক বিদ্যাসাগরকে মান্য করেন। কিন্তু একথাও বলতেন, "তাই বলিয়া সংবাদপত্রের ইংরাজের কাছে সে সকল ঘোষণা করিবার আবশ্যক কি? ঘরের গলদ বাহিরে যে দেখায়, তাহার মত গর্দভ আর কে আছে?"[১২৪] বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও তাঁর সন্ন্যাসীর গেরুয়া বসন ইউরোপে যে রকম সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তাতেই তাঁর কাজ হয়েছিল, ঐ গেরুয়া বসন ছিল প্রতিবাদ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতীক। ভারতের সামাজিক রীতিনীতির পাশ্চাত্যকরণ তিনি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না।[১২৫] জনৈক শিষ্য একবার তাঁর গুরুদেবকে "লর্ড রামকৃষ্ণ" বলে সম্বোধন করায় তিনি তাঁকে বিদ্রূপের কশাঘাত করেছিলেন।[১২৬] এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরক্ত উত্তর মনে পড়ে: "এ বাড়ীতে মিষ্টার বঙ্কিমচন্দ্র বলে কেউ থাকেন না।"

ভারতের গৌরবময় অতীতে গর্ববোধ, বিশেষত আধ্যাত্মিক জ্ঞানে হিন্দু ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্ব, এবং যা কিছু ভারতীয় তার বলিষ্ঠ অনুমোদন—এ সব কিছুতেই বিবেকানন্দর চিন্তাধারা তাঁর সমকালীন ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙালিদের ভাবধারার অনুসারী ছিল। কিন্তু তাঁর দেশপ্রেমের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল তা হল দরিদ্র এবং শোষিত জনগণের সঙ্গে একাত্মতাবোধ এবং মানবসভ্যতার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তাদের উপর যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত অবিচার সম্বন্ধে বেদনাবোধ।[১২৭] দরিদ্রের প্রতি সমবেদনা এবং শোষিতের হয়ে ওকালতি করা যে সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনায় ছিল না, তা নয়। নীলচাষীদের সম্বন্ধে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ঐকান্তিকতা এবং কৃষকদের দুর্দশা সম্বন্ধে বঙ্কিমের আবেগপূর্ণ বিবরণ সমবেদনার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[১২৮] কিন্তু এই মনোভাবকে কার্যকরী কর্মসূচিতে রূপায়িত করার কোনও প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। তাছাড়া উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকের কাছে জনসাধারণ অবিসংবাদীরূপে "ওরা"। তুলনায় বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন যে নতুন ভারতবর্ষের জন্ম হবে "চাষার কুটীর ভেদ করে, কারখানা থেকে।"[১২৯] উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তীকালের সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদীরা 'আনন্দমঠ'-এর উগ্র দেশপ্রেমিকতা এবং বিবেকানন্দর দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু জনগণের দুঃখদুর্দশা সম্বন্ধে বঙ্কিমের পর্যালোচনা এবং দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করবার জন্য বিবেকানন্দর আহ্বান জাতীয়তাবাদী মানসিকতায় বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। বিংশ শতকের প্রথম ভাগের আত্মবলিদানকারী বিপ্লবীরা অভুক্ত জনগণের প্রতি সন্ন্যাসীদের যে সক্ষোভ সমবেদনা, তার মর্ম বোঝেননি। ফলত, মধ্যবিত্ত মানসিকতার ঊর্ধ্বে ওঠার চেয়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াও তাদের কাছে সহজ মনে হয়েছিল।

বিবেকানন্দর বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁকে এই গণ্ডি উত্তরণে সাহায্য করেছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার পর তিনি সর্বপ্রকার ঐহিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেন। তা সত্ত্বেও, সন্ন্যাসগ্রহণের অত্যাবশ্যক নিয়মানুসারে তিনি যখন কপর্দকহীন সন্ন্যাসীরূপে একাকী সারা ভারত পর্যটন করছিলেন, তখনও কিন্তু দেশবাসীর দারিদ্র্যের অনুভূতি তাঁর দেশপ্রেমিকতার ভিত্তি হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, যুবক নরেন্দ্র যে রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল নিতান্তই সমাজের বাইরে, নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধ্যাত্মিক সন্ধিৎসা মাত্র। শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং গুরুর মৃত্যুর পর অনুসৃত আধ্যাত্মিক অধ্যবসায়ের মধ্যেও ধর্ম ব্যতীত কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।[১৩০] তবে যে মায়া থেকে তিনি মুক্তি চাইছিলেন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক অহমিকা থেকে উদ্ভুত জাতীয়তাবাদও তার মধ্যেই ছিল। সর্বাত্মক, নিরবচ্ছিন্ন সমাধির জন্য নরেনের আগ্রহকে স্বার্থপরতা বলে তিরস্কার করেছিলেন রামকৃষ্ণ, কারণ মানবজাতির প্রতি যে তাঁর কর্তব্য ছিল। "কর্তব্য" বলতে গুরুদেব দারিদ্র্যমোচন বুঝেছিলেন কিনা, তা বোঝা যায় না।[১৩১] কয়েক বছর দারিদ্র্যের নগ্ন রূপ প্রত্যক্ষ করে বিবেকানন্দ ভারতের দরিদ্র-শ্রেণীর বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন।[১৩২] ভিক্ষা অথবা দানের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও নিশ্চয়ই দারিদ্র্যের নগ্নরূপ দেখেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দর ক্ষেত্রে বলা যায় যে তাঁর গভীর আবেগপূর্ণ মানসিকতার উর্বর ক্ষেত্রে ভারতের দারিদ্র্য সম্বন্ধে চিন্তার বীজ উপ্ত হয়েছিল।[১৩৩] তাছাড়া, দেশময় ভয়াবহ দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতায় ভারতীয় ঐতিহ্যে তাঁর গর্ববোধ ভীষণ রকম ধাক্কা খেয়েছিল। এর একটা প্রতিবিধান করার প্রচেষ্টা তাঁর পাশ্চাত্যভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।[১৩৪] বস্তুগত অভাববোধ সম্বন্ধে তাঁর মানসিকতায় একটা বৈপরীত্য ছিল। দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা তাঁর আগেই হয়েছিল এবং পিতার মৃত্যুতে যখন তাঁর বিলাস-বহুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল এবং তাঁদের পরিবার নিদারুণ দারিদ্র্যের সম্মুখীন হল, তখন তাঁকে অনশনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।[১৩৫] তার পরই তিনি চূড়ান্তভাবে সন্ন্যাসগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। বরানগরে তরুণ সন্ন্যাসীদলের কঠোর সাধনার মধ্যে বঞ্চিত জীবনকে আনন্দে বহন করার নিদর্শন পাওয়া যায়, কারণ কামকাঞ্চন বর্জন এই প্রক্রিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ক্ষুধার জ্বালা এইভাবে সহ্য করেও কিন্তু তাঁর মনে দরিদ্রের প্রতি কোনও সহানুভূতির উদ্রেক হয়নি। পরিব্রাজকরূপেই তিনি প্রথম দেশের বাস্তব অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বারবার বুভুক্ষার জ্বালার কথা উল্লেখ করেছেন।[১৩৬] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার ঠিক আগে একাকী পরিভ্রমণের পর এক বন্ধুর কাছে তিনি মনের কথা ব্যক্ত করে বলেছিলেন যে, যে ঈশ্বরকে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর দেখা পাননি বটে, তবে মানুষকে ভালবাসতে শিখেছেন।[১৩৭] এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি বুঝেছিলেন যে জীবনের দুঃখকষ্টকে ভাগ্য বলে মেনে নেওয়ার কোনও অর্থ হয় না। এবং সাহায্যের জন্য অর্থসম্পদে সম্পন্ন পাশ্চাত্যের কাছে যখন হাত পেতেছেন, তখন যে শক্তি ও সমাজব্যবস্থার গুণে তাদের প্রাচুর্য এসেছে, তার প্রশংসা করেছেন। নিজেও যে তিনি বঞ্চিতদের একজন, এই বোধ আবার পাশ্চাত্যদের সঙ্গে বৈষম্য এবং জগতের অসাম্যের প্রতি তাঁকে স্পর্শকাতর করে তুলেছিল। তিনি ছিলেন পরাধীন জাতির জাতীয়তাবাদী সন্ন্যাসী, সাম্যনীতিতে তাঁর দৃঢ় আস্থা, তাই পাশ্চাত্যের হিতবাদী দর্শনের ঐহিকতা তাঁকে ক্ষুণ্ন করেছিল।

উনবিংশ শতকের ভারতের পটভূমিকায় জাতীয় পুনর্জাগরণের জন্য তাঁর অসাধারণ পরিকল্পনা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল দরিদ্র এবং নিরক্ষর জনগণ এবং তাঁর পরিকল্পনা ছিল শিক্ষার মাধ্যমে তাদের জাগরিত করা। অর্থসংগ্রহের আশায় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে সংগৃহীত একদল নিবেদিত-প্রাণ সন্ন্যাসী সব জাতির "দরিদ্রনারায়ণের" সেবায় সেই অর্থ বিনিয়োগ করবে।[১৩৮] মানচিত্র, ভূগোল, চলচ্চিত্র ইত্যাদির সাহায্যে সমাজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিম্নতম পারিয়া, চণ্ডাল এদের অজ্ঞতা দূর করতে হবে। স্পষ্টতই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে বঞ্চিতেরা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনে নিজেদের অধিকার দাবি করতে পারে। মহীশূরের মহারাজার কাছে তিনি লিখেছিলেন: "আমাদের নিম্ন-শ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা।.... তাহাদিগকে ভাল ভাল ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা উপহার ফলস্বরূপ আপনিই আসিবে।"[১৩৯] তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘের সন্ন্যাসীরা, সমাজসেবায়, বিশেষত দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর সময় ত্রাণকার্যে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁদের কাজকে বিবেকানন্দ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু যুগ যুগ ধরে পুরোহিত এবং ক্ষত্রিয় শ্রেণীকর্তৃক পদদলিত জনগণের মধ্যে আত্মমর্যাদা এবং মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তোলার প্রধান কার্যসূচির মধ্যে এধরনের কাজ নিতান্তই প্রান্তিক।[১৪০] গান্ধী নেতৃত্বের আগে ভারতের সমাজ-দর্শনে এই আদর্শ একেবারেই ছিল না।

জাতীয় পুনর্জাগরণের কর্মসূচির মধ্যে দেশের অপেক্ষাকৃত সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি অন্যরকম কাজের কথা ভেবেছিলেন। পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণের আগে এ বিষয়ে তিনি বিশেষ চিন্তা করেছিলেন বলে মনে হয় না। অবশ্য দেশের শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে একদল কর্তব্যপরায়ণ সন্ন্যাসী বেছে নেওয়ার কথা তিনি আগেই ভেবেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্রদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করা, এবং বেদান্তের বাণী প্রচার সেই শিক্ষাদানের অন্তর্গত। পশ্চিম থেকে ফিরে এসে তিনি পুরুষোচিত গুণের বিকাশ, পাশ্চাত্যধরনে ঐহিক সুখ অর্জনের প্রচেষ্টা প্রভৃতিকে জাতীয় পুনর্জাগরণের প্রথম পদক্ষেপ বলে প্রচার করেন।[১৪১] তাঁর মতে আধ্যাত্মিকতা এবং বেদান্ত দুর্বলের জন্য নয়। পৌরুষ কিভাবে আয়ত্ত করা যাবে তা অবশ্য তিনি ব্যাখ্যা করেননি। এই কাজে ব্রতীর সন্ন্যাসগ্রহণের উপর তিনি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে স্বার্থহীন এই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য জাগতিক সুখভোগে বৈরাগ্য অবশ্য প্রয়োজন। এমনকি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রয়োগকৌশল আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যে কঠোর পরিশ্রম এবং মনোযোগ দরকার তার জন্যও কিছুটা ভোগসুখ বর্জনের প্রয়োজন হয় বলে তিনি দেখিয়েছেন।[১৪২] কিন্তু বৈরাগ্য হল শক্তিমানের ধর্ম। দুর্বল এবং অবক্ষয়িত জাতির পক্ষে প্রথমে জাগতিক ভোগসুখ লাভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে রজোগুণ আয়ত্ত করা প্রয়োজন। যে সব শক্তিশালী জাতির পার্থিব সম্পদ আত্মিক দৈন্য ঘটিয়েছে, আধ্যাত্মিকতা তাদের জন্যই বেশি প্রয়োজন। কীভাবে জাতির দারিদ্র্যমোচন করা যায় সে বিষয়ে তাঁর চিন্তার অন্ত ছিল না। একজন শিষ্যকে তিনি ভারতীয় হস্তশিল্প সামগ্রী বিদেশে বিক্রী করার চেষ্টা করতে বলেন।[১৪৩] প্রথমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার সময় জাহাজে টাটা তাঁর সহযাত্রী ছিলেন, তাঁকে তিনি জাপানী পণ্যের দালালী না করে দেশে দেশলাই কারখানা স্থাপনের পরামর্শ দেন।[১৪৪] জাপানের শিল্পায়নে তিনি খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।[১৪৫] কিন্তু শক্তিবৃদ্ধি, আত্মনির্ভরতা এবং দারিদ্র্যমোচনের আহ্বানের সঙ্গে তিনি কোনও সংগঠিত কার্যসূচি দিতে পারেননি।[১৪৬]

বিদেশে প্রদত্ত বক্তৃতায় যদিও তিনি অনেকবারই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কঠোর সমালোচনা করেছেন, তবুও, জাতীয় পুনর্জাগরণের বিষয়ে তিনি যে জোর দিয়েছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কোনও উল্লেখ কখনওই করেননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন: "আমি রাজনীতিজ্ঞ নই, রাজনৈতিক আন্দোলনকারীও নই, আত্মাই আমার একমাত্র বিবেচ্য। কলকাতার লোকেদের জানিয়ে দিও যেন আমার লেখায় অযথা কোনও রাজনৈতিক তাৎপর্য না জুড়ে দেওয়া হয়।"[১৪৭] অবশ্য তাঁর এই প্রতিবাদ যে একটু অতিরঞ্জিত, তা প্রমাণ করার পক্ষে বেশ কিছু উদাহরণ আছে। বিপ্লববাদী কার্যকলাপের প্রতি তাঁর সহানুভূতির কথা নানাধরনের সূত্রে জানা যায়। ভাই মহেন্দ্রকে তিনি বলেছিলেন যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যদি সত্যিই কিছু করতে চায়, তবে আগের শতাব্দীর মার্কিনীদের উদাহরণ নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করা উচিত।[১৪৮] ঢাকায় যে সব তরুণ বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে একজন লিখেছেন যে তিনি তাঁদের ঝাঁসীর রানীর আদর্শে, 'আনন্দমঠ'-এর সন্তানদলকে অনুসরণ করে দেশকে মুক্ত করবার উপদেশ দিয়েছিলেন।[১৪৯] একটি সুপরিচিত অনুচ্ছেদে তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে অতীতে বহু জাতি অন্য জাতির সঙ্গে শত্রুতার মাধ্যমে উন্নতি লাভ করেছে।[১৫০] ক্যাপ্টেন র‍্যাণ্ডের হত্যাপরাধে যে চাপেকার ভাইদের ফাঁসী হয়েছিল, শোনা যায় তিনি তাদের স্বর্ণমূর্তি স্থাপন করার কথা বলেছিলেন। সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে স্বামীজী "বিদ্রোহের জন্য স্থিতধী এবং অকুণ্ঠ মনোবলের অধিকারী যুবকদের সন্ধান করছিলেন।" জার্মান ষড়যন্ত্রের কর্ণধার যতীন মুখার্জিকে তিনি বলেছিলেন যে মানব জাতির আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার জন্য ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিশেষ প্রয়োজন।[১৫১] অবশ্য এইসব মন্তব্যকে জোরদার করবার মত উপাদান পাওয়া যায় না। বরং 'স্বামী শিষ্য সংবাদের' মত নির্ভরযোগ্য রচনার একটি অনুচ্ছেদ দেখানো হয়েছে যে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রচেষ্টাকে তিনি নিছক পাগলামি বলে মনে করতেন।[১৫২] প্রগাঢ় মানবিকতায় বিশ্বাসী বিবেকানন্দর বক্তব্য যে সব সময় একই মতানুসারী হত, তা নয়। বিপ্লববাদের প্রতি তাঁর সপ্রশংস মনোভাবের বিবরণ হয়ত সত্য হতেও পারে। তা হয়ত রাজনৈতিক পরাধীনতার প্রতি তাঁর চূড়ান্ত বিরূপতার প্রকাশ। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বিজয়ের ইতিহাস যে তাঁর বিরক্তির কারণ সেই বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে তাদের সমাজের মূল্যায়নে।

এই গ্রন্থে যে তিনজন মনীষীর প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একা বিবেকানন্দই পাশ্চাত্যদেশে গিয়েছিলেন। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এবং ভারত সম্বন্ধে অজ্ঞতাজনিত বিরূপতার বিরুদ্ধে ভারতের জীবনধারা এবং দর্শনের সার্থক প্রবক্তারূপে তিনি সেখানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেশে এবং বিদেশে বিদেশী পুরুষ-মহিলা সকলের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়েছে। তবে অবশ্য কলকাতার রাস্তায় হিন্দু-বিদ্বেষী পাদ্রী অথবা ট্রেনে জাতিবিদ্বেষী সাহেবদের কথা আলাদা, তাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্য ভ্রমণের সময় জাহাজের দিনগুলিতেও জাতিবিদ্বেষের ঘটনা নিয়মিত ছিল। দেশের কোনও শহরে মহামারী দেখা দিলে সংক্রমণের ভয়ে শুধু ভারতীয়দেরই জাহাজঘাটায় ঢুকতে দেওয়া হত না।[১৫৩] জাহাজ শ্রীলঙ্কা ছেড়ে গেলেই যে শ্বেতকায় যাত্রীদের ব্যবহার পালটে যায় তাতে বিবেকানন্দ বেশ মজা পেতেন। কিন্তু দেশে যখন তাঁর নামডাক হয়নি, অথবা পরে যখন তিনি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তখন যে কজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউরোপীয়র সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, তাঁরা সকলেই অত্যন্ত ভদ্র ছিলেন এবং তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে অধ্যক্ষ হেস্টির অত্যন্ত উচ্চধারণা ছিল, এমনকি, রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর কৌতূহল উদ্রেকের পিছনেও হেস্টির কিছু অবদান ছিল। পরিব্রজ্যার সময়ে গাজীপুরে রস, কর্নেল রিভেট-কার্নাক এবং জেলা-বিচারক পেনিংটন সহ অনেক ব্রিটিশ কর্মচারীর সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় এঁরা অভিভূত হয়েছিলেন। বিচারক-মহাশয় তরুণ সন্ন্যাসীকে ইংল্যান্ডে যাবার উপদেশ দিয়েছিলেন, এমনকি নিজে তার খরচ বহন করবার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।[১৫৪] পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের বহু শিষ্য, পৃষ্ঠপোষক এবং বন্ধুর সঙ্গে স্বামীজীর যে গভীর ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল, এগুলি তারই মাঙ্গলিক পূর্বাভাস।

পাশ্চাত্যদেশে বিবেকানন্দর পরিব্রজ্যা বিষয়ে তাঁর অনেকগুলি জীবনীগ্রন্থই বহু তথ্যসমৃদ্ধ—ইংল্যান্ড ভ্রমণ সম্পর্কে মেজোভাইয়ের লেখা, শিষ্যদের স্মৃতিচারণ এবং সর্বোপরি মারি লুই বার্ক এ বিষয়ে আহরিত সমস্ত তথ্যের সুবিশাল সংক্ষিপ্তসার করেছেন। বিশাল তথ্যভাণ্ডারকে আমি ক্ষুদ্রাকারে দেখাতে চাই না, বরং তাঁর পাশ্চাত্য সভ্যতার উপলব্ধি এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে, তারই কয়েকটি বেছে নেব।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে মে তিনি জাপান হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পথে প্রথম যাত্রা করেন এবং ১৪ই জুলাই ভ্যাঙ্কুবার পৌঁছান। শিকাগোর ধর্মসভায় তাঁর সাড়া জাগানো বক্তৃতা এবং মার্কিনদেশের সংবাদপত্রে তার ব্যাপক এবং সপ্রশংস বিবরণ প্রকাশিত হবার পরই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চল এবং পূর্ব উপকূলে বক্তৃতাদানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যেখানেই গেছেন সেখানেই বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি নিউ ইয়র্কে নিয়মিতভাবে যোগ এবং বেদান্ত শিক্ষা দিতে থাকেন। এই প্রচেষ্টার পরিণতি হয়েছিল ওদেশে বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রীষ্মে থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে শারীরিক প্রয়োজনে বিশ্রাম গ্রহণের পর স্টার্ডি এবং মিস ম্যুলার নামক দুই অত্যুৎসাহী ব্রিটিশের আমন্ত্রণে তিনি ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইংল্যান্ড পর্যটনকালে তিনি বক্তৃতা দেন এবং অধ্যাপনা করেন, মাঝে ডিসেম্বর, ১৮৯৫ থেকে এপ্রিল, ১৮৯৬ পর্যন্ত স্বল্পকালের জন্য মার্কিনদেশে যান, এবং কিছুকাল ইউরোপ মহাদেশে পরিভ্রমণ করেন। ১৮৯৬-এর ডিসেম্বরে তিনি ইংল্যান্ড থেকে ইতালি হয়ে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৮৯৯-এর জুন মাসে তিনি আবার ইংল্যান্ড হয়ে মার্কিন দেশে যাত্রা করেন এবং দিন পনেরো ইংল্যান্ডে থেকে অগস্ট মাসে নিউ ইয়র্কে পৌঁছান। দ্বিতীয়বারের যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কালিফোর্নিয়া ভ্রমণ: লস এঞ্জেলেস, পাসাডোনা এবং সান-ফ্রান্সিস্কোতে একটানা বক্তৃতাদান এবং অধ্যাপনার ফলে সান-ফ্রান্সিস্কোতে আমেরিকার দ্বিতীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা হল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে পারীতে ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস বিষয়ক সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি নিউ নিয়র্ক থেকে জাহাজে ওঠেন। পারীতে তিনমাস পর্যটনের পর ফরাসীদেশের প্রধানা গায়িকা এমা কালভের অতিথিরূপে তিনি ভিয়েনা, গ্রীস এবং কনস্ট্যান্টিনোপল হয়ে ইজিপ্টে ছুটি ভোগ করবার উদ্দেশ্যে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে পাড়ি দেন। ওই বছরই ২৬শে নভেম্বর তিনি ভারতের পথে যাত্রা করেন। জাপান হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে—মার্কিন দেশ এবং বিলাত—যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর কাজে পরিণত হয়নি। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে উনচল্লিশ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। অতি সংক্ষিপ্ত জীবনের প্রায় পাঁচ বছর তিনি পাশ্চাত্য দেশে কাটিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই তিনি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যে কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁর উপলক্ষ যতটা বিদেশে ছিল ততটাই ছিল দেশে।

শুধুমাত্র, দেশে তাঁর যা উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্যদেশে তার থেকে একেবারেই আলাদা। দেশের পুনরুজ্জীবন ঘটানো তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য এবং রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর সেই উদ্দেশ্যের হাতিয়ার। দেশের প্রতি কর্তব্যসাধন, দেশের জন্য সন্ন্যাসগ্রহণ এবং পুরুষোচিত গুণের স্ফূর্তির উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বেদান্তের বাণীর ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। দেশে যখনই তিনি বেদান্তের কথা বলেছেন, তখনই ওই প্রাচীন দর্শনের অন্তর্নিহিত নির্ভীকতা এবং নিঃস্বার্থতার উপর জোর দিয়েছেন। ভারতবাসীর কাছে বেদান্তের আধ্যাত্মিকতার চেয়ে নৈতিকতার বাণীই বেশি দরকারী। পাশ্চাত্যে এক বিশ্বজনীন ধর্মের ভিত্তিরূপে তিনি বেদান্তের পরম আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচার করেছেন।

প্রথম বারো মাস আমেরিকায় থাকতে থাকতেই বিবেকানন্দর সে দেশে যাওয়ার উদ্দেশ্য বদলে গিয়েছিল। যেখানে তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন, সেই শিকাগো ধর্মসভাতেই পরিবর্তনের প্রথম সূচনা। শুরুতে তাঁর কাছে "আমেরিকাই একমাত্র স্থান, যেখানে সব কিছুর সাফল্যের সম্ভাবনা আছে।"[১৫৫] এবং প্রথমে তাঁর সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য কিছু কিছু "চিন্তাধারা এবং স্বাভাবিক সাহায্য সংগ্রহের" আশায়, যাতে একটি সংস্থা গঠন করে ভারতীয় জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া যায়, কিন্তু অচিরেই সেই উদ্দেশ্যের পরিবর্তে তিনি "অন্যান্য বক্তাদের মতই" চলার সিদ্ধান্ত নেন।[১৫৬] এই পর্যায়ের বক্তৃতায় তিনি প্রধানত ভারতের সমাজ ও ধর্মকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন, বোঝাবার চেষ্টা করতেন যে খ্রিস্টান পাদ্রীরা যেমন প্রচার করেন ভারতীয়রা সেরকম বর্বর নয়, এবং মার্কিন সমাজের নীতিবোধ নিয়ে লঘু ঠাট্টা করতেন। এসব কিছুর মধ্যেও দেশের কথা তিনি বিস্মরণ হননি।[১৫৭] মাদ্রাজের শিষ্যদের কাছে তিনি বলেছিলেন: "ভারতবাসীর জন্য, দরিদ্র ভারতবাসীর জন্যই আমি পাশ্চাত্যদেশে যাচ্ছি।"[১৫৮] আমেরিকায় লব্ধ অভিজ্ঞতায় নতুন নতুন চিন্তা জন্ম নিয়েছিল। ধর্মসভায় তাঁর বক্তৃতায় অভাবিত আশাপ্রদ সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। ১৮৯৩-এর শরৎকালে মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে তাঁর বক্তৃতায় শ্রোতার ভীড় এবং সে দেশের উচ্চবর্গের সঙ্গে তাঁর ক্রমবর্ধমান পরিচিতি তাঁর মনে নতুন সম্ভাবনার আশা জাগিয়েছিল। ১৮৯৪-এর ডিসেম্বরের একটি চিঠিতে তিনি মার্কিনীদের সামাজিক উচ্চমান এবং আধ্যাত্মিক নিম্নমানের কথা লিখেছেন: "তাদের আমরা আমাদের আধ্যাত্মিকতা শেখাব এবং তাদের সমাজের যা কিছু ভাল তা নিজেরা গ্রহণ করব।"[১৫৯] পরের মাসেই আর এক বন্ধুকে লেখেন, "এদের spirituality দিচ্ছি এরা আমায় পয়সা দিচ্ছে।" এখানে তাঁর নিজের উদ্দেশ্য যেমন স্পষ্ট, তেমনি আবার যাঁরা তাঁর কাছে এসে ভীড় জমাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ক্ষুধাও স্পষ্ট।[১৬০] রামকৃষ্ণের বাণী 'এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত' প্রচার করার তাঁর যে অস্পষ্ট বাসনা ছিল তা এ সময়েই সুস্পষ্ট রূপ নিতে শুরু করেছিল।[১৬১] ইতিমধ্যে, শিকাগো-পরবর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্তৃতাগুলিতে তিনি সর্বধর্মের মৌলিক ঐক্যের উপরে নতুনভাবে জোর দিচ্ছিলেন। সর্বধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে একটি সার্বজনীন ধর্মের সম্ভাবনার কথাও স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছিলেন।[১৬২] ধর্মের মৌলিক সত্যগুলির ব্যাখ্যার মধ্যে আর্যজাতির এক ঐক্যবদ্ধ সভ্যতার আশাও নিহিত ছিল।[১৬৩] ১৮৯৪-এর জুলাই-অগস্টে গ্রীনএকার (মেন) ধর্মীয় সম্মেলনের উদ্যোগে তিনি গ্রীণএকারে নিয়মিতভাবে শিক্ষকতা করেন। শোনা যায়, এইভাবে দর্শন তথা ধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে অদ্বৈত বেদান্ত এবং রাজযোগ শেখানোর মধ্যে দিয়েই তিনি মার্কিনীদের অধ্যাত্মশিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১৬৪]

ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য আগামী মানুষের একান্ত প্রয়োজন বলে যে তাঁর বিশ্বাস ছিল, নিউ ইয়র্কে বেদান্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।[১৬৫] তাঁর বক্তৃতাবলী ক্রমশই বেদান্তে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল এবং অধ্যাত্মবিজয়ের এই নতুন পরিকল্পনায় সাহায্য করবার জন্য তিনি দেশে তাঁর সতীর্থ সন্ন্যাসীদের কাছে লোক চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।[১৬৬] একটি পর্যায়ে তাঁর এই উদ্দেশ্য জাতীয় স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে গিয়েছিল। বেদান্ত তখন তাঁর কাছে সমগ্র মানবজাতির প্রতি ভারতের অবদান; শক্তিশালী পাশ্চাত্য জাতিগুলির পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যেই তিনি তাদের কাছে বেদান্তের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ অধ্যাত্মজ্ঞানলাভের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিসামর্থ্য একমাত্র তাদেরই ছিল।[১৬৭] স্বামীজীর স্বপ্নের নতুন পৃথিবীতে মানুষের চূড়ান্ত ঐহিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের মধ্যে একটা ভারসাম্য রচিত হবে। অবশ্য জাতীয় স্বার্থের কথাও তিনি বিস্মরণ হননি। তবে তখন অর্থসংগ্রহই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তার সঙ্গে ভারতকে শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের প্রভুত্ব এবং দাসত্বের সম্পর্কটির পুনর্বিন্যাস করার উদ্দেশ্য যুক্ত হয়েছিল। ভারতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে পাশ্চাত্যদেশবাসী বন্ধুরূপে তাকে স্বতঃপ্রণোদিত সাহায্য করবে।[১৬৮] মার্কিনদেশে তিনি যে বিপুল অভ্যর্থনা, অগণিত বন্ধু ও শিষ্য এবং সাদর আপ্যায়ন লাভ করেছিলেন পৃথিবীর সর্বত্র যেন তিনি সেরকমটিই আশা করেছিলেন। পশ্চিম জগতের বহু নরনারীর শিষ্যত্ব গ্রহণের ফলে তিনি যে শ্রদ্ধার আসনটি পেলেন তারই প্রতিচ্ছবি তিনি মানসচক্ষে দেখলেন—তাঁর মাতৃভূমি তথা দেশবাসী যেন পাশ্চাত্য জগতের আধ্যাত্মিক দীক্ষাগুরু রূপে প্রতিষ্ঠিত। এক অবহেলিত জাতির একজন নাগরিক যদি এই সম্মান লাভ করতে পারে, তবে যে ঐতিহ্যের ফলে তা সম্ভব হয়েছে, সেই ঐতিহ্য সমগ্র দেশটিকেও সেই সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। নতুন সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা আসবে বলেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন। আগেই দেখিয়েছি যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অন্য কোনও পথে স্বামীজীর আস্থা ছিল না।

কোন বিদেশী সংস্কৃতি তাঁকে কেমনভাবে গ্রহণ করেছে—সেই বিচারে যদি সেই মানুষটি সেই সভ্যতার মূল্যায়ন করেন, তাহলে বলতে হয় বিবেকানন্দ যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে অনেক কিছুই ভাল দেখেছেন তা খুবই সঙ্গত হয়েছে। একথা ঠিক যে, উনবিংশ শতকের মার্কিন দেশে বা ইউরোপে অন্যদেশের আর কোনও নারী বা পুরুষই এতখানি সম্মান পাননি। পাশ্চাত্য সমাজের বিদগ্ধ অভিজাতমহলে তাঁর যে অবাধ গতিবিধি ছিল, সেই সময়কার অশ্বেতাঙ্গ অন্য কেউ সে সুযোগ পাননি। তাছাড়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদেশে যখন গেছেন তখন যে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুলশীল সেই কথা মনে রেখে তাঁর বিপুল সাফল্যের পরিমাপ করতে হবে। শিকাগোর ধর্মসভায় বক্তৃতাদানের আগে কজনই বা তাঁর নাম শুনেছিল! প্রথমে মার্কিন দেশে, পরে ইংলন্ড ও ফ্রান্সে হিন্দু আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যা করে তিনি জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। পশ্চিম জগতে তাঁর সম্মানের বিবরণ পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েই দেশবাসী দেশে সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করে। ভাই মহেন্দ্র লিখেছেন যে পশ্চিমেই তাঁর ব্যক্তিত্ব পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল এবং যখন দেশে ফিরলেন তখন আর তিনি আগের মানুষটি ছিলেন না। এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হয়ত যে তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য, তবে এটাও ঠিক যে, তাঁকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা থেকে উত্তরণ এবং যাদের মতামতকে তিনি মূল্য দিতেন তাদের প্রশংসোবাক্য তাঁর ব্যক্তিত্বের স্ফূরণে বিশেষ সাহায্য করেছিল। পাশ্চাত্যদেশে তিনি যা যা করেছিলেন বা বলেছিলেন, সবই দৈবনির্দেশিত বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

মারি লুই বার্ক দেখিয়েছেন যে সমাজের এবং চিন্তাধারার বিবর্তনে মার্কিনদেশ যখন এক যুগসন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে, সেই সময়ে বিবেকানন্দর নতুন ধরনের বক্তব্যকে তারা স্বাগত জানিয়েছে।[১৬৯] মৌলবাদী খ্রিস্টানরা বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করে চার্চে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনার বিপক্ষে ছিলেন, আবার উদারপন্থীরা নতুন জ্ঞানদীপ্তিকে কাজে লাগিয়ে ধর্মকে সামাজিক প্রয়োজনের উপযোগী করে তুলতে চাইছিলেন; তাঁদের চিন্তাধারা নতুন নতুন চিন্তার দ্বার খুলে দিয়েছিল, এমনকি প্রচলিত সংস্কারের বিকল্পের কথাও চিন্তা করা হচ্ছিল। সত্তর-এর দশকের হক্সলির অজ্ঞেয়বাদ এমনই একটি চিন্তার প্রকাশ। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স, নিউ থট, প্রভৃতি অন্যান্য আন্দোলন যদিও আধ্যাত্মিকতার চেয়ে বেশি ঐহিকতাবাদী ছিল, তবুও এদের মধ্যে আত্মিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ছিল।

AMARBOI.COM

পূর্ব উপকূলের উদারপন্থী খ্রিস্টানরা, বিশেষত ইউনিটারিয়ান বা কঙ্গিগেশনাল চার্চের সভ্যরা এবং যুক্তিবাদী আধ্যাত্মিক মতবাদের অন্বেষ্টাগণ সবচেয়ে বেশি আগ্রহভরে স্বামীজীর উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন। অনেক উচ্চশিক্ষিতা, সমাজসেবী মহিলা নানাবিধ সংঘ, সংস্থা, বক্তৃতা, সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে, এমনকি এসবের বাইরেও নানাভাবে কাজ করে সমাজ সংগঠনে নিজেদের উৎসাহ দেখাতেন; বিবেকানন্দর শিষ্যদলের একটি বড় অংশ এঁদের নিয়ে গঠিত ছিল। অবশ্য তাঁর আবেদন যে শুধুমাত্র ধর্মপরায়ণ এবং আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণালব্ধ ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী প্রমুখ ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদেরও চিন্তার খোরাক ছিল। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য এবং বেদান্তের সুচিন্তিত যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা হার্ভার্ড-এর অধ্যাপক রাইট এবং পরে ম্যাক্সম্যুলার এবং ডয়সেন-এর মত পণ্ডিতপ্রবরদেরও ভাবিয়ে তুলেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কথাবার্তায় চিন্তাশীল নারী-পুরুষ সকলেই তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছিলেন। এবং সেই কারণেই উন্নতমানের মার্কিন পত্রপত্রিকাগুলিতেও তাঁর কার্যকলাপের বিস্তারিত বিবরণ প্রকশিত হত।[১৭০] ফলে তাঁর সম্বন্ধে ইতিমধ্যে যে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল তা আরও ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য তাঁর অসাধারণত্বও তাঁর প্রচারের একটা বড় কারণ। সন্ন্যাসীর বেশে বিবেকানন্দকে মনোরম দেখাত। তাঁর বক্তৃতার যে সব বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে সব সময়েই তাঁর বেশবাস এবং সুন্দর চেহারার বিবরণ থাকত। 'মিনিয়াপোলিস ট্রিবিউন' তাঁর বাঙালি কেতায় ইংরাজি উচ্চারণের মাধুর্যের উল্লেখ করে লিখেছিল : "স্বরবর্ণের বিকৃত উচ্চারণে শব্দের ব্যঞ্জনা ঠিক হয় না বলেই তাঁর বক্তৃতা অসাধারণ শোনায়।"[১৭১] জনপ্রিয় পত্রিকাগুলির উদ্দেশ্য অবশ্য তাঁকে বোঝার চেয়ে বেশি উত্তেজনা সৃষ্টি করা, তারা অনেক ভেবেচিন্তে তাঁর নামের উচ্চারণ ভুল করত এবং তাঁকে "রাজা", "শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ", "বৌদ্ধ শ্রমণদের দূত", এমনকি, "ভারতের অত্যুচ্চপদস্থ মহান পুরোহিত" বলেও বর্ণনা করেছে।[১৭২] তাঁর বক্তৃতার বিষয়গুলিরও আবোলতাবোল ব্যাখ্যা দিত।[১৭৩] একটি বক্তৃতার উদ্ভট শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল "Karmax" (কর্ম ?)। বোধহয় অন্য সবকিছুর চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বই তাদের সবচেয়ে বেশি অভিভূত করেছিল। যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন, অথবা যাঁরা গভীর আগ্রহভরে তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসতেন, তাঁরা সকলেই তাঁর প্রতি এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের কথা বলেছেন,—তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কারণ তাঁর অকপট গভীর আধ্যাত্মিকতা এবং নিচ্ছেদ নিঃস্বার্থতা। একটি প্রতিবেদনে এই আশা প্রকাশ করা হয়েছিল যে তাঁর কাছে পাশ্চাত্যদেশের কথা শুনে হয়ত ভারতবাসী পাশ্চাত্যদেশবাসীর গুণপণার মর্যাদা দিতে পারবে।[১৭৪] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে জাতির অহংকারে সংশয় কেবল পরাধীন উপনিবেশবাসীদেরই একচেটিয়া নয়।

ভারতের এই সন্ন্যাসী সম্বন্ধে মার্কিনীদের উৎসাহ-উদ্দীপনার বিবরণ এখন যথেষ্ট প্রমাণ সমৃদ্ধ। সময় এবং পারিপার্শ্বিকের পরিপ্রেক্ষিতে সে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। শিকাগো ধর্মসভার বক্তৃতার পর তাঁর করমর্দন করার জন্য মহিলাদের মধ্যে যে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল সে কাহিনী সকলেরই জানা। 'শিকাগো টাইম্‌স্‌'-এর প্রতিবেদন অনুসারে ধর্মসভায় তিনিই সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। *Poetry: A Magazine of Verse* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত্রী হ্যারিয়েট মনরো লিখেছেন যে বিবেকানন্দর ঐ বক্তৃতাটি শুনে তাঁর মনে যে উদাত্ত ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়েছিল, তা কদাচিৎ লাভ করা যায়। ডেট্রয়টে স্বামীজীর আগমন প্রসঙ্গে 'ট্রিবিউন' লিখেছিল যে ঐ শহরের সাংস্কৃতিক মহলে ঐ রকমের উত্তেজনা কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি ঐসময়ে ঐ শহরের শিরোমণির মর্যাদা পেয়েছিলেন, এবং শহরের বৃহত্তম সভাকক্ষেও তাঁর শ্রোতাদের স্থান সঙ্কুলান হত না।[১৭৫]

ভালবাসা আদান-প্রদানে তাঁর যে সাবলীল সারল্য ছিল তাতে তাঁর মার্কিন বন্ধুবান্ধব অবাক হয়ে যেতেন। পরস্পরের মধ্যে গভীর প্রীতির সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতানো বাঙালি সমাজের প্রচলিত ধারা। মার্কিনীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে বিবেকানন্দ সেইভাবে সম্বন্ধ পাতানো ঐ অসম্ভব পরিবেশেও সম্ভব করে তুলেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে কেউই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেননি। কথায় ও কাজে অকৃত্রিম আন্তরিকতা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সমৃদ্ধ শিশু-সুলভ সারল্যের জন্যই বোধহয় তাঁর এইসব ব্যবহারে কেউ আপত্তি করেনি, অন্য যে কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রেই যা অশোভন মনে হতে পারত। চল্লিশোত্তীর্ণা শ্রীমতী জর্জ হেলকে তিনি মাতৃসম্বোধন করতেন, তাঁর কন্যা এবং বোনঝিদের বলতেন ভগিনী। তাঁরাও আবার প্রত্যুত্তরে তাঁকে ভাই বলতেন। একদিন শ্রীমতী হেল দরজা খুলে তাঁর বাড়ির উলটোদিকে রাস্তায় বসে থাকা বিবেকানন্দকে দেখতে পেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ তখন ধর্মসভায় প্রতিনিধিত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে গেছেন কিন্তু তাঁর থাকার কোনও জায়গা নেই। অনির্দিষ্টকালের জন্য নিজের বাড়িতে বিবেকানন্দকে থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর মধ্যে যেমন শ্রীমতী হেলের মহানুভবতার প্রকাশ তেমনি আবার বিবেকানন্দর সম্মোহনী শক্তিরও প্রকাশ।[১৭৬] বলা বাহুল্য, এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই মার্কিন রমণীদের সম্পর্কে তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব গড়ে উঠেছিল।

ধর্মসভার আগে এবং পরে বহু সম্পন্ন মার্কিনপরিবার তাকে স্বাগত জানিয়েছিল। লেখিকা-অধ্যাপিকা কেট স্যানবর্ণই (Kate Sanborn) বোধহয় মার্কিনীদের মধ্যে প্রথম তাঁকে নিউ ইংল্যান্ড-এর গ্রামে নিজের বিলাস-বহুল গৃহে স্বাগত জানিয়েছিলেন।[১৭৭] তাঁর মাধ্যমেই স্বামীজী অধ্যাপক রাইট-এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, যাঁর পরিচয়পত্রের সাহায্যে তিনি শিকাগোর ধর্মসভায় ঢোকবার অনুমতি পেয়েছিলেন। সম্মেলনের শেষে শিকাগোর "প্রতিটি গৃহের বৈঠকখানায় তিনি সবচেয়ে আদরণীয় অতিথির" মর্যাদা পেয়েছিলেন।[১৭৮] ডেট্রয়টে তিনি মিশিগানের প্রাক্তন রাজ্যপালের বিধবা পত্নী শ্রীমতী জন ব্যাগলের (John Bagley) অতিথি হয়েছিলেন। ডেট্রয়টের সমাজে শীর্ষমণিরা তাঁর প্রাসাদোসম গৃহে মিলিত হয়ে প্রথম স্বামীজীকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন।[১৭৯] অন্যান্য যাঁদের আতিথ্য তিনি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শিকাগোর লায়ন (Lyon) পরিবার, তাঁরা ছিলেন লুইসিয়ানার একটি চিনি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং শিকাগো শহরের কেন্দ্রস্থলে বিরাট কুকুরশাল এবং অশ্বশাল নিয়ে তাঁদের বাড়ি ছিল ; মিশিগান-পেনিনসুলার কার কোম্পানির অংশীদার এবং প্রাচ্যশিল্প সংগ্রাহক চার্লস, এল, ফ্রিয়ার (Charles L. Freer), ডেট্রয়টের অন্যতম ধনীশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী, সেনেটের সদস্য টি, ডব্লু, পামার (T. W. Palmer), শ্রীমতী ভ্যান্ডারবিল্ট-এর কাকা ফ্ল্যাগ (Flagg), ডাকাতি করে ব্যারনের পর্যায়ে উন্নীত এক ব্যক্তির উত্তরাধিকারিণী হেলেন গুল্ড (Helen Gould) ইত্যাদি।[১৮০] তাঁর পরিচিত, বন্ধু এবং গুণগ্রাহীদের তালিকা দেখলে মনে হবে যেন সমাজের কর্তাব্যক্তিদের নামের নিবন্ধ দেখা হচ্ছে। জন, ডি, রকেফেলারের (John D. Rockfeller) এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে থাকার সময় ঐ টাকার কুমীরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। বিবেকানন্দর শিষ্যদের বিশ্বাস, তাঁর তীক্ষ্ণ পরিহাসের ফলেই রককেফেলারের মানবিকতার বোধ জাগরিত হয়েছিল। ঐ বাড়িতেই তাঁর মাদাম কালভের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়, সেই পরিচয় ক্রমে প্রগাঢ় সৌহার্দ্যে পরিণত হয়।[১৮১] একজন সুন্দরী ধনীকন্যা তো তাঁকে বিবাহের অভিলাষই জানিয়েছিলেন। তবে, বোধহয় এ ব্যাপারে শুধু তিনি একা নন। যে সব ধনী গৃহস্থের গৃহে তিনি আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন তাদের কাছ থেকে তিনি ও দেশের উচ্চবর্গীয়দের জীবনযাত্রার ধারণা লাভ করেছিলেন ; গুণগতমানরক্ষার প্রচেষ্টা এবং ঐহিক উন্নতির লক্ষণ বলে তাঁদের জীবনযাত্রা তাঁর মতে প্রশংসার্হ। ভাই মহেন্দ্র অনেকবার লিখেছেন যে নির্জীব দীনহীন জীবনযাত্রা তিনি মোটেই বরদাস্ত করতে পারতেন না, তাই মনে হয় মার্কিন রীতি তাঁর মনোমত হয়েছিল। সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য—তা হল শক্তিমানের ধর্ম, অথবা নিঃস্বের ক্ষুধা তাঁর কাছে দৈন্যদশাকে মেনে নেওয়ার নির্বীর্যতার থেকে একেবারেই আলাদা। মার্কিন জড়বাদের মধ্যে হয়ত মানুষের আধ্যাত্মিক কৌতূহলের ক্ষুধা মিটবে না, কিন্তু জড়বাদের উৎস যে বিপুল প্রাণশক্তি তা আধ্যাত্মিকতারও উৎস হতে পারে।[১৮২] তাছাড়া দুর্বল, দরিদ্র, নিরুৎসাহ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতবাসীর পক্ষে আগে এইরকম জীবনীশক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে তবেই আত্মার মুক্তির মত কঠিন কাজের কথা ভাবা উচিত। আত্মজ্ঞান দুর্বলের জন্য নয়।[১৮৩]

যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ ভ্রমণের ফলে ও দেশের জীবনযাত্রার বহু দিক তাঁর সামনে উদঘাটিত হয়েছিল। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই সেসময়কার সেরা বুদ্ধিজীবী ছিলেন, অনেকে আবার গভীরভাবে দর্শন ও ধর্ম বিষয়ে চর্চা করতেন। বোস্টনে তাঁর পরিচয়পত্র পাঠানো হয়েছিল চিন্তাবিদ, কর্মবীর এবং কেতাদুরস্ত বলে যাঁদের নামডাক ছিল, তাঁদের কাছে।[১৮৪] যেখানে বক্তৃতা দেওয়া বিশেষ সম্মান বলে গণ্য হত, সেই আমেরিকান সোশ্যাল অ্যাসোসিয়েশন ও স্মিথ কলেজে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসিক্স্ বিভাগের অধ্যাপক জন রাইট ও তাঁর পরিবার বিবেকানন্দর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা মনোবিজ্ঞানী উইলিয়ম জেম্স্ বিবেকানন্দর মতবাদে খুবই আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন।[১৮৫] 'ফোরাম' এবং 'আটলান্টিক মান্থলি' পত্রিকার সম্পাদক ওয়াল্টার হাইনস্ পেজ নিজের পত্রিকায় তাঁকে লেখা দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।[১৮৬] তাঁর গুণমুগ্ধদের লম্বা তালিকায় এলা হুইলার উইলকক্স এবং হ্যারিয়েট মনরোর মত কবি, প্রাচ্যশিল্পের সমঝদার আর্নেস্ট ফেনোলোসা, বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী রবার্ট গ্রীন ইঙ্গারসোল এবং গায়িকা এমা থার্সবিও ছিলেন। লায়ন পরিবারের বাড়িতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করেন। তাঁরা তাঁকে "দেখে নিতে" এসেছিলেন, কিন্তু পরে স্বীকার করেছিলেন যে প্রতিটি বিষয়েই তাঁরা স্বামীজীর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন। শিকাগো সম্মেলনের পর আন্তর্জাতিক ইলেকট্রিকাল কংগ্রেসে আগত অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে লর্ড কেলভিন এবং অধ্যাপক ফন হেলমহোলট্স্ ছিলেন।[১৮৭] তবে ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহী উদারচেতা পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যেই তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি কৌতূহল জাগরিত হয়েছিল। শিকাগো সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা রেভারেন্ড জন বারোজ পরে কিছুটা বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পড়লেও দীর্ঘদিন স্বামীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতি মার্ভিন-মারি স্নেল তাঁর সম্বন্ধে বলেন যে "নিঃসন্দেহে তিনিই সম্মেলনের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি"। ঐক্যবাদী এবং অজ্ঞেয়বাদীদের সঙ্গেও তিনি বিদগ্ধ আলোচনা চালিয়ে যেতে পারতেন, বিশেষত অজ্ঞেয়বাদ আন্দোলনের একটি শাখা ফ্রি রিলিজাস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে, যার সদস্যরা ছিলেন সমন্বয়বাদী। ডেট্রয়টের টেম্পল বেথ-এল এর ইহুদি পুরোহিত ডক্টর গ্রসম্যান বিবেকানন্দর বক্তৃতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে চ্যাপমান পর্বের নিস্পন্দ আবেগের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। দার্শনিক উইলিয়ম আর্নেস্ট হকিং অল্প বয়সে অদ্বৈত সম্বন্ধে বিবেকানন্দর বক্তৃতা শুনে বলেছিলেন যে এ শুধু তাঁর কেতাবী জ্ঞানের পরিচয় নয়, নিজস্ব অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপলব্ধি। কিন্তু স্পেন্সর আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে মানসিক অস্থিরতা বলে বরবাদ করে দেওয়ায় সাময়িকভাবে হকিং বিবেকানন্দর শিষ্যত্বে আস্থা হারিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের দর্শনে বিবেকানন্দর অটল বিশ্বাস দেখে তিনি আবার নিজের মনেও বিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন।[১৮৮] ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দ আবিষ্কর্তা পদার্থবিজ্ঞানী নিকোলা টেসলার মত খ্যাতনামা ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, কিন্তু টেসলা লিখেছেন যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিছক সৌজন্য বিনিময় ছাড়াও তাঁদের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হয়েছিল, এছাড়া আর কিছুই জানা যায় না, কি ধরনের কথা হয়েছিল তাও জানা যায় না।[১৮৯] যুক্তরাষ্ট্রে যে তিনি শুধুমাত্র উচ্চবর্গীয় ধনী ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গেই যোগাযোগ করেছিলেন, তা নয়। শিকাগো বক্তৃতার আগে তিনি কারাগারের কয়েদীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ; আর একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন শিশুদের উদ্দেশ্যে।[১৯০] মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণের সময় তিনি শ্রমিক-কৃষকদের উদ্দেশ্যেও বক্তৃতা দিয়েছিলেন।[১৯১] যে সব নরনারী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন সাধারণ মানুষ। ১৮৯৩-৫ খ্রিস্টাব্দে নিউ ইয়র্কের যে ছাত্ররা তাঁর কাছে পড়েছিলেন, তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই সম্পন্ন ছিলেন, বাকিদের পাঠচক্রটি চালিয়ে যাবার চেয়ে বেশি চাঁদা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না।[১৯২] তবে অবশ্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেরাই তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। নরওয়ের বিখ্যাত বেহালাবাদকের বিধবা পত্নী ওলি বুল, প্রবাসী ফরাসী রাজতন্ত্রবাদী শ্রীমতী মারি লুইজি, যিনি আধুনিক প্রগতিশীলা মহিলা বলে নিউ ইয়র্কে বিখ্যাত ছিলেন, বিবেকানন্দ তাঁকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন ; নিউ ইয়র্কের একটি জনপ্রিয় সংবাদপত্রে কর্মরত রুশীয় ইহুদি লিওঁ ল্যান্ডসবার্গ-কেও তিনি সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁর সন্ন্যাসজীবনের নামকরণ করেছিলেন কৃপানন্দ ; সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত তৃতীয় ব্যক্তির নাম ডক্টর স্ট্রীট, তাঁর নাম হয়েছিল স্বামী যোগানন্দ ; ব্রুকলিনের কুমারী সারা এলেন ওয়াল্ডো-ও তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেছিলেন। এছাড়াও দুই "ভগিনী"—দেবমাতা (লরা গ্লেন) এবং ক্রিশ্চাইন গ্রীনস্টিডেলও ছিলেন। থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস পার্কে জনৈক কুমারী ডাচারের ছোট বাড়িটিতে অবসর যাপনের সময় যে সব ছাত্র তাঁর কাছে হাজির হয়েছিল, তাদেরও সবাইকে তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন। তারা সকলেই দর্শন ও ধর্মসম্বন্ধে জ্ঞানলাভে গভীর আগ্রহী ছিল এবং তাদের কাউকেই সমাজচ্যুত অথবা "নতুন উত্তেজনার সন্ধানরত ঢুলু ঢুলু চোখ" থিওসফিস্ট বলা যাবে না।[১৯৩]

এইভাবে, মার্কিন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে স্বামীজী পরিচিত হয়েছিলেন, এবং তারা তাঁকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয়বারের যাত্রায় যুক্তরাষ্ট্রের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তাঁর পরিচয় আরও গভীর এবং বিস্তৃত হয়। এই সময় তাঁর খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়ে এবং সাউথ পাসাডেনার মিড (Mcad) ভগিনীদ্বয়ের মত যাঁরা নামের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় এমন ধর্মমত এবং আধ্যাত্মিকতার জন্য আগ্রহ বোধ করতেন, তাঁরা তাঁর কাছে আসেন।[১৯৪] তাঁদের মধ্যে "নিউ থট" আন্দোলনের সভ্যরা ছিলেন, বিশেষত লস এঞ্জেলেসের "হোম অফ থট" নামক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এবং ক্যালিফোর্নিয়ার বিদগ্ধ দার্শনিকগণ। তাঁদের আলোচনা যে সবসময়ে সৌজন্য বিনিময়ে সীমাবদ্ধ থাকত, তা নয়। সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেজ-এর সম্পাদক বার্নার্ড বমগার্ট (Bernherd Baumgardt) এবং বেশ কয়েকজন "প্রগতিশীলা" মহিলা তাঁর নবপরিচিত দলে ছিলেন বটে, তবে পূর্ব উপকূলের বুদ্ধিজীবীরা যেরকম তর্কযুদ্ধে নেমেছিলেন, পশ্চিমে সেরকমটা হয়নি। ১৯০০-এর জানুয়ারিতে তিনি ভগিনী ক্রিস্টিন-কে লিখেছিলেন যে উত্তেজনার প্রথম পর্ব শেষ হয়ে গেছে।[১৯৫] বোধহয় ক্যালিফোর্নিয়ার অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি মার্কিনীদের উৎসাহকে বুদ্বুদের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বামীজী সম্বন্ধে যে রকম ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল, ইংলন্ড বা ইউরোপে ততটা হয়নি। তবে অতলান্তিকের অন্য পারের অভিজাত এবং বুদ্ধিজীবীদের মহলে তিনি প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। এবং লন্ডন এবং অন্যত্র যেখানেই বক্তৃতা দিয়েছেন, কোথাওই শ্রোতার অভাব ছিল না। প্রাজ্ঞ, চিন্তাশীল নারী ও পুরুষ, প্রাক্তন ভারতীয় কর্মচারী, প্রাচ্যতত্ত্ববিদ, ধর্মানুরাগী এবং সেইসঙ্গে কিছু পাগলাটে লোক— ইংলন্ড এবং ইউরোপে এইসব ধরনের লোকের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছিল। নিবেদিতার বিবরণ পড়ে বোঝা যায় যে ইংলন্ডের শ্রোতাদের মধ্যে স্বামীজীর বক্তব্যকে বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা ছিল, যার মধ্যে অনেক সংশয়ও ছিল। স্বামীজীর মন্তব্য পড়ে মনে হয় যে আমেরিকার তুলনায় ইউরোপের নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা তাঁর ভালই লেগেছিল। তাঁর প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে গভীর চিন্তাভাবনা করেছে বলেই তাদের উচ্ছ্বাসের অভাব— স্বামীজী এইরকম ভেবেছিলেন। তুলনায় মার্কিনীদের উচ্ছ্বাস নিতান্তই সাময়িক কিনা কে জানে!

যে দুজন স্বামীজীকে ইংলন্ডে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন কুমারী হেনরিয়েটা ম্যুলার, তিনি শিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, কথাবার্তাও বলেছিলেন। অন্যজন প্রাক্তন থিওসফিস্ট, ই টি স্টার্ডি, তিনি আলমোড়ায় সতীর্থ শিবানন্দের কাছে স্বামীজীর কথা শুনেছিলেন।[১১৬] পরবর্তী ঘটনাবলীতে মনে হয় যে দুজনের কেউই স্থিতধী ছিলেন না।[১১৭] জে জে গুডউইন সম্বন্ধে অবশ্য একথা বলা যাবে না। সাম্রাজ্যেশ্বরী ইংলন্ড সম্বন্ধে গর্ববোধ এবং ভারতের সবকিছু সম্বন্ধেই তীব্র ঘৃণাবোধ থাকা সত্ত্বেও প্রভূত ধনী এবং প্রথম সারির স্টেনোগ্রাফার ঐ ভদ্রলোক নিজের লাভজনক বৃত্তি পরিত্যাগ করে স্বামীজীর অনুগামী হয়েছিলেন।[১১৮] ভারতে তাঁর অকালমৃত্যু স্বামীজীর মনে নিদারুণ পুত্রশোকের মত বেজেছিল। ব্রিটেনে আরও তিনজন তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন— জাতীয়তাবাদী আইরিশ কুমারী মার্গারেট নোব্‌ল ওরফে ভগিনী নিবেদিতা, এছাড়া ক্যাপটেন ও শ্রীমতী সেবিয়ার (Sevier)। গুডউইনের মত তাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন এবং গুডউইন যা পারেননি, তাঁরা তাই করেছিলেন—গুরুদেবের দেশকে নিজেদের দেশ করে নিয়েছিলেন। গুডউইন যেমন তাঁর কাছে পুত্রসম ছিলেন, নিবেদিতা তেমনি ছিলেন কন্যাসমা। সেবিয়ারদের কাছ থেকে তিনি কতভাবে উপকৃত হয়েছেন বারবার চিঠিপত্রে তিনি তার উল্লেখ করেছেন। ইউরোপে তাঁর যে সব বন্ধু ছিলেন তাঁরা সমাজের অভিজাত এবং প্রভাবশালী, আবার প্রগাঢ় বুদ্ধিমান। লন্ডনে থাকাকালীন অধিকাংশ সময়ে ইংরেজ সমাজের উচ্চপর্যায়ের লোকেরাই তাঁকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করতেন। একজন ডিউকও তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আলবেনির ডিউকের স্ত্রী তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসতেন। এছাড়াও ছিলেন চার্চের একজন ক্যানন (পুরোহিত) এবং একজন সেনাপতির পত্নী।[১১৯] সে যুগের দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ম্যাক্সমুলার এবং কার্ল ডয়সনের সঙ্গে তাঁর ভাববিনিময় তথা ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল। সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড (Sarah Barnhardt)-এর সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। তুর্কী এবং ইজিপ্ট ভ্রমণের সময় তাঁর একজন সঙ্গী ছিলেন কার্মেল মিশনের সদস্য পেয়র হিয়াসান্থ, পোপকে অমান্য করার অপরাধে যিনি বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেদান্ত, শয়তান এবং যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে সমান আগ্রহী জুল বোওয়া পারিতে তাঁকে নিজগৃহে স্থান দিয়েছিলেন। চীন এবং ভারত সম্বন্ধে আগ্রহী, দর্শন এবং ধর্ম বিষয়ের লেখক, 'ম্যাক্সিম কামান'—খ্যাত স্যার হিরম ম্যাক্সিম—প্রদত্ত পরিচয়পত্রের সাহায্যে তাঁর নিকটপ্রাচ্য ভ্রমণ সহজ হয়েছিল।[২০০] সংক্ষেপে বলা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় বিবেকানন্দর ইউরোপ ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত হলেও গুরুত্বহীন হয়নি। ইউরোপীয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয়, কথাবার্তা হওয়ার ফলে সে দেশের জীবনযাত্রা ও রীতিনীতির ধারা সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

ইউরোপ বা আমেরিকা, কোথাওই তিনি একতরফা ভালরই স্বাদ পাননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতিবৈষম্য-প্ররোচিত অনেক অপমানের জ্বালা সইতে হয়েছে তাঁকে। বাল্টিমোরে শ্বেতকায় হোটেল-মালিকরা তাঁকে ঢুকতেই দেয়নি ; নিউ ইয়র্কে চুল-কাটার সেলুন-মালিকরা তাঁকে সোজাসুজি 'পথ দেখ' বলে দিয়েছিল। বোস্টনের বদমাশ ছেলেরা তাঁর অপরিচিত পোশাক দেখে তাঁকে তাড়া করেছিল ; ভারত থেকে অবসরপ্রাপ্ত এক উদ্ধত-প্রকৃতি কর্মচারী লন্ডনে সভার মধ্যেই তাঁকে অপমান করেন ; জাহাজে দুজন ইংরেজ পাদ্রী হিন্দু এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এমন কুৎসা করতে শুরু করেন যে শেষপর্যন্ত স্বামীজী তাঁদের একজনকে ছুঁড়ে জলে ফেলে দেবেন বলে ভয় দেখান।[২০১]

কিন্তু ভণ্ড এবং দুশ্চরিত্র বলে তাঁর বিরুদ্ধে আমেরিকায় যে কুৎসা রটনা হচ্ছিল, তার তুলনায় এসব নগণ্য।[২০২] মৌলবাদী খ্রিস্টানরা, বিশেষত যে সব পাদ্রী ভারতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিধর্মী এবং রোমান ক্যাথলিক মঠ-বাসিনীদের দুঃস্বপ্নের রাজত্ব বলে প্রচার করত, তারা বিবেকানন্দর মুখে প্রচলিত খ্রিস্টিয় রীতিনীতির সমালোচনা তথা ভারতের রীতিনীতির সমর্থন বরদাস্ত করতে পারছিল না। ভারতীয় রমণীকুলের উন্নয়নার্থে মহারাষ্ট্রের নারীস্বার্থবাদী (Feminist) মহিলারা রমাবাঈ মণ্ডলের সহায়তায় চাঁদা তুলছিলেন, ভারতের নারীত্বের ব্যাখ্যায় বিবেকানন্দ তাঁদের সমালোচনা করায় তাঁরা মুশকিলে পড়লেন। ব্রাহ্ম প্রচারক প্রতাপ মজুমদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন, শিকাগো ধর্মসভাতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন, বিবেকানন্দর জনপ্রিয়তায় তিনি ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়লেন। মোটামুটি ভাবে এঁদের সবাইকার বক্তব্য হল এই যে বিবেকানন্দ ব্রাহ্মও নন, যথার্থ সন্ন্যাসীও নন, এবং তিনি কারওরই প্রতিনিধি নন। বলা বাহুল্য, মহিলা ভক্তদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ে তাঁরা অশ্লীল ইঙ্গিত করতেও ছাড়েননি। তবে এইসব অপপ্রচার ব্যর্থ হল, কারণ, স্বামীজীর অনুরোধে তাঁর বন্ধু এবং ভক্তরা মিলে কলকাতা ও মাদ্রাজে বিরাট জনসভার আয়োজন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃতিত্বের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সেইসব জনসভার বিবরণ মার্কিন দেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় কুৎসা রটনা বন্ধ হল। তবে এই ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছিলেন মার্কিন বন্ধুদের কাছ থেকে, বিশেষত মহিলাদের থেকে, তাঁর প্রতি যাঁদের অকুণ্ঠ ভালবাসা ছিল, এবং তাঁরাই অসাধারণ মনোবল নিয়ে কুৎসা বন্ধ করলেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাঁর শত্রুর চেয়ে বন্ধুর সংখ্যাই বেশি হয়েছিল এবং তাঁর পাশ্চাত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় তিক্ততার স্বাদ মুছেই গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ্চাত্যের মূল্যায়নে এইসব তিক্ত এবং মধুর অভিজ্ঞতার প্রভাব পড়েছিল বলেই এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। কোনো রকম আপস অথবা কূটচাল তিনি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না, তাই খ্রিস্টধর্মপ্রচার, পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকতা, পাশ্চাত্যদেশে ভারত সম্বন্ধে ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যখন সাধারণ্যে বক্তৃতা দিতেন তখন তার ভাষা অনেক সময়েই দুঃসহ হয়ে উঠত। সব ধর্মই কয়েকটি মৌলিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু পাপ এবং পাপীকে মেনে নেওয়ার প্রবণতা তিনি কোনোমতেই মেনে নেবেন না। আবার ঠিক ঐরকম জোর দিয়েই তিনি অদ্বৈতবাদ প্রচার করতেন যাতে অনেকসময়েই তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তরাও অস্বস্তিতে পড়তেন। খ্রিস্টধর্মের সারমর্ম এবং যীশুর দৈব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও খ্রিস্টধর্মে প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে যেগুলি নিরর্থক অথবা ক্ষতিকর সেগুলির তিনি তীব্র সমালোচনা করতেন। সেইকারণে অনেক খ্রিস্টান তাঁর বক্তব্যে মর্মাহত বোধ করতেন। কিন্তু তাঁর কিছুই এসে যেত না, কারণ তাঁর মনে কারও সম্বন্ধে কোনও বিদ্বেষ ছিল না। শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে যা বলত তার কিছুটা গোঁড়ামি বশত হলেও কিছুটা আবার মূল্যবোধে আঘাত লাগার কারণে। লিওঁ ল্যান্ডসবার্গ, স্টার্ডি, মিস ম্যুলার, নিবেদিতা, এমনকি কখনও কখনও গুডউইনের মত অনুগতর সঙ্গেও যে তাঁর সম্পর্ক চিড় খেত অনেকক্ষেত্রেই তার কারণ সন্ন্যাসী হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর এতটুকু হস্তক্ষেপও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। অবশ্য ম্যুলার এবং স্টার্ডি কেন তাঁকে পরিত্যাগ করলেন তার ব্যাখ্যা এ সবের মধ্যে পাওয়া যায় না। মহেন্দ্র লিখেছেন সারদানন্দ লন্ডনে বিবেকানন্দর রাগের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। ঐ গুণটি তিনি বিদেশেই আয়ত্ত করেছিলেন। সারাজীবনই তিনি লড়াই করেছেন, পাশ্চাত্য দেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তাঁকে কঠিন লড়াই করে জয়লাভ করতে হয়েছে। কয়েকটি সংঘাত অবশ্য তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। এ সবের সঙ্গে ওদেশে পাওয়া সহানুভূতি ও সহৃদয়তার অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্যের জীবনধারার মূল্যায়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে ঐ সব সংঘাত সম্বন্ধে তিনি পুরাপুরি নিরাসক্ত হয়ে মতামত দিয়েছেন। পাশ্চাত্যদেশের সমাজে পরশ্রীকাতরতা নেই, এই কথাটার উপর তিনি বারম্বার জোর দিয়েছেন।[২০৩] বোধহয় দেশে ফিরে যে তাঁকে নানাধরনের শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই মন্তব্য।[২০৪] ভারতের যুব সম্প্রদায় তাঁর গাড়ির ঘোড়া খুলে নিয়ে নিজেরা স্বেচ্ছায় টেনে নিয়ে গেছে বটে, কিন্তু পুরোহিততন্ত্র, থিওসফিস্ট এবং ব্রাহ্মদের ঐকান্তিকতার অভাবকে সরাসরি সমালোচনা করে তিনি রক্ষণশীল এবং সংস্কারপন্থী— দুই দলকেই শত্রু করেছিলেন। হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য অনেকেই থিওসফিপন্থীদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। তাদের অনেকেই বিবেকানন্দর গোঁড়া ভক্ত ছিলেন, কিন্তু আমেরিকায় বিবেকানন্দর সঙ্গে তাঁদের বিরোধের কথা উত্থাপন না করার জন্য তাঁরা যে অনুরোধ করেছিলেন, স্বামীজী তাতে কর্ণপাত করেননি। ফলে তাঁর আরও কিছু শত্রু বৃদ্ধি হল। এইসব শক্তিমান শত্রুর অন্যতম নব্য-বৈষ্ণব শিশিরকুমার ঘোষের দলবল এবং তাঁর অতি জনপ্রিয় 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। দেশে, বিশেষত বাংলায়, তাঁর নামে অপপ্রচারের তীব্রতা তাঁর মানসিক স্থৈর্যকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। বোধহয় এই কারণেই তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিলককে বলেছিলেন যে নিজের দেশের বাইরে নেতৃত্ব করা অনেক সহজ। কত দুঃখেই না তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন। আর এই জন্যই বোধহয় পরে যখন তিনি বিদেশের সংঘাতের দিকে ফিরে চেয়েছিলেন তখন তাতে আর তিক্ততার লেশও ছিল না। দেশে তাঁকে যে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, সেই তুলনায় বিদেশে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার খুবই নগণ্য।

স্বামীজীর জীবনের যে সব অভিজ্ঞতা তাঁর পাশ্চাত্যের মূল্যায়নে প্রভাব রেখেছিল, সেই বিষয়ে আলোচনার উপসংহারে তাঁর ব্যক্তিত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর আমি জোর দিতে চাই। উনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদীরূপে তিনি ঔপনিবেশিক শাসন সম্বন্ধে একরকম নিষ্ফল আক্রোশ বোধ করতেন। নিষ্ফল আক্রোশ— কেন না অদূর ভবিষ্যতে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথের শেষে তিনিও কোনও আলোকবর্তিকার আভাস পাননি।[২০৫] ব্রিটিশ শাসনের ঘটনাকে স্বীকার করে নিয়ে জাতীয় পুনর্জাগরণ এবং আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সে যুগে যে সব পরিকল্পনা ছিল, তাঁর পাশ্চাত্যে প্রচার পরিকল্পনা সেগুলির অন্যতম। সমকালীন অন্য অনেকের চেয়ে ব্রিটিশ জাতির প্রশংসায় তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, তাঁর বিরক্তিও অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর জগৎ-বিমুখতা, নিষ্কলুষ আধ্যাত্মিকতা এবং প্রখর বুদ্ধির প্রভাবে তিনি অনেকটা নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন। তাছাড়া এক অকৃত্রিম সারল্যের গুণে তিনি স্নেহবিনিময় করতে পারতেন। পাশ্চাত্যের, বিশেষত ইংরাজ ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে তাঁর যে মূল্যায়ন, তা শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, বরং এক প্রগাঢ় সৌহার্দ্যের উপলব্ধিতে তা সম্ভব হয়েছিল। পাশ্চাত্য জীবনধারা সম্বন্ধে বিবেকানন্দর বলা এবং লেখায় যে সরল কৌতুকের সুর ধ্বনিত হয়েছে, তাতে সেগুলি এক অনন্য বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে, যা সে যুগের অন্য কোনও ভারতীয়ের লেখায় পাওয়া যায় না। প্রাচ্যের নিরলস জ্ঞানানুসন্ধানীরা মাঝে মাঝেই তাঁর চাপল্যে হতবাক হয়ে পড়েছেন। তাঁর মতে জগতের স্রষ্টা গুরুগম্ভীর দেবতা নন, এবং সৃষ্টি শুধু আনন্দ নয়, কৌতুকেরও উৎস।[২০৬] তাঁর নিজস্ব শৈলীর বাঙলা রচনায় অনেক জায়গাতেই সদুদ্দেশ্যে তিনি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া, তাঁর জীবনকে উপভোগ করার আগ্রহ ভোগবাসনার দ্বারা কলুষিত হয়নি বলে তিনি যা দেখতেন তাতেই আনন্দের প্রতিশ্রুতি পেতেন। অদ্বৈতে বিশ্বাস নিয়ে তিনি অনায়াসে আধ্যাত্মিকতা থেকে জাগতিক বিষয়ে চলে আসতে পারতেন। একবার বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতার পর যখন সবাই ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁর এক অদ্ভুত মন্তব্য শোনা গেল। তিনি বললেন, "ওরা সেটি কিভাবে করে তা এখন আমি জেনে গেছি," 'সেটি' বলতে অবশ্য তিনি নির্বিকল্প সমাধির কথা বলছিলেন না, বলছিলেন মলিগাটানি স্যুপ-এর কথা![২০৭] একজন বুদ্ধিজীবী, সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে তিনি ইউরোপকে দেখেছিলেন। কিন্তু সেই উচ্চপর্যায়ের চিন্তার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্য একটি দিক—এক কৌতুকপ্রিয় দুষ্টু ছেলে যেন সবসময়েই উঁকিঝুঁকি দিয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দর বিখ্যাত রচনা, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,' পারস্পরিক অনুভূতি সম্বন্ধে এক অসাধারণ উক্তি দিয়ে তিনি শুরু করেছেন :[২০৮] "বিসূচিকার বিভীষণ আক্রমণ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহামারীর উৎসাদন, ম্যালেরিয়ার অস্থিমজ্জাচর্বণ, অনশন-অর্ধাশন-সহজভাব, মধ্যে মধ্যে মহাকালরূপে দুর্ভিক্ষের মহোৎসব, রোগশোকের কুরুক্ষেত্র, আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কাল পরিপ্লুত মহাশ্মশান, তন্মধ্যে ধ্যানমগ্ন মোক্ষপরায়ণ যোগী—ইউরোপী পর্যটক এই দেখে।"

"ত্রিংশকোটি মানবপ্রায় জীব—বহুশতাব্দী যাবৎ স্বজাতি বিজাতি স্বধর্মী বিধর্মীর পদভরে নিষ্পীড়িত প্রাণ, দাসসুলভ পরিশ্রম-সহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন, আশাহীন, অতীত-হীন, ভবিষ্যদ-বিহীন, 'যেন-তেন-প্রকারেণ' বর্তমান প্রাণধারণমাত্র-প্রত্যাশী, দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচ-চাতুরী-প্রতারণা-সহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্বলের যমস্বরূপ, বলহীন, আশাহীনের সমুচিত কদর্য-বিভীষণ-কুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক মেরুদণ্ডহীন, পূতিগন্ধপূর্ণ-মাংসখণ্ডব্যাপী কীটকুলের ন্যায় ভারতশরীরে পরিব্যাপ্ত-ইংরেজ রাজপুরুষের চক্ষে আমাদের ছবি।

"নববলমধুপানমত্ত হিতাহিতবোধহীন হিংস্রপশুপ্রায় ভয়ানক, স্ত্রীজাতি কামোন্মত্ত, আপাদমস্তক সুরাসিক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড়সহায়, ছলে-বলে-কৌশলে পরদেশ-পরধনাপহরণপরায়ণ, পরলোকে বিশ্বাসহীন, দেহাত্মবাদী, দেহপোষণৈকজীবন— ভারতবাসীর চক্ষে পাশ্চাত্য অসুর।"

এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য তাঁর মতে "বুদ্ধিহীন, বহির্দৃষ্টি লোকের কথা"। "সুশীতল, সুপরিষ্কৃত, সৌধশোভিত নগরাংশে বসবাসকারী বিদেশী "'নেটিভ' পাড়াগুলিকে নিজেদের দেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহরের সঙ্গে তুলনা করেন।" ভারতবাসীদের যা সংসর্গ তাঁদের হয়, তা কেবল "একদলের লোক—যারা সাহেবের চাকরি করে।...ইউরোপী চক্ষে এ মজুরির, এ দাসবৃত্তির, এ নীচতার মধ্যে যে কিছু ভাল থাকা সম্ভব, তা বিশ্বাস হয় না।" আমরা দেখি—শৌচ করে না, আচমন করে না, যা-তা খায়, বাছবিচার নাই, মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচ—এ জাতের মধ্যে ভাল কি রে বাপু! ...বিদেশীকে আমরা সমাজে মিশতে দেই না, 'ম্লেচ্ছ' বলি,— ওরাও 'কালো দাস' বলে আমাদের ঘৃণা করে।" এ দুয়ের মধ্যে কিছু সত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু দুদলেই ভিতরের আসল জিনিস দেখেনি।"[২০৯]

ভূদেবের রচনায় সাংস্কৃতিক বৈসাদৃশ্য বিষয়ে যে ধারণা দেখা যায়, বিবেকানন্দর রচনায় তাই ভিন্ন শিরোনামে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী তাদের রীতিনীতি, যার মধ্যে দিয়ে একটি জাতীয় চরিত্র গঠিত হয়।[২১০] তাঁর মতে প্রত্যেক মানুষেরও জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে, তার ব্যবহারের মধ্যে সেই উদ্দেশ্যেরই প্রকাশ। জাতি যখন ব্যক্তিসমষ্টি ভিন্ন অন্য কিছু নয়, তখন তার মধ্যে একটা সমষ্টিগত উদ্দেশ্য থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি জাতি বা সংস্কৃতি প্রাণবন্ত থাকে, ততক্ষণ তার জাতীয় ভাবে মনুষ্যসমাজ উপকৃত হয়। ইউরোপের সাংস্কৃতিক আদর্শের মধ্যে ইতিহাসের যে প্রয়োজন মিটেছে, তার মধ্যেই ইউরোপের প্রভুত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। প্রত্যেক জাতিকেই বিচার করতে হবে তার নৈতিক মূল্যবোধ দিয়ে। "তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চোখে আমাদের দেখা,—এ দুই ভুল।"[২১১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারত এবং ইউরোপের জাতীয় উদ্দেশ্যের মৌলিক বিভেদটি তিনি একটি বাক্যাংশে প্রকাশ করেছেন : "আমাদের দেশে মোক্ষলাভেচ্ছার প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে ধর্মের।"[২১২] ধর্ম, স্বামীজীর ভাষায়, "যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়...ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে...বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। ...ধর্ম হচ্ছে কার্য্যমূলক, যার কর্ম করে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, অর্থাৎ যে ধার্মিক, একমাত্র সেই মোক্ষলাভের যোগ্য।"[২১৩] পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে এই অত্যুচ্চ আদর্শ বিধৃত হয়েছে। খ্রিস্টের আদর্শ সবাইকে ভালবাসা, শত্রুকে আঘাত ফিরিয়ে না দেওয়া এবং নশ্বর এই জগতের প্রতি বৈরাগ্যভাব আনা—কিন্তু ইউরোপীয় জীবনযাত্রায় এই সব আদর্শের বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি। বরং গীতার উপদেশ তারাই গ্রহণ করেছে। "সদা মহারজোগুণ, মহাকার্য্যশীল, মহা উৎসাহে দেশ-দেশান্তরের ভোগসুখ আকর্ষণ করে ভোগ করছে।" অপরপক্ষে ভোগসুখহীন বৈরাগ্যের পথ গ্রহণ করেছে ভারতবাসী। স্বামীজীর মতে সুরাসুরের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পার্থক্যের উদাহরণ আছে। তবে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এই মন্তব্যের মধ্যে মূল্যবোধের কোনও বিচার নেই, কারণ পৌরাণিক দেবতাদের সব কাজ আদর্শ বলে বিবেচিত হয় না। বরং তুলনায় অসুরদের আচরণ অনেক বেশি ন্যায়সঙ্গত। দেবতারা ঈশ্বর এবং পরলোকে বিশ্বাস করতেন, অপরপক্ষে অসুরগণ ঐহিক সুখভোগে ব্যাপৃত থাকতেন—এই জন্যই তিনি ঐ পৌরাণিক কাহিনী ব্যবহার করেছেন। সুতরাং "তোমরা (ভারতীয়রা) দেবতার বাচ্চা আর পাশ্চাত্যেরা অসুর বংশ।"[২১৪]

তুলনার শেষে তিনি তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন : "এরাও ভাল, আমরাও ভাল ; তবে ভালর রকমারি আছে, এইমাত্র।"[২১৫] কিন্তু অনেক বক্তৃতায়, বিশেষত পাশ্চাত্যে, তিনি সব সময়ে এই উদার মনোভাব দেখাতে পারেননি। ভারতীয় সমাজকে তিনি যতটা তীব্র ভাষায় গালিগালাজ করেছেন, পাশ্চাত্যের রীতিনীতি ও আদর্শকে কখনই ততটা কটুকাটব্য করেননি, তা সত্ত্বেও কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব সর্বময় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি বলেই মনে হয়। দেশে তিনি যা কিছু বলেছেন, বিশেষত তাঁর বাংলা রচনায় ওরকম কোনও দাবির নজির নেই, বরং দারিদ্র্য, দৌর্বল্য এবং সামাজিক অবক্ষয়ের উপরেই তিনি জোর দিয়েছেন। ডেট্রয়টে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে ভারতীয়রা সবচেয়ে নীতিপরায়ণ জাতি, যার সরল অর্থ দাঁড়ায় যে নৈতিকতার বিচারে পাশ্চাত্যদেশ ভারতের তুলনায় অনেক নীচে।[২১৬] মিনিয়াপোলিস-এ বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে পাশ্চাত্যবাসীদের বাস্তবমুখিনতা ব্যবসা এবং নতুন কিছু খুঁজে বার করবার প্রচেষ্টায়, কিন্তু প্রাচ্যদেশীয়দের বাস্তবমুখিনতা ধর্মে।[২১৭] এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে মার্কিন শ্রমিক এবং কৃষকরা রাজনীতির অনেক খবরাখবর রাখে এবং প্রত্যেকেই দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের যে কোনও একটিকে সমর্থন করে। সোনার মূল্যমান সম্পর্কে যে বিতর্ক চলছিল, তারা সে বিষয়েও অবহিত ছিল। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে তাদের কোনও ধারণাই নেই। অন্যদিকে ভারতীয় কৃষক রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু না জানলেও একেশ্বরবাদ বা আস্তিক্যবাদ সম্বন্ধে অজ্ঞ নয়। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ভিত্তিতে ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে তিনি ভাই মহেন্দ্রকে লন্ডনে বলেছিলেন যে পাশ্চাত্যবাসীদের সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়াবার কোনও কারণ নেই। তারা শুধু জাগতিক ব্যাপারটাই বোঝে, আর কিছুই বোঝে না। ব্যবসায়ীর মানসিকতা নিয়ে তাদের ভারতের রহস্য বুঝে উঠতে অনেক সময় লাগবে। গুরুদেব যে বলতেন, কামকাঞ্চনে আসক্ত মানুষ কীটের মত, মনে হয় সেই কথার সূত্র ধরেই তিনি ভাই মহেন্দ্রকে বলেছিলেন, "এরা সব কীটের মত, তুমি অনায়াসে তাদের মাড়িয়ে যেতে পার।"[২১৮] আর এক জায়গায় মহেন্দ্রকে তিনি যা বলেছেন, তাতে মনে হয় যে শুধু নৈতিকতাই নয়, মানবিকতার বিচারেও ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ। তিনি বলেছিলেন যে ইউরোপীয়রা কাজ করে কর্তব্যবোধের তাগিদে; ভারতে সব প্রেরণার উৎস হল প্রেম।[২১৯] একটু অন্যরকমভাবে তিনি নিবেদিতাকে বলেছিলেন: "তোমরা পাশ্চাত্যদেশীয়রা কাজ চাও। জীবনের ছোট ছোট কাজে যে কাব্য তা তোমরা বোঝ না।"[২২০] বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী দিয়ে তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন—মৃত্যুর সার্বজনীনতার অভিজ্ঞতা দিয়ে পুত্রশোকাতুরা মাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে, বলির জন্য উৎসর্গীকৃত ছাগলদের বাঁচাবার জন্য বুদ্ধ নিজের শরীর দান করেছেন, ইত্যাদি। অন্যদিকে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার ঘটনাটি কর্মমুখী প্রাচীন রোমানদের মনকে আবিষ্ট করেছিল, কারণ তাদের কাছে এই ঘটনা বেশ মনোগ্রাহী নাটক মনে হয়েছিল। এ সবের অন্তর্নিহিত বক্তব্য ছিল যে আধ্যাত্মিক মানসিকতার ফলে ভারতবাসীর যে সূক্ষ্ম রুচিবোধ পাশ্চাত্যে তা নেই।

দুই সভ্যতার মৌলিক পার্থক্য তাদের বিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিবর্তন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ কোনও কোনও ক্ষেত্রে পূর্ববর্ণিত দেবতা-অসুরের উদাহরণ ব্যবহার করেছেন, কোথাও আবার তখনকার পণ্ডিতদের ইতিহাসের ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করেছেন। উদাহরণ এবং বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া অবশ্য ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। দেবতা বলতে তিনি প্রাচীনকালে এশিয়ার নদী-উপত্যকাগুলিতে বসবাসকারী কৃষিজীবীদের কথা বলেছেন, যারা পরে প্রাচীন নাগরিক সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল। অসুর তাঁর মতে খাদ্য-সংগ্রাহক, পশুপালক, যাযাবর সম্প্রদায়, যারা দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধও করেছিল, আবার তাদের সভ্যতায় প্রভাবিতও হয়েছিল। জীবনযাত্রার প্রক্রিয়ায় দেবতারা ছিলেন দুর্বলদেহী, তাঁদের সহ্যশক্তিও দুর্বল, কিন্তু প্রখর বুদ্ধিপ্রভাবে কারিগরী কলাকৌশলের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। অসুরগণ শারীরিক ক্ষমতায় বলীয়ান, কঠোর পরিশ্রমী এবং সহনশীল।[২২১] তাদের বাসস্থান ছিল পাহাড়ের উপর অথবা সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে। শিকার ও পশুপালন থেকে তারা ক্রমে নিজেদের দেশ থেকে বেরিয়ে কখনও বা সমুদ্র পার হয়ে দস্যুবৃত্তি করতে লাগল। সব সভ্যতাই বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বটে, তবে ইউরোপীয় সভ্যতায় অসুরকুলের প্রাধান্য দেখা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এশিয়া থেকে দলে দলে লোক ইউরোপে গিয়েছিল, বিবেকানন্দ সে কথার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু, সঙ্গতভাবেই গ্রীসকেই পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মস্থান বলেছেন। এক্ষেত্রেও অবশ্য এশিয়া মাইনর থেকে আগত সভ্য জাতির ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপে বসতি স্থাপন এবং প্রাচীন দ্বৈপ সভ্যতায় মিশরীয় সভ্যতার প্রভাবের উপর জোর দিয়েছেন।[২২২]

তবে প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতা তাঁর দরদী মনকে এমনই গভীরভাবে প্রভাবিত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল যে ঐ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠা অথবা নিজের দেশের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব না হোক, অন্তত সমান মর্যাদা দেখানোর কোনও প্রচেষ্টা নেই। গ্রীক সভ্যতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রতিফলিত হয়েছে ফরাসী রীতিনীতির প্রশস্তিতে—পারি তাঁর মতে 'ভূস্বর্গ', গ্রীক সভ্যতার মর্মার্থ ফরাসী ঐতিহ্যে পুনর্জন্ম লাভ করেছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। প্রাচীন হেলেনীয়দের সম্বন্ধে তিনি এক কাব্যিক বর্ণনা দিয়েছেন : "ভূমধ্যসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর দ্বীপমালা-পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বিভূষিত একটি ক্ষুদ্র দেশে অল্পসংখ্যক অথচ সর্বাঙ্গ সুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢ় স্নায়ুপেশী সমন্বিত, লঘুকায় অথচ অটল-অধ্যবসায়-সহায়, পার্থিব সৌন্দর্যসৃষ্টির একাধিরাজ, অপূর্ব ক্রিয়াশীল প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন।[২২৩]... মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্য্যশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে মানুষ পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্যাদি শিল্পে—অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে।...আধুনিক বাঙালি—আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ঐ যবন গুরুদিগের পদানুসরণ করিয়া ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্ধা অনুভব করিতেছি।" "উনবিংশ শতকের ইউরোপ প্রাচীন গ্রীসের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী।" সে যুগে প্রচলিত প্রবাদ যে "যাহা কিছু প্রকৃতি সৃষ্টি করেন নাই তাহা গ্রীক মনের সৃষ্টি"—বিবেকানন্দ তা মেনে নিয়ে উদ্ধৃত করেছেন। গ্রীকদের ধর্ম, এক অতীব সুন্দর জিনিস—কোনও ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ না হওয়ায় হয়ত তা লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু ইউরোপের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচারের ক্ষেত্রে তার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করছে।[২২৪]

ইউরোপের মৌলিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে তাঁর নিজের উপলব্ধিতেই তিনি হেলেনীয় সভ্যতার অসাধারণ উৎকর্ষ এবং তার প্রতি মনুষ্যসভ্যতার ঋণ স্বীকার করেছিলেন। আধুনিক ইউরোপের পূর্বসূরী গ্রীক মানস পরম সত্তার স্বর্গীয় রহস্য উদঘাটনের জন্য যেমন বহিঃপ্রকৃতিতে অনুসন্ধান করেছিল, তেমনি জীবনের সমস্যা সমাধানেরও পথ খুঁজেছিল। গ্রীকদের দৃষ্টি ছিল বহির্মুখী, কারণ শক্তিপ্রদায়ী আবহাওয়া এবং স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে তাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, "যেখানে গাম্ভীর্য্য অপেক্ষা সৌন্দর্য্যের বেশি সমাবেশ—নিরাভরণা কিন্তু হাস্যময়ী প্রকৃতি।"[২২৫] গ্রীকদের মন তাই বহির্মুখী, তারা বাইরের জগৎকে বিশ্লেষণ করতে চাইল। তাই এই সভ্যতায় বিশ্বজনীন সত্যে উপনীত হবার বিজ্ঞান সকলের উদ্ভব।" যে সব ভাব এবং তত্ত্বের দ্বারা প্রকৃতি ও মানুষের আচরণের সাধারণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, এখানে সেগুলিকেই স্বামীজী "বিশ্বজনীন সত্যের বিজ্ঞান" বলেছেন। বহির্মুখী দৃষ্টির ফলে "গ্রীক সভ্যতার প্রধান ভাব হল প্রকাশ ও বিস্তার।"[২২৬] এই বিশেষ গুণটি বর্তমান ইউরোপ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে।

একই বংশ থেকে জাত হলেও গ্রীকদের কিন্তু প্রাচীন ভারতীয়দের মত অন্তর্মুখী দৃষ্টি ছিল না, এবং দেহের বিনাশের পর জীবনের অস্তিত্বের গোপন রহস্য নিয়ে তারা কোনোরকম ভাবনাচিন্তা করেনি। মৃত্যুর পর জীবন সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল নেহাতই ছেলেমানুষি ধরনের এবং স্বর্গের ধারণা ছিল দুঃখগুলি বাদ দিয়ে পৃথিবীরই মত।[২২৭] ধর্ম সম্বন্ধেও তাদের ধারণা বেশিদূর এগোয়নি। তুলনায় হিন্দুরা যে জগতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস করত তাকে ঘিরে ছিল উন্নতশির হিমালয়, নিবিড় অরণ্য এবং বেগবতী নদীরাজি, তারা তাই নিজেদের পরিবেশ সম্বন্ধে একরকমের শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় অনুভব করত। সেখানকার জলবায়ুও পরিশ্রমের উপযোগী ছিল না, তাই তাদের চিন্তা ছিল অন্তর্মুখী, আত্ম ও সত্তার প্রকৃতি নিয়ে ; যা কিছু মহান নয়, তা তাদের চিন্তায় স্থান পায়নি। এই সব কারণেই প্রাচীন গ্রীসে যে সব গুণপনা বিকাশ লাভ করেছিল, আধুনিক ইউরোপ যে সব গুণের উত্তরাধিকারী, "সেই উদ্যম, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আত্মনির্ভরতা, অটল ধৈর্য্য, কার্য্যকারিতা, একতাবন্ধন, এবং উন্নতিতৃষ্ণা"—ভারতে তার কোনোটিই হয়নি।[২২৮]

বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে এই দুই সভ্যতার মহামিলনের মুহূর্ত থেকেই আজ পর্যন্ত যা যা মানুষ আয়ত্ত করেছে তা ঘটেছে। "অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শনবিদ্যা গ্রীক উৎসাহের সম্মিলনে রোমক, ইরাণী প্রভৃতি মহা-জাতিবর্গের অভ্যুদয় সূচিত করে। সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহাজলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্দ্ধ ভূভাগ ঈশাদি নামাখ্যাত অধ্যাত্ম-তরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত পুনরায় ঐ প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করে এবং বোধ হয়, আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলন-কাল উপস্থিত।"

স্বামীজীর ভবিষ্যতের স্বপ্ন ছিল—যে ভারতবাসী আজ আত্মমর্যাদাহীন, দরিদ্র, পূর্বপুরুষের অনুপযুক্ত উত্তরাধিকারী, তারা পাশ্চাত্যের কাছ থেকে ঐহিক সুখভোগেচ্ছার শিক্ষা নেবে, ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যও সেখানে বিশেষ ভূমিকা নেবে, সে দিন বেশি দূর নয় বলেই তাঁর ধারণা ছিল। 'বর্তমান সমস্যা' নামক প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন গ্রীসের প্রশস্তি গেয়েছেন। যে ঐতিহাসিক আলোচনায় তিনি ইউরোপ ও ভারতের সফল সম্মিলনের কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে কিন্তু তাঁর 'প্রাচ্য' এশিয়া ভূখণ্ডের অন্যান্য অঞ্চলেও পরিব্যাপ্ত হয়েছে, অর্থাৎ, 'আমরা' ও 'তাহারা' এই দ্বৈতসত্তার নতুন এক উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠায় তিনি ইসলামকে জড়িত করেছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদের যে নবচেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ ছিলেন তাতে ভারতের ঐস্লামিক সংস্কৃতিকে এ দেশের নিজস্ব মনে করার প্রবণতা ছিল এবং তা আবার জাতীয় সংহতিরও ভিত্তি ছিল। এই কারণেই আধুনিক ইউরোপের জন্মদানে আরব জাতির ভূমিকার উপর তিনি এত গুরুত্ব দিয়েছেন। এশিয়া-বাসী হিসাবে নবলব্ধ গৌরববোধ প্রকাশিত হয়েছে জাপানের প্রতি সপ্রশংস মনোভাবে এবং চীনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দর্শনে। সংক্ষেপে বলা যায় যে সব সময়েই কোনও না কোনও আদর্শগত প্রসঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য সম্বন্ধে মতামত দিয়েছেন, এমনকি যখন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অতীত বা বর্তমানের পাশ্চাত্য জীবনধারার বিভিন্ন দিককে প্রশংসা করেছেন, তখনও।

ইউরোপের অতীত সম্বন্ধে যে সব সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তিনি করেছেন সেখানে কিন্তু অবিমিশ্র প্রশস্তি প্রাধান্য পায়নি। একদিকে প্রকৃতি এবং অন্যান্য জাতির উপর ইউরোপের কর্তৃত্বের পটভূমিকায় সে দেশের বর্তমান ইতিহাসের ব্যাখ্যা এবং অন্যদিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক সংহতিসাধনের প্রচেষ্টা বিবেকানন্দর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সব বিষয়ে বক্তব্যের মধ্যে বারবারই তিনি কয়েকটি মূল্যবোধের উপর জোর দিয়েছেন। ইউরোপের অসুর-উত্তরাধিকারত্ব, অর্থাৎ, যে সমাজ কৃষিজীবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, খাদ্য আহরণকারী, শিকারী—তার জীবনচর্যায় সঞ্জাত উদ্দাম শক্তি এবং হিংস্র মানসিকতার ধারণা নিয়েই তিনি ইউরোপের ইতিহাসকে বুঝেছেন। বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের সংমিশ্রণে ঐ উদ্দামতা এবং হিংস্রভাব ক্রমশ কমে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি 'বর্বর' শব্দটি অনেকবার ব্যবহার করেছেন। উনবিংশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীর কাছে আধুনিক ইউরোপের বর্বর পূর্বপুরুষদের প্রসঙ্গ খুবই পছন্দসই ছিল। আগেই দেখিয়েছি যে ভূদেব এবং বঙ্কিম বারবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। বিবেকানন্দ কিন্তু ইউরোপের বর্বর পূর্বপুরুষদের কথা তুললেও তাঁর নিজের সমন্বয়ের ধারণার উপরই জোর দিয়েছেন, দেখাতে চেয়েছেন যে উনবিংশ শতকের অতি সুসভ্য পাশ্চাত্যদেশবাসীর মধ্যযুগীয় বর্বর পূর্বপুরুষ আদিতে এশিয়ারই অধিবাসী, জঙ্গলাকীর্ণ তরাই এবং তৃণক্ষেত্রে বিচরণকারী 'অসুর'। তাঁর মতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিবর্তনে এশিয়া কখনও দাতারূপে, কখনও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মত, অনেক প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছে। এই ব্যাখ্যার মধ্যে তিনি তাঁর নিজের যে স্বপ্ন—যে একদিন বেদান্তের সমন্বয়কে ভিত্তি করে এক সার্বজনিক ধর্ম ও ঐতিহ্য গড়ে উঠবে, তার সমর্থন পেয়েছিলেন।

ইউরোপ ভ্রমণের বিবরণে ভূমধ্যসাগর সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান আর নাই," যেখানে তিনটি মহাদেশের সভ্যতা মিলেছে এবং পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় হয়েছে।[২২৯] "নানা বর্ণ, জাতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও আচারের বহুশতাব্দীব্যাপী যে মহাসংমিশ্রণের ফলস্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে সংমিশ্রণের মহাকেন্দ্র এইখানে।" ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন, ফিনিসিয়া, ইহুদি, ইরাণ, গ্রীস ও রোম সকলে মিলে আর্য ও সেমেটিক সভ্যতার অবদানগুলির মিলন ঘটানোয় প্রয়াসী হয়েছে। প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতায় এবং তার মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যুত্থানে ভারতের প্রত্যক্ষ অবদানের সম্ভাবনার কথাও তিনি তুলেছেন। প্রাচীন মিশরের পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সমুদ্রের দক্ষিণ দিকে 'পুনট' নামক যে জায়গা থেকে মিশরীয়রা মিশরে প্রবেশ করেছিল, সেই 'পুনট'কে বর্তমান মালাবার বলে চিহ্নিত করার মতবাদ বিবেকানন্দ এখানে উল্লেখ করেছেন। তাদের প্রথম রাজার নাম মেনেস : হিন্দু ঐতিহ্য অনুযায়ী মানবজাতির পিতা 'মনুর' সঙ্গে তাঁর নামের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

প্রাচীনকালে এশিয়াবাসী দলে দলে নির্গত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বসতি করেছিল, অর্থাৎ বর্তমান জাতিসমূহের এক পিতৃত্ব তাদের সমন্বয়ের অন্যতম ভিত্তি।[২৩০] তিনি বলেছেন যে এই সব অভিযাত্রীরা ছিল বর্বর এবং তাদের বেশিরভাগ চূড়ান্ত বর্বরতার পর্যায়েই ছিল। কয়েকটি মাত্র ক্ষুদ্র এলাকায় তারা সভ্য হতে পেরেছিল। রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যারা তারাও তাঁর মতে বর্বর ছিল, তারা সুসভ্য এট্রুসকানদের পরাজিত করে তাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প প্রভৃতি শিখে নিজেরা সভ্য হল। প্রথমে তাদের সাম্রাজ্য প্রধানত অসভ্য জাতি অধ্যুষিত ইউরোপের উপর বিস্তৃত ছিল। উত্তর দিকে সীমান্তের ওপারে অন্য অসভ্য জাতির বাস ছিল, এশিয়ার 'অসুরদের' দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তারা সম্পদ এবং বিলাসের আধিক্যে অবক্ষয়প্রাপ্ত রোমান সাম্রাজ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যের সভ্যতায় এশিয়ার অবদান ইহুদিদের মাধ্যমে পৌঁছেছিল ; রোমকদের দ্বারা পরাজিত হয়ে তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা আবার তাদের নতুন ধর্মমত—খ্রিস্টধর্ম—সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। বিভিন্ন 'অসুর' দলের আগমন, এবং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত—এই নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই আধুনিক ইউরোপের জন্ম হয়েছে। বহু জাতির সংমিশ্রণে যে ইউরোপীয় জাতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে নানা ধরনের মানুষ আছে—কৃষ্ণ এবং গৌর উভয় বর্ণ, কালো বা কটা, চোখের রঙও বিভিন্ন। অনেকের আকৃতি হিন্দুদের মত, কেউ বা আবার চীনেদের মতো চ্যাপ্টা মুখ। যাই হোক, এক জায়গায় কিন্তু তারা সকলেই এক, "এ সকল জাত বর্বর, অতি বর্বর...দিবারাত্রযুদ্ধ মারকাটের আগুনে গলে মিশতে লাগল। ...উত্তরের গুলো বোম্বেটে রূপে বাগে পেলেই অপেক্ষাকৃত সভ্যগুলোর উৎসাদন করতে লাগল। মাঝখান থেকে ক্রিশ্চান ধর্মের দুই গুরু, ইতালির পোপ, আর পশ্চিমে কনষ্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্ক, এরা এই জন্তুপ্রায় বর্বর বাহিনীর উপর, তাদের রাজারাণী—সকলের উপর কর্তাত্তি চালাতে লাগল।" ভূদেবের মতে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের ফলে ইউরোপের সভ্য হওয়ার সুযোগ এসেছিল, যদিও যীশুর বাণীর মর্মার্থ ইউরোপের অন্তরে প্রবেশ করেছিল কি না সে বিষয়ে তিনি ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মধ্যযুগীয় ইউরোপের উপর খ্রিস্টধর্মের এইরকম প্রভাবের কথা বিবেকানন্দও বলেছিলেন কি না তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। পোপ এবং প্যাট্রিয়ার্কদের প্রভাবের কথা তিনি যেন একটু অসৌজন্যের ভঙ্গিতেই বলেছেন : "সকলের উপর কর্তাত্তি চালাতে লাগল।"

মধ্যযুগের ইউরোপের সভ্যতার পথে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় এশিয়ার বিশেষ অবদানের কথা তিনি আবারও বলেছেন। এশিয়ার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের নবতর মহিমার প্রভাবেই ইউরোপ সভ্য হতে পেরেছিল। সেই সময়কার পণ্ডিতমহলে প্রচলিত ছিল যে, ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবরা অসভ্য ছিল, বিবেকানন্দর ভাষায় "বন্যপশুপ্রায়", তিনি এই মতে বিশ্বাস করতেন। এই পশুপ্রায় মানুষের দল মহম্মদ নামক সাধুপুরুষের আগমনে সংস্কৃত হল এবং অদম্য উৎসাহ নিয়ে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল। এই প্রবল জোয়ার পূর্ব-পশ্চিম দু দিক থেকে ইউরোপে এসে পড়েছিল ; আরবরা ইউরোপের বর্বর অধিবাসীদের কাছে গ্রীক ও ভারতীয়, এই দুটি পৃথক ঐতিহ্য বহন করে এনেছিল। স্পেনের মুরজাতীয় বিজেতারা সেখানে এক উন্নত সভ্যতার পত্তন করে। তারাই প্রথম পাশ্চাত্যদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে যেখানে ইটালি, ফ্রান্স, এমনকি সুদূর ব্রিটেন থেকেও ছাত্ররা আসত। আরবদের কাছ থেকে যুদ্ধবিদ্যা এবং সভ্যতার অন্যান্য আনুষঙ্গিক শেখবার জন্য ইউরোপের রাজন্য এবং অভিজাতরা স্পেনে আসত। স্বামীজীর মতে ইউরোপের সামন্ততন্ত্রও গড়ে উঠেছিল আরব রীতির অনুকরণে। বিজিত দেশে মুসলমানদের জায়গীর প্রথা তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন : "মুসলমানেরা একটা দেশ জয় করে, রাজা—আপনার এক বড় টুকরো রেখে বাকি সেনাপতিদের বেঁটে দিতেন। তারা খাজনা দিত না, কিন্তু রাজার আবশ্যক হলেই এতগুলি সৈন্য দিতে হবে। এইরকমে সদা প্রস্তুত ফৌজের অনেক হাঙ্গামা না রেখে, আবশ্যককালে-হাজির প্রবল ফৌজ প্রস্তুত রইল।" কিন্তু 'মুসলিম' রীতি ও ইউরোপের অনুকরণের মধ্যে তিনি একটি পার্থক্য লক্ষ করেছেন। বলা বাহুল্য, প্রথমটি তাঁর মতে অনেক বেশি ন্যায়সঙ্গত, কারণ "রাজা, সামন্তচক্র, ফৌজ ও বাকি প্রজা" সবাই এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সামাজিক ভারসাম্য বজায় থাকত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউরোপে কিন্তু "রাজা আর সামন্তচক্র বাকি সব প্রজাকে করে ফেললে একরকম গোলাম।" তাঁর ধারণা হয়েছিল যে "প্রত্যেক মানুষ কোন সামন্তের অধিকৃত মানুষ হয়ে তবে জীবিত রইল—হুকুম মাত্রেই প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধযাত্রায় হাজির হতে হবে।"

মধ্যযুগ থেকে আধুনিকত্বে উত্তরণে ইউরোপ আর একটি ঘটনার জন্য এশিয়ার কাছে ঋণী, সে ঘটনা হল ক্রুশেড বা ধর্মযুদ্ধ। তুর্ক বা তাতার—এশিয়ার এই নতুন অসুরদলের অভ্যুত্থানে ধর্মযুদ্ধের সূচনা। তুর্করা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল, যুদ্ধজয়েও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিল, তা সত্ত্বেও আরবদের সম্বন্ধে তাঁর যেমন সশ্রদ্ধ মনোভাব ছিল, এদের সম্বন্ধে তা ছিল না। তাঁর মতে এই শ্রেণীর অসুরদের মধ্যে ভারতের মোগলরা ছাড়া[২৩১] আর কেউই সভ্যতার ধার ধারত না। "এ অসুরজাত কস্মিনকালে বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা করে না, জানে মাত্র লড়াই। ও রক্ত না মিশলে যুদ্ধবীর্য্য বড় হয় না।" রাশিয়ার জঙ্গী মনোভাবের পিছনে আছে তাদের পূর্বপুরুষের শিরায় তাতার রক্ত, কারণ রুশদের চার ভাগের তিন ভাগই হল তাতার। এক সময়ে সভ্যজগতের অর্ধেকেরও বেশি তাতাররা জয় করেছিল। ঈজিপ্ট এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ থেকে ভারত এবং চীন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাদের কবলিত ছিল।

"তাতাররা আরবি খলিফার সিংহাসন কেড়ে নিলে, ক্রিশ্চানদের মহাতীর্থ জিরুসালম প্রভৃতি স্থান দখল করে ক্রিশ্চানদের তীর্থযাত্রা বন্ধ করে দিলে, অনেক ক্রিশ্চান মেরে ফেললে"—এই হল বিবেকানন্দর মতে ধর্মযুদ্ধের কারণ। সেই সময় ক্রুশেড সম্বন্ধে পণ্ডিতদের এই মতটিই জনপ্রিয় হয়েছিল। বিবেকানন্দ এর সঙ্গে এমন একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যার মধ্যে তাঁর বলিষ্ঠ স্বকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। খ্রিস্টানদের উপর তুর্কির আক্রমণে ইউরোপের প্রতিক্রিয়াকে তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন : "ক্রিশ্চান ধর্মের গুরুরা ক্ষেপে উঠল ; ইউরোপময় তাদের সব বর্বর চেলা ; রাজা প্রজাকে ক্ষেপিয়ে তুললে—পালে পালে ইউরোপী বর্বর জিরুসালম উদ্ধারের জন্য আশিয়ামাইনরে চলল। কতক নিজেরাই কাটাকাটি করে মলো, কতক রোগে মলো, বাকি মুসলমানে মারতে লাগলো। সে ঘোর বর্বর ক্ষেপে উঠেছে—মুসলমানেরা যত মারে তত আসে। সে বুনোর গোঁ। আপনার দলকেই লুঠছে, খাবার না পেলে মুসলমান ধরেই খেয়ে ফেলে। ইংরেজ রাজা রিচার্ড মুসলমান-মাংসে বিশেষ খুশি ছিলেন, প্রসিদ্ধি আছে।"[২৩২] সভ্যতা এবং বর্বরতার মধ্যে সব সংঘাতের মতই এই সংঘাতেরও পরিণতি একই হয়েছিল। সামরিক শক্তির জন্য অসুর রক্তের অনুপ্রবেশের প্রয়োজন ছিল এই কথা বলে তিনি নিজের মতেরই বিরোধিতা করেছেন। যাই হোক, উপসংহারে তিনি বলেছেন যে জেরুসালেম মুক্ত করা সম্ভব না হলেও, ইউরোপ এশিয়ার কাছ থেকে সভ্যতার মন্ত্রে দীক্ষা নিতে শুরু করেছিল। "কিন্তু ইউরোপ সভ্য হতে লাগল। সে চামড়াপরা, আম-মাংস খেকো বুনো ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি আশিয়ার সভ্যতা শিখতে লাগল...দার্শনিক মত শিখতে লাগল ; একদল ক্রিশ্চান নানা (Knights-Templars) ঘোর অদ্বৈত বেদান্তী হয়ে উঠল ; শেষে তারা ক্রিশ্চানীকে ঠাট্টা করতে লাগল।"

মধ্যযুগের শেষাশেষি পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতাগুলি মোটামুটি সুস্পষ্ট আকৃতি পেয়েছিল। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া এবং পর্বতসঙ্কুল তটভূমির পটভূমিকায় এই সভ্যতার জন্ম। অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে, দেবতা এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসুরদের যথাবিহিত অবদানে গড়ে উঠেছিল সেখানকার মনুষ্যকুল। শক্তিধর, জঙ্গী মনোভাবাপন্ন ইউরোপীয়রা আত্মরক্ষা এবং নিজেদের ধর্মরক্ষার জন্য অনবরতই যুদ্ধ করত। "যে তলওয়ার চালাতে পারে, সে হয় বড় ; যে তলওয়ার না ধরতে পারে, সে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কোন বীরের তলওয়ারের ছায়ায় বাস করে জীবনধারণ করে।" এদের আর একটি কাজ হল বাণিজ্য। "এই সভ্যতার উদ্দেশ্য ইহ-পারলৌকিক ভোগ, উপায় তলওয়ার, সহায় বীরত্ব।" শিষ্য শরৎ চক্রবর্তীকে তিনি একবার বলেছিলেন যে ইউরোপীয়রা ভারতের পৌরাণিক কাহিনী কথিত সেই "মহাপরাক্রান্ত বিরোচনের সন্তান", যিনি বলেছিলেন যে মানুষের দেহই আত্মা।[১৩৩]

এই সব কিছুর পরিণতি যে পাশ্চাত্য সভ্যতা তার সঙ্গে তিনি ভারতের জীবনাদর্শের তুলনা করেছেন—"যারা সমতল দেশ পেলে, চাষবাস শিখলে, তারা পেটের দায়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পেলে, তারা অধিকতর সভ্য হতে লাগল।" তাঁদের কাছে সুখ ছিল মনের ও চিন্তার, দেহের নয়। পৃথিবীর নশ্বর জীবন তাঁদের কাছে মায়া, তাই তাঁরা জ্ঞান ও মোক্ষর মধ্যে শান্তির পথ খুঁজেছিলেন। "বিদ্যা ও ধর্মের পায়ের নীচে তলওয়ার রইল। তার একমাত্র কাজ ধর্মরক্ষা করা।...লাঙ্গল, তলওয়ার সকলের অধিপতি রক্ষক হইলেন ধর্ম। তিনি রাজার রাজা, জগৎ নিদ্রিত হলেও তিনি সদা জাগরূক। ধর্মের আশ্রয়ে সকলে রইল স্বাধীন।" এখানে মনে রাখতে হবে যে বিবেকানন্দ নিজেই বারবার এই আদর্শায়িত অতীত সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন, বিশেষত, পদদলিত জনসাধারণের অধিকার সম্বন্ধে ভারতের চিরন্তন অবহেলার প্রশ্নটিকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও, ইউরোপের ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী অতীতকে প্রতিহত করতে তিনি এক উজ্জ্বল শান্তিময়, ধর্মপরায়ণ সমাজের ছবি তুলে ধরেছেন।

ইউরোপের ইতিহাসে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের উপর যে জোর তিনি দিয়েছেন, তার সঙ্গে সমকালীন ইতিহাসের একটি ঘটনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, বলা বাহুল্য, সে ঘটনা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের সংগ্রাম। উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য সম্বন্ধে যে কোনও প্রসঙ্গের ভেতরই এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যাবে। মার্কিনী পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন থেকে মারি লুই বার্ক খ্রিস্টান জাতিসমূহের বিশেষত ইংরাজদের, খ্রিস্টধর্মবিরোধী আগ্রাসী নীতি সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তিগুলি সংগ্রহ করেছেন। লন্ডনে এক অভদ্র প্রশ্নকর্তাকে ভারতে ব্রিটেনের অপকর্মের বিবরণ শুনিয়ে তিনি কেমনভাবে জব্দ করেছিলেন ভাই মহেন্দ্র সে গল্প লিখেছেন। ইউরোপের ইতিহাসের সার সঙ্কলনের মধ্যে তিনি সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে বহুল-প্রচলিত মতবাদেরই পুনরুক্তি করেছিলেন : "ইউরোপীয়রা যে দেশে বাগ পান, আদিম মানুষকে নাশ করে নিজেরা সুখে বাস করেন...ওরা হা-ঘরে, 'হা অন্ন হা অন্ন' করে কাকে লুঠবে মারবে বলে ঘুরে বেড়ায়...তুমি ইউরোপী, কোন দেশকে কবে ভাল করেছ ?" ইংরেজদের দাম্ভিকতার বিরুদ্ধেও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন : "অপেক্ষাকৃত অবনত জাতিকে তোলবার তোমার শক্তি কোথায় ?" অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আফ্রিকার দুর্বল জাতিগুলিকে "বন্য পশুবৎ" ইউরোপীয়রা মেরে ফেলেছে। "আর ভারতবর্ষ তা কস্মিনকালেও করেননি।" পাশ্চাত্য ধারায় সভ্যতার অগ্রগতি মানে অন্যায়কে ন্যায় প্রতিপন্ন করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"স্টানলি দ্বারা তাঁর সমভিব্যাহারী ক্ষুধার্ত মুসলমান রক্ষীদের—এক গ্রাস অন্ন চুরি করার দরুন চাবকানো"—এই হল ইউরোপের ন্যায়বিচার। "এই সভ্যতার অগ্রসরণ লন্ডন নগরীতে ব্যভিচারকে, পারিতে স্ত্রী-পুত্রাদি অসহায় অবস্থায় ফেলে পালানোকে এবং আত্মহত্যা করাকে 'সামান্য ধৃষ্টতা' জ্ঞান করে।"

তাঁর মতে, "ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকবো। আর্য্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান করব, আমাদের চেয়ে বড় করব। আর্য্যের উপায়—বর্ণবিভাগ। শিক্ষা সভ্যতার তারতম্য, সভ্যতা শিখবার সোপান—বর্ণবিভাগ। ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু ; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।"[২৩৪] আবার বলি, বিবেকানন্দ অতীত ও বর্তমান ভারতের সামাজিক পরিস্থিতির এক ভিন্নধর্মী ছবি তুলে ধরেছেন এবং সেইসঙ্গে নিজের দেশবাসীকে সমাজ সুবিন্যস্ত করার বিধান দিয়েছেন।

যে জটিল পরিস্থিতিতে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার অভ্যুত্থান হয়েছিল সে বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করে তিনি ঐ সভ্যতার চরিত্র সম্বন্ধে মতামত দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর ঐ বক্তব্যের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে হীন ধারণা এবং গ্রীক সংস্কৃতিতে গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় :[২৩৫] "ইউরোপে ক্রিশ্চান ধর্ম তলওয়ারের দাপট চালিয়ে দিলেন...সভ্যতার আকর প্রাচীন গ্রীস ডুবে গেল।" পরাজিত গ্রীসের কাছে রোমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গ্রহণ করার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, এবং ইউরোপের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ সম্বন্ধে উনবিংশ শতকের প্রচলিত মতবাদ যে সেই সময়ে শিক্ষা এবং সংস্কৃতি অন্তর্হিত হয়েছিল, সেই যুগকে তিনি ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কালের সঙ্গে অভিন্ন বলে দেখিয়েছেন। খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে ইউরোপের অন্ধকার যুগের কার্যকারণ সম্বন্ধের যে আভাস এখানে পাওয়া যায়, ইতিহাস সৃষ্টিতে খ্রিস্টধর্মের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সে আভাস আরও স্পষ্ট হয়েছে, এ বিষয়ে পরে আলোচনা করেছি। সমকালীন অনেকের মতই তাঁরও বিশ্বাস ছিল যে কনস্টান্টিনোপলের পতন, গ্রীক পণ্ডিতদের পশ্চিমদিকে পলায়ন এবং গ্রীকদের 'বিদ্যা-বুদ্ধি-শিল্পের' পুনরুজ্জীবনের ফলেই ইউরোপে 'রেনেসাঁস' এবং ইংলন্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সে সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। "প্রাচীন ইতালি নবজীবনে বেঁচে উঠতে লাগল।...ইউরোপের অন্যান্য অংশের তখন প্রথম জন্ম।"[২৩৬] এই প্রসঙ্গে তিনি যুক্তিবাদী মননশীলতার উপর জোর দিয়েছেন। প্রথমে পুঁথিগত সমালোচনা এবং পরে ভৌতবিজ্ঞান ইউরোপীয়দের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের নিদর্শন।

ইউরোপের ঐ নবচেতনার অন্যতম পরিণতি—রিফর্মেশনের তিনি এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জোর করে দুনিয়াসুদ্ধকে মোক্ষমার্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে "বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ, যীশু করলেন গ্রীস-রোমের সর্বনাশ।" "কেবল বৈদিক ধর্মে এই চতুর্বর্গ সাধনের উপায় আছে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।" তা ছাড়া বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় গুণগত বৈশিষ্ট্যের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন ভারতে এবং মধ্যযুগের ইউরোপে বৈরাগ্যের আদর্শ সভ্যতার অবক্ষয় সূচিত করেছিল। "তারপর ভাগ্যফলে ইউরোপীয়গুলো প্রটেস্টান্ট হয়ে যীশুর ধর্ম ঝেড়ে ফেলে দিলে ; হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।"[২৩৭]

ফ্রান্স এবং ফরাসী সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর যে বিশেষ রকম উচ্চ ধারণা ছিল তা বোঝা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় তাঁর আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসের বিচার থেকে। মাত্র কয়েকমাস ফরাসী দেশে থেকে তিনি ঐ দেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ঐ স্বল্প পরিচয় তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'রেনেসাঁসে'র সময় থেকে ইউরোপের ঐতিহাসিক বিবর্তন আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি একটা নতুন ধরনের কথা বলেছেন—সমাজের বিবর্তনে তার প্রাচীনত্বের প্রভাব। ইউরোপে রেনেসাঁসের সময় "...নানা কারণে ভারতবর্ষও জেগে উঠেছিল কিছু, আকবর হতে তিন পুরুষের রাজত্বে বিদ্যা, বুদ্ধি শিল্পের আদর যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অতি বৃদ্ধ জাত নানা কারণে আবার পাশ ফিরে শুলো। ইতালি বুড়ো জাত, একবার সাড়াশব্দ দিয়ে আবার পাশ ফিরে শুলো।...ইউরোপে ইতালির পুনর্জন্ম গিয়ে লাগল বলবান অভিনব নতুন ফ্রাঁ জাতিতে...নূতন ফ্রাঁ জাতি আদরে সে তেজ গ্রহণ করলে।" ক্রমশ ফ্রান্স থেকে সেই ধারা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। এশিয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের কৃতিত্বও তাঁর মতে ফ্রান্সের: "ভারতে এসে সে তরঙ্গ লাগলো; জাপান সে বন্যায় বেঁচে উঠল।"[২৩৮]

দুর্গতি এবং পদদলিতদের প্রতি মমত্ববশত তিনি ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে একটা উত্তেজনা বোধ করতেন। বিপ্লবকালীন ফ্রান্স সম্বন্ধে তাঁর সংক্ষিপ্ত রচনায় সন্ত্রাসের কোনও সমালোচনা স্থান পায়নি। সমস্ত সমালোচনাই উদ্দিষ্ট হয়েছে অত্যাচারী রাজা এবং অভিজাতবর্গের প্রতি। বিপ্লব সম্বন্ধে চূড়ান্ত মন্তব্যগুলিই তাঁর সহানুভূতির পর্যাপ্ত নিদর্শন: "স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব—বন্দুকের নলমুখে, তলওয়ারের ধারে, ইউরোপের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়ে দিলে।...তারপর ন্যাপোলেয় ফ্রাঁস মহারাজকে দৃঢ়বদ্ধ সাবয়ব করবার জন্য বাদশা হলেন।" নেপোলিয়নের পতন এবং ফরাসী-জার্মান যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় তিনি গভীর দুঃখের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।[২৩৯]

আধুনিক ইউরোপীয় সমাজগুলির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি পরিণামবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে জীবজগতের ক্ষেত্রেও যেমন, আদিম অবস্থা থেকে সুসভ্য সমাজের উত্তরণেও তেমন এই তত্ত্ব এখন সকলেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, "ভারত ছাড়া অন্যত্র সকল দেশের ধর্মে ছিল এই যে, দুনিয়াটা সব টুকরা টুকরা, আলাদা আলাদা। ঈশ্বর একজন আলাদা, প্রকৃতি একটা আলাদা, মানুষ একটা আলাদা, ঐ রকম পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, মাটি-পাথর ধাতু প্রভৃতি সব আলাদা আলাদা।...ভারতবর্ষে চিন্তাশীল মনীষীরা প্রথমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদা ভাবটা ভুল। ও সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে, এমনকি ঈশ্বর স্বয়ং-এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে।" ইউরোপের পণ্ডিতরা এ কথা বুঝেছেন জড়বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে। এই ঐক্যের উপলব্ধির একটি প্রকাশ হল পরিণামবাদ, যদিও, "সে এক কেমন করে বহু হল, এ কথা আমরাও বুঝি না, ওরাও বোঝে না।" পরিণামবাদকে যদি অদ্বৈতের প্রকাশ বলা যায়, তাহলে বলতে হয় যে, "এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগৎ এক", এবং প্রকৃতি ও মানুষ আপাত বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক চূড়ান্ত সমন্বয়ের পথে ধাবিত হচ্ছে।[২৪০]

অসীমের মধ্যে যে ঐক্য, তা শুধুই অধিবিদ্যাগত সত্য এবং মানুষের চূড়ান্ত পরিণতির এক সুষম সমন্বয়; কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন যাত্রাপথে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত জাতীয়তাবাদ এবং আগ্রাসী মনোভাব সৃষ্ট যে নিরবচ্ছিন্ন সংঘাত, তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি উনবিংশ শতকের ইউরোপীয় রাজনীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলেছেন। এই সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ফরাসী-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যেখানে ফ্রান্স নিজের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়সঙ্কল্প, অন্যদিকে নবপ্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থায় তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষমতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অস্ট্রিয়া ব্যতীত সমস্ত জার্মান-ভাষী এলাকা তার নিয়ন্ত্রণাধীন। জার্মানিই প্রথম "প্রত্যেক নরনারীকে রাজদণ্ডের ভয় দেখিয়ে বিদ্যা শিখিয়েছে। আজ সে বৃক্ষের ফল ভোজন করছে।" ইউরোপে তার পদাতিক বাহিনী শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, সর্বোচ্চ স্থান নেবার জন্য তার নৌবাহিনীও প্রাণপণ করেছে এবং স্বামীজীর মতে "জার্মানির পণ্যনির্মাণ ইংরেজকেও পরাভূত করেছে। ইংরেজের উপনিবেশেও জার্মান পণ্য, জার্মান মনুষ্য ধীরে ধীরে একাধিপত্য লাভ করছে, জার্মানির সম্রাটের আদেশে সর্বজাতি চীনাক্ষেত্রে অবনতমস্তকে জার্মান সেনাপতির অধীনতা স্বীকার করছেন।"[২৪১]

অস্ট্রিয়ার অবক্ষয় ইউরোপের ইতিহাসের গতিকে প্রভাবান্বিত করতে পারে বলে তাঁর মনে হয়েছিল। নিজের মান-মর্যাদা এবং গৌরব রক্ষার আশা এখনও অস্ট্রিয়ার মনে জাগে, কিন্তু তা চরিতার্থ করবার মত শক্তি তার নেই। প্রুশিয়ার হাতে পরাজয়ই তার অবক্ষয়ের কারণ। স্বামীজী মন্তব্য করেছেন, "তুর্ককে ইউরোপে 'আতুর বৃদ্ধ পুরুষ' বললে, অস্ট্রিয়াকে 'আতুরা বৃদ্ধা স্ত্রী' বলা উচিত।" ইউরোপের অবশিষ্ট একমাত্র ক্যাথলিক সম্রাট বলে (স্পেন এবং পোর্তুগাল ধর্তব্য নয়) অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ বংশীয় সম্রাটগণ পোপের সমর্থনপুষ্ট। কিন্তু পোপের ধর্মীয় প্রাধান্য বজায় থাকলেও তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা এখন ভ্যাটিকান শহরে সীমাবদ্ধ, এবং ইতালি অস্ট্রিয়ার অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে এখন তার শত্রুপক্ষ। "ইংলন্ডের কুপরামর্শে নবীন ইতালি মহাসৈন্য-বল, রণপোত-বল" সংগ্রহ করতে গিয়ে "ঋণজালে জড়িত হয়ে...হাবসি বাদশার কাছে হেরে, হতশ্রী, হতমান হয়ে বসে পড়েছে।"[২৪২]

নেতৃত্বের সংগ্রাম যেমন সংঘাতের একটি কারণ, তেমনি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ—এক জাতি, এক ধর্মাবলম্বী এবং এক ভাষাভাষী সমস্ত জনগণের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা অপর এক কারণ। স্বামীজীর দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল যে অস্ট্রিয়ার বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যের জার্মান অধ্যুষিত এলাকাগুলি জার্মানি গ্রাস করবে। রাশিয়া তা বরদাস্ত করবে না, এবং তুর্কী রাশিয়ার চিরশত্রু বলেই জার্মান সম্রাট সম্প্রতি ঐ 'আতুর বৃদ্ধের' প্রতি খুবই সৌজন্য দেখাচ্ছে। বিবেকানন্দর এই রাজনীতির ব্যাখ্যা উনবিংশ শতকের নব্বই-এর দশকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে লেখা এই মন্তব্যে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, বছর পনেরো পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিবদমান শিবিরগুলি ঠিক ঐভাবেই গঠিত হয়েছে।[২৪৩]

তিনি দেখিয়েছেন যে, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ অস্ট্রিয়া এবং তুর্কী, উভয় সাম্রাজ্যেরই পতনের একটি বড় কারণ। বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে ঐক্যসূত্রে বেঁধে রাখার ক্ষমতা তাদের কারওরই ছিল না। অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের গ্রীক এবং হুঙ্গীররা কখনওই জার্মান-ভাষীদের সঙ্গে পুরোপুরি মিলেমিশে যায়নি। হুঙ্গীর এবং তুর্কীরা এক নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং বহু যুদ্ধের পর তারা নামেমাত্র অস্ট্রিয়ার অধীনতা স্বীকার করেছিল। একইভাবে, তুর্কীর অধীনে থাকলেও সার্বিয়া এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুলগেরিয়া কার্যত স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল। "বহু রক্তস্রোতে, বহু যুদ্ধের পর তুর্কের দাসত্ব ঘুচেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিষম উৎপাত।" যেহেতু সমস্ত ইউরোপ পরস্পর বিবদমান শত্রুশিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকেও স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্য সৈন্যবাহিনী গঠন করতে হচ্ছে যা তাদের ক্ষমতায় কুলোয় না। ফ্রান্স-প্রুশিয় যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় এই সামরিক প্রস্তুতির অন্যতম কারণ বলে বিবেকানন্দ মনে করেছেন। একদিকে প্রতিশোধস্পৃহা, অন্যদিকে নিরাপত্তার অভাববোধের ফলেই ফ্রান্সে সৈন্যবাহিনী মোতায়েনের বিরাট আয়োজন : "কুক্ষণে ফ্রান্স জার্মানির কাছে পরাজিত হল। ক্রোধে আর ভয়ে ফ্রান্স দেশসুদ্ধ লোককে সেপাই করলে। জার্মানি সিঙ্গি খেপিয়েছে—তাকেও কাজে কাজেই তৈয়ার হতে হল। অন্যান্য দেশেও এর ভয়ে ও, ওর ভয়ে এ—সমস্ত ইউরোপময় ঐ কনস্ক্রিপশন, এক ইংলন্ড ছাড়া।" তবে বিবেকানন্দর ধারণা ইংলন্ডেও "এ বোয়ার যুদ্ধের শিক্ষা পেয়ে বোধহয় কনস্ক্রিপশনই বা হয়।" ইতিমধ্যে সে তার নৌবাহিনী, উপনিবেশ সবই বাড়াচ্ছে। বলকান রাজ্যগুলি তুর্কীর অধীনতা মুক্ত হয়েছে বটে, তবে তারা ভারতের মতই দরিদ্র, অথচ তাদেরও ইউরোপীয় রীতিতে বহু ব্যয়সাপেক্ষ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সৈন্যসজ্জা করতে হচ্ছে। "চাষা কাজেই ছেঁড়া ন্যাতা গায়ে দিয়েছে—আর শহরে দেখবে কতগুলো ঝাব্বাঝুব্বা পরে সেপাই। ইউরোপময় সেপাই, সেপাই—সর্বত্রই সেপাই।"

কয়েক বছর আগে, ঐ একই ঘটনাকে উপলক্ষ করে ভূদেব মন্তব্য করেছিলেন, পাশ্চাত্য দেশের উদাহরণ নিয়ে ভারত যেন ঐ পথে পা না বাড়ায়। কিন্তু সন্ন্যাসী স্বামীজী পাশ্চাত্যে রজোগুণের প্রকাশ এবং স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ অন্যমত পোষণ করতেন : "স্বাধীনতা এক জিনিষ, গোলামি আর এক।...স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষ গুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই। ইউরোপের লোকেরা ঐ সর্বিয়া, বুলগার প্রভৃতিদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে—তাদের ভুল অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু এতকাল দাসত্বের পর কি একদিনে কাজ শিখতে পারে? ভুল করবে বইকি—দু'শ করবে; করে শিখবে, শিখে ঠিক করবে। দায়িত্ব হাতে পড়লে অতি দুর্বল সবল হয়। অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়।"[২৪৪] দেশবাসীর প্রতি বিবেকানন্দর উপদেশের সারমর্ম ছিল, নৈতিক দৃঢ়তার চেয়ে শারীরিক শক্তি অর্জনই তাদের বেশি দরকার। দেশকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য তিনি ইউরোপের কাছে বাস্তব শিক্ষা নিতে চেয়েছিলেন। বহু শতাব্দীর বিদেশী শৃঙ্খল মোচন করে বেরিয়ে আসা বলকান রাজ্যগুলির মত অপ্রত্যাশিত স্থানেও তিনি সেই উদাহরণ দেখেছিলেন।

নিজের প্রগাঢ় দেশপ্রেম সত্ত্বেও দেশপ্রেমের বাড়াবাড়ি যে বাতুলতার পর্যায়ে পৌঁছতে পারে সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, অনেক সময়েই অত্যন্ত সরসভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীরা যে প্রচলিত কুসংস্কারগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করতেন, তা নিয়ে তিনি অশোভন কৌতুক করেছেন। দেশপ্রেমের আতিশয্যে ইউরোপীয়রাও যে যথেষ্ট বোকামি করতে পারে, তা তাঁর নজর এড়ায়নি। জার্মানি কর্তৃক অবমাননাকর পরাজয়ের পর ফ্রান্সের অতীত গৌরব নিয়ে গর্ববোধকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন : "ফ্রান্স এখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থায় পড়ে প্রাচীন গৌরব স্মরণ করছে—আজকাল ন্যাপোলেঁয় সংক্রান্ত পুস্তক অনেক।" স্বামীজীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বান্ধবী মাদাম বার্নহার্ড নেপোলিয়নের পুত্রের দুর্দৈব সম্বন্ধীয় এক নাটকে অভিনয় করে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলেন। লেগর্ল (L'aiglon, the Young Eagle) বা 'গরুড় শাবক' নামক এই নাটকের বিষয়বস্তু ছিল—নেপোলিয়নের একমাত্র পুত্র মাতামহের সানব্রান প্রাসাদে একরকম নজরবন্দী অবস্থা থেকে পালাতে গিয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। দেশপ্রেমী ফরাসী পুরুষ ও মহিলার কাছে এই লেগর্ল নাটক পরমপ্রিয় হয়েছিল। সানব্রান প্রাসাদ দেখতে গিয়ে বিবেকানন্দ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। একদল ফরাসী পর্যটক 'গরুড় শাবক' কোন ঘরে শুতেন, কোন ঘরে খেলা করতেন ইত্যাদি দেখতে চাওয়ায় অস্ট্রিয় রক্ষী (তার কাছে তো নেপোলিয়নের নামই বিরক্তিকর) "মুখ হাঁড়ি করে, গজগজ করতে করতে ঘরদোর দেখাতে লাগল ; কি করে, বকশিশটা ছাড়া বড়ই মুশকিল।"[২৪৫]

উগ্র জাতীয়তাবাদের যে সবটাই হাস্যকর নয়, তা তিনি ঠিকই জানতেন। "এখন প্রত্যেক শক্তিমান জাতির যুদ্ধপোতনিচয় পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় কি গোলযোগ হচ্ছে, তাতে সকলেই দু কথা কইতে চায়। নিজেদের প্রাধান্য, স্বার্থ, বাণিজ্যরক্ষা করতে চায়। কাজেই মাঝে মাঝে কয়লার দরকার। পরের জায়গায় কয়লা লওয়া যুদ্ধকালে চলবে না বলে, আপন আপন কয়লা নেওয়ার স্থান করতে চায়। ভাল ভালগুলি ইংরেজ তো নিয়ে বসেছেন ; তারপর ফ্রান্স, তারপর যে যেথায় পায়—কেড়ে, কিনে, খোশামোদ করে—এক একটা জায়গা করেছে এবং করছে। সুয়েজ খাল...ফরাসীদের হাতে। কাজেই ইংরেজ এডেনে খুব চেপে বসেছে, আর অন্যান্য জাতও রেড সীর ধারে ধারে এক একটা জায়গা করেছে। সাতশ বৎসরের পর—পদদলিত ইতালি কত কষ্টে পায়ের উপর খাড়া হয়েই ভাবলে...দিগ্বিজয় করতে হবে! ইউরোপের এক টুকরোও কারও নেবার জো নেই...আশিয়ার বড় বড় বাঘা-ভালকো—ইংরেজ, রুশ, ফ্রেঞ্চ, ডাচ—এরা আর কি কিছু রেখেছে ? এখন বাকি আছে দু-চার টুকরো আফ্রিকার। ইতালি সেই দিকে চলল।...উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এল। তারপর ইংরেজরা রেড-সীর ধারে একটা জমি দান করলে।...কিন্তু হাবসি বাদশা মেনেলিক এমনি গো-বেড়েন দিলেন যে, এখন ইতালির আফ্রিকা ছেড়ে প্রাণ বাঁচানো দায় হয়েছে।[২৪৬] আবার রুশের ক্রিশ্চানি এবং হাবসির ক্রিশ্চানি নাকি এক রকমের—তাই রুশের বাদশা ভেতরে ভেতরে হাবসিদের সহায়।"

ঊনবিংশ শতকের ক্ষমতার লড়াই এবং পারস্পরিক আক্রমণাত্মক মনোভাবকে বিবেকানন্দ যেমন বুঝেছিলেন, উপরের উদ্ধৃতিটি তারই সংক্ষিপ্তসার। তথাকথিত প্রগতিসম্পন্ন জাতিগুলি যে ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল তা তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, তাই এখানে কোনও নৈতিক বিচার নেই, আছে শুধু প্রচ্ছন্ন পরিহাস।

বৈষম্য মানব-সমাজের, বিশেষত ইউরোপীয় সমাজের স্বাভাবিক প্রবণতা বলে তাঁর মনে হয়েছে, এবং ঐ বৈষম্যকে যে ভারতীয় সমাজের চতুর্বর্ণের সঙ্গে তুলনা করা যায়, উদাহরণ দিয়ে তা দেখিয়েছেন।[২৪৭] "পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনায় বোধহয় যে প্রাকৃতিক নিয়মের বলে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ সনাতন কাল হইতেই সকল সভ্য সমাজে বিদ্যমান আছে।" উন্নতির সহায়ক হিসাবে বর্ণবিভাগের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। অন্যত্র বর্ণবিভাগের অন্তর্নিহিত শ্রম বিভাগের উৎপত্তির কথা তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :[২৪৮] "একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগল—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি করে। একদল সেই ভোগ্যদ্রব্য রক্ষা করতে লাগল। সকলে মিলে সেইসব বিনিময় করতে লাগল, আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ জায়গার জিনিসটা ও-জায়গায় নিয়ে যাবার বেতনস্বরূপ সমস্ত জিনিসের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলে। একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষ করলে, সে পেল ঘোড়ার ডিম; যে পাহারা দিলে, সে জুলুম করে কতটা আগভাগ নিলে। অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে মলো!! পাহারাওয়ালার নাম হল রাজা, মুটের নাম হল সওদাগর। এ দু-দল কাজ করলে না, ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগল। যে জিনিস তৈরি করতে লাগল, সে পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান' ডাকতে লাগল।"

'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী রূপে পর্যায়ক্রমে চতুর্বর্ণের অধিকারলাভের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সমাজের বিবর্তনের একটি পরিকল্পনা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই এই ব্যাখ্যা অবাস্তব হলেও প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিশ্বজনীন পরিপ্রেক্ষিত এবং পাশ্চাত্যের ইতিহাসে তার প্রাসঙ্গিকতা বোঝাবার প্রচেষ্টা সহজেই বোধগম্য।

তিনি দেখিয়েছেন যে প্রত্যেক বর্ণেরই ভাল-মন্দ দু'দিকই আছে। পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর শক্তি তাঁদের বুদ্ধিবল "অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের বার্তা ও সহায়তার জন্য সর্বমানবপ্রাণ সদাই ব্যাকুল, কিন্তু সাধারণের সেখানে প্রবেশ অসম্ভব। ইন্দ্রিয়সংযমী, অতীন্দ্রিয়দর্শী, সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষেরাই সে রাজ্যে গতিবিধি রাখেন এবং অন্যকে পথ প্রদর্শন করেন।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষমতা বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। "দেহবিৎ পুরোহিত দেববৎ পূজিত হয়েন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আর তাঁহাকে অন্নের সংস্থান করিতে হয় না।" 'ধনজনমদোন্মত্ত' রাজগণ 'তপোবলসহায়' পুরোহিতের সামনে নতজানু। "ইঁহারাই পুরোহিত, মানবসমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক...সর্বদেশে প্রথম পূজা তিনিই পাইয়াছিলেন।" কিন্তু তাঁদের বৃত্তির মধ্যেই লুকিয়ে আছে ছলনা এবং "নিদারুণ ঈর্ষাপ্রসূত অপরাসহিষ্ণুতার" বীজ। "স্থূলের মধ্য দিয়া শক্তির বিকাশ সর্বজনীন প্রত্যক্ষ", তা সকলেই দেখে, সকলেই বোঝে। "কিন্তু যেখানে শক্তির আধার ও বিকাশকেন্দ্র কেবল মানসিক, যেখানে বল কেবল শব্দবিশেষে, উচ্চারণবিশেষে, জপবিশেষে বা অন্যান্য মানসিক প্রয়োগবিশেষে", যেখানে সার্থকতা বা প্রতিহিংসাপরায়ণতাও নানারকম অতিপ্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়, এইসব বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিকর্তাগণ যে প্রহেলিকার জগতে বাস করেন, সেখানে কোনো কিছুই দিনের আলোর মত স্বচ্ছ ও প্রত্যক্ষ নয়। এইসব কিছুর সম্মিলিত ফল তাঁদের মধ্যে এক মানসিক সঙ্কীর্ণতা এবং সেই সঙ্গে পরশ্রীকাতরতা-জনিত অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করেছে। "যে বলে আমার দেবতা বশ,...যাহার বিনিময়ে আমার পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ঐশ্বর্য্য", অন্যের কাছে এ শক্তি প্রতিভাত হয় না ফলে তা গোপন রাখার সুযোগ অনেক, এবং গোপনতার সুযোগে তারা সমাজে একটি কায়েমী স্বার্থ গড়ে তোলে। স্বার্থপরতা এবং ভণ্ডামি এই রকম গোপনতার স্বাভাবিক পরিণতি। "বিনাভ্যাসে, বিনা বিতরণে প্রায় সর্ববিদ্যার নাশ, যাহা বাকী থাকে, তাহাও অলৌকিক দৈব উপায়ে প্রাপ্ত বলিয়া আর মার্জ্জিত করিবারও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেষ্টা বৃথা বলিয়া ধারণা হয়। তাহার পর বিদ্যাহীন, পুরুষকারহীন, পূর্বপুরুষদের নামমাত্রধারী পুরোহিতকুল পৈতৃক অধিকার, পৈতৃক সম্মান, পৈতৃক আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যেন তেন প্রকারেণ চেষ্টা করেন, অন্যান্য জাতির সহিত কাজেই বিষম সংঘর্ষ।"[২৪৯] বলা বাহুল্য, ভারতের ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে উদ্দেশ্য করেই তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। খ্রিস্টিয় পুরোহিত ও পাদ্রীদের তিনি যেভাবে সমালোচনা করতেন, তাতে মনে হয় তাদেরও তিনি এদেরই দলে ফেলেছিলেন।

দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়দের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তার অর্থ সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকে না: "রাজসিংহে মৃগেন্দ্রের গুণদোষরাজি সমস্তই বিদ্যমান। একদিকে আত্মভোগেচ্ছায় কেশরীর করাল নখরাজি তৃণগুল্মভোজী পশুকুলের হৃৎপিণ্ড বিদারণে মুহূর্তও কুণ্ঠিত নহে; আবার কবি বলিতেছেন ক্ষুৎক্ষাম জরাজীর্ণ হইলেও ক্রোড়াগত জম্বুক সিংহের ভক্ষণরূপে কখনই গৃহীত হয় না।"[২৫০] প্রত্যক্ষভাবে ক্ষত্রিয়বর্ণের ন্যায়-অন্যায় বোঝাতে ব্যবহৃত হলেও ব্রিটিশ বা পাশ্চাত্যদেশীয় সিংহ যে শান্তিপ্রিয় জাতিগুলির শান্তির বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, এই উপমা দিয়ে স্বামীজী তাও বুঝিয়েছেন। ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রাধান্যের ফলে সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া অন্যান্য প্রতিক্রিয়াও দেখা গিয়েছিল। রাজার ব্যক্তিত্বে দেবত্ব আরোপিত হওয়ায় তাঁর যথেচ্ছ সুখভোগের অধিকারও স্বীকৃত হয়েছিল। সুতরাং "পর্ণকুটীরের স্থানে অট্টালিকার সমুত্থান,...সুরম্য আরাম, উপবন, মনোমোহন আলেখ্যনিচয়, ভাস্কর্য্য রত্নাবলী, সুকুমার কৌষেয়াদি বস্ত্র—শনৈঃ পদসঞ্চারে প্রাকৃতিক কানন, জঙ্গলে স্থূল বেশভূষাদির স্থান অধিকার করিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিজীবী পরিশ্রমবহুল কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া অল্পশ্রমসাধ্য ও সূক্ষ্মবুদ্ধির রঙ্গভূমি শত শত কলায় মনোনিবেশ করিল। গ্রামের গৌরব লুপ্ত হইল, নগরের আবির্ভাব হইল।...পুরোহিত যে প্রকার সর্ববিদ্যা কেন্দ্রীভূত করিতে সচেষ্ট, রাজা সেই প্রকার সকল পার্থিব শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে যত্নবান", ফলে "পৌরোহিত্য ও রাজন্যশক্তিদ্বয়ের বিষম কলহ।...এবং সাধারণ ব্যক্তি নিচয়ের সহিত শক্তিমান শাসনকারীদের সংঘর্ষ" অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। "এ যুদ্ধের জয়পরাজয়ের উপর সমাজের প্রাণবিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে।" বিবেকানন্দ দেখাতে চেয়েছেন যে এইসব সংঘাত ভারতের ইতিবৃত্তেও অপ্রতুল নয়, তবে যে সংঘাতের কথা মনে করে একথা বলেছেন সেই উদাহরণটি তিনি পাশ্চাত্যদেশের ইতিহাস থেকে নিয়েছিলেন।

পাশ্চাত্যের উদাহরণ সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়েছে সমাজের বিবর্তনে তৃতীয় বর্ণ বা বৈশ্যশ্রেণীর ক্ষমতালাভের বিবরণে। ব্রাহ্মণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির উপর, ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রশক্তির উপর, এবং বৈশ্যশ্রেণীর শক্তি অর্থের অতুল ক্ষমতার উপর। একটি সুন্দর অনুচ্ছেদে নাটকীয় ভাষায় তিনি তা বর্ণনা করেছেন: "মুদ্রারূপী অনন্তশক্তিমান আমার হস্তে।...হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি—ইহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য্য—ইহার কৃপায় আমার অভিমতসিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধুসঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান করিবে কে?—আমি। যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।" তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছেন, "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াধিপত্যে যে প্রকার বিদ্যা ও সভ্যতার সঞ্চয়, বৈশ্যাধিকারে সেই প্রকার ধনের। যে টঙ্ক ঝঙ্কার চাতুর্বর্ণ্যের মনোহরণ করিতে সক্ষম, বৈশ্যের বল সেই ধন। সে ধন পাছে ব্রাহ্মণ ঠকায়, পাছে ক্ষত্রিয় বলাৎকার দ্বারা গ্রহণ করে, বৈশ্যের সদাই এই ভয়। আত্মরক্ষার্থ সেজন্য শ্রেষ্ঠিকুল একমতি। কুসীদ-কশাহস্ত বণিক—একালের হৃৎকম্পউৎপাদক। যাহাতে রাজশক্তি বৈশ্যবর্গের ধনধান্য-সঞ্চয়ের কোন বাধা না জন্মাইতে পারে, সেজন্য বণিক সদাই সচেষ্ট।...অর্থবলে রাজশক্তিকে সঙ্কীর্ণ করিতে বণিক সদাই ব্যস্ত।...কিন্তু শূদ্রকুলে সে শক্তি সঞ্চার হয়—এ ইচ্ছা বণিকের আদৌ নাই।"[২৫১]

সভ্যতা সঞ্চালনে বৈশ্যের বিশেষ কৃতিত্ব আছে। তারা এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাতায়াত করে, সঙ্গে এক দেশের জ্ঞান, শিল্পকলা অন্য দেশে নিয়ে যায়। "যে বিদ্যা, সভ্যতা ও কলাবিলাসরূপ রুধির ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াধিকারে সমাজ হৃৎপিণ্ডে পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, বণিকের পণ্যবীথিকাভিমুখী পন্থানিচয়রূপ ধমনীযোগে তাহা সর্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে।" এতে সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে। বিবেকানন্দর পরিচিত পৃথিবী তখন পাশ্চাত্যদেশীয় বৈশ্যদের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন।

পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের যে বিপুল ক্ষমতা, বিবেকানন্দ তা যথাযথভাবে উপলব্ধি করে মানবসভ্যতায় তার অবদানেরও প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ইউরোপীয় পুঁজিবাদ যে মানবসমাজকে উচ্চতর আদর্শের পথে নিয়ে যাচ্ছে, এ কথা তিনি মানতে রাজি নন। ইউরোপে গণতন্ত্রের ব্যবহারিক রূপ দেখে তিনি সেটাই সন্তুষ্ট হননি। "উপায় তো সব দেশেই এক—অর্থাৎ গোটাকতক শক্তিমান পুরুষ যা করছে তাই হচ্ছে।...ও তোমার পার্লামেন্ট দেখলুম, সেনেট দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম।...শক্তিমান পুরুষরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।" ভারত সম্বন্ধে তিনি বেশ খাঁটি দেশপ্রেমিকের ভঙ্গিতে বলেছেন : "ভারতবর্ষে শক্তিমান পুরুষ কে?—না, ধর্মবীর। তাঁরা আমাদের সমাজকে চালান।...এতে তোমার বাড়ার ভাগ ঐ মেজরিটি, ভোট প্রভৃতি হাঙ্গামাগুলো নেই, এই মাত্র।" এতে যেমন ভারতবাসী রাজনীতির শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তেমনি আবার "রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপীয় দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে," সেটাও আমাদের দেশে নেই। ইউরোপের রাজনীতিকে তিনি "ঘুষের ধূম, সে দিনে ডাকাতি" বলে বর্ণনা করেছেন, যাতে মানুষের উপর সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে যায়। "যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে, শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে। জিত হলে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে, আর প্রজাগুলো তো সেখানেই মারা গেল।"[২৫২]

যেদিন শূদ্রশক্তির জাগরণ হবে, তারা শাসনক্ষমতা অধিকার করবে, বিবেকানন্দ সেইদিনকে স্বাগত জানিয়েছেন।[২৫৩] "যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য্য, বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব," তারা সব কিছু থেকেই বঞ্চিত। মানবসমাজের বৃহত্তম অংশ তারা, কিন্তু নিজেদের মধ্যে সংহতিসাধনে অপারগ বলেই তারা সকলের দ্বারা পদদলিত। তবে আশা আছে। উর্দ্ধাধঃ স্বিমুখীগতি বর্তমান সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। উচ্চপদে শূদ্র এবং নিম্ন ধরনের বৃত্তিতে নিযুক্ত উচ্চতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেণীর উদাহরণ এখন বিরল নয়। ইতিহাসে এই গতির অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। রোমের শূদ্র ক্রীতদাসগণ ইউরোপের মহাবলশালী ক্ষত্রিয় যোদ্ধা হয়েছিল। একদা শক্তিশালী চীন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হতে চলেছে, অন্যদিকে আবার জাপান তার অন্ধকারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে জাতিপুঞ্জে উচ্চবর্ণের আসন নিতে চলেছে। এইভাবে শূদ্রজাতিগুলি যদি ক্ষত্রিয়ত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের পথে পা বাড়াতে পারে, তাহলে নিপীড়িত জনসাধারণও আশার আলো দেখতে পায়। বিবেকানন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে একদিন শূদ্রবর্ণীয়েরা সমস্ত মানবজাতির উপর প্রভুত্ব করবে। তারা কিন্তু পুরোহিত বা যোদ্ধা বা বৈশ্যরূপে উচ্চতর বর্ণের পদাধিকারী হয়ে প্রভুত্ব করবে না। শ্রমজীবী জনসাধারণরূপেই করবে। যেন কোনও অলৌকিক শক্তির বলে সার্থক ভবিষ্যৎদর্শীরূপে তিনি বলেছিলেন যে এই পরিবর্তনের ধারার সূচনা হবে রুশ এবং চীন দেশে।[২৫৪] নতুন সূর্যোদয়ের ঊষার আলো ইউরোপের দিগন্তে ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। "সোস্যালিজম, এনার্কিজম, নাইহিলিজম প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।" এইসব লক্ষণ দেখে শোষক সম্প্রদায় বিচলিত হয়ে পড়ছে। বঙ্কিম, ভূদেব দুজনেই পাশ্চাত্যের সাম্যবাদী আদর্শ সম্বন্ধে মতামত দিয়েছেন। প্রথমজন সাম্যবাদী আদর্শে নিজের প্রথম জীবনের উত্তেজনাকে উত্তর জীবনের সুচিন্তিত মতবাদে 'ভুল' বলেছেন। ভূদেব বরাবরই এই আদর্শকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং উদারপন্থী মানসিকতার বিকৃতি বলেছেন। বিবেকানন্দ কিন্তু নিঃসংশয় হয়েই আশা করেছিলেন যে পৃথিবীর দরিদ্র জনসাধারণ একদিন ক্ষমতার উত্তরাধিকার লাভ করবে। ভারতে পরিব্রজ্যার দিনগুলিতে শোষিত-নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতি তাঁর যে সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছিল, তা শুধু ভারতের জনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েনি। দুটি পথ ধরে তিনি স্বাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করেছিলেন—একটি বেদান্তের তুরীয় মার্গ, অন্যটি পৃথিবীব্যাপী অভুক্ত জনসাধারণের সঙ্গে একাত্মবোধ। কোনোটির দ্বারাই নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন সম্ভব ছিল না, তা সত্ত্বেও, যদি এসব কারণে তাঁর দৃষ্টি কিছুটা আচ্ছন্ন হয়েও থাকে, সেই দৃষ্টির মধ্যে যে মূল্যবোধ ধরা পড়েছে, তা শাসকশ্রেণীর সুযোগ-সুবিধার প্রতি বিদ্বেষজনিত বিদেশী-বর্জনের মনোভাবের থেকে একেবারেই আলাদা।

পাশ্চাত্য সমাজের যে ধারা সেটি সঠিকভাবে বুঝেছিলেন বলেই পৃথিবীতে শূদ্র অধিকার সম্বন্ধে তাঁর একটু সংশয় ছিল। ইউরোপে যে জন্মসূত্রে না হয়ে মানুষের বর্ণ নির্ধারিত হয় তার বৃত্তি এবং প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে, সেই রীতি তাঁর মতে শূদ্রকর্তৃত্বের পথে একটি মস্ত বাধা। সাধারণ লোকের পক্ষে ওপরে ওঠার সুযোগ-সম্ভাবনা খুবই কম। স্বল্পসংখ্যক যাঁরা ব্যতিক্রম, তাঁরা বিদ্যা বা অর্থে যোগ্যতা অর্জন করলে উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হয়ে যান। অর্থাৎ তাঁদের কৃতকার্যতায় জনসাধারণের কোনও লাভ হয় না। উপরন্তু উচ্চবর্গের যাঁরা অকৃতী তাঁরা আবার ক্ষমতাহীনদের দল ভারী করেন।

স্বামীজীর সমস্ত চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দুতে যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী। সমাজে ক্ষমতার আকর, বিদ্যা, অস্ত্রশক্তি বা অর্থ, যাই হোক, সর্বক্ষেত্রেই ক্ষমতা উৎসারিত হয় জনগণ থেকে। ক্ষমতার এই মৌলিক উৎস থেকে তফাত হয়ে থাকলে তা নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবেই পুরোহিত শক্তি দূরে সরে যাওয়ার ফলে দুর্বল হয়ে সহজেই ক্ষত্রশক্তির কাছে পরাজিত হয়েছিল ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার ক্ষত্রিয়রাও একইভাবে জনগণসমর্থিত বৈশ্য শ্রেণীর কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিল। এখন বৈশ্য শ্রেণীরও অভীষ্ট সিদ্ধি হয়েছে, তাই তারা এখন জনসাধারণের থেকে নিজেদের তফাত করতে ব্যস্ত, "এইস্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।" তবে তাঁর মতে "গরীব নিম্নজাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগল, তখন থেকেই ইউরোপ উঠতে লাগল। রাশি রাশি অন্য দেশের আবর্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরীব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায় ; এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড।" ভারতের সমস্যাকে তিনি যেমন বুঝেছিলেন, বলা বাহুল্য, তার সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আবার ভারতের সমস্যাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়েই সমাজ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব আদর্শের সৃষ্টি। প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি তিনি এইভাবে শেষ করেছেন : "বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী—এরা শুনলে বা না শুনলে...কিছুই এসে যায় না। এঁরা হচ্ছেন শোভামাত্র, দেশের বাহার..."[২৫৫]

ইউরোপীয় সভ্যতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য যেমন ইউরোপীয় প্রথায় বর্ণবিভাগ তেমনি পাশ্চাত্য জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত তার শক্তি এবং দুর্বলতার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ইউরোপের খ্রিস্টধর্ম। তিনি যে ইউরোপের ধর্মের মূল্যায়ন করেছেন, সেখানে আপাতদৃষ্টিতে অনেক পরস্পরবিরোধী মন্তব্য আছে। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্যের ভিতর যেমন শ্রদ্ধা এবং প্রশস্তি আছে, তেমনি আছে ঘৃণা এবং বিরক্তি যা প্রায় বিদেশী-বিদ্বেষের পর্যায়ে পৌঁছেছে। প্রকৃতপক্ষে, মন্তব্যগুলি পরস্পরবিরোধী নয়, বরং তাঁর বিভিন্ন স্তরের উপলব্ধি বলা যায়। নিজের অতীন্দ্রিয়-সারবাদী ধর্মবিশ্বাসের ফলে তিনি খ্রিস্ট ও খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে কিছুটা শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বেদান্তের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের তুলনায় খ্রিস্ট ধর্মমত ও বিশ্বাস যেন অন্তঃসারশূন্য। Higher Criticism নামক নতুন চিন্তাধারা এমন সব মৌলিক প্রশ্ন তুলেছিল যা আস্তিক্যবাদের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে হিন্দুধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করে যে খ্রিস্টধর্মের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা হচ্ছিল, এইসব বিশ্লেষণের ফলে তাঁর মনে ঐ শ্রেষ্ঠত্বের দাবি সম্বন্ধে সংশয় জেগেছিল। খ্রিস্টিয় ধর্মবিশ্বাসের সমালোচনা শুধুই সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নয়, বরং হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান, সুরুচিবোধ এবং আধ্যাত্মিকতা সর্বসমক্ষে তুলে ধরাই তাঁর আসল উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। প্রসঙ্গক্রমে দুই ধর্মমতের তথাকথিত সাদৃশ্য এবং ঐতিহাসিক সম্পর্কের উপর তিনি জোর দিয়েছেন। ইতিহাসে খ্রিস্টধর্মের ভূমিকার মূল্যায়নে ঐ ধর্মের গোঁড়ামি এবং অসহিষ্ণুতার ঘটনাবলী এবং খ্রিস্টান জাতিগুলির অখ্রিস্টিয় অত্যাচারের কাহিনীর প্রতি তাঁর ক্ষুরধার সমালোচনা বর্ষিত হয়েছে। যে কঠোরভাষায় তিনি মিশনারি এবং তাদের কার্যকলাপের সমালোচনা করেছেন, তাকে অসহিষ্ণুতার পর্যায়ে ফেলা যায় ; যদিও অসহিষ্ণুতা কোনও ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ হতে পারে না বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন।

এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে আমি যুবক নরেন্দ্রর খ্রিস্টের জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার কথা আলোচনা করেছি ; তিনি যে Imitation of Christ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন এবং চূড়ান্ত অনটনের মধ্যে বাইবেল পড়ে সান্ত্বনা লাভ করতেন, তার উল্লেখ করেছি। রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম অনুষ্ঠান ছিল ক্রিস্টমাস ইভ পালন করা।[২৫৬] তাঁর বিচারে ধর্ম ও ধর্মমত সম্পূর্ণ আলাদা এবং এই বিচারবোধ নিয়েই তাঁর সব সমালোচনা। সমস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মমতেরই উদ্দেশ্য এক এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির আকিঞ্চনও একই ভাবের—এই সত্যের উপলব্ধিই তাঁর মতে 'ধর্ম'। ধর্মমতের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিজিগীষা বর্তমান। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বলে ধর্মমতও নানারকমের এবং এক সম্প্রদায়ের মানুষ যা যা চায় তার ভিত্তিতেই তাদের ধর্মমত গঠিত হয়। পৃথিবীতে অসংখ্য ধরনের বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ আছে। এক মহান ও মঙ্গলময় নৈতিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাসের পথটি যে যার মত করে বেছে নেয়। সব পথেরই অন্তর্নিহিত সুন্দর আদর্শের জন্য 'ধর্ম' বলতে সবগুলিকেই বোঝায়।[২৫৭] এই অনুচ্ছেদে বিবৃত আদর্শ এবং খ্রিস্ট ধর্মমত সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্যের মধ্যে অন্যান্য ধর্মমত পুরোপুরি মেনে নেওয়ার নির্দেশ নেই। এই গ্রন্থে আলোচিত অন্য দুই মনীষীর মতই স্বামীজীও ব্যক্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিক নির্বিশেষে সকলের জন্য বৈরাগ্যের খ্রিস্টিয় আদর্শকে মেনে নিতে পারেননি। 'আসল খ্রিস্টধর্ম' এবং 'খ্রিস্ট ধর্মমতের' মধ্যে তিনি পার্থক্য করেছেন। মনে হয় প্রথমটি তাঁর মতে যীশুর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্মবিশ্বাসগুলি চার্চ গড়ে তুলেছে, সেগুলির প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। আত্মা অবিনশ্বর, কিন্তু অনাদি নয়—এই বিশ্বাসকে তিনি অমার্জিত এবং ভুল বলেছেন।[২৫৮] স্যাক্রামেন্ট নামক খ্রিস্টিয় অনুষ্ঠান তাঁর মতে "বীভৎস", "কোনো মানুষের সদ্‌গুণাবলী পাওয়ার আশায় তাকে হত্যা করে মাংস খাওয়া ও রক্তপান করা তো নরখাদকের বৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।[২৫৯] কোনো কোনো বর্বর জাতি অবশ্য এই রকম করে থাকে।" খ্রিস্টধর্মের আলোচনায় বারবার রক্তের উল্লেখও তিনি বরদাস্ত করেননি।[২৬০] একটি বক্তৃতায় যে তিনি খ্রিস্টান ধর্মমতকে "ভয়ঙ্কর, বর্বর এবং পাশব" বলেছেন তা কিন্তু এই ধর্মে বারবার রক্তের উল্লেখ থাকার জন্য নয়, বরং খ্রিস্ট যে বলেছেন, "তুমি যেরকম ব্যবহার আশা কর, সেরকম ব্যবহার নিজে কর"—তার জন্য। এই উপদেশের মধ্যে তিনি অন্যের প্রতি সদ্ব্যবহার অপেক্ষা আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার অভিব্যক্তি দেখেছেন। সাকার ঈশ্বর এবং স্বর্গরাজ্য থেকে আদর্শ খ্রিস্টান যে মাঝে মাঝে খ্রিস্টিয় এবং অখ্রিস্টিয় জগতের তফাত দেখবেন, খ্রিস্টধর্মের এই কল্পনা তাঁর মতে হাস্যকর। এর বিপরীত হিন্দুধর্মের আদর্শ : "সমস্ত স্বার্থ ছাড়া কাজই ভাল এবং স্বার্থপরতা খারাপ সব ক্ষেত্রেই।"[২৬১]

খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে তাঁর গুছিয়ে লেখা সমালোচনার চেয়ে বক্তৃতা এবং ইতস্তত উল্লেখের মধ্যে ঐ ধর্ম সম্বন্ধে এইরকম সব অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্য রয়ে গেছে। অধিকতর যুক্তিবাদী বলে খ্রিস্টানদের যে দাবি তার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া অবশ্য তাঁর সুচিন্তিত মতামতেরই অংশ। জনৈক মার্কিন ধর্মযাজক বলেছিলেন যে, "এই রেড সী মুসা সদলবলে পদব্রজে পার হয়েছিলেন,...একথা এখন আধুনিক বিজ্ঞান-যুক্তির দ্বারা প্রমাণ হতে পারে"—এই কথার উত্তরে তিনি লিখেছেন : "এখন সব দেশে ধর্মের আজগুবিগুলি বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার এক ঢেউ উঠেছে।"[২৬২] আরও সুচিন্তিত একটি সমালোচনায় বাইবেল সংক্রান্ত আলোচনা ও তথাকথিত 'হায়ার ক্রিটিসিজম' প্রসঙ্গে খ্রিস্টধর্ম সংক্রান্ত অনেক প্রচলিত সংস্কার বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন। "সমস্ত সেমিটিক জাতিদের ধর্ম কিঞ্চিৎ অবান্তরভেদে প্রায় একরকমই ছিল" এবং মেসোপটেমিয় সভ্যতা তাদের উৎস বলে তিনি মনে করতেন। "বাল" এবং "মোলখ" এর পূজা উপলক্ষে পুত্রকন্যাকে জীবন্ত পোড়ানো অথবা "মন্দিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কামসেবা" প্রভৃতি "কতগুলি ভয়ানক ও জঘন্য ব্যাপারও ছিল" বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। ঐ প্রবন্ধেই বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট অংশটি যে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দের আগেকার নয়, তার অনেক কাহিনীই যে ব্যাবিলোনিয়দের কাছ থেকে পাওয়া, আত্মা বা পরলোকে অবিশ্বাস প্রভৃতি তত্ত্ব তিনি আলোচনা করেছেন। এইসব আলোচনায় ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাচীনত্ব, মৌলিকত্ব, আধ্যাত্মিক বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতি অন্তর্নিহিত আছে, পূর্বোক্ত ডেট্রয়েট-বক্তৃতার মত তা প্রকট নয়। পরলোকবাদ, মৃতের পুনরুত্থান এবং শয়তানবাদ এইসব পারসীক মতবাদ পারসীক শাসনকালে ইহুদিধর্মের মধ্যে গ্রথিত হয়েছিল বলে তিনি মনে করতেন। ইহুদিদের 'য়াভে' দেবতাও তাঁর মতে মিশরি। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধর্মের অংশ নিয়ে সমন্বয়বাদী জুডা-খ্রিস্টিয় ধর্মমতের অভ্যুত্থান হয়েছিল। হিন্দুদের পৌত্তলিকতা, কামাচার, নিষ্ঠুর প্রথা ইত্যাদির যে সমালোচনা ইউরোপীয়রা করে থাকেন, তারই প্রত্যুত্তর হিসাবে যেন তিনি ইহুদি ধর্মমতের মধ্যে যে পৌত্তলিকতা—জেরুসালেমের মন্দিরের দ্বারদেশে বৃহৎ পুংচিহ্ন স্তম্ভ, ইফ্রেমের 'য়াভে', জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেবতার নিকট জীবন্ত অগ্নিতে আহুতি দান, মন্দিরের মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতির কুপ্রথার উল্লেখ করেছেন। এর পরে আবার 'হায়ার ক্রিটিসিজম'-এর প্রসঙ্গে যীশুর ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। "যে সময়ে ঈশা জন্মেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি, সে সময়ে ঐ য়াহুদীদের মধ্যে দুইজন ঐতিহাসিক জন্মেছিলেন—জোসিফুস আর ফিলো। এঁরা য়াহুদীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়েরও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ঈশা বা খ্রিশ্চানদের নামও নাই, অথবা রোমান জজ তাঁকে ক্রুশে মারতে হুকুম দিয়েছিল, এর কোন কথাই নাই।...নিউ টেস্টামেন্টের যে চার পুস্তক তার মধ্যে 'সেন্ট জন' নামক পুস্তক তো একেবারে অগ্রাহ্য হয়েছে। বাকি তিনখানি—কোন এক প্রাচীন পুস্তক দেখে লেখা, এই সিদ্ধান্ত।...যে সকল কথা, উপদেশ বা মত নিউ টেস্টামেন্ট গ্রন্থে আছে, ও সমস্তই নানা দিগদেশ হতে এসে খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই য়াহুদীদের মধ্যে বর্তমান ছিল, এবং হিলেল প্রভৃতি রাব্বিগণ (ইহুদী পুরোহিত) প্রচার করেছিলেন।" একটু ঠাট্টার সুরে তিনি এই প্রসঙ্গের উপসংহার করেছেন : "পণ্ডিতরা তো এইসব বলছেন, তবে অন্যের ধর্ম সম্বন্ধে যেমন সাঁ করে এক কথা বলে ফেলেন, নিজেদের দেশের ধর্ম সম্বন্ধে তা বললে কি আর জাঁক থাকে ? কাজেই শনৈঃ শনৈঃ যাচ্ছেন।"[২৬৩]

হিন্দুধর্ম থেকেই যে খ্রিস্টধর্ম উদ্ভূত হয়েছে, এই দাবির মধ্যে নিজের জাতির সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সবচেয়ে বেশি প্রকট। এখানে সিদ্ধান্তের চেয়েও তাঁর ব্যবহৃত ভাষায় তার প্রমাণ : "আমাদের ধর্ম অন্যান্য সব ধর্ম অপেক্ষা প্রাচীন, এবং ক্রিশ্চান মত—এর বিপরীতধর্মিতার জন্য আমি একে ধর্ম বলিনা—হিন্দু ধর্ম থেকেই উদ্ভূত। হিন্দুধর্মের অনেক শাখাপ্রশাখার একটি।"[২৬৪] খ্রিস্টানদের ঈশ্বরের মাতা এবং হিন্দুদের মাতৃদেবী তাঁর মতে এক। ভূদেবও একই কথা বলেছেন। ইউরোপীয়দের রীতিনীতিতে এবং মেয়েদের প্রতি ব্যবহারে তিনি "শক্তিপূজার" রেশ দেখতে পেয়েছেন।[২৬৫] 'পরিব্রাজকে' তিনি ইতিহাসের উদাহরণ দিয়ে এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করেছেন : "এই মিশরে টলেমি বাদশার সময়ে সম্রাট ধর্মাশোক ধর্মপ্রচারক পাঠান।...তারা নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলে—থেরাপিউট, অসসিনি, মানিকি ইত্যাদি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা হতে বর্তমান ক্রিশ্চানি ধর্মের সমুদ্ভব।"[২৬৬]

হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি খ্রিস্টধর্মের সঙ্গতি দেখেছিলেন বটে তবে পাশ্চাত্যের ইতিহাসে খ্রিস্টিয় ধর্ম প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে তিনি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। সভ্যতার বিকাশে এই ধর্মের কোনও অবদান আছে বলে তিনি স্বীকার করেন না; এই প্রসঙ্গে তিনি ইসলামের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের তুলনা করেছেন: "ক্রিশ্চানধর্ম প্রথম তিন শতাব্দীতে জগৎসমক্ষে আপনাকে পরিচিত করতেও সমর্থ হয়নি, এবং যখন কনস্টানটাইনের তলোয়ার একে রাজ্যমধ্যে স্থান দিলে, সেদিন থেকে কোন কালে ক্রিশ্চানী ধর্ম আধ্যাত্মিক বা সাংসারিক সভ্যতাবিস্তারের কোন সাহায্য করেছে? যে ইউরোপী পণ্ডিত প্রথম প্রমাণ করেন যে পৃথিবী সচলা, ক্রিশ্চানধর্ম তাঁর কি পুরস্কার দিয়েছিল? কোন বৈজ্ঞানিক কোন কালে ক্রিশ্চানীধর্মের অনুমোদিত? ক্রিশ্চানী সঙ্ঘের সাহিত্য কি বিজ্ঞানের, শিল্প বা পণ্যকৌশলের অভাব পূরণ করতে পারে? আজ পর্য্যন্ত 'চার্চ' প্রোফেন সাহিত্য প্রচারে অনুমতি দেন না। আজ যে মনুষ্যের বিদ্যা এবং বিজ্ঞানে প্রবেশ আছে, তা কি অকপট ক্রিশ্চান হওয়া সম্ভব? নিউ টেস্টামেন্টে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রশংসা নেই। কিন্তু এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নেই যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোরাণ বা হদিসের বহু বাক্যের দ্বারা অনুমোদিত এবং উৎসাহিত নয়। ইউরোপের সর্বপ্রধান মনীষিগণ—ইউরোপের ভলটেয়ার, ডারউইন, বুকনার, ফামারিয়ঁ, ভিক্টর হুগো-কুল বর্তমানকালে ক্রিশ্চানী দ্বারা কটুভাষিত এবং অভিশপ্ত, অপরদিকে এই সকল পুরুষকে ইসলাম বিবেচনা করেন যে, এই সকল পুরুষ আস্তিক, কেবল ইহাদের পয়গম্বর-বিশ্বাসের অভাব। ধর্মসকলের উন্নতির বাধকত্ব বা সহায়কত্ব বিশেষরূপে পরীক্ষিত হোক, দেখা যাবে ইসলাম যেথায় গিয়েছে, সেথায়ই আদিম নিবাসীদের রক্ষা করেছে।...ক্রিশ্চানধর্ম কোথায় এমন কাজ দেখাতে পারে? স্পেনের আরব, অস্ট্রেলিয়ার এবং আমেরিকার 'আদিম নিবাসীরা কোথায়? ক্রিশ্চানেরা ইউরোপী য়াহুদীদের কি দশা করছে এখন? এক দানসংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী ছাড়া ইউরোপের আর কোন কার্য্যপদ্ধতি গসপেলের অনুমোদিত নয়—গসপেলের বিরুদ্ধে সমুত্থিত। ইউরোপে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই ক্রিশ্চানধর্মের বিপক্ষে বিদ্রোহ দ্বারা। আজ যদি ইউরোপে ক্রিশ্চানীর শক্তি থাকত, তাহলে পাস্তের এবং ককের ন্যায় বৈজ্ঞানিক সকলকে জীবন্ত পোড়াত এবং ডারউইনকল্পদের শূলে দিত। বর্তমান ইউরোপে ক্রিশ্চানী আর সভ্যতা আলাদা জিনিস। সভ্যতা এখন তার প্রাচীন শত্রু ক্রিশ্চানীর বিনাশের জন্য পাদ্রীকুলের উৎসাদনে এবং তাদের হাত থেকে বিদ্যালয় এবং দাতব্যালয়সকল কেড়ে নিতে কটিবদ্ধ হয়েছে। যদি মূর্খ চাষার দল না থাকত, তাহলে ক্রিশ্চানী তার ঘৃণিত জীবন ক্ষণমাত্র ধারণ করতে সমর্থ হত না, কারণ নগরস্থিত দরিদ্রবর্গ এখনই ক্রিশ্চানী ধর্মের প্রকাশ্য শত্রু! এর সঙ্গে ইসলামের তুলনা কর। মুসলমান দেশে যাবতীয় পদ্ধতি ইসলামধর্মের উপর সংস্থাপিত এবং ইসলামের ধর্মশিক্ষকরা সমস্ত রাজকর্মচারীদের বহুপূজিত এবং অন্য ধর্মের শিক্ষকরাও সম্মানিত।"[২৬৭]

বিবেকানন্দর মতে গোঁড়ামি, অসহিষ্ণুতা এবং জঙ্গী মনোভাব ব্যবহারিক খ্রিস্টধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। খ্রিস্টের উপদেশের সঙ্গে এসবের কোনও সম্পর্কই নেই বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।[২৬৮] গথ জাতির নিষ্ঠুরতা এবং খ্রিস্টধর্মের গোঁড়ামির ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রেকো-রোমান সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হয়েছিল। অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন খ্রিস্টানরা বহু ঈশ্বরবাদী হওয়ার অপরাধে বিখ্যাত গ্রন্থাগার সহ আলেকজান্দ্রিয়া শহর ভস্মীভূত করেছিল।[২৬৯] তাদের নিজেদের সমাজও গোঁড়ামির হাত থেকে নিস্তার পায়নি, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ডাইনি শিকার। তাদের নানা বর্বরতার তুলনায় ভারতের সতীপ্রথা অনেক ভাল কারণ সতীরা সমাজ পরিত্যক্ত ছিলেন না, বরং সমাজে তাঁরা সম্মানিত হতেন।[২৭০] খ্রিস্টানদের অসহিষ্ণুতার ধারা এখনও পূর্ণোদ্যমে বর্তমান। তাঁর মতে তাদের অসহিষ্ণুতার চূড়ান্ত নিদর্শন আমেরিকায় এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে পাদ্রীদের প্রচারকার্য। হিন্দুদের তারা অমানুষ বর্বর বলে প্রচার করেছে, যারা নাকি মা হয়ে শিশুকে কুমীরের মুখে ফেলে দেয়, স্বামী স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে।[২৭১] হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি এবং জনসাধারণের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে পাদ্রীরা যে ধর্মান্তরিত করতেন, তিনি তারও সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে এইসব ধর্মান্তরিত ব্যক্তি বিকৃত বুদ্ধির উদাহরণ।[২৭২] অবশ্য খ্রিস্টানদের অসহিষ্ণুতা শুধু অল্পবুদ্ধি পাদ্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পারী শহরে কেন ধর্ম সম্মেলন হল না, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ খ্রিস্টানদের সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির কথা বলেছেন : "চিকাগো মহামণ্ডলীতে ক্যাথলিক সম্প্রদায় বিশেষ উৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন, ভরসা—প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের উপর অধিকার বিস্তার ; তদ্বৎ সমগ্র খ্রিস্টান জগৎ—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বর্গকে উপস্থিত করাইয়া স্বমহিমা কীর্তনের সুযোগ নিশ্চিত করিয়াছিলেন।" কিন্তু পরিস্থিতি বিপরীত হওয়ায় তাদের সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা রূঢ় আঘাত পেয়েছে। ফ্রান্সে ক্যাথলিকরা প্রবল, তারা বিশেষরকম নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে।[২৭৩]

বলা বাহুল্য যে খ্রিস্টান জাতিগুলির আগ্রাসী কার্যকলাপকেই তিনি সবচেয়ে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। খ্রিস্টান জাতিগুলি সবচেয়ে সমৃদ্ধ বলেই অখ্রিস্টানদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করা উচিত বলে খ্রিস্টানদের যে দাবি, শিকাগো সম্মেলনের একটি বক্তৃতায় তিনি তাকে ঠাট্টা করেছিলেন। খ্রিস্টান ইংলন্ডের সমৃদ্ধির জন্য তাকে ২৫০,০০০,০০০ এশিয়াবাসীর স্কন্ধে আরোহণ করতে হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। স্পেন কর্তৃক মেক্সিকো আক্রমণের মধ্যে দিয়ে খ্রিস্টান ইউরোপের সমৃদ্ধির সূচনা। তাঁর মতে খ্রিস্টানরা যেমন অন্যদের ধ্বংস করে নিজেদেয় সমৃদ্ধিসাধন করেছে, হিন্দুরা তা কখনই করবে না।[২৭৪] খ্রিস্টান ইউরোপের কাছে পরাধীনতার গ্লানি যে তাঁর মনকে কতখানি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা বোঝা যায় যখন দেখি যে ধর্মসভায় গিয়ে তিনি ইউরোপের আগ্রাসনের সমালোচনা করছেন—অর্থাৎ ধর্ম ও রাজনীতির বিভেদরেখাটি লুপ্ত হয়েছে।

ইউরোপের সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়গুলি অবশ্য তাঁর প্রশংসা লাভ করেছে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে অভারতীয় রীতিকে তিনি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। ইউরোপের সুকুমার শিল্পের মূল্যায়ন প্রসঙ্গেই অবশ্য এ কথা বিশেষ করে বলা যায়, যদিও এ বিষয়েও তাঁর বক্তব্য অনেকাংশে পরস্পরবিরোধী। পাশ্চাত্য জীবনধারায় যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের অনুভূতি আছে তা তাঁর ভাল লেগেছিল; তাই ভারতীয় জীবনযাত্রায় তার অভাব তাঁকে দুঃখ দিয়েছিল। "পরিষ্কার সাজানো-গোছানো এ দেশের (পাশ্চাত্যে) এমন অভ্যাস যে, অতি গরীব পর্য্যন্তরও ও বিষয়ে নজর।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ্চাত্যের দেশ-বিদেশের শিল্প-সংগ্রহ করার উৎসাহও তাঁর ভাল লেগেছিল। যদিও দারিদ্র্যকবলিত ভারতবাসীর পক্ষে সে কাজ সম্ভব নয়, তাও তিনি জানতেন। চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যে পাশ্চাত্যদেশের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য বলেই তিনি মেনে নিয়েছিলেন : "ও দুটো কাজে আমরা চিরকালই অপটু। আমাদের ঠাকুরদেবতা সব দেখোনা, জগন্নাথেই মালুম !! বড় জোর ওদের নকল করে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায় !!" এ প্রসঙ্গে মজার ব্যাপার হল এই যে বাঙালি পটুয়া আর রাজস্থানের চিত্রকর তাঁর প্রশংসা পেয়েছে : "তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রি-করা পোটো ভাল—তাদের কাজ তবু ঝকঝকে রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায় ! বরং জয়পুরে সোনালী চিত্রি, আর দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল।"[২৭৫] প্রাণহীন কৃত্রিম সৌন্দর্য তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না, "অবচীন কালের...লম্বা লম্বা বিশেষণ, সমাস, শ্লেষ" ইত্যাদি তাঁর মতে সংস্কৃত ভাষার "মড়ার লক্ষণ" ; ঠিক তেমনি ভারতের মন্দির স্থাপত্য—"বাড়িটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি, থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে।"[২৭৬]

এই বিষয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে ধ্রুপদী যুগের গ্রীক ভাস্কর্য এবং ভারতের বৌদ্ধ শিল্পকলা—দুটি ভিন্ন ধরনের শিল্পশৈলী আলাদা আলাদা কারণে তাঁর ভাল লেগেছিল। লুভার মিউজিয়মে দেখা গ্রীক ভাস্কর্যের সংক্ষিপ্ত অথচ মনোগ্রাহী বিবরণে তিনি মাইকেনি এবং একিয়ান (প্রাচীন গ্রীক) শিল্পকলায় এশিয়ার প্রভাব লক্ষ করেছিলেন ; ঈজিপ্ট এবং ব্যাবিলনের সঙ্গে যোগাযোগ ও সংঘর্ষের ফলে এশিয় শিল্পকলা প্রাচীন গ্রীক শিল্পে অনুপ্রবেশ করেছিল। তবে এশিয় শিল্পের সঙ্গে গ্রীক শিল্পের তফাত এই যে, "গ্রীক শিল্প প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনের যাথাতথ্য জীবন্ত ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছে।" তিনি লক্ষ করেছেন যে, "খ্রিঃ পূঃ ৭৭৬ হতে খ্রিঃ পূঃ ৪৭৫ পর্য্যন্ত 'আর্কেইক' গ্রীক শিল্পের কাল। এখনও মূর্তিগুলি শক্ত (Stiff), জীবন্ত নয়। ঠোঁট অল্প খোলা, যেন সদাই হাসছে। ...সব মূর্তিগুলি দু-পা সোজা করে, খাড়া (কাঠ) হয়ে দাঁড়িয়ে আছে...বস্ত্র সমস্ত মূর্তির গায়ের সঙ্গে জড়ানো, তালপাকানো-পতনশীল বস্ত্রের মত নয়।" কলাবিদ্যানিপুণ একজন ফরাসী পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন : "(ক্লাসিক) গ্রীক শিল্প চরম উন্নতিকালে বিধিবদ্ধ প্রণালীশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা তখন কোন দেশের কলাবিধিবন্ধনই স্বীকার করে নাই বা তদনুযায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই।" এর পরে, আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর থেকে গ্রীক শিল্পের অবনতির প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : "জাঁকজমকের বেশী চেষ্টা এবং মূর্তিসকল প্রকাণ্ড করবার চেষ্টা এই সময়ে গ্রীক শিল্পে দেখতে পাওয়া যায়।" এই প্রসঙ্গের উপসংহারে "গ্রীক শিল্প তদ্দেশীয় পূর্ব পূর্ব শিল্পীদের কার্য্যের নকল মাত্র...নূতনের মধ্যে হুবহু কোন লোকের মুখ নকল করা"—এই প্রবণতা তাঁর পছন্দ ছিল না।[২৭৭]

ভিয়েনাতে কুন্সথিস্টোরিসেস-এ ডাচ চিত্রকরদের শিল্পের বিবরণেও "হুবহু নকলের" প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মনে হয়েছিল যে এই শিল্পে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার কোনও প্রচেষ্টা নেই, শুধুমাত্র প্রকৃতির যথাযথ নকলই চিত্রকরদের অভিপ্রায়।[২৭৮] শিল্পের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে এই অস্পষ্ট উক্তির তাৎপর্য বোঝা যাবে।[২৭৯] যথার্থ শিল্প বলে যাকে অভিহিত করা যেতে পারে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে কোনও ভাব প্রকাশিত হবে। শিল্পের মধ্যে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের আবরণ উন্মোচিত হবে। দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মধ্যেও এই সৌন্দর্যবোধ থাকা উচিত। কি ভারত, কি ইউরোপ, সর্বত্রই আধুনিক শিল্পকলায় মৌলিকত্ব হারিয়ে গেছে, কারণ আধুনিক চিত্রশিল্পীরা যেন আলোকচিত্রশিল্পীদের পন্থা নিয়েছে। সামাজিক রীতিনীতি এবং সৃজনশীল শিল্পের মধ্যে প্রত্যেক সমাজের স্বকীয়তা পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপের শিল্পবিন্যাসে একটা তীক্ষ্ণ ধার তিনি লক্ষ করেছিলেন। নাচের সময় তাদের হাত-পা ছোড়ার ভঙ্গিতে, তাদের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে তিনি যেন বেয়নেটের খোঁচা অনুভব করতেন। তুলনায় ভারতের নৃত্যগীতে একটা ভোঁতা ভাব আছে, যেন ঢেউয়ের মত ওঠে আবার মিলিয়ে যায়।

এইখানে তিনি ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান প্রধান চিন্তা—জড়বাদ এবং অজ্ঞেয়বাদের মধ্যে তাঁর পছন্দসই তুলনার অবতারণা করেছেন। জড়বাদী ইউরোপে প্রকৃতিই শিল্পের প্রথম উপলক্ষ। যে সব ঐতিহ্যের উদ্দেশ্য অজ্ঞেয়বাদী আদর্শ, সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্নতা দেখানো হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই অসামান্য দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। ইউরোপের শিল্পকলা দেখে মনে হয় যেন প্রকৃতির একটি অংশ তুলে আনা হয়েছে। ভারতীয় ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণগুলি প্রকৃতির উর্ধ্বে এক ভাবের জগতে নিয়ে যায়। শেষেরটির ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে বৌদ্ধ ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ অবদানগুলির সঙ্গে তুলনীয় পৃথিবীতে কোথাও কিছু নেই। একজন ভাববাদীর স্বাভাবিক পছন্দই এই উক্তির মধ্যে ধরা পড়েছে। তবে, সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও বোধ হয় পুরোপুরি অনুপস্থিত নয়।

অবশ্য পাশ্চাত্যের পাণ্ডিত্যের বহু ক্ষেত্র সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। 'পরিব্রাজকে' তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক এবং লেখ-উপাদানের সাহায্যে অপরীক্ষিত উপাদানের যথাযথ মূল্যায়ন করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা, মধ্যপ্রাচ্য এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের মধ্যে লিখিত ইতিহাসের আবিষ্কারকে তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন বিদ্যায় বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির অবদানের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। ভারততত্ত্ব বিষয়ে জার্মান, ফরাসী ও ডাচদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। প্রাচীন অ্যাসিরিয়, মিশরিয়, হিব্রু সভ্যতা এবং বাইবেল সম্বন্ধীয় গবেষণা ইংরেজরা "আরম্ভ করে দিয়ে তারপর সরে পড়ে।" খ্রিস্টধর্মের বিশ্লেষণের ব্যাপারে এইসব খ্রিস্টান পণ্ডিতদের সাবধানী পদক্ষেপের বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেছেন এবং ঐ প্রসঙ্গে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক মাসপেরোর 'ইস্তোয়ার আঁসিয়েন ওরিআঁতাল' নামক গ্রন্থে "যেখানে যেখানে মাসপেরোর অনুসন্ধান খ্রিস্টধর্মকে আঘাত করে, সে সব গোলমাল করে দেওয়া আছে" বলে লিখেছেন। তবে আবার এই আশাও প্রকাশ করেছেন যে "হিন্দু প্রভৃতির ধর্মপুস্তককে ওঁরা যেমন বেপরোয়া হয়ে টুকরো টুকরো করেন, কালে সেইপ্রকার সৎসাহসের সহিত য়াহুদী ও ক্রিশ্চান পুস্তকাদিকেও করবেন," কারণ, "এখন মারধোর, জ্যান্ত পোড়ানো তো আর নেই, কেবল সমাজের ভয় ; তা উপেক্ষা করে অনেকগুলি পণ্ডিত উক্ত পুস্তকগুলিকেও বেজায় বিশ্লেষণ করেছেন।"[২৮১] উনবিংশ শতকের জাতিবিদ্যার (ethnology) প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বলেছেন যে "সমস্ত মানুষ এক আদিম পিতামাতা হতে অবতীর্ণ হয়েছে, একথা এখন লোকে বড় মানতে চায় না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরিচয় তাদের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে—এই তত্ত্ব মেনে নিয়েও কিন্তু তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল, "বর্তমান সমস্ত জাতিই এইসকল জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন।"[২৮২]

পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য ধারার পরিবর্তে তিনি তাদের প্রাচ্যতত্ত্বকেই প্রধান উপজীব্য করেছেন। পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞান নিয়ে ভূদেব এবং বঙ্কিম যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, বিবেকানন্দর রচনায় তা একরকম অনুপস্থিত। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে যেন তাঁর একটা বৈদগ্ধ্য ছিল, তাঁর সমস্ত বৌদ্ধিক এবং ধর্মীয় চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল সেই জ্ঞান, এবং ওই বিষয়ে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মতামতের উপর তিনি অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক দৃঢ়তা নিয়ে মন্তব্য করতেন। খুব বেশি হলে, ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে কোনও কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিতের মন্তব্যে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ভূদেব বা বঙ্কিমের মত বিরক্ত চিত্তে পরিত্যাগ করার প্রবণতা বিবেকানন্দর রচনায় দেখা যায় না।

ইউরোপীয় ভারততত্ত্ববিদদের মানসিকতায় একটা কালানুক্রমিক বিবর্তন এবং কল্পনার নন্দনকানন তিনি লক্ষ করেছিলেন : "তাঁরা জানতেন অল্প আর সেই অল্প জানা থেকে আশা করতেন অনেকটা। এ ছাড়া অনেক সময়ে তাঁরা অল্পস্বল্প যা জানতেন, তা নিয়েই বাড়াবাড়ি করার চেষ্টা করতেন।"[২৮৩] প্রসঙ্গক্রমে কালিদাসের শকুন্তলাকে "ভারতীয় দর্শনের চূড়ান্ত" বলার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এঁদেরই পরবর্তী যাঁরা তাঁরা ছিলেন প্রধানত অজ্ঞ এবং প্রতিক্রিয়াশীল, তাঁদের কাছে প্রাচ্যের সব কিছুই উপহাসের যোগ্য। বিশেষত ভারতের সব কিছুকেই তাঁরা মনে করতেন অন্য কোনো জাতির অবদান : "আচমকা একদিন সকালবেলায় বেচারি হিন্দুরা জেগে উঠে দেখল তাদের নিজের বলে যা কিছু ছিল, সব গেছে। তাদের শিল্পকলা কেড়ে নিয়েছে অজানা এক জাতি, তাদের স্থাপত্য ছিনিয়ে নিয়েছে আর এক জাতি, আবার তৃতীয় আর এক জাতি নিয়ে নিয়েছে তাদের যা কিছু পুরোনো বিজ্ঞানচর্চা। এমনকি ধর্মও আর তাদের নিজেদের নয়।"[২৮৪] তারপরে আবার একদল নতুন ধরনের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের অভ্যুত্থান হয়েছে, "যাঁরা শ্রদ্ধাবান, সমমর্মি এবং প্রকৃত জ্ঞানী।" জনৈক শিষ্যের কাছে তিনি ম্যাক্সমুলারকে বেদের বিখ্যাত টীকাকার, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক স্থাপনকারী, সায়ানাচার্যের অবতার বলেছিলেন।[২৮৫] অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের অনেক অভিমতই স্বামীজী মেনে নেননি, যেমন, ম্যাক্সমুলার লিখেছেন, "যতই সৌসাদৃশ্য থাকুক না কেন, যতক্ষণ না ইহা প্রমাণিত হইবে যে, কোনও গ্রীক সংস্কৃতভাষা জানিত, ততক্ষণ সপ্রমাণ হইল না যে, ভারতবর্ষের সাহায্য প্রাচীন গ্রীস প্রাপ্ত হইয়াছিল।" ঐ একই যুক্তি ব্যবহার করে বিবেকানন্দ বলেছেন, "যতক্ষণ ইহা না প্রমাণিত হয় যে, কোনও হিন্দু কোনও কালে গ্রীক ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, ততক্ষণ ঐ গ্রীক প্রভাবের কথা মুখে আনাও উচিত নয়।"[২৮৬] তা সত্ত্বেও "আমাদের প্রাচীন সাহিত্য রক্ষা ও বিস্তার করার জন্য এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ানোর জন্য" হিন্দুদের ম্যাক্সমুলারের কাছে ঋণের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। "ম্যাক্সমুলারকে যদি বলি এই নব আন্দোলনের প্রবীণ অগ্রদূত, তবে পল ডয়সেন অবশ্যই তাঁর এক নবীন পতাকাবাহক। ভাষাতত্ত্বের পর্যালোচনার আগ্রহে বহুকাল ধরে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের বিচিত্র ভাব ও আধ্যাত্মিকতার যে মূল্যবান রত্নরাজি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল," তিনি দুঃসাহসিকতার সঙ্গে সেগুলো তুলে ধরলেন। প্রাচীন গ্রীস ও আধুনিক জার্মানি তত্ত্বালোচনা রীতিতে পণ্ডিত ডয়সেন পশ্চিমী পণ্ডিতদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যিনি বেদান্ত সম্বন্ধে একান্ত স্বাধীন মত ব্যক্ত করেছেন। "আজকের দিনে আমাদের এই রকম খাঁটি বন্ধুর খুব দরকার। এঁরা আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান রোগটিকে সারাতে পারবেন। রোগটি হল একদিকে...প্রতিটি গেঁয়ো কুসংস্কারকে আমাদের শাস্ত্রের সার সত্য বলে ধরে রাখতে চাওয়া—আবার অন্যদিকে জঘন্য নিন্দা করা।"

ইউরোপের ভারততত্ত্ববিদদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেও তাঁদের অনেক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিবেকানন্দর গভীর সংশয় ছিল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে পারিতে অনুষ্ঠিত ধর্মেতিহাস সভায়, বৈদিক ধর্ম যে অগ্নি, সূর্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক জড়বস্তুর আরাধনা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই মত তিনি খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন। অথর্ববেদ-সংহিতা থেকে উদ্ধৃত করে তিনি শিবলিঙ্গের নরলিঙ্গত্বের ধারণা খণ্ডন করে ব্রহ্মত্ব-মহিমা প্রমাণ করেন। এক জার্মানি পণ্ডিত শালগ্রাম-শিলাকে স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন বলায় বিবেকানন্দ বলেন, "শালগ্রাম সম্বন্ধে এ নবীন মত অতি আকস্মিক।"[২৮৭] "ঐ যে ইউরোপী পণ্ডিত বলছেন যে, আর্য্যেরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের 'বুনো'দের মেরে কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন, ও সব," বিবেকানন্দর মতে, "আহাম্মকের কথা।" পারি সভায় তিনি এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। রামায়ণকে আর্যদের "দক্ষিণী বুনো-বিজয়" বলাতেও তাঁর আপত্তি ছিল। তাঁর মতে লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে উন্নত ছিল, এবং বানর প্রভৃতি রামচন্দ্রের বন্ধু-মিত্র, বিজিত-পরাজিত নয়। তাঁর মতে এইসব ব্যাখ্যার মধ্যে ইউরোপের নিজস্ব আগ্রাসী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।[২৮৮] বিবেকানন্দর বক্তব্যের মধ্যে আবার ভারতের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব, দুর্বলকে নিধন করার পরিবর্তে তাকে তুলে ধরার মহত্ত্ব প্রভৃতি ঐতিহ্য ব্যক্ত হয়েছে।

পাশ্চাত্য সম্বন্ধে যে সব রচনায় আদর্শগত দিকটি খুব প্রকট নয়, বরং যেখানে তাঁর জীবনের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয়েছে, বিবেকানন্দর সেই সব রচনাই বোধহয় সবচেয়ে উপভোগ্য। ধনী পরিবারের এই প্রাণবন্ত কৌতুকপ্রিয় সন্তানটি যে একসময়ে খাবার-দাবার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আনন্দ পেতেন, সঙ্গীতে যে তাঁর জ্ঞান ও দক্ষতা দুই-ই ছিল, তিনি যে খেলাধুলায় অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন, তাঁর গৈরিক বসনের নীচে কোনও কিছুই কিন্তু হারিয়ে যায়নি। ইউরোপের সুরুচিপূর্ণ ভোগ-বিলাস দেখে কালিদাসের মেঘদূতে অঙ্কিত অন্য আর এক যুগের, আর এক জাতির ভোগ-বিলাসের কথা তাঁর মনে পড়েছিল।[২৮৯] নিরন্তর চিন্তাশীল, দেশব্রতী, ধর্মভাবাপন্ন এই মানুষটির লেখা একটি বিখ্যাত অনুচ্ছেদের শুরু হয়েছে এই প্রশ্ন দিয়ে: "এ ইউরোপ কি ?...সমস্ত মানুষ এদের পদানত কেন ? এরা কেনই বা এ কলিযুগের একাধিপতি ?" উত্তরটি কিন্তু আশাতীত, ভিন্নধর্মী। "এ ইউরোপ বুঝতে গেলে পাশ্চাত্য ধর্মের আকর ফ্রাঁস থেকে বুঝতে হবে। পৃথিবীর আধিপত্য ইউরোপে, ইউরোপের মহাকেন্দ্র পারি। পাশ্চাত্য সভ্যতা, রীতিনীতি, আলোক আঁধার, ভালো মন্দ সকলের শেষ পরিপুষ্ট ভাব এইখানে—এই পারি নগরীতে।" বিস্ময়াবিষ্টের মতন তিনি ফ্রান্সের বিবরণ দিয়েছেন: "নাতিশীতোষ্ণ, অতি উর্বরা, অতিবৃষ্টি নাই, অনাবৃষ্টিও নাই, সে নির্মল আকাশ, মিঠে রৌদ্র, ঘাসের শোভা, ছোট ছোট পাহাড়, চিনার বাঁশ প্রভৃতি গাছ, ছোট ছোট নদী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট ছোট প্রস্রবণ—সে জলে রূপ, স্থলে মোহ, বায়ুতে উন্মত্ততা, আকাশে আনন্দ। প্রকৃতি সুন্দর, মানুষও সৌন্দর্য্যপ্রিয়।...সেই ইন্দ্রভুবন অট্টালিকাপুঞ্জ, নন্দনকানন উদ্যান, উপবন, মায় চাষার ক্ষেত, সকলের মধ্যে একটু রূপ—একটু সুচ্ছবি দেখবার চেষ্টা এবং সফলও হয়েছে।" পারি তাঁর কাছে "মর্ত্যের অমরাবতী, সদানন্দ নগরী। এ ভোগ, এ বিলাস, এ আনন্দ—আর কোথায় ? লন্ডনে, নিউ ইয়র্কে ধন আছে ; বার্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট ; নেই সে ফরাসী মাটি, আর সর্বাপেক্ষা নেই সে ফরাসী মানুষ।...এ অদ্ভুত ফরাসী চরিত্র প্রাচীন গ্রীক মরে জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছ্যাবলা আবার অতি গম্ভীর, সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্য ফরাসী মুখে বেশিক্ষণ থাকে না, আবার জেগে ওঠে।"[২৯০]

পারি বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত ইউরোপের আদর্শ। দুনিয়ার বিজ্ঞান-সভা ফরাসী অ্যাকাডেমির নকল। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের গুরুও পারি। সর্বত্রই সামরিক-বিজ্ঞানের ভাষা এখনও ফরাসী। পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সব কিছুরই উৎস পারি। অন্যেরা সকলেই তাকে অনুকরণ করেছে। "এরা হচ্ছে শহুরে, আর সব জাত যেন পাড়াগেঁয়ে। এরা যা করে তা পঞ্চাশ বৎসর, ২৫ বৎসর পরে জার্মান, ইংরেজ প্রভৃতি নকল করে।..." এগালিতে, লিবার্তে, ফ্রাতের্নিতের ধ্বনি ইউরোপ তোলপাড় করে ফেলছে। ফ্রান্স অন্য ভাব, অন্য উদ্দেশ্য অনুসরণ করছে, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য জাত এখনও সেই ফরাসী বিপ্লব মক্‌শ করছে। "যে দেশ যে পরিমাণে এই পারি নগরীর সঙ্গে নিজেদের যোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে, সে জাত তত পরিমাণে উন্নতি লাভ করবে।"—এই মতকে তিনি "কিছু অতিরঞ্জিত সত্য" বলেছেন। "এই পারিতে যদি ধ্বনি ওঠে তো ইউরোপ অবশ্যই প্রতিধ্বনি করবে। ভাস্কর, চিত্রকর, গাইয়ে, নর্তকী—এই মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলে আর সব দেশে সহজেই প্রতিষ্ঠা হয়।"

স্বামীজী তাঁর এই প্রিয় নগরীর পরিচিত দুর্নাম থেকে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। "অবশ্য এ কথা ইংরেজরাই বলে থাকে, এবং অন্য দেশের যে সব লোকের পয়সা আছে এবং জিহ্বোপস্থ ছাড়া দ্বিতীয় ভোগ জীবনে অসম্ভব, তারা অবশ্য বিলাসময় জিহ্বোপস্থের উপকরণময় পারিই দেখে!" অন্যান্য নগরও "ভোগের উদ্যোগপূর্ণ ; তবে তফাৎ এই যে, অন্য দেশের ইন্দ্রিয়চর্চা পশুবৎ, প্যারিসের—সভ্য পারির ময়লা সোনার পাতমোড়া ; বুনো শোরের পাঁকে লোটা, আর ময়ূরের পেখমধরা নাচে যে তফাৎ, অন্যান্য শহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ প্যারিস-বিলাসের সেই তফাৎ।...দুনিয়ায় যার দু পয়সা হয়, সে অমনি পারি-নগরী অভিমুখে ছোটে কেন ? রাজা-বাদশারা চুপিসারে নাম ভাঁড়িয়ে এ বিলাস-বিবর্তে স্নান করে পবিত্র হতে আসেন কেন ?...অধিকাংশ কদর্য্য নাচতামাসা বিদেশীর জন্য...এ সব বিদেশী আহাম্মক ধনীদের জন্য।...ফরাসী বড় সাবধান, বাজে খরচ করে না, পয়সাগুলি সব বার করে নেয়, আর মুচকে মুচকে হাসে।"

ফরাসী জাতি এবং তাদের মহানগরীর প্রসঙ্গে তিনি সামাজিক রীতিনীতি, বিশেষত পারিবারিক জীবন এবং স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের বিষয় পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের পার্থক্যের আলোচনা করেছেন। কোনও নৈতিক মানদণ্ড খাড়া না করেই তিনি এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বেশ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এবং হাস্যপরিহাসের ভঙ্গিতে বিবেকানন্দ বিভিন্ন দেশের, এবং বলা বাহুল্য, ইউরোপ ও ভারতের সাংস্কৃতিক রীতিনীতির বৈচিত্র্য আলোচনা করেছেন। মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উল্লেখের নিয়ম এক এক সমাজে এক এক রকম ; এক সমাজে যা অত্যন্ত স্বাভাবিক, অন্য সমাজে তা একান্তই অশালীন—এই ব্যাপারটিতে তিনি বেশ কৌতুকবোধ করতেন। গুরুদেবের কাছে এবং হিন্দু ঐতিহ্য থেকে শেখা উচ্চমানের সারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তার ফলে সাংস্কৃতিক বৈসাদৃশ্য যে অবশ্যম্ভাবী তা বুঝেও তিনি সেসব নিয়ে রসিকতা করেছেন। কলকাতার অশালীন কথ্যভাষার অজস্র ব্যবহারে তাঁর যে বাংলা লেখার দৃপ্ত, বিশিষ্ট ভঙ্গি, সেই ভঙ্গিতে এইসব আদবকায়দা নিয়ে তাঁর ঠাট্টা-তামাসা পাঠকের অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে।

ফরাসীদের তুলনায় মার্কিন, জার্মান, এমনকি ইংরেজ সমাজও তাঁর মতে 'খোলা'।[২৯১] "দু-চার দিনের আলাপেই আমেরিকান বাড়ীতে দশ দিন বাস করবার নিমন্ত্রণ করে ; জার্মানি তদ্রূপ ; ইংরেজ একটু বিলম্বে।" ফরাসীরা কিন্তু ঘনিষ্ঠদেরই গৃহে স্থান দেয়। অবিবাহিতা মেয়েরা আড়ালেই থাকে, অভিভাবকরা তাঁদের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। তবে "এরা আমোদপ্রিয়, কোন বড় সামাজিক ব্যাপার নর্তকীর নাচ না হলে সম্পূর্ণ হয় না।" এতে তাদের সামাজিক আচার সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। নর্তকীর নগ্নদেহে নাচ ভারতীয়ের চোখে অশালীন মনে হতে পারে, কিন্তু ফরাসীদের কাছে তা অত্যন্ত সহজ। তাদের এই 'সয়ে যাওয়া' ভাবটা যে সন্ন্যাসীকেও বিচলিত করেনি, এটাই বেশি আশ্চর্যের ব্যাপার। "ইংরেজ গুলবাটা মুখ, সদা নিরানন্দ, ওদের মতে এ বড় অশ্লীল, কিন্তু থিয়েটারে হলে আর দোষ নেই। ...ইংরেজ আমেরিকান দেখতেও ছাড়বে না, আবার ঘরে গিয়ে গাল দিতেও ছাড়বে না।"

তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কের ধারণাটি সর্বত্রই এক : "পুরুষ মানুষের অন্য স্ত্রী সংসর্গে বড় দোষ হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলাটায় মুশকিল।" এ বিষয়ে অন্য দেশের ধনী পুরুষদের মত ফরাসীরা একটু বেশি উদার। ইউরোপে পুরুষের ব্যাভিচারটা দোষের নয়, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন আলাদা। "বরং বিদ্যার্থী যুবক ও-বিষয়ে একান্ত বিরত থাকলে তার মা-বাপ দোষাবহ বিবেচনা করে, পাছে ছেলেটা 'মেনিমুখো' হয়। পুরুষের একগুণ পাশ্চাত্যদেশে চাই—সাহস ; এদের ভার্চু (Virtue) শব্দ আর আমাদের বীরত্ব একই শব্দ।"

সাংস্কৃতিক বৈসাদৃশ্য যে অত্যন্ত স্বাভাবিক—তাঁর এই বিশ্বাসের ব্যাখ্যা এই আলোচনার উদ্দেশ্য। একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে তিনি বলেছেন : "এ সকল কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জাতির এক-একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেইখানটা হতে সে জাতির রীতিনীতি বিচার করতে হবে। ...আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চোখে আমাদের দেখা—এ দুই ভুল।"[২৯২] পাশ্চাত্য জড়বাদের সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিকতার তুলনা এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে বটে, তবে আত্মপ্রতিষ্ঠা বা ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের দাবির পরিবর্তে দুই সভ্যতার জীবনাদর্শের পার্থক্যের ওপরই এখানে তিনি জোর দিয়েছেন। "আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ। ব্রহ্মচর্য্য বিনা তা কেমনে হয়, বলো ?" ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্য ভোগ, সেখানে ব্রহ্মচর্য্যের কোনো স্থান নেই। মেয়েদের সতীত্ব রক্ষার ব্যাপারে ইউরোপের যে ভাবনা সে বিষয়ে তিনি এক অদ্ভুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শারীরতাত্ত্বিক যুক্তি দেখিয়েছেন :—স্ত্রীলোকের ব্যাভিচারের ফল বন্ধ্যাত্ব।

পাশ্চাত্যে, বিশেষত মার্কিন দেশে মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা ও তাদের প্রতি ব্যবহার দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। নারীর মর্যাদা সম্বন্ধে ভারত ও পাশ্চাত্যদেশের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য তাঁর চোখে পড়েছিল। "ভারতে জননীই আদর্শ নারী। মাতৃভাবই এর প্রথম ও শেষ কথা..., পাশ্চাত্যে নারী স্ত্রী, সেখানে স্ত্রীর রূপেই মেয়েদের ভাব প্রকাশ পেয়েছে।"[২৯৩] বাংলার উচ্চবর্ণের মহিলাদের অবস্থা দেখে, এবং যে সব উচ্চস্তরের শিল্পী ও প্রভাবশালী পাশ্চাত্য অভিজাত মহিলার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল, তাদের দেখে, পাশ্চাত্য সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে তাঁর একটা অতিরঞ্জিত ধারণা হয়েছিল। কবি রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীকে তিনি লিখেছিলেন : "পাশ্চাত্য দেশে নারীর রাজ্য, নারীর বল, নারীর প্রভুত্ব।"[২৯৪] পাশ্চাত্য সমাজে মেয়েদের প্রতি ব্যবহারকে তিনি হিন্দুদের শক্তিপূজার সঙ্গে তুলনা করেছেন—যেখানে ঐশ্বরিক শক্তি নারীরূপে প্রকৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে এবং মাতৃরূপে পূজিত হচ্ছেন। আগেই দেখিয়েছি যে মেরীর প্রতি ভক্তিভাব তাঁর মতে তাঁকে পূজারই সামিল। "তবে আমাদের পুজো ঐ তীর্থস্থানেই, সেইক্ষণমাত্র ; এদের দিনরাত, বার মাস। আগে স্ত্রীলোকের আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চস্থান আদর, খাতির।" ইউরোপে 'শিভ্যালরি'র আদর্শগুলিকে তিনি শক্তিপূজার নামান্তর বলেছেন, এবং যখন থেকে "ইউরোপে সভ্যতার উন্মেষ ইউরোপে সেই মুর শাসনকাল থেকেই এর শুরু। এই সুসভ্য ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে মুরগণ শক্তিহীন, শ্রীহীন হয়ে, স্বস্থানচ্যুত হয়ে আফ্রিকার কোণে অসভ্যপ্রায় হয়ে বাস করতে লাগলো, আর সে শক্তির সঞ্চার হল ইউরোপে, 'মা' মুসলমানকে ছেড়ে উঠলেন ক্রিশ্চানের ঘরে।"[২৯৫] পাশ্চাত্য দেশে মেয়েদের যে সম্মান দেওয়া হয় তার জন্য তারা প্রশংসার্হ।[২৯৬] এ ব্যাপারে মার্কিনীরা সর্বোত্তম। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে এক পত্রে তিনি লিখেছেন : "এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে জগতে নাই, কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ, আর দয়াবতী...এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রী : (তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমি লজ্জাস্বরূপিনী)—তারা মাতৃদেবীর অবতার, তাদের সঙ্গে ভারতের মেয়েদের তুলনাই হয় না, ভারতের পুরুষরা তাদের পায়ের নখের যোগ্যও নয়।" তুলনামূলকভাবে তিনি ভারতে দশ বছরের মেয়ের বিয়ে দেওয়ার বিশ্রী প্রথার কথা বলেছেন। ভারতে যদি পাশ্চাত্যের মত এক সহস্র রমণী সৃষ্টি করা যেত, তাহলে হয়ত এ দেশের কিছু মঙ্গল হতেও পারে।[২৯৭] মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মহিলা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা এবং বহুসংখ্যক উপার্জনক্ষম মহিলাকে দেখে বিবেকানন্দ অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁদের কর্মদক্ষতাও তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ঐ ব্যাপারে তাঁর নিজের খুব একটা দক্ষতা ছিল না বলেই বোধহয় তিনি স্বীকার করেছেন যে তারা যা করেছে তার 'সিকিভাগের সিকিভাগও' তিনি নিজে করতে পারতেন না।[২৯৮]

ঐ একই চিঠিতে তিনি মার্কিন পরিবারের বিবাহ, প্রাক-বিবাহ প্রণয় প্রভৃতি বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। তাদের সব কিছুই ভারতীয় রীতির বিপরীত। তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা বক্তব্যের চেয়ে ভাষাতেই বেশি প্রকাশ পেয়েছে : "এদেশে মেয়ের সম্বন্ধেই সম্বন্ধ। ছেলে বে করে পর হয়ে যায়—মেয়ের স্বামী ঘন ঘন স্ত্রীর বাপের বাড়ী যায়। ...বে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়া এদেশে বড়ই হাঙ্গামা। প্রথম মনের মতো বর চাই। দ্বিতীয় পয়সা চাই। ছোঁড়া ব্যাটারা ইয়ারকি দিতে বড়ই মজবুত—ধরা দেবার বেলা পগার পার। ছুঁড়ীরা নেচে কুঁদে একটা স্বামী যোগাড় করে, ছোঁড়া ব্যাটারা ফাঁদে পা দিতে বড়ই নারাজ। এইরকম করতে করতে একটা 'লভ্' হয়ে পড়ে—তখন সাদি হয়।"[২৯৯]

অন্যত্র তিনি ইউরোপের ক্ষুদ্র পরিবারের কথা বলেছেন, কিন্তু সমকালীন অন্য অনেকের মত তাঁর ঐ ধরনের পরিবারকে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা বলে মনে হয়নি।[৩০০] পাশ্চাত্যে মেয়েদের যে সম্মান প্রদর্শন করা হত তার প্রশংসা করলেও স্বামীজী নিজে ততটা সম্মান করতেন কিনা সন্দেহ। তাঁর লন্ডনের বাড়ির জানালা দিয়ে নীচে রাস্তার ভিড়ে মহিলাদের দেখে তিনি যে ছড়াটি লিখেছিলেন তাকে ঠিক সম্মান প্রদর্শন বলা যায় না :

"ছাতি হাতে, টুপি মাথায় আসছে যত ছুঁড়ি,
মুখে মেখেছে তারা ময়দা ঝুড়ি ঝুড়ি।"

তাঁর ভাই আবার বিবেকানন্দর ব্যাখ্যাটিও টুকে রেখেছেন : "(মুখের পাউডার) ক্ষুর দিয়ে চেঁছে ফেলা যায়।"[৩০২] যিনি স্বয়ং মাকালীকে নিয়ে ঠাট্টা করতে পারেন, মহিলাদের নিয়ে আর তাঁর সঙ্কোচ কি ? তাছাড়া যাদের তিনি "চার্চ উওমেন" বলেছেন, সেইসব মার্কিন মহিলাদের তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি। অত্যন্ত গোঁড়া এবং অভদ্র একদল বয়স্ক মহিলা তাঁর বিরুদ্ধে সর্বত্র বিষ উদ্গীরণ করে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁদেরই সম্বন্ধে বিবেকানন্দ এ নামটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রধানত মধ্য-পশ্চিম এবং দক্ষিণাঞ্চলের চার্চের পৃষ্ঠপোষিকা এইসব মহিলা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণমনা, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা হতাশার শিকার। তাঁর ব্যাপারে তাঁদের মাথাব্যথার কারণটা কি তা বুঝলেও তিনি কপট দয়া দেখাননি।[৩০২] অত্যন্ত রগচটা মানুষ ছিলেন তিনি এবং যাদের অপছন্দ করতেন তাদের বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে ছাড়তেন না, কিন্তু রাগের কারণ দেখাবার ধার ধারতেন না।

সংস্কৃতির তারতম্যের উপলব্ধি তাঁর মনে এক অবিচল মধুর সহিষ্ণুতার সৃষ্টি করেছিল। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধের কয়েকটি বিখ্যাত অনুচ্ছেদে ঔচিত্যবোধ এবং পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে দুই আদর্শের তুলনার মধ্যে তাঁর এই সদানন্দ সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।[৩০৩] কিছুটা পারিপার্শ্বিক এবং আবহাওয়ার দরুনই নানা পার্থক্য। কিন্তু এইসব আপাততুচ্ছ ব্যাপারের পার্থক্য দুই সংস্কৃতিতে মানসিকতা ও জীবনোদ্দেশ্যে মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।

আংশিক বা সামগ্রিক নগ্নতার প্রতি বিভিন্ন দেশের মনোভাব নিয়ে তিনি বেশ কিছু আলোচনা করেছেন। গরম দেশে লজ্জা নিবারণের জন্য কটিবস্ত্রই যথেষ্ট, তার থেকে বেশি যা কিছু তা আভরণ। ঠাণ্ডার দেশের লোকেরা বস্ত্রসম্ভার ব্যবহার করতে বাধ্য। "আদুড় গায়ে গয়না পরতে গেলেই তো ঠাণ্ডায় মৃত্যু, কাজেই অলঙ্কার-প্রিয়তাটা ঐ কাপড়ের উপর গিয়ে পড়ে। যেমন আমাদের দেশে গয়নার ফ্যাশন বদলায়, এদের তেমনি ঘড়ি ঘড়ি বদলাচ্ছে কাপড়ের ফ্যাশন। ঠাণ্ডা দেশমাত্রেই এজন্য সর্বদা সর্বাঙ্গ না ঢেকে কারু সামনে বেরুবার জো নেই। বিলেতে ঠিক ঠিক পোশাকটি না পরে ঘরের বাইরে যাবার জো নেই।" কিন্তু এখানেই সব বলা হয়নি। "পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের পা দেখানো বড়ই লজ্জা, কিন্তু গলা ও বুকের খানিকটা দেখানো যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে। আমাদের দেশে মুখ দেখানো বড়ই লজ্জা ; কিন্তু সে ঘোমটা টানার চোটে শাড়ি কোমরে ওঠেন উঠুন, তায় দোষ নেই (এটা অবশ্যই একটু বাড়াবাড়ি !)।...পাশ্চাত্য দেশের নর্তকী ও বেশ্যারা লোক ভুলাবার জন্য অনাচ্ছাদিত।...আমাদের দেশের আদুড় গা ভদ্রলোকের মেয়ের ; নর্তকী বেশ্যা সর্বাঙ্গ ঢাকা। পাশ্চাত্য দেশে মেয়েছেলে সর্বদাই গা-ঢাকা, গা আদুড় করলে আকর্ষণ বেশী হয় ; আমাদের দেশে দিনরাত আদুড় গা, পোশাক পরে ঢেকেঢুকে থাকলেই আকর্ষণ অধিক।" একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে এই ধরনের পর্যবেক্ষণ সত্যিই আশ্চর্য। ইউরোপীয় পুরুষদের যে নিজেদের মধ্যে নগ্নতায় কোনও সঙ্কোচ নেই, তাও তিনি লক্ষ করেছেন। পিতাপুত্রে একসঙ্গে নগ্নদেহে স্নান করে, ভারতবর্ষে যা কেউ ভাবতেও পারে না।

"আমাদের দেশের চেয়ে ইউরোপে ও আমেরিকায় মলমূত্রাদি ত্যাগে বড়ই লজ্জা।" বিবেকানন্দর মতে আমাদের দেশে এই লজ্জা সম্ভব নয় : "আমরা হচ্ছি নিরামিষভোজী—এক কাঁড়ি ঘাস-পাতা আহার। আবার বেজায় গরম দেশ, এক দমে লোটা-ভর জল খাওয়া চাই। কাজেই, সে সব যায় কোথা, বল ?" তুলনায় "পাশ্চাত্যদেশের আহার মাংসময়, কাজেই অল্প," সঙ্গে "খুদে খুদে গ্লাসে একটু মদ খাওয়া।" এই বিষয়ে তাঁর সরস মন্তব্য : "গরুর গোয়াল, ঘোড়ার আস্তাবল, আর বাঘ-সিঙ্গির পিঁজরার তুলনা কর দিকি !" পাশ্চাত্যের খাদ্য তথা নির্গমন রীতি নিয়ে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ইংলন্ড আমেরিকায় মেয়েদের সামনে মলমূত্র বা পেটের কোনও প্রকার অসুখের কথা বলা যাবে না, "পায়খানায় যেতে হবে চুরি করে।...মেয়েরা মলমূত্র চেপে মরে যাবে, তবুও পুরুষের সামনে ও নামটিও আনবে না।" এ ব্যাপারে ফরাসীদের সঙ্কোচ একটু কম, জার্মানদের আরও কম। "ইংরেজ ও আমেরিকানরা কথাবার্তায়ও বড় সাবধান, মেয়েদের সামনে। সে 'ঠ্যাঙ' বলবার পর্য্যন্ত জো নেই। ফরাসীরা আমাদের মতো মুখ খোলা ; জার্মানি রুশ প্রভৃতি সকলের সামনে খিস্তি করে।"

কিন্তু প্রেম-প্রণয়ের কথা, আমাদের দেশে যা প্রকাশ্যে আলোচনা করা নিষিদ্ধ—তা তারা বাবা-মা ছেলে-মেয়েতে অনায়াসে বলে। বাবা মেয়ের প্রণয়ীকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন,—ভারতে এ ব্যাপার সম্মান ও সম্ভ্রমের অবমাননা, কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে তা হয়েই থাকে এবং প্রকাশ্যে চুম্বন ও আলিঙ্গনকেও তারা দোষাবহ মনে করে না। ভারতীয় দৃষ্টিতে যা অশালীন সেরকম অনেক বিদেশী রীতির আলোচনায় তিনি অসাধারণ সংযম দেখিয়েছেন, কিন্তু কোনও আবেগের বহিঃপ্রকাশের বাড়াবাড়িকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। জাহাজে তাঁর সহযাত্রী একজন মার্কিন পাদ্রী এবং তাঁর পত্নী যে "জড়াজড়ি হয়ে কোণে চার ঘণ্টা বসে থাকে," তা দেখে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করতেন। ঐ দম্পতির সাত বছরে ছটি সন্তান হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দর মন্তব্য : "ইউরোপীয় সভ্যতা বোঝা দায় ! আমরা যদি বাইরে কুলকুচো করি, কি দাঁত মাজি, বলে, কি অসভ্য ! আর জড়াজড়িগুলো গোপনে করলে ভাল হয় না কি ?" অপরাধী পাদ্রী হওয়ায় উত্তর ইউরোপে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতে যে পাদ্রীদের বিবাহ করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তাই নিয়ে তিনি এক সরস মন্তব্য করেছেন : "প্রোটেস্টান্ট ধর্মে উত্তর ইউরোপের যে কি উপকার করেছে—যদি এই দশ ক্রোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজ সব মরে যায়, খালি পুরোহিতকুল বেঁচে থাকে, বিশ বৎসরে আবার দশ ক্রোরের সৃষ্টি।"[৩০৪]

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে ইউরোপের সামাজিক রীতিনীতির বিচারে বিবেকানন্দর মন্তব্য সব সময় দেশ-জাতিভেদের মাপকাঠিতে নির্ণীত হয়নি। "তাদের" নিয়মনীতি অনুসারে "তাদের" বিচার করবার সচেতন প্রয়াসও সব সময়ে কার্যকরী হয়নি, বিশেষত পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যকর নিয়মকানুনের প্রসঙ্গে। তাঁর মতে দৈহিক পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে হিন্দুরাই সর্বোৎকৃষ্ট। শুধুমাত্র তারাই জলমাটি দিয়ে শৌচ করে। চীনেদের কাছে কাগজের ব্যবহার শিখে ইউরোপীয়গণ ঘৃণ্য বর্বরতা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। প্রতিদিন স্নান করার কথা ইউরোপীয়রা জানেই না, ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ হবার পর ইংরেজরা নিজেদের বাড়িতে ওই রীতি কতকাংশে চালু করেছে। একমাত্র আমেরিকায় ধনীরা নিয়মিত স্নান করে। "জার্মান—কালেভদ্রে; ফরাসী প্রভৃতি কস্মিনকালেও না!!!...রুশফুশগুলো তো আসলে ম্লেচ্ছ," তারা স্নানের ধারই ধারে না। "স্পেন ইতালি অতি গরম দেশ, সে আরও নয়—রাশীকৃত লসুন খাওয়া, দিনরাত ঘর্মাক্ত, আর সাতজন্মে জলস্পর্শও না! সে গায়ের গন্ধে ভূতের চৌদ্দপুরুষ পালায়—ভূত তো ছেলেমানুষ!...প্যারিস—সভ্যতার রাজধানী প্যারিস, রঙ-ঢঙ ভোগবিলাসের ভূস্বর্গ প্যারিস," সেখানে বারোটি বড় বড় হোটেলে খোঁজ করে কোথাও "স্নানের স্থান" পাওয়া গেল না।[৩০৫]

পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তাঁদের পরিচ্ছন্নতাবোধের জন্ম। তাদের সমস্ত জোরটিই হচ্ছে বহিরাবরণের উপর—পরিচ্ছন্ন হওয়ার চেয়ে পরিচ্ছন্ন দেখানোর উপর, শুধুমাত্র "মুখটি ধোয়া, হাত ধোয়া—যা বাহিরে দেখা যায়।" সেইজন্যই ইউরোপে "শরীর সম্বন্ধী সমস্ত কার্য্য অতি গোপনে করা উচিত। খেয়ে আঁচানো, লোকমধ্যে থুথু ফেলা এসব মহা অভদ্রতা। লোকলজ্জার ভয়ে খেয়ে দেয়ে মুখটি মুছে বসে থাকে, ক্রমে দাঁতের সর্বনাশ হয়।...আমাদের আবার দুনিয়ার লোকের সামনে রাস্তায় বসে বমির নকল করতে করতে মুখ ধোওয়া, দাঁত মাজা, আঁচানো।...ওদেশে খেতে খেতে রুমাল বার করে নাক ঝাড়ো—তত দোষের নয়, আমাদের দেশে ঘৃণার কথা।...ময়লাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে আমরা ময়লা হয়ে থাকি অনেক সময়। ময়লায় আমাদের এত ঘৃণা যে ছুঁলে নাইতে হয়; সেই ভয়ে স্তূপাকৃতি ময়লা দোরের পাশে পচতে দিই।...বিলাতি রাঁধুনীর চৌদ্দপুরুষে কেউ স্নান করেনি...কিন্তু ধপধপে কাপড় আর টুপি পরেছে। রুমাল বার করে ফোঁৎ করে নাক ঝাড়লে, আবার সেই হাতে ময়দা মাখলে। শৌচ থেকে এল—কাগজ ব্যবহার করে, সে হাত ধোবার নামটিও নেই, সেই হাতে রাঁধতে লাগল। হয়তো একটা মস্ত কাঠের টবের মধ্যে দুটো মানুষ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রাশীকৃত ময়দার উপর নাচছে—কি না ময়দা মাখা হচ্ছে। গরমি কাল—দরবিগলিত ঘাম পা বেয়ে সেই ময়দায় সেঁধুচ্ছে। তারপর তার রুটি তৈয়ার যখন হল, তখন দুগ্ধফেননিভ তোয়ালের উপর চীনের বাসনে সজ্জিত হয়ে পরিষ্কার চাদর বিছানো টেবিলের উপর, পরিষ্কার কাপড় পরা কনুই পর্য্যন্ত সাদা দস্তানা-পরা চাকর এনে সামনে ধরলে!...আমাদের রাঁধুনী স্নান করেছে, কাপড় বদলেছে; হাঁড়িপত্র উনুন—সব ধুয়ে মেজে সাফ করেছে...বামুনের কাপড়ে খামচে ময়লা উঠছে।...হিঁদু করছেন ভিতর সাফ, বিলাতি করছেন বাইরে সাফ। হিঁদু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে, বিলাতি সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে।" পার্থক্যের মূল কিন্তু অনেক গভীরে। "আমরা স্নান করি কেন ?—অধর্মের ভয়ে ; পাশ্চাত্যেরা হাতমুখ ধোয় পরিষ্কার হবে বলে।" মানুষ ছোট-বড় যে কাজই করে, তার মধ্যেই তার ঐতিহ্যের নৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। কিন্তু সব সময়ে বোধহয় তা হয় না। নৈতিকতার বাইরে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবেও সামাজিক রীতিনীতির তারতম্য দেখা দেয়। "দেশভেদে যে সকল কার্য্য অনিবার্য্য, সেগুলো সমাজ সয়ে নেয়। আমাদের গরম দেশে খেতে বসে আধঘড়াই জল খেয়ে ফেলি—এখন ঢেঁকুর না তুলে যাই কোথা। কিন্তু ঢেঁকুর তোলা পাশ্চাত্য দেশে অতি অভদ্রের কাজ।" সর্বসমক্ষে নাক ঝাড়া পাশ্চাত্য দেশে দূষণীয় নয়—"এ ঠাণ্ডা দেশে মধ্যে মধ্যে নাক না ঝেড়ে থাকা যায় না।"

খাওয়াদাওয়ার আলোচনায় নৈতিকতার প্রশ্নটি আরও গোলমাল হয়ে গেছে, যদিও শারীরবৃত্তিক প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নই এক্ষেত্রে তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। "আমরা নিরামিষাশী, আমাদের অধিকাংশ রোগ পেটে ; উদরভঙ্গে বুড়োবুড়ী মরে। এরা মাংসাশী, এদের অধিক রোগই বুকে। হৃদরোগে, ফুসফুস রোগে এদের বুড়োবুড়ী মরে।" তাঁর মতে মানুষের রোগের প্রকৃতির সঙ্গে তার মানসিকতার একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। "হৃদয়াদি উপরের শরীরের রোগে আশা-বিশ্বাস পুরো থাকে—যক্ষ্মারোগী মরবার সময় পর্য্যন্ত বিশ্বাস রাখে যে সেরে উঠবে।" অন্যদিকে, পেটের রোগগ্রস্ত লোকেরা "প্রায় নিরুৎসাহ বৈরাগ্যবান" হয়।[৩০৬] মাংস খাওয়ার ঔচিত্য নিয়ে যে তর্কবিতর্ক, তিনি শুধু তাই তুলে ধরেছেন। মাংস খাওয়ার কুফল বিষয়ে ইউরোপে যে নতুন তর্কের সূত্রপাত হয়েছে, তিনি বিনা মন্তব্যে তার উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে প্রত্যেক জাতির খাদ্যাখাদ্যের বিচার তাদের আদর্শ বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে জড়িত। অন্যদের থেকে আলাদাভাবে হিন্দুরা যে "জন্ম-কর্ম-ভেদে আহারাদি সমস্তই পৃথক"—এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেটাই ঠিক। "মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষ ভোজন অবশ্যই পবিত্রতর। যাঁর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ ; আর যাকে খেটেখুটে এই সংসারের দিবারাত্রি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বইকি।...নইলে বলবানের পদতলে দুর্বল পেষা যাবেন।" ইতিহাসে দেখা যায় "চিরকালই মাংসাশী জাতিরাই যুদ্ধবীর, চিন্তাশীল ইত্যাদি।"[৩০৭] তবে ইউরোপের খাওয়াদাওয়ার নিয়ম যে তিনি সবটাই পছন্দ করেছেন, তা নয়। তারা যে "বন্য পশুপক্ষীর মাংস না পচলে খায় না, তাজা পেলেও তাকে টাঙিয়ে রাখে—যতক্ষণ না পচে দুর্গন্ধ হয়"—তিনি বেশ ঘৃণাভরেই একথাগুলি বলেছেন। পচা মাংস ও পনীর-প্রীতি তাঁর কাছে পচা জিনিসের প্রতি লালসা বৈ কিছুই নয়।[৩০৮] আদিম অবস্থায় মানুষ যখন শিকার ধরে খেত, সেই অভ্যাসই এদের মধ্যে রয়ে গেছে। সে সময় যা প্রয়োজন ছিল, পরে তা রেওয়াজ হয়ে গেল। তাছাড়া, "সকল ধর্মেই খাওয়া-দাওয়ার একটা বিধিনিষেধ আছে, নাই কেবল ক্রিশ্চানী ধর্মে।" ইহুদিদের বিধিনিষেধগুলি তিনি উল্লেখ করেছেন। তালিকা পৃথক হলেও এইসব বিধিনিষেধগুলিতে হিন্দু ও ইহুদিদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।[৩০৯]

তাঁর মতে ভাল খাওয়া ইউরোপীয়দের ভাল স্বাস্থ্যের অন্যতম কারণ। জলবায়ু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং ভাল থাকা অপরাপর কারণ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ, তাঁর মতে, অল্প বয়সে বিয়ে না করা। এই কারণেই "এ সব দেশে ৪০ বৎসরের পুরুষকে জোয়ান বলে—ছোঁড়া বলে। ৫০ বৎসরের স্ত্রীলোক যুবতী।" তুলনায় বাঙালি ত্রিশ পেরোলেই যৌবনোত্তীর্ণ।[৩১০]

স্বাস্থ্য খারাপ হলেও "দুনিয়ার সব জাতির চেয়ে এই হিঁদুর জাত সুশ্রী, সুন্দর।" ইউরোপীয়রা স্বাস্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও বৈকল্যমুক্ত নয় এবং তাতে তাদের দেখতেও খারাপ লাগে। যেমন টাক আর দাঁতের রোগ ইউরোপে প্রায় সবার। মানবদেহের স্বাভাবিক সৌষ্ঠবকে বিকৃত করার উদ্ভট রীতি শুধু ভারতীয় সমাজে নয়, সব সমাজেই আছে। "এরা এখন ভদ্রলোকে বড় নাক-কান ফোঁড়ে না ; কিন্তু কোমর বেঁধে বেঁধে, শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে, পিলে যকৃৎকে স্থানভ্রষ্ট করে শরীরটাকে বিশ্রী করে বসে। 'গড়ন গড়ন' করে এরা মরে, তায় ঐ বস্তাবন্দি কাপড়ের উপর গড়ন রাখতে হবে।"[৩১১]

উপরন্তু, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বলেই যে তারা বেশি সাহসী বা চরিত্রবান, তা নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি যাদের কথা বলেছেন, তারা ভারতের উচ্চবর্গীয় নয়, তারা সেই দীনহীননীচ জাতি, যারা "সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে।" তাদের প্রতি তাঁর শুধু সহানুভূতি নয়, শ্রদ্ধা ছিল। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে যে 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে তিনি ইউরোপে গিয়েছিলেন তার বাঙালি কর্মচারীদের আত্মমর্যাদা, সাহস এবং দক্ষতা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। "এই সকল বাঙালী খালাসী, কয়লাওয়ালা, খানসামা প্রভৃতির কাজ দেখে, স্বজাতির উপর যে একটা হতাশ বুদ্ধি আছে, সেটা অনেকটা কমে গেল। এরা কেমন আস্তে আস্তে মানুষ হয়ে আসছে, কেমন সবলশরীর হয়েছে, কেমন নির্ভীক অথচ শান্ত! সে নেটিভি পা-চাটার ভাব মেথরগুলোরও নেই—কি পরিবর্তন!" সাহেবদের কাজে ভাগ বসাচ্ছে বলে বিলেতে এদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে হাঙ্গামা হচ্ছে। নিজেদের বিরক্তি চাপা দেবার জন্য সাহেবরা সেই একঘেয়ে জাতিগত দুর্নাম দিয়ে বলে, "ঝড়-ঝাপটা হলে, জাহাজ বিপদে পড়লে এদের সাহস থাকে না।" কিন্তু স্বামীজী লিখেছেন, "কাজে দেখা যাচ্ছে ও অপবাদ মিথ্যা। বিপদের সময় গোরাগুলো মদ খেয়ে, জড় হয়ে নিষ্কর্মা হয়ে যায়। দেশী খালাসী এক ফোঁটা মদ জন্মে খায় না, আর এ পর্য্যন্ত কোন মহাবিপদে একজনও কাপুরুষত্ব দেখায়নি।" ভারতে নেতারাই ভীরু, যারা তাদের সঙ্গে লড়াইতে নামে, তারা নয়।[৩১২]

স্বামীজীর রচনায় ইউরোপের দরিদ্রশ্রেণীর সমস্যাগুলির প্রতি তাঁর সহানুভূতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ওদেশে যন্ত্রের প্রাবল্যে মানুষও যেন প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। "সব এক পোষাক, এক খাওয়া, এক ধাঁজে কথা কওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি হতে হতে ক্রমে সব যন্ত্র।" "মেলা কলকব্জা মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপাপত্তি করে জড়পিণ্ড তৈয়ার করে। কারখানায় লোকগুলো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর, সেই একঘেয়ে কাজই কচ্চে, এক এক দলে...পিনের মাথাই গড়ছে, সুতোর জোড়াই দিচ্ছে...ফল ঐ কাজটিও খোয়ানো, আর তার মরণ। জড়ের মত একঘেয়ে কাজ করতে করতে জড়বৎ হয়ে যায়।"[৩১৩] আত্মা-বিনাশকারী একঘেয়েমি মানুষকে ভাবনা-চিন্তাবিহীন অভ্যাসের দাসে পরিণত করছে, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার মধ্যে এই সব পাপ ঢুকছে। সারা ইউরোপে একই রকম খাদ্য ও বস্ত্র তাদের অবক্ষয়ের পরিচয়। হিন্দুরা যেমন জানবার, বোঝবার চেষ্টা না করে পূর্বপুরুষের ধারা অনুসরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে, বর্তমান ইউরোপও তেমনি এক আবর্তে পড়েছে। মানুষ যখন যন্ত্রে পরিণত হয়, তখন সেই সভ্যতার পতন অনিবার্য।[৩১৪]

পাশ্চাত্য জীবনধারা প্রসঙ্গে নৈতিক বিচার এবং ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে তার তুলনা করেই ক্ষান্ত হননি বিবেকানন্দ। আগেই দেখিয়েছি যে তিনি যা দেখতেন, শুনতেন, তার প্রতি তিনি একটা শিশুসুলভ আমোদ বোধ করতেন, আবার বুদ্ধি দিয়ে তাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতেন। সমকালীন ধারা তাঁর মূল্যায়নকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেনি, এবং তিনি যা বলেছেন বা লিখেছেন, তার মধ্যে একটা অভিনবত্ব চোখে পড়ে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সংস্কৃতির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যগুলির উপর তিনি আলোকপাত করেছেন। পারি সম্বন্ধে যদিও অনেক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রোমই তাঁর সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। প্রাচীন পম্পেই শহরের আধুনিকত্ব তাঁর ভাল লেগেছিল ; তাঁর মতে সেই শহরে বাষ্পশক্তি এবং বিদ্যুৎ ছাড়া সবই ছিল, এমনকি আধুনিক শিল্পকলার তুলনায় এর শিল্পকলাও উন্নতমানের।[৩১৫] কনস্টান্টিনোপল শহরও তাঁর ভাল লেগেছিল—"অলিগলি, ময়লা, কাঠের বাড়ী ইত্যাদি, কিন্তু ঐ সকলে একটা বিচিত্রতাজনিত সৌন্দর্য্য আছে।"[৩১৬] "তুর্কী স্বভাবসিদ্ধ রণকুশলতা, উদারতা" এবং সঙ্গীত-কলায় কুশলতার জন্য হুঙ্গারিয়ানদের তাঁর ভাল লেগেছিল।[৩১৭] কিন্তু ভিয়েনা—"প্যারিসের নকলে ছোট শহর" তাঁর ভাল লাগেনি। ইউরোপ ভ্রমণ প্রসঙ্গে তিনি বাঙালির খাওয়াদাওয়ার উদাহরণ দিয়ে কৌতুক করেছেন: "প্যারিসের পর ইউরোপ দেখা—চর্ব্বচুষ্য খেয়ে তেঁতুলের চাটনি চাকা।"[৩১৮] তাঁর মতে ইউরোপের মাত্র তিনটি জাতি সভ্য, তারা হল—ফরাসী, জার্মান এবং ইংরেজ। "বাকিদের দুর্দশা আমাদের মতো, অধিকাংশ এত অসভ্য যে, এশিয়ায় এত নীচ কোন জাত নেই। সার্বিয়া-বুলগেরিয়ায় সেই মেটে ঘর, ছেঁড়া ন্যাকড়াপরা মানুষ, আবর্জনারাশি...আবার ক্রিশ্চান কিনা—দু-চারটে শূয়োর অবশ্যই আছে। দুশো অসভ্য লোকে যা ময়লা করতে পারে না, একটা শোরে তা করে দেয়।"[৩১৯]

বিবেকানন্দ বলেছেন যে ফ্রান্স ও তার রাজধানী পারি ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। কৃষ্টিসম্পন্ন সব পশ্চিমীরাই চলনে-বলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে, খাবার-দাবারে ফরাসীদের অনুকরণ করেন। "ফরাসী ভাষা সভ্যতার ভাষা—পাশ্চাত্য জগতে ভদ্রলোকের চিহ্ন।...এখনও ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিশেষ বিশেষ পোশাক বিদ্যমান ; কিন্তু ভদ্র হলেই, দু পয়সা হলেই অমনি সে পোশাক অন্তর্ধান হন, আর ফরাসী পোশাকের আবির্ভাব। ঘাগরা-পরা গ্রীক, তিব্বতী-পোশাক-পরা রুশ যেমন 'বোদ্র' হয়, অমনি ফরাসী কোট-প্যান্টালুনে আবৃত হয়।...তবে আজকাল," স্বামীজী লক্ষ করেছেন, "পারি অপেক্ষা লন্ডনে পুরুষদের পোশাক ভব্যতর, তাই পুরুষদের পোশাক লন্ডন-মেড।"[৩২০]

ফরাসী ও জার্মান জাতির মধ্যে প্রবল পার্থক্য তাঁর নজর এড়ায়নি। জার্মানি তখন "কেন্দ্রীভূত নূতন মহাবল, মহাবেগে উদয়শিখরাভিমুখে চলেছে।" একদিকে তিনি দেখেছেন "কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয় অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস ; আর একদিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকার, দিঙ্‌নাগ জার্মানির স্থূলহস্তাবলেপ। প্যারিসের পর পাশ্চাত্য জগতে আর নগরী নাই ; সব সেই প্যারিসের নকল, অন্ততঃ চেষ্টা। কিন্তু ফরাসীতে যে শিল্প সুষমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য, জার্মানে, ইংরেজে, আমেরিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে অনুকরণ স্থূল। ফরাসী বলবিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ ; জার্মানির রূপবিকাশ চেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর, জার্মান প্রতিভার মধুর হাস্য-বিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। ফরাসীর সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের মত—কস্তুরীর মতো এক মুহূর্তে উড়ে ঘর দোর ভরিয়ে দেয় ; জার্মান সভ্যতা পেশীময়, সীসার মতো, পারার মতো ভারি, যেখানে পড়ে আছে তো পড়েই আছে। জার্মানের মাংসপেশী ক্রমাগত অশ্রান্তভাবে ঠুকঠাক হাতুড়ি আজন্ম মারতে পারে ; ফরাসীর নরম শরীর মেয়েমানুষের মতো ; কিন্তু যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আঘাত করে, তখন সে কামারের এক ঘা।...জার্মান ফরাসীর নকলে বড় বড় বাড়ী অট্টালিকা বানাচ্ছেন, কিন্তু তা দেখলে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়...এ বাড়ী কি হাতী-উটের 'তবেলা' ? আর ফরাসীর পাঁচতলা হাতী ঘোড়া রাখবার বাড়ী দেখে ভ্রম হয় যে, এ বাড়ীতে বুঝি পরীতে বাস করবে।"[৩২১]

আমেরিকায় জার্মান ঔপনিবেশিকের সংখ্যা খুব বেশি হওয়ায় সেখানে জার্মান প্রভাবও বেশি।[৩২২] অবশ্য বিবেকানন্দর চোখে মার্কিন সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতার শাখাবিশেষ, প্রধানত ব্রিটিশ রীতিনীতির ধারক, তাকে আলাদা আখ্যা দেওয়া যায় না।[৩২৩] তা সত্ত্বেও, ঐ মহান দেশে তিনি ভারতের দরিদ্রদের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন, তার প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। সাংগঠনিক ক্ষমতা, দারিদ্র্যমুক্তি এবং এই ক্ষুদ্র জগতের প্রাচীর ভেঙে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে তিনি সকলের অনুকরণযোগ্য বলেছেন।[৩২৪] মার্কিনীদের স্বাধীনতার মানসিকতা এবং কর্মোদ্যোগকেও তিনি প্রশংসা করেছেন। ভারতবাসীর উদ্যমহীনতার চেয়ে তাদের অসংযমও ভাল। আগন্তুকদের প্রতি মার্কিনীদের ব্যবহারে তিনি মোহিত হয়েছিলেন। পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে, দুঃস্থ, সন্ত্রস্ত অবস্থায় যে সব দরিদ্র আইরিশ ওদেশে যায়, কয়েকমাসের মধ্যেই তাদের ভোল পালটিয়ে যায়। দেশে তারা ঘৃণার পাত্র, নিরাশার মধ্যে তাদের জন্ম ও জীবনযাত্রা, ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর কাছে তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি প্রত্যাহৃত। তাদের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করে মার্কিনীরা তাদের মধ্যে আশা ও সাহসিকতার সঞ্চার করে। মানসিকতার এই বিপুল পরিবর্তন থেকে ভারতবাসীর শিক্ষা নেওয়া উচিত।[৩২৫] এই দেশে সুবিধা সুযোগের কোনো অভাব নেই, তাই সেখানকার দরিদ্ররাও হতাশায় ভেঙে পড়েনি। তাঁর চোখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি নতুন দেশ, শক্তিতে ভরপুর এবং নতুন সব কিছুকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।[৩২৬] এমনকি ভারী ভারী প্রাচীন ইউরোপীয় আসবাবপত্রের চেয়ে মার্কিন দেশের জিনিসগুলিও তাঁর বেশি পছন্দ হয়েছিল। মানুষের কাজে লাগাবার জন্য যে বিদ্যুৎকে তারা নিয়ন্ত্রিত করেছে, তাদের সমস্ত কাজের মধ্যে যেন সেই তড়িৎপ্রবাহ। লন্ডনের চেয়ে নিউ ইয়র্কেই উঠতি ভারতবাসীর শেখার অনেক কিছু আছে।[৩২৭] জাতিগত বৈষম্যের যে অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল, সে বিষয় তিনি পরিহাসচ্ছলে বিবৃত করেছেন, তা সত্ত্বেও তাঁর ধারণা হয়েছিল যে অন্তত ভারতের ক্ষেত্রে আমেরিকা ইংলন্ডের তুলনায় অনেকটা মানসিক বৈকল্যমুক্ত। সামাজিকতার আদর্শে তারা ভারতীয়দের তুলনায় অনেক উন্নত, বিশেষত মিলেমিশে কাজ করায় এবং সমাজজীবনে পরশ্রীকাতরতাহীনতায়। বিবেকানন্দর মতে ঈর্ষাপরায়ণতা পরাধীন জাতিগুলির অন্যতম দুর্লক্ষণ। আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে তিনি ঈর্ষার মনোভাব লক্ষ করেছিলেন—সমসাময়িক ভারতীয়দের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতই তারাও নিজেদের জাতির যে কটি লোক উন্নতি করেছে তাদের সহ্য করতে পারত না।[৩২৮]

মার্কিনীদের অনেক গুণ ছিল। তারা সত্যভাষী এবং সাধারণত দয়া-পরবশ। তবে তাদের সব কিছুই দেহকেন্দ্রিক ; দেহের প্রয়োজন মেটাতে, তাকে ঠিক রাখতে, এবং নানাভাবে সাজাতে তাদের শক্তি ফুরিয়ে যায়। "শরীর হল এদের ধর্ম, তাই মাজা, তাই ঘষা—তাই নিয়ে আছে। নখ কাটবার হাজার যন্ত্র, চুল কাটবার দশ হাজার, আর কাপড়-পোশাক গন্ধ-মশলার ঠিক-ঠিকানা কি!" এদের সম্বন্ধে তিনি আরও মন্তব্য করেছেন : "এরা ভাল মানুষ।...সব ভাল, কিন্তু ঐ যে 'ভোগ', ঐ ওদের ভগবান—টাকার নদী, রূপের তরঙ্গ, বিদ্যার ঢেউ, বিলাসের ছড়াছড়ি।"[৩২৯] পৃথিবীতে এরা ধনীশ্রেষ্ঠ, খরচে অদ্বিতীয়, ভোগে-বিলাসেও অদ্বিতীয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় যখন চারিদিকে সব কিছুতেই বরফ জমে যাচ্ছে, তখনও, "তামাসা কি জানো ? বাড়ির ভেতর জলে এক ডেলা বরফ না দিয়ে এরা পান করে না। বাড়ির ভেতর গরম কিনা, তাই।"[৩৩০] তবে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে মার্কিনীদের এই অর্থোপার্জনের জন্য সদাব্যস্ত জীবনযাত্রা তাঁর কাছে অর্থহীন এবং ক্লান্তিকর বলে মনে হয়েছিল।[৩৩১] তাদের মনে আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র ছিল না। ধর্মের ব্যাপারে তাদের যে আগ্রহ তা নিতান্তই সাময়িক উত্তেজনা ছাড়া কিছু নয়। আধ্যাত্মিকতার বদলে ভূত-প্রেত-ভেল্কিই তাদের আগ্রহের বিষয়। ওদেশের দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা পাপ থেকে পরিত্রাণের সহজ পথ চায়, অসাধু যাজকও সেই দুর্বলতার সুযোগ নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি যে সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তার প্রশংসা করলেও মার্কিনীদের মনে তিনি কতটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, সে বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।[৩৩২]

ইংরেজ ও মার্কিন ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিবেকানন্দ একটি প্রবল পার্থক্য লক্ষ করেছিলেন। যে কাজ তারা উপযুক্ত মনে করে সেটি সাধনে গভীর মনোনিবেশ ও গুরুত্ব আরোপ করা ইংরেজদের চরিত্র, তুলনায় মার্কিনীরা অব্যবস্থচিত্ত।[৩৩৩] ইংরেজদের দেশে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত তাদের সম্বন্ধে তাঁর বেশ ঘৃণার মনোভাব ছিল। শৈশবেই তিনি "ঘৃণ্য বিদেশীদের ভাষা" শিখতে অস্বীকার করেছিলেন।[৩৩৪] অ্যানিস্কুয়ান, ম্যাসাচুসেটস্‌-এ ভ্রমণকালে একবার তিনি ইংরেজদের সম্বন্ধে রাগে ফেটে পড়েছিলেন, শ্রীমতী রাইট তার বর্ণনা দিয়েছেন : "মাত্র অল্পকাল আগেও এরা ছিল অসভ্য। এদের গায়ে পোকা কিলবিল করত। আর এরা এদের গায়ের দুর্গন্ধ ঢেকে রাখত নানা সুগন্ধ দিয়ে।" তাদের তিনি "একেবারেই বর্বর" বলেছেন। এবং বর্বরতার কারণ তাঁর মতে উত্তরের তীব্র আবহাওয়া এবং অভাব। খ্রিস্টধর্মের প্রতি তাঁদের আনুগত্য নেহাতই মৌখিক, সভ্যতা বিস্তার করার উদ্দেশ্য ভণ্ডামি, তাদের মনের মধ্যে পাপ এবং হিংসা ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—আর একবার হূণ আক্রমণ হবে, চীনেরা ইউরোপ জয় করে নেবে, এবং পৃথিবীতে আবার অন্ধকার যুগ নেমে আসবে। অন্য জাতির প্রতি নিষ্ঠুরতার পাপে তাদের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ষিত হবে, যেমন ভারতের উপর হয়েছে। আমেরিকায় সাধারণের সামনে এটিই তাঁর প্রথম বক্তৃতা এবং শ্রোতৃমণ্ডলী ক্ষুদ্র হলেও এই বক্তৃতায় তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর বিরক্ত মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। ভারতে হিন্দু ও মুসলমান যুগের সঙ্গে তুলনা করে ব্রিটিশ শাসনকালের অবদান প্রসঙ্গে তিনি এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহুল-প্রচলিত মন্তব্য করেছিলেন : "ইংরেজরা রাশি রাশি ব্র্যান্ডির ভাঙ্গা বোতল ছাড়া আর কিছুই রাখেনি।"[৩৩৫]

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ঘটনাকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি, এবং অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজদের সম্বন্ধে বিরূপ মূল্যায়নের আসল কারণ এই বিদ্বেষী মনোভাব। ইংলন্ডে ভ্রমণ কালে তাঁর কথোপকথনের কিয়দংশ তাঁর ভাই লিপিবদ্ধ করেছেন, সেখানে অনেক তীক্ষ্ণ মন্তব্য দেখা যায়, যেমন, ইংরেজরা অত্যন্ত অত্যাচারী এবং অকৃতজ্ঞ ; নিষ্ঠুরতা এবং স্বার্থপরতা ইংরেজ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ; ব্রিটিশরা কাপুরুষ বলে হিন্দুরা তাদের হয়ে যুদ্ধ করেছে ; ভারতীয় সিপাইদের বীরত্বের দরুন ইংরেজ সেনারা ভিক্টোরিয়া ক্রশ পাচ্ছে, ইত্যাদি। একদিন তাঁর হতভাগ্য ভক্ত, দেশপ্রেমী গুডউইনকে তিনি বলেছিলেন যে ভারতবাসী একদিন তাঁদের লেবুর মত চটকাবে।[৩৩৬]

ইংলন্ডে কয়েক মাস কাটাবার পর অবশ্য তাঁর মত পালটিয়ে গিয়েছিল। হেল ভগিনীদ্বয়কে তিনি লিখেছিলেন : "ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল, তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমি বুঝতে পারছি, অন্য সব জাতের চেয়ে প্রভু কেন তাদের অধিক কৃপা করেছেন। তারা অটল, অকপটতা তাদের অস্থিমজ্জাগত, তাদের অন্তর গভীর অনুভূতিতে পূর্ণ।" ইংরেজদের উচ্ছ্বাসহীনতাকে তিনি "বাইরে একটা কঠোরতার আবরণ মাত্র" বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সেই নির্মোকের অন্তরালে অনেক সদগুণ লুকিয়ে আছে, যেমন, অকপট সৌহার্দ্য।[৩৩৭] তাদের চরিত্রে ঔদার্য্যের ব্যাপ্তি তাঁকে বিস্মিত করেছিল : "ত্যাগের ভাব কতকটা বোঝে—ইংরেজ চরিত্রের গভীরতা এখানেই।"[৩৩৮] ইংলন্ডে বেদান্তচর্চা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন ; শিক্ষিত ইংরেজদের উন্নতমানের বিচারবোধ এবং তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা দেখে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে তাঁর বেদান্ত শিক্ষণের ফল আমেরিকার চেয়ে ইংলন্ডেই বেশি ফলবে।[৩৩৯] ইংরেজদের দেশপ্রেমকে তিনি এতই মর্যাদা দিয়েছিলেন যে, তাদের স্বার্থপরতাও তাঁর চোখে গুরুত্বহীন ঠেকেছিল। তাছাড়া ভারতীয় চরিত্রের যে দোষের ফলে তাদের সমাজজীবন কলুষিত হয়ে উঠেছিল, সেই পরশ্রীকাতরতা ইংরেজ চরিত্রে একেবারেই নেই, এবং তার ফলেই তারা সারা পৃথিবীকে বশে এনেছে। দাসসুলভ মানসিকতা ব্যতীতই যে আনুগত্য সম্ভব, তা তারা দেখিয়ে দিয়েছে এবং সেই কারণেই আইন-অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও তাদের স্বাধীনতাও যথেষ্ট।[৩৪০]

তবে ইংরেজদের সামাজিক কৃষ্টির মূল্যায়নে বিবেকানন্দ যুগের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এক জায়গায় অবশ্য তাঁর মত প্রচলিত ধারার থেকে আলাদা, যদিও সহজে তিনি অন্য সুর ধরেননি। নেহাতই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মনোভাব বদলে গিয়েছিল। ইংরেজদের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে মার্কিনীরা যে তাঁকে রাজার সম্মান দিয়েছিল, তার সঙ্গে ইংরেজদের অভ্যর্থনার তুলনা এসে পড়ে। ঐ মনোমোহন সন্ন্যাসীকে মার্কিনীরা যেরকম প্রবল উৎসাহে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, ইংলন্ডে তার অর্ধেকও ছিল না। 'নেটিভ' ভারতবাসী সম্বন্ধে ইংরেজদের মনোভাব তিনি ভাল করেই জানতেন। তাঁর সমস্ত ইংরেজ বন্ধুর মধ্যে শুধুমাত্র ক্যাপ্টেন ও শ্রীমতী সেবিয়ার, এই দুজনই ঐ মানসিকতা-মুক্ত ছিলেন বলে তাঁর ধারণা ছিল : "সেবিয়ার দম্পতিই একমাত্র ইংরেজ, যাঁরা এদেশীয় ঘৃণা করেন না ; এমনকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টার্ডিকেও বাদ দেওয়া চলে না। একমাত্র সেবিয়াররাই আমাদের উপর মুরুব্বিয়ানা করতে এদেশে আসেননি।"[৩৪১] স্টার্ডি এবং মিস মুলার—যে দুজন তাঁকে প্রথম ইংলন্ডে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—তাঁদের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের ঘটনাসহ, ইংলন্ডে তাঁর অভিজ্ঞতার সবটাকেই ভালো বলা যায় না। ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে তাঁর তিক্ত মনোভাবের কথা স্মরণ রেখে বলতে হয় যে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করতে পারতেন বলেই তাঁর পক্ষে তাদের সদ্‌গুণগুলির উল্লেখ সম্ভব হয়েছে। দেশের ইতিহাসের সঙ্কট ব্যাখ্যার প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্যের, বিশেষত ইংলন্ডের সম্বন্ধে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যেও এইরকমই নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের প্রচেষ্টা যে সর্বক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে, তা নয়। কিন্তু সেই প্রচেষ্টার পরিণতিকে শুধুমাত্র তাঁদের মানসিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ বলতে চাইলে তাঁদের পারিপার্শ্বিকের জটিলতার যথাযথ বিচার হয় না। বিবেকানন্দ ও তাঁর সমভাবাপন্ন সমকালীনদের কাছে ব্রিটিশ শাসন যে অসহ্য ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা শত্রুর শক্তিকে যাচাই করে দেখতে চেয়েছিলেন এবং ইংলন্ডের ইতিহাস আর প্রচলিত সংস্কারের মধ্যে সেই শক্তির উৎস সন্ধান করেছিলেন। ইংলন্ডের শক্তি, ইংলন্ডবাসীর আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের যে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে কিছুটা প্রশংসার মনোভাবও ছিল। শাসকশ্রেণীর সঙ্গে শিক্ষিত ভারতীয়দের সম্পর্কের জটিলতার কথা স্মরণ রেখে বলতে হয় যে ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রশংসার মধ্যে কিছুটা অনুরাগও মিশে ছিল। সেই কারণেই সব মূল্যায়নের মধ্যেই পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার সন্নিবেশ হয়েছে, তাকে সামঞ্জস্যহীনতা বা সংশয় না বলে জটিলতা বলেই বোঝা উচিত।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে স্বামীজীর মতামতে ঐ জটিলতাই লক্ষ করা যায়, এবং আগেই দেখিয়েছি যে এ ব্যাপারে তিনি একা নন। ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের অনেকটাই, বিশেষত তীব্র প্রতিক্রিয়াজনিত মন্তব্যগুলি অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের মতই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি এইরকম তীব্র মন্তব্যে পরিপূর্ণ। ভারত এবং অন্যত্র ব্রিটিশের সভ্যতা পরিবহনের বাহন হল তরবারি, 'বাইবেল, বেয়নেট এবং ব্র্যান্ডি' তার প্রতীক। নিজেদের সুখের জন্য তারা ভারতের রক্ত চুষে খেয়েছে এবং বিপুল ধনরাশি লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। পরাজিত হতভাগ্যদের নিরন্তর অপমান করে তাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছে, ভারতে তাদের অবদান হল দারিদ্র্য, অবক্ষয় এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা।[৩৪২] ভালর মধ্যে, "এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই।"[৩৪৩] "ব্রিটিশ রাজ্যে গৃহস্থের কোন কষ্ট নাই।"[৩৪৪]

তাঁর গভীর চিন্তাপ্রসূত মন্তব্যে, বিশেষত বাংলা রচনায়, ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে কিছুটা মৌলিক এবং যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। যুগে যুগে পৃথিবীতে এক-একটি বর্ণ ক্রমান্বয়িকভাবে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে—ভারতের বর্ণভেদ প্রথা থেকে উদ্ভূত তাঁর এই তত্ত্বকে ঘিরেই তাঁর চিন্তাধারা আবর্তিত হয়েছে। বৈশ্যশক্তি ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি। ব্যবসায়িক স্বার্থ ও বুদ্ধিকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ জাতির চরিত্র গড়ে উঠেছে। "ইংরেজ চরিত্রে ব্যবসা-বুদ্ধি, আদান-প্রদান প্রধান ; যথাভাগ ন্যায়বিভাগ ইংরেজের আসল কথা।" ঠিক তেমনি "রাজনৈতিক স্বাধীনতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড।" "রাজা, কুলীনজাতি-অধিকার, ইংরেজ ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করে, কেবল যদি গাঁট থেকে পয়সাটি বার করতে হয় তো তার হিসাব চাইবে।...রাজা জোর করে টাকা আদায় করতে গিয়ে মহাবিপ্লব উপস্থিত করালেন।"[৩৪৫] অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালকে বৈশ্য প্রাধান্যের কাল বলা যায়। "বৈশ্যাধিকারের চেষ্টায় এক প্রান্তের পণ্যদ্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে দেশ-দেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ।...কিন্তু গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ দেখা যাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসংঘর্ষে অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে।"[৩৪৬]

কিন্তু তাঁর মতে, ব্রিটিশের শোষণের চেয়েও বিদেশী আইনের নিগড়ে স্বাধীন চিন্তাশক্তির অপমৃত্যু ঘটিয়ে যে ভারতবাসীর মননশীলতার ধ্বংসসাধন করা হচ্ছিল, সেটাই ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে বড় কুফল। "দন্তধাবন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্য্যন্ত সমস্ত চিন্তা—যদি অপরে আমাদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয় এবং রাজশক্তির পেষণে ঐ সকল নিয়মের বজ্রবন্ধনে আমাদের বেষ্টিত করে, তাহা হইলে আর আমাদের চিন্তা করিবার কি থাকে? চিন্তাশীলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে...জড়ত্বের আগমন। এখনও প্রত্যেক ধর্মনেতা, সমাজনেতা সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য ব্যস্ত!!! দেশে কি নিয়মের অভাব?"[৩৪৭]

ঔপনিবেশিক শাসনের শোষণের চরিত্র এবং জাতিগত বৈষম্যের যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, তা একেবারেই মৌলিক। তিনি বলেছেন যে স্বেচ্ছাচারী শাসকের অধীনে সাধারণত জাতিবৈষম্য দেখা যায় না, কারণ এইরকম শাসনব্যবস্থায় জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই শাসনক্ষমতা থেকে দূরে রাখা হয়। এক্ষেত্রে জাতিগত অধিকার বা সুবিধার বিশেষ সুযোগ থাকে না। "কিন্তু যেখানে...প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন করে, সেস্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ ব্যবধান রচিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিতদের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্যল্পকালে বিজিত জাতির বহুকল্যাণসাধনে সমর্থ, সে শক্তির অধিকাংশ ভাগই বিজিত জাতিকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা ব্যয়িত হয়।...ইংরেজ কৃষ্ণবর্ণ বা 'নেটিভ' অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল, ইহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমাদের আপনাদের মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক জাতিগত ঘৃণাবুদ্ধি আছে।"[৩৪৮] অবশ্য ইঙ্গ-ভারতীয়দের ঘৃণার ফলে এখন ভারতবাসীর মনে কিছুটা সাম্যভাব এসেছে। এখন সকলেই 'নেটিভের' নিম্নপর্যায়ে নেমে এসেছে।[৩৪৯] সাম্যভাব আনার ফল সবটাই খারাপ হয়নি। "পিতৃপিতামহগত গুণের পক্ষপাতিতা ঢের কমিয়া আসিয়াছে...সাঁওতাল বংশধরেরাও ইংরাজের কৃপায় বাঙ্গালীর পুত্রদিগের সহিত বিদ্যালয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থাপন করিতেছে।"[৩৫০]

ভারত সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ইংলন্ডের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় বিবেকানন্দ কৌতুক অনুভব করেছিলেন। "ইংরেজ সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে, ভারত সাম্রাজ্য তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরেজজাতির সর্বনাশ উপস্থিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইবে। অতএব 'যেন তেন প্রকারেণ' ভারতে ইংলন্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে। এই অধিকার-রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইংরেজজাতির 'গৌরব' সদা জাগরূক রাখা।" যতদিন পর্যন্ত "যে বীর্য্য, অধ্যবসায় ও স্বজাতির একান্ত সহানুভূতিবলে তাঁহারা এই রাজ্য অর্জন করিয়াছেন, যে সদাজাগরূক বিজ্ঞানসহায় বাণিজ্যবুদ্ধিবলে সর্বধনপ্রসূ ভারতভূমিও ইংলন্ডের প্রধান পণ্যবীথিকা হইয়া পড়িয়াছে," তা বজায় থাকবে, ততদিন ইংলন্ডের চিন্তার কোনও কারণ নাই বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। "কিন্তু যদি ঐ সকল গুণপ্রবাহের বেগ মন্দীকৃত হয়, বৃথা গৌরব-ঘোষণে কি সাম্রাজ্য শাসিত হইবে? এজন্য এ সকল গুণের প্রাবল্য সত্ত্বেও অর্থহীন 'গৌরব' রক্ষার জন্য এত শক্তিক্ষয় নিরর্থক।"[৩৫১]

ভূদেব এবং বঙ্কিমের মত বিবেকানন্দও ভারতীয় সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে জাতীয়ভাবের অভাবকে বিদেশী শাসনের সর্বাপেক্ষা কুফল বলেছেন। নবপ্রচারিত জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ইংরেজদের সমগোত্র হওয়ার প্রচেষ্টা তথা অনুচিকীর্ষাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন: "এখন সকল জাতির মুখে শুনছি, তাঁরা নাকি পাকা আর্য্য...আর শুনি ওঁবা আর ইংরেজরা নাকি এক জাত, মাসতুতো ভাই।...এ দেশে দয়া করে এসেছেন, ইংরেজের মতো।...আর ওদের ধর্মটা ঠিক ইংরেজদের ধর্মের মতো। ওঁদের বাপ-দাদা ঠিক ইংরেজদের মতো ছিল, কেবল রোদ্দুরে বেড়িয়ে কালো হয়ে গেল! (কিন্তু) 'সব নেটিভ' সরকার বলছেন। সেজেগুজে বসে থাকলে কি হবে বলো? ও টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বলো? যত দোষ হিঁদুর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে গেলে, লাথি-ঝাঁটার চোটটা বেশী বই কম পড়বে না। 'সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত।' ধন্য ইংরেজ সরকার! তোমার 'তখৎ তাজ অচল রাজধানী হউক!"[৩৫২] —আবার কখনও কখনও সাহেবী পোশাক পরা ভারতীয়দের দেখে তিনি নিজের বেদনা জ্ঞাপন করেছেন। "যখন ভারতবাসীকে ইউরোপী বেশভূষা মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত! চতুর্দশশতবর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর 'নেটিভ' নহেন।...আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্য্যজাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!"[৩৫৩]

যে প্রশ্নে সমকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মন বিভ্রান্ত হয়েছিল—পশ্চিম থেকে আমাদের শেখারই বা কি আছে আর বর্জন করবারই বা কি আছে—বিবেকানন্দের প্রচার এই প্রশ্নেরই উত্তর। দুই সংস্কৃতির মধ্যে জাতীয় মর্যাদা বজায় রেখে ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে সংহতি সাধনের কথা তিনি বলেছিলেন। পশ্চিম থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখবার আছে, কিন্তু তারা আমাদের সমাজের যে সব সমালোচনা করে, এমনকি যে সবের প্রশংসাও করে, সে সব কিছুকেই বিচার-বিবেচনা করে গ্রহণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি রামকৃষ্ণদেবের একটি ব্যঙ্গাত্মক উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: "জনৈক শিক্ষিত বাঙালী গীতার প্রশংসা করিয়াছে।" তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রবল গতিবেগ রোধ করতে পারছিল না। এই নব্য আদর্শের বন্যার সবটাই ক্ষতিকারক কিনা, সে বিষয়ে তিনি নিঃসংশয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে পারেননি। তিনি লিখেছেন, "এই পাশ্চাত্য বীর্য্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জ্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়,"[৩৫৪] আবার তিনি নিজেই ভারতীয় সমাজের অনেক প্রথাকে অমানুষিক এবং পরিত্যাজ্য বলেছেন। বিশেষত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যদি শূদ্র-জাগরণের মধ্যে দিয়ে, নিপীড়িত জনগণের অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে হয়, তাহলে যে সমাজ-ব্যবস্থায় তাদের মানবিক অধিকার অস্বীকৃত হয়েছে, সেই ব্যবস্থাকে বর্জন করতেই হবে।

ভূদেব এবং বঙ্কিমের মত, বিবেকানন্দ কিন্তু প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের কতটুকু গ্রহণযোগ্য আর কতটুকু পরিত্যাজ্য সে বিচার করেননি। নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তনে ভারতের দারিদ্র্যমুক্তির সম্ভাবনা তাঁর মনে জেগেছিল এবং ঐ ব্যাপারে সাহায্য লাভের ক্ষীণ আশা নিয়ে তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর আস্থা কোনও সময়েই বিচলিত হয়নি। ভারতের দরিদ্র শ্রেণীকে অজ্ঞতা-মুক্ত করবার জন্য মানচিত্র, ভূগোলক, ছায়াচিত্র প্রভৃতি নতুন ধরনের কলা-কৌশলের প্রয়োগ করতে হবে বলে তিনি মনে করতেন। এইসব সুযোগ নেবার জন্য পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের কোনও প্রয়োজন ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল জাগরিত হয়েছিল প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মাধ্যমে। জীবনের প্রথমদিকে ভারতের সঙ্কট সম্বন্ধে তিনি কোনোরকম ভাবনাচিন্তা করেছিলেন কিনা, অথবা পড়াশুনার মাধ্যমে ইউরোপীয় দর্শন ও সমাজকে তিনি যেটুকু জেনেছিলেন তার কোনও বিচার বিশ্লেষণ করেছিলেন কিনা—এ সব বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। এমনকি ঔপনিবেশিক যুগের বুদ্ধিজীবীর মনে যে প্রশ্ন সদা-জাগরূক ছিল, যে, পাশ্চাত্য থেকে আমাদের কি কি গ্রহণীয়, তাও তাঁর মনকে খুব আন্দোলিত করেছিল বলে মনে হয় না, কারণ, পরে ইউরোপ এবং আমেরিকায় তিনি যা দেখেছিলেন, তার ভিত্তিতে হাস্য-পরিহাসের মধ্যে দিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। শোষণ ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদিতার মধ্যে দোষের আর কিছুই তিনি দেখেননি। তাঁর অনুভূতিতে "আমরা" ও "তাহারা"র দ্বৈধ যথাক্রমে আধ্যাত্মিকতা এবং ঐহিকতার মধ্যে সীমিত ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশবাসীদের মধ্যে তিনি একটা প্রশংসনীয় পুরুষোচিত প্রাণশক্তি এবং রজোগুণের প্রকাশ দেখেছিলেন, উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হবার জন্য যা মানুষের একান্ত প্রয়োজন। তুলনায় ভারতীয়রা তমোগুণে নিমগ্ন, তাদের ক্লৈব্য এবং সর্বপ্রকার নীচতা জয় করতে হলে প্রথমে ওই রজোগুণ আয়ত্ত করতে হবে : "যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে ; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে ; তবে হইবে কি ? চাই—অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"[৩৫৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপসংহার

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্যদেশ নিয়ে আলোচনা-গবেষণা বাঙালি বুদ্ধিজীবীর প্রায় বাতিকে পরিণত হয়েছিল। এই মানসিকতা গান্ধী-যুগের জাতীয়তাবাদীদের অন্তঃসমীক্ষার একেবারেই বিপরীত। বিংশ শতকে তৎকালীন কর্মসূচি অথবা ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যের পক্ষে ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক রীতিনীতি হয় অনাবশ্যক, না হয় মানসিকতার অস্থিমজ্জায় মিশে যাওয়ার ফলে ও বিষয়ে ক্রমাগত পর্যালোচনার আর কোনও প্রয়োজন ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণোদিত বহির্বিশ্বের জ্ঞানের সঙ্গে ভারতের চিরাচরিত মূল্যবোধের সমন্বয় করবেন, এরকম একজন ভবিষ্যৎ দেশনায়কের স্বপ্ন ভূদেব দেখেছিলেন উনবিংশ শতকের আশির দশকে। এই রকম উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে ইউরোপ ও মার্কিনী সংস্কৃতির পর্যালোচনা অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। প্রায় চার দশকের সংগঠিত রাজনীতির ফলে নেতৃত্বের নতুন নতুন ধারা সৃষ্টি হয়েছিল। সেইসব ধারার উৎস পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে কিনা, সে প্রশ্নেরও আর কোনও গুরুত্ব ছিল না। রাজনীতির ধারা পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে এমন এক দৃঢ় প্রত্যাশার সৃষ্টি করেছিল যে এদেশে ওই ব্যবস্থার উপযোগিতার প্রশ্নটিও অবান্তর বলে মনে করা হত। এ ধরনের প্রশ্ন উঠলে বাস্তবক্ষেত্রে তা এড়িয়েই চলা হত। অনুরূপভাবে, উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রসারে পাশ্চাত্য জীবনধারা সম্বন্ধে এক ঘৃণ্য মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। ইংরেজদের অনুকরণ করার স্পৃহা যদিও দেশ থেকে রাতারাতি উঠে যায়নি, তবুও, স্বদেশীর মাহাত্ম্যে জাতীয়তাবোধের উপর বিদেশী অনুকরণের কুপ্রভাবের আলোচনার আর দরকার ছিল না।

রাজনৈতিক আদর্শবাদ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে আমি উদাহরণ ব্যবহার করেছি, কারণ এসব ক্ষেত্রেই বুদ্ধিজীবীদের মানসিকতার পরিবর্তন বেশি ধরা পড়ে। অধিকন্তু, উনবিংশ শতকের বাংলায় ইউরোপ সম্বন্ধে আগ্রহ ও কৌতূহলের মূলে ছিল জাতীয়তাবাদ। সমাজে জাতীয় চেতনার বর্ধিত পরিসর, কিছুটা আত্মনির্ভরতা এবং সক্রিয় রাজনীতির অভিজ্ঞতা ও প্রস্তুতির ফলে বিশের দশকের বাঙালি পূর্বযুগের মত অপ্রস্তুত বোধ করত না। তৎকালিক সক্রিয়তা এবং নতুন আশাকে ঘিরে যে ভাবনা-চিন্তা তার দরুন প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরবনিনাদের প্রয়োজনও আর ছিল না। রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি তার স্থান করে নিয়েছিল, যদিও নবসৃষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রদায়িক সমস্যা তাকে অভীষ্ট পথে এগোতে দেয়নি। তবে মানসিকতার পরিবর্তন সম্বন্ধে সাধারণভাবে যা বললাম বিশেষ সমীক্ষায় তা অন্যরকম দাঁড়াতেও পারে।

যাই হোক, বিংশ শতকের পরিবর্তিত মানসিকতা সম্বন্ধে আমার মন্তব্যের উদ্দেশ্য হল আগের যুগের বাঙালি বুদ্ধিজীবী মানসিকতার উপাদানগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া। সেই উপাদানগুলি হল,—পাশ্চাত্য ঐতিহ্য উপলব্ধির প্রচেষ্টা, ভারতের সঙ্গে সে দেশের সংস্কৃতির তুলনা, যেসব ক্ষেত্রে ভারত ইউরোপের থেকে শ্রেষ্ঠতর না হোক, অন্ততপক্ষে সমান, সেগুলি খুঁজে বার করা, এবং সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের ঐতিহ্যের কতটুকু গ্রহণ করা এবং কতটুকু পরিত্যাগ করা উচিত, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া। আলোচ্য ব্যক্তিরা যেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছিলেন, সেগুলি প্রায় সবই ঐসব ভাবনা-চিন্তার সীমারেখার ভিতরেই পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীর স্বাজাত্যাভিমান দ্বিধাগ্রস্ত ততক্ষণই বিশ্ববাসী তার ঐতিহ্যকে কী চোখে দেখছে তাই নিয়ে তার দুশ্চিন্তা। শাসকশ্রেণীর বিরূপ মূল্যায়ন নিজেরা মেনে নিত বলেই তাদের দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যেত, পাছে শেষ পর্যন্ত জগৎসমক্ষে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। অদূর ভবিষ্যতে সক্রিয় রাজনীতি ঐ উদ্বেগ অনেকটাই প্রশমন করেছিল কিন্তু নব্বই-এর দশকের বুদ্ধিজীবীরা তা আশা করতে পারেননি। যে ক্ষোভের ফলে ইউরোপের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বার করার প্রচেষ্টা চলছিল, সক্রিয় রাজনীতি তারও বহিঃপ্রকাশের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

বিশ্বের দরবারে নিজেদের ঐতিহ্যের স্থান এবং মূল্য নিয়ে দুর্ভাবনা হয়ত সম্প্রদায়গতভাবে উনবিংশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীর পাশ্চাত্য ঐতিহ্য নিয়ে মাথাব্যথার একটি কারণ ; কিন্তু এছাড়া আরও কারণ ছিল, এই গ্রন্থে আলোচিত ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তা প্রকাশ, যেমন সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এক ঐতিহ্য সম্বন্ধে স্বাভাবিক কৌতূহল, বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা এবং তার প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের ঘটনাবলী। সম্পর্কটা যে শাসক এবং শাসিতের, এই বোধ থেকেই দুর্ভাবনার সূত্রপাত। রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সামাজিক আধিপত্য শাসক শ্রেণীর কুক্ষিগত হওয়ায় সামগ্রিকভাবে দেশবাসীর অধিকারহীনতা ঔপনিবেশিক শাসনের অঙ্গাঙ্গী বলে বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। শ্বেতকায় জাতির গাত্রবর্ণই তার প্রভুত্বের প্রতীক। নিজের সমাজের কৌলীন্য বাইরে শ্বেতকায়দের অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারত না। আমলাতন্ত্রের সর্বোচ্চ পদগুলি ভারতীয় কর্মচারীদের কাছে সুদূরপরাহত ছিল। নিজের সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিকেও অফিস-কাছারিতে সাহেব-বস্-এর দৈনন্দিন ধৃষ্টতা মেনে নিতে হত। বিদেশী আমলাদের তৈরি আইন এ দেশবাসীর জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করত। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত আছে—আইনে এ কথা লেখা থাকলেও বাঙালি বুদ্ধিজীবীর বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিপরীত। এইভাবে গড়ে ওঠা সম্পর্কের অবধারিত ফল হয়েছিল আত্মপ্রত্যয়ের অভাব এবং হীনম্মন্যতা। কিন্তু তারই পাশাপাশি দুই ভিন্নধর্মী ঐতিহ্যের যোগাযোগে সৃষ্ট জীবনের নতুন নতুন সম্ভাবনাও উঁকি দিচ্ছিল। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে সেরকমটা আশা করা যায়নি। এমনকি এই শাসক-শাসিতের সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যেই অন্য ধরনের সম্ভাবনাও ছিল কিন্তু তার গণ্ডি ছিল সীমিত। কিন্তু সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে সৃষ্ট পরিবেশে সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার সুযোগ দেখা দিয়েছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের ভাণ্ডার থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেবার অনেক কিছুই ছিল, সেই বৈচিত্র্যময় সমাবেশ থেকে নিজের নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে এক-একজন এক-একটি বিষয় গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের প্রতিক্রিয়ার ধরন ও গভীরতাও হয়েছে আলাদা আলাদা। উচ্চপদ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা না থাকলেও ভাবের বাহন বই বা পাশ্চাত্য ভাবধারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীর কাছে নিষিদ্ধ ছিল না। তাছাড়া, রামমোহন রায়ের সময় থেকেই বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে শিক্ষিত ইউরোপীয়দের সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ইউরোপ ভ্রমণ এবং সেখানে পড়াশোনার সুযোগে যোগাযোগের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছিল, যদিও প্রায় সবাইকেই অল্পবিস্তর জাতিবৈষম্যের জ্বালা সইতে হয়েছিল। কিন্তু আবার বলছি, এসব সত্ত্বেও, এমনকি ঔপনিবেশিক শাসনের পটভূমিকাতেও দুই ভিন্নধর্মী ঐতিহ্যের সম্পর্ক কোনও বিশেষ ধারা অনুসরণ করে গড়ে ওঠেনি। আমাদের আলোচ্য তিনজন প্রবক্তাও সমকালীন অনেকের মতই পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের বিশ্লেষণে একই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, কিন্তু তাঁদের উত্তরের ব্যাপ্তি ছিল অনেকখানি। এক-একজন এক-একটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন। ফলত তাঁদের গবেষণা-লব্ধ বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু একেবারেই আলাদা আলাদা, এমনকি তাঁদের দেওয়া ব্যাখ্যারও চরিত্র বিভিন্ন। এঁদের তিনজনেরই মানসিকতার বিকাশ হয়েছিল উনবিংশ শতকের বাংলার চিন্তাধারার সীমিত গণ্ডির মধ্যে, তা-সত্ত্বেও এই বিভিন্নতা এবং তাঁরা সকলেই মনে-প্রাণে হিন্দু ছিলেন—নিজেদের হিন্দুত্বে প্রগাঢ় গর্ববোধে উদ্দীপ্ত হিন্দু।

কিন্তু তাঁরা তিনজনে কি একই অর্থে হিন্দু ছিলেন?

ভূদেবের হিন্দুত্ব ছিল স্মৃতি-নির্দেশিত আচার-আচরণের নিয়মনিষ্ঠা অনুসরণের মধ্যে দৃঢ়নিবদ্ধ, যে নিয়মনিষ্ঠ থাকলে তবেই গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃতি দেবে। বিবেকানন্দ যে কালাপানি পার হওয়ার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেননি এবং আরও যেসব আচার তিনি লঙ্ঘন করেছিলেন ভূদেব সেগুলি মেনে নিতেন কিনা সন্দেহ। উচ্চবর্ণের একান্নবর্তী পরিবারের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধে তিনি গৌরববোধ করতেন। বাল্যবিবাহের রীতিও তাঁর স্বীকৃতি লাভ করেছিল। অস্পৃশ্য শ্রেণীর দুরবস্থায় ব্যথিত বোধ করলেও বর্ণভেদের উপযোগিতায় তাঁর গভীর আস্থা ছিল। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে তিনি দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই স্বপ্ন সম্ভব করবার আশায় তিনি তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয় দান করেছিলেন। তবে তিনি ইসলাম ধর্মকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলেন।

বঙ্কিমের ধর্মজীবনের সূত্রপাত সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে যৌবনে তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, যদিও আবেগপ্রবণ ভক্তিবাদ সম্বন্ধে তাঁর অভিব্যক্তি বিচিত্রধর্মী। যুক্তিবাদী জ্ঞান এবং পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের উপর গভীর আস্থাবশত প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের অনেক কিছুকেই তিনি ঘৃণার চোখে দেখেছিলেন। শাস্ত্রনির্দেশিত আচার-আচরণের একনিষ্ঠ অনুসরণ তিনি মেনে নিতে পারেননি। বর্ণভেদ তাঁর মতে অমানুষিক শোষণের পদ্ধতি, এবং ভারতের অধোগতির কারণ। সুতরাং হিন্দু ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যগুলিকে খোলাখুলি অর্থে বিচার করলে চলবে না। একদিকে কোঁৎ, স্পেন্সার এবং মিল এবং অন্যদিকে গীতা এবং মহাভারত থেকে তাঁর মনোমত বিষয়গুলির সমন্বয়ে তিনি নিজের পছন্দসই এক আদর্শ নিজেই তৈরি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলি, যদিও 'আনন্দমঠ'-এ রূপায়িত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাগতিক আদর্শের সঙ্গে বিবেকানন্দর জাতির সেবার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসগ্রহণের আদর্শের যথেষ্ট মিল দেখা যায়, বঙ্কিম কিন্তু সন্ন্যাসের আদর্শ বর্জন করেছিলেন এবং সন্ন্যাসের প্রতি নবসৃষ্ট উত্তেজনার তিক্ত সমালোচনা করেছিলেন। পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার সফল হয়নি।

যে কোনও মানদণ্ডেই বিচার করা হোক না কেন, বিবেকানন্দ এবং বঙ্কিমের ধারণায় হিন্দু ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। স্বামীজীর কাছে বেদান্ত এবং অদ্বৈতবাদ—পরমসত্তা বা ব্রহ্মজ্ঞানলাভের নিশ্চিত পন্থাই ভারতের আধ্যাত্মিকতার মর্মবাণী। এই বাণীকে ভিত্তি করে বিশ্বজনীন ধর্ম সৃষ্ট হলে তাই মানবজাতিকে নতুন পরিপূর্ণতা এনে দেবে। জীর্ণদেহী, খালি পেট, অধোগামী ভারতবাসী অবশ্য হঠাৎ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বৈদান্তিক আত্মজ্ঞান লাভ করবে, এমন আশা করা যায় না। সেই কারণেই তিনি তাদের রজোগুণ আয়ত্ত করার উপর জোর দিয়েছেন। আবার, পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্যও রজোগুণ আয়ত্ত করা আবশ্যক। জাতির পুনর্জাগরণ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা বঙ্কিমের অনুরূপ। বঙ্কিম যে বিশ্বজগতের রক্ষাকর্তা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু অথবা দশপ্রহরণধারিণী দুর্গাকে আহ্বান করেছেন, তা গোঁড়া হিন্দুর ভক্তিভরে দেবতাকে স্মরণ করা নয়, বরং জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনায় তিনি এক প্রচলিত রীতিকে কাজে লাগিয়েছেন। বিবেকানন্দ যে রজোগুণের ওপর জোর দিয়েছেন, তাকেও সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাণ্ডার থেকে একটি উদাহরণ ব্যবহার করা বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তাঁর হিন্দুত্বের কোনও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েনি। বরং পাশ্চাত্যদেশের সব কিছুতেই তিনি রজোগুণের সমারোহ লক্ষ করেছিলেন। তিনি যেভাবে ব্রাহ্মণদের পুরোহিত এবং শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধগুলিকে 'অচ্ছুৎমার্গ' বলে বর্ণনা করেছেন, তাতে ভূদেব নিশ্চয়ই খুশি হতেন না। হিন্দুদের সামাজিক বিধানে যে অমানুষিক নিপীড়নের ব্যবস্থা আছে, বঙ্কিমের মত তিনি তার সমালোচনা করে পুনর্বিবেচনায় ভুল স্বীকার করেননি। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে এই দুজনের একটি বিষয়েই মিল ছিল, তা হল তাঁরা কেউই তার একতরফা প্রশংসা করেননি। ভারতীয় ঐতিহ্যের মূর্তিমান ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে বঙ্কিম গর্দভ বলেছেন, কারণ ক্ষত্রিয় হয়েও তিনি পাশা খেলায় বাজি রেখে নিজের রাজ্য এবং স্ত্রী হারিয়েছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া এবং রানীর সম্পর্কের প্রতি বিবেকানন্দ ব্যঙ্গভরে কটাক্ষ করেছেন। নিজেদের প্রচলিত সংস্কারকে এইভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার কথা ভূদেব ভাবতেই পারতেন না।

আমি দেখাতে চেয়েছি যে হিন্দুত্বের গর্ববোধ সত্ত্বেও এই তিনজনকে এবং হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসুর মত আরও অনেকে, যাঁরা একই মনোভাবের অংশীদার ছিলেন, তাঁদের সবাইকে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদী বলে মনে করা ভুল হবে। হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদ শব্দটির আবার কিছুটা সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা আছে। আধুনিক ভারতের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই শব্দটির প্রতি প্রতিক্রিয়ার অনেক কারণ আছে। আমাদের বর্তমান আলোচনায় তিনটি প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ্য—সমাজ-সংস্কার সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া, মুসলিম সম্প্রদায় এবং ভারতের মুসলিম শাসনকাল সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া, এবং শেষে, ভারতের জনসাধারণ এবং তাঁদের অবস্থার উন্নতিসাধন বিষয়ক প্রতিক্রিয়া।

ভূদেব যে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির কোনও রকম পরিবর্তনের বিরোধী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তার কারণ হিসাবে তাঁকে মোটেই 'পুনরভ্যুত্থানবাদী' বলা যাবে না, বরং যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছিল, যেগুলির মধ্যে দিয়ে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, অন্যান্য সমাজের তুলনায় সেগুলিকে তাঁর খারাপ মনে হয়নি, বলেই তিনি পরিবর্তন চাননি। তিনি দেখিয়েছেন যে অবিবাহিতা ইংরেজ মহিলাদের তুলনায় ভারতীয় বিধবাদের অবস্থা বেশি কিছু খারাপ নয়। উপরন্তু, তাঁর মতে, জাতির পুনর্জাগরণের মত অবশ্য প্রয়োজনীয়, গুরুভার কর্তব্যের ক্ষেত্রে সমাজ-সংস্কারের ঐসব প্রচেষ্টা নেহাতই প্রান্তিক। তাঁর মতে বিধবা-বিবাহের রীতি মুসলিম বা নিম্নবর্ণের সমাজে বিশেষ কোনও উন্নতি সাধন করতে পারেনি। মুসলিমদের প্রতি মনোভাব দিয়ে যদি উনবিংশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীর হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদের মানসিকতার বিচার করা হয়, তাহলে বোধহয় বলতে হয় যে ভূদেব ঐ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। আদিপর্বের জাতীয়তাবাদীরা যে মুসলিম নিগ্রহের বিরুদ্ধে হিন্দু দেশপ্রেমীদের তথাকথিত বলিষ্ঠ প্রতিবাদের ঘটনা সগর্বে প্রচার করতেন ভূদেব তা মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর কৃত মূল্যায়নে ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের অবদানের গুরুত্ব কম নয়। দেশের ভবিষ্যৎপ্রসঙ্গে তিনি দুই সম্প্রদায়ের সমানভাবে অংশগ্রহণের উপর জোর দিয়েছেন। জনসাধারণের প্রতি তাঁর সমবেদনা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনুসৃত নীতির মধ্যে, এবং যেখানে যেখানে তার কার্যকরী প্রয়োগ হয়েছে—যেমন শিক্ষাবিদ হিসাবে আদিবাসী গোষ্ঠীসহ সবার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে। ভারতের পরাধীনতাকে তিনি সামাজিক বৈষম্যের অপরাধে ঈশ্বরের অভিশাপ বলে মনে করেছিলেন। সাম্যবাদী নীতিকে তিনি প্রকাশ্যেই ভ্রান্ত বলে পরিহার করেছিলেন এবং ভারতীয় সমাজে মুষ্টিমেয় ধনী পরিবারের অস্তিত্বের সমালোচনাকে জাতীয়তাবিরোধী বলে নিন্দা করেছিলেন। তাঁর মতে ঐ মুষ্টিমেয় ধনিক সম্প্রদায়কে জাতীয় অর্থনীতিতে বিদেশী অনুপ্রবেশের প্রভাব প্রতিরোধের জন্য বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরবর্তী যুগে জাতীয় স্বার্থে অনুসৃত শ্রেণীসহযোগিতার নীতিই তাঁর এই বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ভূদেবের আদর্শ এবং নীতিকে বোধহয় 'পুনরভ্যুত্থানবাদী' বা 'প্রতিক্রিয়াশীল' না বলে 'রক্ষণশীল' বলাই সমীচীন। কিন্তু তার পরেও বলতে হয় যে তাঁর রক্ষণশীলতার মধ্যে অনেক উগ্র আধুনিক চিন্তাধারার বীজ সুপ্ত ছিল।

সমকালীন চিন্তাধারার কোনও বিশেষ গণ্ডিতে বঙ্কিমের স্থান নির্দেশ করা বেশ কঠিন। অসুবিধার প্রধান কারণ তাঁর নিজের মানসিক অস্থিরতা এবং পরিবর্তনশীলতা। বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ করা প্রভৃতি সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তিনি মোটেই উৎসাহ দেখাননি, অথচ এইরকম বিবাহ হওয়া উচিত, তা স্বীকার করেছেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের পুরোপুরি অনুসরণ করে তিনি ভারতে মুসলিম শাসনের যুগকে অত্যাচারের যুগ বলেছেন। আমি উদাহরণ উদ্ধৃত করে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার ফল এইসব কেতাবী প্রচেষ্টা আধুনিক পরিভাষায় তা সাম্প্রদায়িকতা বৈ কিছুই নয়।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে বঙ্কিমের যুগে ভারতের মুসলিম শাসকদের স্বৈরাচারী সম্রাটরূপেই দেখা হত। সেই পটভূমিকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্রাজ্যের মুসলিম জনসাধারণের উপরও কালিমা লেপন করা হয়েছিল, ঠিক যেমনভাবে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর পরিবর্তে সমগ্র ব্রিটিশ জাতিই সাম্রাজ্যবাদিতার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিল। সেই আদিযুগে বুদ্ধিজীবীদের একটি অতি ক্ষুদ্রাংশ সাম্প্রদায়িকতার কুফল এবং অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সমকালীন দৃষ্টিতে বিচার করলে, বঙ্কিম যেরকম আবেগের সঙ্গে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার শোষণ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেছেন, তাতেই তাঁর ব্যক্তিত্ব ভাস্বর হয়ে ওঠে। "সাম্য" প্রবন্ধটিকে ভ্রমাত্মক বলে পরিত্যাগ করলেও ভারতের কৃষকদের দুর্দশার যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন, তা কোনোদিন পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন বলে মনে করেননি। অবশ্য এই প্রতিভাদীপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে কোনোমতেই বিপ্লবী বলা যায় না। তিনি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাননি, তার একটি কারণ অবশ্য ব্রিটিশদের বন্ধু হিসাবে তাদের কথার খেলাপ হোক, তা তিনি চাননি। সমাজতন্ত্রবাদী ভারতে যে বঙ্কিম-বর্ণিত হতদরিদ্র কৃষকগোষ্ঠীর অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি একথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের আলোচ্য তিনজন মনীষীর মধ্যে ব্যক্তি হিসাবে বোধহয় মানসিক সংঘাতে অস্থির সৃজনশীল শিল্পী বঙ্কিমই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। তাঁর চিন্তাধারার জটিলতাকে কোনও বিশেষ সংজ্ঞার কাঠামোয় সীমিত করার প্রচেষ্টা বাতুলতা।

বঙ্কিমের মত বিবেকানন্দও উনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কারমূলক কার্যগুলিকে জাতির পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অবান্তর না হোক, নেহাতই প্রান্তিক বলে মনে করতেন। ভারতীয় সমাজের উন্নতিকল্পে বিদেশী শাসকশ্রেণীর সাহায্য প্রার্থনা করাটা তাঁর কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হয়েছিল। হিন্দু সমাজের কুপ্রথাগুলি নিয়ে ক্রমাগত আলোচনা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশীদের আত্মতুষ্টি তাঁর জাতির অহঙ্কারকে ক্ষুণ্ণ করত। বিদেশে যেসব হিন্দু রীতিনীতির যৌক্তিকতা তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার অধিকাংশই তিনি নিজে মানতেন না। ভারতীয় সমাজের যেসব ধরনের পরিবর্তনের কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন তা তাঁর সমসাময়িক অথবা পূর্ববর্তীদের তুলনায় অনেক বেশি প্রগতিবাদী। ভারতের এলিট গোষ্ঠীকে তিনি জীবন্মৃত বলেছেন, মমির সঙ্গে তুলনা করেছেন, এবং যে শোষিত জনগণ চিরদিন নিজেদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে সেই ন্যায়সঙ্গত দাবিদারদের স্বার্থে পথ ছেড়ে দাঁড়াতে বলেছেন। বুদ্ধিজীবীদের জন্য তিনি সামান্য একটি কর্তব্য নির্দেশ করেছেন, তা হল, গণদেবতাকে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়ে তাদের শারীরিক ও মানসিক পুষ্টিবর্ধন করা, যাতে তারা নিজেদের ভাগ্য জয় করে নিতে পারে। হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদ, এমনকি ঔপনিবেশিক যুগের মধ্যবিত্ত আদর্শের সঙ্গেও তাঁর আদর্শকে ঠিক খাপ খাওয়ানো যায় না। ইসলামের প্রতি তাঁর মনোভাবে, বিশেষত ভারতে তার ভূমিকা প্রসঙ্গে তাঁর উগ্র প্রগতিবাদী চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে। ইউরোপের সভ্যতার স্রষ্টারূপে তিনি যে সগর্বে ইসলামের দাবি ঘোষণা করেছেন তার মধ্যে তাঁর সর্ব-এশিয়বাদের ইঙ্গিত আছে। খ্রিস্টধর্মের গোঁড়ামি ও অত্যাচারিতার সঙ্গে তিনি ইতিহাসে ইসলামের সাংস্কৃতিক অবদানের তুলনা করেছেন। মুঘল যুগের ঐতিহ্যে তাঁর গৌরববোধ ভাবাবেগের উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল। হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদের এবং তৎসহ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াসমূহের প্রবক্তা হিসাবে বিবেকানন্দকে বিচার করলে তাঁর বক্তব্যের প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবিচার হবে না। বিদেশে তিনি হিন্দু দর্শনের অপরিচিত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রচার করেছেন। এক রহস্যময় নবযুগের প্রত্যাশা নিয়ে তাঁর এই প্রচার—যে নবযুগে সমগ্র মানবকুল শক্তিমান পাশ্চাত্য জাতিগুলির পরিচালনায় হিন্দু শিক্ষকতায় আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পরিপূর্ণতা লাভ করবে। এই উপলব্ধির জন্য শক্তিমান পাশ্চাত্য নতমস্তকে ভারতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবে। উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং রহস্যসন্ধানী সন্ন্যাসীর মনের আশা ছিল এইরকম। মানবজাতির মঙ্গল এবং জাতির গৌরবের জন্য ভারতীয় সংস্কৃতির যে যে বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল, তিনি শুধু সেগুলিই প্রচার করেছিলেন। যে কথা আগেই বলেছি, তারই পুনরুক্তি করে বলছি যে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াগুলি যে হিন্দুদের আগেই জানা ছিল, এই গ্রন্থে আলোচিত তিনজন মনীষীরই এই তত্ত্বে এতটুকুও আস্থা ছিল না। ভারতের প্রচলিত কুসংস্কারসমূহের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তত্ত্বের প্রয়োগ নিয়ে বিবেকানন্দ জঘন্য ঠাট্টা করেছেন।

হিন্দুসত্তা এবং সমকালীন প্রধান প্রধান রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর প্রতি তাঁদের মনোভাবের মধ্য দিয়ে তিনজন মনীষীর ব্যক্তিসত্তা এবং জীবনের অভিজ্ঞতার বিভিন্নতা ধরা পড়েছে। আমি দেখাতে চেয়েছি যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে তাঁরা যা কিছু খুঁজতে চেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন,—যা কিছু তাঁদের পাশ্চাত্য সম্বন্ধে উপলব্ধির উপাদান এসব কিছুর মধ্যে যে সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য আছে তা তাঁদের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং জীবনচর্যার ফল। ভূদেব ও বঙ্কিম, দুজনেই ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ, দুজনেই সরকারী আমলা। পরিবেশ ও শিক্ষা একইরকম হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ব্যক্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। ব্রাহ্মণের কঠোর নৈষ্ঠিক শুদ্ধতার মধ্যে মানুষ হওয়ায় ভূদেবের চরিত্র সেইভাবেই গড়ে উঠেছিল। বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে ইহুদি গুরু বলে মনে হত। তাঁর সমসাময়িকদের মতে স্কুলজীবন থেকেই তিনি আচারগত পবিত্রতা এবং নিয়মনিষ্ঠায় কঠোর ছিলেন। তাঁর রচনাশৈলী ছিল স্বচ্ছ, সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল—উনবিংশ শতকের বাংলা গদ্যরীতির অলঙ্কার-বাহুল্য থেকে একেবারেই মুক্ত; এ থেকে তাঁর শৃঙ্খলাপরায়ণ চরিত্রই ধরা পড়ে। উপন্যাস রচনার অসফল সংক্ষিপ্ত প্রয়াস ব্যতীত যেখানে তাঁর দক্ষতা, সেই ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি সম্বন্ধে নিঃসংশয় এবং নিজের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভরশীল নীতিকথামূলক সমাজতাত্ত্বিক প্রবন্ধ রচনাতেই তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন। বয়ঃসন্ধিকালের সাময়িক উত্তেজনা ব্যতীত জীবনের আর কোনো সময়ে তিনি সাংস্কৃতিক সংঘাতে জর্জরিত হননি। উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য দর্শন এবং জীবন-বেদের মূল্যবোধ দিয়ে তাঁর মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। প্রত্যক্ষবাদী দর্শনে তাঁর আগ্রহের মধ্যে ঐ মানসিকতা ধরা পড়েছে যদিও ঐ আগ্রহের অন্যতম কারণ ছিল কোঁৎ-এর রচনায় পুরোহিত (ব্রাহ্মণ) সম্প্রদায়ের প্রশস্তি। নিজের অজ্ঞাতে পাশ্চাত্যের যে সব প্রভাব তাঁর মূল্যবোধের মধ্যে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল, তিনি বোধহয় সত্যসত্যই সেগুলি সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বলতে হয় যে তিনি একেবারেই পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক-অনুসারী এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। মূল্যবোধের ক্ষেত্রে তাঁর চোখে পাশ্চাত্যের সব কিছুই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানের তুলনায় নিম্নমানের। জীবনের পারিপার্শ্বিক থেকেই, বিশেষত বাংলার একান্নবর্তী পরিবারের আবেগময় পরিবেশের প্রতি তার প্রগাঢ় অনুরক্তি থেকেই তাঁর এই দৃঢ়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ঐ পরিবেশকে নষ্ট করে দেয় বলেই তাঁর মতে তা পরিত্যাজ্য। অবশ্য, হিন্দু রীতিনীতির নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাঁর যে বক্তব্য তাকে সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বলা যায় না, অন্ততপক্ষে সচেতনভাবে তিনি তা করেননি। এ ছিল তাঁর যথার্থ বিশ্বাস এবং দেশবাসীকে তিনি এই বিশ্বাসের অংশীদার করতে চেয়েছিলেন। দেশপ্রেমীরূপে তাঁর আশা ছিল এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই জাতির পুনর্জাগরণ হবে। তাঁর কাছে দেশের চিরাচরিত রীতিনীতিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ভৌগোলিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার মতই গুরুত্বপূর্ণ।

পাশ্চাত্য ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে তিনি এক বিষয়মুখী বিশ্লেষণ দিতে চেয়েছিলেন এবং ব্যক্তিগত আশা এবং পছন্দ যে বিচারবোধকে আচ্ছন্ন করতে পারে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তা সত্ত্বেও অতি মনোগ্রাহী 'সামাজিক প্রবন্ধের' বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি এক পূর্বনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। তাঁর মতে পাশ্চাত্য ইতিহাস থেকে মানুষ যা যা করা উচিত নয়, তার শিক্ষা নেবে। হিন্দুরা পাশ্চাত্যবাসীর থেকে শুধুই তাদের ব্যবহারিক দক্ষতা এবং সামাজিক সংহতির শিক্ষা নেবে। বেঁচে থাকার জন্য সামাজিক সংহতি এবং তার চূড়ান্ত রূপ দেশপ্রেমের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু ভূদেবের মূল্যবোধের মাপকাঠিতে এগুলি নিম্নমানের। অপ্রতিহত দেশপ্রেম স্বাধিকারের ক্ষেত্র বাড়ানোয় প্ররোচনা দেয়, তা আগ্রাসী মনোভাবেরই নামান্তর। তার চূড়ান্ত পরিণতি দেশজয়ের মত ভয়ঙ্কর অপরাধমূলক এবং হিংসাত্মক ঘটনায়। শেষ পর্যন্ত এসবের ফলে যে যুদ্ধ হবে তাতেই পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ঐ হিংসার উৎসের সন্ধানে তিনি পাশ্চাত্যের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করে দেখেছেন যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই তার উৎস, যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তাঁর মতে স্বার্থপরতার জয়গান, সম্পদ-সৃষ্টির প্ররোচনা, অবৈধভাবে জাতীয় স্বার্থসিদ্ধি—এসবের সমাহার, সংক্ষেপে যে বর্বর আক্রমণকারীর দল রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল, তাদের মানসিকতার উত্তরাধিকার। পাশ্চাত্যের সব প্রচেষ্টার মূল এক নীতিজ্ঞানহীন স্বার্থপরতা, তা যৎসামান্য প্রশমিত হয়েছিল খ্রিস্টধর্মের সীমিত ইহলৌকিক উপদেশের প্রভাবে। তবে খ্রিস্টধর্ম তারা গ্রহণ করেছিল নামে, কাজে নয়।

নৈতিকতা, কিংবা সর্বব্যাপী ধর্ম, অথবা উচিত ব্যবহারের তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই ভূদেব এইসব আলোচনা করেছেন। তিনি এবং তাঁর পিতা-পিতামহ ব্রাহ্মণ্য নীতি অনুযায়ী সৎ জীবনের ভিত্তি এই আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। যে আদর্শের কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই, কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে তা অনুভব করেছিলেন, যে আদর্শ তাঁর নিজের ঐতিহ্যের ভিত্তি, সেই আদর্শের মানদণ্ডে নিজের পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞানের সাহায্যে তিনি পাশ্চাত্যের মূল্যায়ন করেছেন। দেশপ্রেম তাঁর মতে ঐ ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং প্রসারণ।

তাঁর পাশ্চাত্য মূল্যবোধ গ্রহণ করতে না পারার সঙ্গে যেন গান্ধীবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। 'স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাসে' তিনি ভারতের ভবিষ্যতের যে ছবি এঁকেছেন, তাতে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার পর শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারে তাঁর অনীহা, কারণ মানুষই হোক আর দেশই হোক, সীমাহীন লোভের বশবর্তী হলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে জোর করে দখল করার প্রচেষ্টা এবং যুদ্ধ। ইংলন্ডের সম্পদই তার নৈতিক অধোগতির কারণ। গান্ধীর মতই তিনিও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিচিত্র রূপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহিত হননি। জীবনীকাররা তাঁর ইউরোপীয় সাহিত্য—বিশেষত গ্যেটে-প্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্য শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর একটি বই লেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সুবিশাল রচনাবলীর মধ্যে তাঁর পাশ্চাত্য সাহিত্যপ্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায় না। হয়ত নৈতিক উদ্দেশ্য, ধর্মীয় আদর্শ এবং ইতিহাসের গতির পারস্পরিক যোগসাজসেই যে সমাজের বিবর্তন হয় এবং তার রীতিনীতি গড়ে ওঠে, তাঁর এই প্রিয় তত্ত্বই তিনি পরিকল্পিত পাশ্চাত্য শিল্পকলা বিষয়ক বইটিতে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য জীবন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের বাঁধুনি যেমন দৃঢ় তেমনি তা তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। প্রতিটি যুক্তির সঙ্গে উদাহরণ দিয়েছেন এবং পাশ্চাত্যে জীবনকে তিনি একছাঁচে ফেলা বৈচিত্র্যহীন, বৈশিষ্ট্যহীন ঘটনাবলীর সমাবেশ বলে দেখেননি। স্থান-কালের পরিবর্তনে যে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে তা তিনি সযত্নে লক্ষ করেছেন। কিন্তু এইসব চর্চার লক্ষ্য একটিই, তা হল ঐতিহ্যগত নৈতিক আদর্শকে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তে পরিণত করা। ভারতীয়রা যেন ব্যবহারিক-দক্ষতা ব্যতীত আর কিছুই ইউরোপীয়দের থেকে না গ্রহণ করে, দেশবাসীকে তিনি এই উপদেশ দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য দর্শন এবং সংস্কৃতি বিষয়ে নিজের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যকে কাজে লাগিয়ে এই উপদেশকে যুক্তিসিদ্ধ করেছিলেন। সংক্ষেপে, বক্তব্যের ব্যাপ্তি এবং উপকরণের প্রাচুর্য সত্ত্বেও তাঁর অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য খুবই সীমিত এবং তাও আবার পূর্বনির্দিষ্ট অনুমান নির্ভর।

ভূদেবের থেকে আলাদা বঙ্কিম ছিলেন সর্বোপরি একজন শিল্পী এবং উপন্যাস রচনার শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন পাশ্চাত্য শৈলী থেকে। ইউরোপের সাহিত্য ও সমাজ-দর্শনে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের চিত্রশিল্প এবং ভাস্কর্যের প্রতি তিনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অনুভব করতেন এবং তা ভারতীয় শিল্পকলার চেয়ে উচ্চমানের বলে মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে আগেকার যুগে এবং পৃথিবীর অন্যত্র যেসব সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল তাদের সবার থেকে ইউরোপের বর্তমান কালের সভ্যতা তাঁর কাছে অনন্য উৎকর্ষ এবং কৃতিত্বের দাবি নিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল। সমকালীন ভারতের, বিশেষত তাঁর সমগোত্র বাঙালিদের অবক্ষয় এবং হীনমান সম্বন্ধেও তিনি স্থিরনিশ্চয় হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দুর্বলতা এবং সংস্কৃতির কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভারত উৎকর্ষের দাবি রাখতে পারে, অত্যন্ত সচেতনভাবে তিনি সেগুলি খুঁজে বার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। স্বাজাত্যাভিমান তাঁর মতে জাতীয় পুনর্জাগরণের অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ। হীনম্মন্যতা থেকে পরিত্রাণ না পেলে আত্মগৌরব জাগরিত হতে পারে না।

ভূদেবকে যদি ব্রাহ্মণ্য নিষ্ঠা এবং সংযমের প্রতীক বলা যায়, তবে বঙ্কিম ছিলেন সৃজনশীল শিল্পী তথা বুদ্ধিজীবী বাঙালির প্রতীক—আবেগপ্রবণ, দ্বন্দ্ববিহ্বল এবং যুক্তিবাদে অনুপ্রাণিত যদিও তাঁর আবেগপ্রবণ চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্তি সব সময়ে খাপ খেত না। তাঁর দেশাত্মবোধের অনেকটাই ছিল আবেগমিশ্রিত এবং রাজনৈতিক পরাধীনতার কারণে অপমানবোধের মধ্যেও কিছুটা ছিল ব্যক্তিগত। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক অপ্রীতিকর হওয়াটাই স্বাভাবিক, তবু, নানাভাবে অপমানিত হয়ে আত্মগর্বী এবং আবেগপ্রবণ বঙ্কিম মর্মাহত হয়েছিলেন। মাঝে মাঝেই তাই পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁর ভালবাসার জোয়ারে বিদেশ-বিদ্বেষের ভাটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টান দেখা যায়। তবুও, জানবার ইচ্ছাই তাঁর পাশ্চাত্য জীবনধারা বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্য। সমসাময়িক অক্ষয় দত্তের মত তিনিও উদার-মানবিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং যুক্তি দিয়ে বোঝবার ইচ্ছা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মানসিকতাকে ইউরোপের উন্নতির মূল বলে মনে করতেন। কিছুটা বাংলার কৃষককুলের দুর্দশা চাক্ষুষ করায় এবং কিছুটা পাশ্চাত্য সমাজ-দর্শন পঠনের ফলে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর এক আবেগভিত্তিক বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। তবে পাশ্চাত্য দর্শনের শ্রেণীবৈষম্যের ধারণা থেকেই তাঁর ভাবনার জাল বিস্তৃত হয়েছিল। কালক্রমে হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে তিনি একটি জীবন-দর্শন এবং জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কার করেছিলেন এবং তাই তাঁর কাছে জাতির আত্মমর্যাদা এবং পুনর্জাগরণের ভিত্তি হতে পারে বলে মনে হয়েছিল। শেষের দিকের উপন্যাসগুলিতে এই আদর্শের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। 'আনন্দমঠ'-এ স্বাধীনতার জন্য কল্পিত যুদ্ধও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত। এর মধ্যে তিনি হীনম্মন্যতা থেকে মুক্তির পথ পেয়েছিলেন। তাঁর সমকালীনদের মতে বেন্থাম, মিল, কোঁৎ এবং ম্যাথু আর্নল্ডের উপর নির্ভর করে তিনি এই আদর্শকে রূপ দিয়েছিলেন। যদিও বঙ্কিম বলতে চেয়েছেন যে ঐ সব উপাদান তিনি ধার করেননি, সেগুলি নেহাতই সাদৃশ্যমূলক (যেসব দার্শনিকের থেকে তিনি ধার করেছিলেন, তারা তাঁর মতে 'ইউরোপীয় হিন্দু' বৈ কিছুই নন)। আবার এও বলেছেন যে, প্রাচীন হিন্দুদের উপলব্ধ সত্যকেই ইউরোপীয়রা দীর্ঘকাল পরে অস্পষ্টভাবে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। এইসব বক্তব্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টা তাতে সে যুগের সমাজজীবনের একটি প্রবণতা বিধৃত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির উপযুক্ত একটি জীবন-দর্শন খুঁজে বের করার গঠনমূলক উদ্দেশ্যও ছিল, যে উদ্দেশ্য জাতীয়তাবাদের আদিপর্বে সকলের মনকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তবে এটাও ঠিক যে একটি সুপরিব্যপ্ত জীবনদর্শনের অনুসন্ধান থেকে ভারতের জাতীয়তাবাদীরা কোনো সময়েই বিরত হননি।

AMARBOI.COM

উদার মানবিকতাবাদী বঙ্কিম অনায়াসেই পাশ্চাত্য মূল্যবোধের সংমিশ্রণে জাতির জন্য এক নৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনচর্যা গড়ে তুলেছিলেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঋণ যে তিনি স্বীকার করতে চাননি তার কারণ ঔপনিবেশিক 'এলিট'-এর সহজাত হীনম্মন্যতা। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব এবং নিষ্কাম কর্মের আদর্শে যে চিন্তা-ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে তা শুধুই সর্বসাধারণের জন্য বলে মনে হয় না। প্রায় বাল্যকাল থেকেই জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভাবনা এবং একটি জীবনদর্শনের আগ্রহ যে তাঁকে ক্লিষ্ট করত সে কথা বঙ্কিম একটি উপদেশাত্মক রচনায় প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। ঔপনিবেশিক-পূর্ব যুগে তাঁর পূর্বপুরুষদের মনে এই ধরনের প্রশ্ন কোনোদিনই জাগেনি। ব্যক্তিবিশেষের মনে এই প্রশ্নের উদয় হলে প্রচলিত জীবনধারার মধ্যেই তার উত্তর পাওয়া যেত। এ ব্যাপারে ভূদেবকে উদাহরণ বলা যেতে পারে, কিন্তু তিনি যে পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ করে চলতেন এরকম মনে করবার কোনও কারণ নেই। পাশ্চাত্য ধরনে যুক্তিবাদী চিন্তার মুখোমুখি হয়ে তাঁর যে সাময়িক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল, পিতার পথনির্দেশে তা অচিরেই শান্ত হয়েছিল। অকালপক্ক বালক বঙ্কিম বোধহয় কোনও কিছুরই অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধ সম্বন্ধে তাঁর কোনও ধারণাই ছিল না এবং পিতার কাছ থেকেও তিনি প্রায় কোনও নির্দেশই পাননি। যৌবনের উচ্ছ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর মনে একরকমের অপরাধবোধ সৃষ্টি করেছিল। অল্পবয়সে যুক্তিবাদী দর্শনে বিশ্বাসের ফলে তিনি প্রচলিত রীতিনীতি ও বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করতে শিখেছিলেন। আবার যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর অতি উচ্চধারণা ছিল, তার প্রতিভূ রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জাতিগুলিকে তিনি যে শুধু অপছন্দ করতেন তা নয়, তাদের তিনি ঘৃণা করতে শুরু করেছিলেন। এই কারণেই মহাভারত এবং গীতার মধ্যে দুঃসাধ্য অনুসন্ধান চালিয়ে তিনি এমন একটি জীবনদর্শন আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন যা তাঁকে উদ্বেগমুক্ত করবে, আবার স্বাজাত্যাভিমানও তৃপ্ত করবে। কিন্তু পাশ্চাত্য মূল্যবোধ তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছিল। এবং তাঁর সমন্বয়িত জীবনাদর্শ থেকে কোনোমতেই তিনি সেই বিজাতীয় আত্মাকে বহিষ্কার করতে পারেননি।

অনুভবনশীল শিল্পী ও ব্যক্তিরূপে তিনি জীবনকে গভীরভাবে ভালবাসতেন এবং অনাবিল আনন্দের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের রসাস্বাদন করতেন। সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে যে বিদেশী সাহিত্যের তুলনা তিনি করেছেন, তা তাঁর সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার পরিধি গভীর এবং বিস্তৃত করবার প্রচেষ্টা, হীনম্মন্যতার পরিপূরণ নয়। তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের পরিকল্পনা ছিল। পরিকল্পনা কার্যকরী হলে পাশ্চাত্য দেশে তিনি কোনও নৈতিক উপকরণ পেতেন কি না সন্দেহ। বয়োজ্যেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন দত্তের মত বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পী হিসাবে পাশ্চাত্যের মানবিকতাবাদের সঙ্গে তাঁর যে একাত্মবোধ, শতাব্দীর প্রথম কয় দশকেই সেই বোধের সূত্রপাত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সম্পর্কের অবধারিত পরিণতি যে অসন্তোষ এবং হীনম্মন্যতা, এই বোধ তার উপর কিছুটা প্রলেপ দিয়েছিল। পাশ্চাত্যের মানবিকতাবাদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এমন এক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল, যাকে দুই বিপরীতধর্মী সংস্কৃতির নানা সংঘাত কালিমালিপ্ত করতে পারেনি। তার ফলেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জ্ঞান এবং শিল্পসম্ভার এবং জীবনধারার উৎকর্ষ এবং বিচিত্র দিকগুলি নিয়ে এক ধরনের আগ্রহ থেকেই গিয়েছিল।

আমাদের তৃতীয় চরিত্র বিবেকানন্দ ছিলেন পাশ্চাত্যধারায় শিক্ষিত হিন্দু সন্ন্যাসী; একজন প্রায় নিরক্ষর সাধুপুরুষকে তিনি গুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বরের সন্ধানে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে তিনি ভারত পরিভ্রমণ করে দেশের দারিদ্র্যের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর অল্পবয়সের মধ্যবিত্তসুলভ দেশপ্রেম অতীন্দ্রিয়বাদের আকর্ষণে চাপা পড়ে গিয়েছিল, ভারতের জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে সচেতন করে আত্মমর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় সঙ্কল্পের মধ্যে তা আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিয়েছিল। এই নবোদ্দেশ্য সাধনের উপকরণ সংগ্রহের জন্যই তিনি পশ্চিমদেশে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর মনে নতুন নতুন আগ্রহ জেগেছিল, যেমন, মানবজাতির মুক্তিসাধন এবং সেই পথ পরিক্রমায় ভারতকে জগদ্‌গুরুর উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্যের কাছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য তিনি মার্কিন দেশে যাননি। ছাত্র হিসাবে তিনি পাশ্চাত্য দর্শন যা কিছু শিখেছিলেন, ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদে দীক্ষাগ্রহণের পর তা একেবারেই তুচ্ছ মনে হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে যুবক সন্ন্যাসীর দল আরও অনেক কিছুর সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম এবং ইউরোপের ইতিহাস পড়েছিল, এমনকি তারা মন্ত্রের মত 'Vive la republique'ও গাইত। বাঙালি বুদ্ধিজীবী মানসিকতায় লৌকিক সাহিত্য পঠনের আগ্রহ চিরন্তন, বরং সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক মোক্ষলাভের সঙ্গেই তার সম্পর্ক নেই। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দর গণজাগরণের পরিকল্পনার কেন্দ্রে ছিল এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা যার মাধ্যমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরক্ষর জনসাধারণ পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে কিছু ধারণা লাভ করবে। তাঁর ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের আবিষ্কারও যেমন আকস্মিক, সাফল্যও তেমনি অভাবিত। নিজের চারিত্রিক উচ্ছ্বাস দিয়েই তিনি তাকে বরণ করে নিয়েছিলেন—যা কিছু দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন, তা উপভোগ করেছিলেন, পরমানন্দে উল্লসিত হয়েছিলেন। এই অভিজ্ঞতার প্রভাবে এক অসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভা বিকশিত হয়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যের কয়েকটি অনবদ্য সৃষ্টি সম্ভব করেছিল। এক অসাধারণ প্রাণবন্ত পুরুষের বিচিত্র মনোভাব সেগুলির মধ্যে বিধৃত হয়েছে, জীবন সম্বন্ধে যাঁর আগ্রহ ছিল কিন্তু জীবনের জন্য তিনি বুভুক্ষু ছিলেন না। শুধুমাত্র দেশের মঙ্গলের চিন্তায় তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদের মাধ্যমে মোক্ষলাভের ঐকান্তিক আগ্রহ ব্যাহত হয়েছিল। ব্যক্তিগত সব আশা-আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে ছিলেন তিনি, দৈহিক কামনা-বাসনাও তিনি জয় করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর বক্তব্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার অভাব নেই। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র মনোভাব জাতিবিদ্বেষের রূপ নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিতে তিনি বারংবার ভারতের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রেখেছেন এবং ভারতের অযৌক্তিক প্রথাগুলির উল্লেখ এড়িয়ে গেছেন। ইতিহাসে খ্রিস্টধর্মের ভূমিকা এবং খ্রিস্টিয় ধর্মপ্রচারকদের সম্বন্ধে তাঁর নির্ভীক সমালোচনা তাঁর ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী মনোভাবের প্রকাশ। এগুলিই আবার ধর্মের ব্যাপারে এশিয়া, বিশেষত ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের দাবির ভিত্তি।

পাশ্চাত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় তিনি একটি নতুন জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন, যদিও সেটির আবিষ্কার তাঁর পাশ্চাত্য ভ্রমণের উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল না; তা হল ইউরো-মার্কিন সংস্কৃতির প্রাণোচ্ছলতা, সংস্কৃত ভাষার সাংস্কৃতিক শব্দভাণ্ডার থেকে 'রজস্' শব্দ দিয়ে তিনি তার অনুবাদ করেছেন। পাশ্চাত্যের ভক্তদের কাছে তিনি বলেছিলেন যে বৈরাগ্যের মনোভাবই মুক্তির পথ। নিজের দেশবাসীকে তিনি সব প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে পাশ্চাত্যবাসীদের মত রজোগুণ আয়ত্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সাধারণভাবে যেসব উপদেশ দেওয়া হত যেমন, ধীরে ধীরে পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিবিদ্যা শিখে নেওয়া, কিংবা তাদের মত সামাজিক দক্ষতা অর্জন করা, অথবা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মূল্যবোধের সমন্বয় করে তাকে নির্ভেজাল ভারতীয় বলে চালানো—বিবেকানন্দর উপদেশাবলী এ সব কিছুর থেকে একেবারেই আলাদা। অবশ্য দুই সংস্কৃতির মৌলিক প্রবণতাগুলিকে তিনিও বিশ্লেষণ করেছিলেন, এবং যে সরল সরসতার সঙ্গে সেই দ্বৈধ ব্যাখ্যা করেছেন, তা এখনও ঐ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলে পরিগণিত হতে পারে। দুই সংস্কৃতির স্বকীয়তাগুলিকে তিনি আবার দেহ ও আত্মার প্রতি অভিনিবেশ,—যথাক্রমে ঐহিকতা বা হিতবাদ এবং আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই তুলনার মধ্যে দুটি বিপরীত মনোভাব জড়িত আছে। পাশ্চাত্যের হিতবাদের বিপরীতে প্রাচ্য তথা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে তুলে ধরার মধ্যে সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে ঐ উদাহরণ তিনি সমসাময়িক ভারতের প্রসঙ্গে ব্যবহার করেননি।...সুদীর্ঘ সংশয়ের মধ্য দিয়ে পথ পরিক্রমার পর বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর জীবন এবং উপদেশাবলীর মধ্যে ভারতের আধ্যাত্মিকতার মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর কাছে আধ্যাত্মিকতাই মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ পরিণতি এবং পাশ্চাত্যের প্রচলিত ভাবধারায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তুলনীয় কিছুই পাননি। বরং পাশ্চাত্যে তিনি দেখেছিলেন শক্তিপ্রবাহ ঐহিক সুখের সন্ধানে নিয়োজিত, ভারতে যার কোনও তুলনা নেই। ইউরোপের উন্নত সভ্যতার উৎকর্ষের প্রশংসা তো তিনি করেই ছিলেন, এমনকি, মানবসভ্যতার বিবর্তনের চরম পরিণতি যে সত্ত্বগুণ বা আধ্যাত্মিকতা, পাশ্চাত্যের প্রাণশক্তিতে তিনি সেই সত্ত্বগুণ লাভের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিকতাও খুঁজে পেয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর রচনায় যে দ্বৈত মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে, একটি পর্যায়ে তা তাঁর অভিজ্ঞতার তাত্ত্বিক উপস্থাপন মাত্র, তাকে ঠিক সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি বলা চলে না। এই প্রসঙ্গে তাঁর লেখা পারি নগরীর আনন্দোচ্ছল বিবরণ মনে রাখতে হবে। সেখানকার অবৈধ আনন্দের প্রকাশও তাঁর কাছে কদর পেয়েছে—সে যেন নৃত্যরত ময়ূরের মতই সুন্দর।

ঊনবিংশ শতকের বাঙালি মানসিকতা যাঁদের চিন্তাধারার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল, আবার সে যুগের মানসিকতার প্রধান প্রবণতাগুলি যাঁদের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে, এমন তিনজন চিন্তানায়কের ধ্যান-ধারণাই এই গ্রন্থের আলোচ্য। ঔপনিবেশিক পটভূমিকায় কিছু না কিছু আঘাত অল্পবিস্তর প্রায় সবাইকেই সইতে হত, আমি দেখাতে চেয়েছি যে তাঁদের অনুভূতিতে সে আঘাত গভীর দাগ কেটেছিল। ঐ অনুভূতি থেকেই সে যুগের উচ্চবর্গীয়দের মধ্যে ইউরোপের ক্ষমতার উৎকর্ষ এবং নৈতিকতার অপকর্ষ সম্বন্ধে যেন একটা ছাঁচে ঢালা আদর্শ সৃষ্ট হয়েছিল। আমাদের আলোচ্য লেখকগণও সেই ছাঁচকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু তাঁরা একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে এবং আলাদা আলাদা বিষয়ের উপর জোর দিয়ে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া কোনও সহজ-সরল ছাঁচের অন্তর্ভুক্ত নয় এমনও অনেক কিছু তাঁরা বলেছেন। দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতবাদের সপক্ষে যুক্তিজালের পার্থক্য তাঁদের ব্যক্তিত্ব এবং জীবনধারণের অভিজ্ঞতার যে বৈচিত্র্য নির্দেশ করে, ঔপনিবেশিক বা তৎপূর্ব যুগের ভারত বিষয়ক সাহিত্যে বাস্তব ইতিহাসের সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটের যথাযথ আলোচনা হয়নি। অসামূহিক দৃষ্টিভঙ্গিই যে ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণের একমেবাদ্বিতীয়ম্ পথ—সেই মতের পক্ষে, অথবা, যে বিশ্লেষণী কাঠামোর একটা সাধারণ তাৎপর্য আছে তাকে অস্বীকার করার তর্কে আমি নামছি না। শুধু এটুকু বলতে চাই যে, ব্যক্তির প্রেক্ষিতে যে আলোচনা সেখানে অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত পার্থক্য অতীতের এমন সব সত্য উদ্ভাসিত করতে পারে, প্রবণতা এবং সামাজিক শ্রেণীগত বিচার যেখানে পৌঁছতেই পারে না। তাছাড়া, ঐসব বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়েই মিথস্ক্রিয়ার জটিলতা উন্মোচিত হয়, বিভিন্ন সংস্কৃতির যোগাযোগের ফলে, এমনকি ঔপনিবেশিক শাসনের পটভূমিকায় যে ভিন্নতর প্রতিক্রিয়া এবং মানসিকতা সৃষ্ট হতে পারে, তারও ধারণা পাওয়া যায়। সবচেয়ে স্পষ্ট এবং সবচেয়ে কম ব্যবহৃত উদাহরণটি নিয়েই বলা যায় যে প্রভুত্বাসীন জাতির সংস্কৃতির প্রতি উপনিবেশের এলিটদের মনে একইরকম প্রতিক্রিয়া হয়নি। ভূদেব স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই মূল্যবোধের প্রায় সবটুকুই বর্জন করেছিলেন এবং অন্যদের কাছেও সেইরকমই আশা করেছিলেন। বিবেকানন্দ উন্নতির সোপানরূপে সাময়িকভাবে ঐ আদর্শ অনুসরণ করার কথা বলেছিলেন বটে, কিন্তু তা ছিল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিপরীতধর্মী রীতিনীতি এবং মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে। ইউরো-মার্কিন ভাবধারায় সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যই নেই।

যেসব মানসিকতা এখানে আলোচিত হল তাদের প্রতীক না বলে স্রষ্টা বলাই উচিত। এগুলির মধ্যে সুসংহত হয়ে আছে সমসাময়িক ভাবনার বিভিন্ন ধারা, যা হয় চলতি ছিল, না হয় আমাদের আলোচ্য লেখকগণ অথবা অন্যান্য সমাজনেতাদের দ্বারা এলিট সংস্কৃতির শব্দভাণ্ডারে সংযোজিত হয়েছিল। এইসব অনুভূতিই জাতীয়তাবাদী চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নিছক আদর্শবাদী উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয় তখনকার এমন সব ভাবনা-চিন্তার মধ্যেও মিশেছিল এই উপলব্ধি। এখানে এমন অনেক বক্তব্য আলোচিত হয়েছে যেগুলি কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞের বৈদগ্ধজাত বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক কৌতূহল-প্রণোদিত জিজ্ঞাসার উত্তর। আদর্শবাদের ব্যাপ্তি তো রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে সুদূর-প্রসারিত। মূল্যবোধ, জগৎ-সমীক্ষা এবং পার্থিব প্রসঙ্গে যে অনুক্ত মূল্যবোধ আচরণের ঔচিত্য এবং সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে বিধৃত থাকে, সে সব কিছুই আদর্শবাদের কাঠামোয় সম্পৃক্ত। জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই প্রায় পাশ্চাত্যরীতি অসঙ্গত বলে মনে হয়নি। অবশ্য তা পুরোপুরি, বা অংশত, অনুসরণ করা যেতেও পারে, নাও যেতে পারে। পাশ্চাত্যরীতির মূল্যায়ন প্রধানত হয়েছে এইভাবে যে, সম্পূর্ণ আলাদা একটি ভাবধারা, তার প্রশংসা করা চলে; সমালোচনাও, কিন্তু কোনোমতেই জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করা চলে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টীকা

পশ্চাদপট

১। শতাব্দীর প্রথম দশকে জনসাধারণের দাবির প্রেক্ষিতে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য : George Smith, The life of Alexander Duff, 1, 96; N. K. Sinha, ed, The History of Bengal (1757-1905), Calcutta, 1968, গ্রন্থে R.C. Majumdar, Education প্রবন্ধে উদ্ধৃত।
১৮১৯ সালের মধ্যে বাংলায় বিশপস্ কলেজ সহ চারটি কলেজ স্থাপিত হয়েছিল যেখানে অল্প কয়েকজন অখ্রিস্টান ছাত্র প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। ১৮৩৫ সালে স্কুল বুক সোসাইটির বই বিক্রির ক্ষেত্রে একটি বাংলা বইয়ের অনুপাতে দুটি ইংরেজি বই বিক্রী হওয়ার ঘটনায় ইংরাজির জনপ্রিয়তার আন্দাজ পাওয়া যায়। মজুমদার, পূর্বোল্লেখ, ৪৩৬।

২। মিশনারীদের মনোভাব একটি বাক্যাংশে বিধৃত হয়েছে : "The monster of Hinduism, the enemy of both God and man." দ্রষ্টব্য : G. Gogerly, The Pioneers: A Narrative of Facts connected with the Early Christian Missions in Bengal, London, n. d. 5; Weitbrecht, Missionary Sketches in North India, London, 1858; K. A. Ballhatchet, 'Some Aspects of Historical Writings on India by Protestant Christian Missionaries during the Nineteenth and Twentieth Centuries' in C. H. Philips, ed. Historians of India, Pakistan and Ceylon, 344 ff; and M. A. Sherring, The History of Protestant Missions in India, London, 1844, 96.

৩। দ্রষ্টব্য : শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলকাতা, ১৯০৩, ১১২—

৪। রাজনারায়ণ বসু, আত্মজীবনী, কলকাতা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ (১৯০৮), ৮৬—

৫। জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : পার্থ চট্টোপাধ্যায়, Nationalist Thought and The Colonial World: A Derivative Discourse? Delhi, 1986, Chap. 1

৬। বিপিনচন্দ্র পাল, তর্কচূড়ামণির আদর্শের অপরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে তাঁর ধর্মব্যাখ্যা গ্রন্থে, কলকাতা, ১৮৮৪।

৭। রাজনারায়ণ বসু, আত্মজীবনী, ১১৬-৭।

৮। অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৬৮, লিখেছিল প্রতি ক্ষেত্রে ইংরেজদের অত্যাচার প্রতিহত করতে বাঙালিরা বদ্ধপরিকর। দ্রষ্টব্য : R.C. Majumdar, The National Movement (1833-1905), in N.K. Sinha ed পূর্বোল্লেখ, ২০৬।

৯। পূর্বোল্লেখ, ৮৩। তারিখটিতে বোধহয় ভুল ছিল, বোধহয় এটি আরও কিছুদিন পরের ঘটনা।

১০। রাজনারায়ণ বসু, বৃদ্ধ হিন্দুর আশা। কলকাতা, ১৮৮৭।

১১। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, A Nation in Making Being the Reminiscences of Fifty years of Public Life, Oxford University Press, 1925, Ch. V.

১২। উদ্ধৃতি, বিমানবিহারী মজুমদার, History of Political Thought from Rammohan to Dayananda, কলকাতা, ১৯৩৪, ৯১। The Philosophical Radicals শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি বাংলার প্রথম দিকের উগ্র মতগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

১৩। ঐ, উদ্ধৃতি, ১৫৩।

১৪। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতামত সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য বিমানবিহারী মজুমদার, পূর্বোল্লেখ, ২-৬ অধ্যায় এবং সেখানে উল্লিখিত অন্যান্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৫। ঐ, ২৭৬-৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬। দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী, The Present State of the East India Company's Crimical Judicature and Police under the Bengal Presidency, The Bengal Harkaru, 18 February, 1843.
১৭। রাজনারায়ণ বসু, আত্মজীবনী, ৩০।
১৮। The Bengal Harkaru, 24 April, 1843.
১৯। রামদাস শর্মা (ইন্দ্রনাথের ছদ্মনাম, এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত), ভারত উদ্ধার কাব্য, কলকাতা, ১৮৭৭।
২০। Indian Education Commission, 1882, Report, 269; R.C. Majumdar, 'Education' in N. K. Sinha, পূর্বোল্লেখ, ৪৪৬-৫০।
২১। বিমানবিহারী মজুমদার, পূর্বোল্লেখ, ৩২৩-৪, পাদটীকা।
২২। দ্রষ্টব্য : দ্বিতীয় অধ্যায়।
২৩। বিমানবিহারী মজুমদার, পূর্বোল্লেখ ১০৫-৬, পাদটীকা, ১১৮।
২৪। উদ্ধৃতি, সমাচার দর্পণ, ৫ জুন, ১৮৩০।
২৫। লেখকের জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার রচনার থেকে উদ্ধৃতি, India Gazette, 12 April, 1833.
২৬। দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী, পূর্বোল্লেখ।
২৭। অক্ষয় কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, কলকাতা, ২, মুখবন্ধ।
২৮। কিশোরীচাঁদ মিত্র, Memoirs of Dwarakanath Tagore, পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ১৮৭০, ৩৯।
২৯। উদ্ধৃতি, বিমানবিহারী মজুমদার, পূর্বোল্লেখ, ১১৩।
৩০। দ্রষ্টব্য R.C. Majumdar in N. K. Sinha, ed., পূর্বোল্লেখ, ২০৬।
৩১। উদ্ধৃতি, ঐ।
৩২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলকাতা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ২০১-২।
৩৩। দ্রষ্টব্য : তৃতীয় অধ্যায়।
৩৪। উদ্ধৃতি, বিমানবিহারী মজুমদার, পূর্বোল্লেখ, ১২৭।
৩৫। The India Gazette, 17 February, 1833.
৩৬। The Bengal Spectator, September, 1842, 88.
৩৭। দ্রষ্টব্য : অক্ষয় কুমার দত্ত, ধর্মনীতি, কলকাতা, ১ম অধ্যায়।
৩৮। বিমানবিহারী মজুমদার, পূর্বোল্লেখ, ২৪৫।
৩৯। G.H. Forbes, Positivism in Bengal: A Case-study in the Transmission and Assimilation of Ideology, Calcutta, 1975.

AMARBOI.COM

ভূদেব মখোপাধ্যায়

১। উৎসর্গ, পুষ্পাঞ্জলি (প্রথম প্রকাশ, ১৮৭৬), ভূদেব রচনা সম্ভার (প্রমথনাথ বিশী কৃত ভূমিকাসহ), কলকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ (১৯৬২)। ভূদেবের রচনা থেকে উদ্ধৃতিগুলি প্রধানত এই সংস্করণ থেকে ব্যবহৃত হয়েছে, ক্ষেত্রান্তরে তা উল্লেখ করা হয়েছে।
২। ভূদেব জীবনী, মুদ্রণ ও প্রকাশনা কাশীনাথ ভট্টাচার্য, ১ম সংস্করণ, চুঁচুড়া, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ (১৯১১), ৬-৭।
৩। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, ভূদেব চরিত, তিন খণ্ড কলকাতা ১৩২৪-৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯১৭-২৭), ১ম খণ্ড, ১২-১৩।
৪। ঐ, ২৫।
৫। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব, হুগলি, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ (১৮৮১), ৩০ ; ভূদেব চরিত, ৩য় খণ্ড, ১৮৭।
৬। ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ১১০।
৭। ঐ, ৫১।
৮। ঐ, ৯৪।
৯। ঐ, ৫৪।
১০। ঐ, ৯৭-১০০, ১০৬।
১১। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পারিবারিক প্রবন্ধ (এডুকেশন গেজেট, ১৮৭৫-৬-এ প্রথম প্রকাশ ;) ১১শ সংস্করণ, চুঁচুড়া, ১৯৩৯, ১০২-৩ ; সামাজিক প্রবন্ধ (প্রথম প্রকাশ ধারাবাহিকভাবে এডুকেশন গেজেটে, ১৮৮৭-৯), ৫০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২। পারিবারিক প্রবন্ধ, পিতামহ অধ্যায় ; ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ৭-৮।
১৩। পারিবারিক প্রবন্ধ, ১-৫ ; ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড ৮, ১১০, ১৭৬ ; ৩য় খণ্ড ৯২।
১৪। পারিবারিক প্রবন্ধ, উৎসর্গপত্র ; ১০২-৩, ১৪৯ ; কোঁৎ-এর মতবাদ উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির একবারই মাত্র বিবাহ করা উচিত ; ঐ, ১৪৯।
১৫। ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ১০৬।
১৬। রাজনারায়ণ বসু, আত্মজীবনী, ৪৭।
১৭। ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ১৪৮।
১৮। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ১৮৩-৪।
১৯। ঐ, ১৭৮।
২০। ঐ, ১৮১।
২১। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, হাসির গান ; রাজনারায়ণ বসু, সেকাল আর একাল, পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, কলকাতা ১৮০০ শকাব্দ (১৮৭৮), ৬০-১।
২২। রাজনারায়ণ বসু, আত্মজীবনী, ১৯১।
২৩। রাজনারায়ণ বসু, সেকাল আর একাল, ৩২-৬২।
২৪। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ নেশন ইন মেকিং, লন্ডন, ১৯২৫, ৮ম অধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, বৃদ্ধ হিন্দুর আশা, ২।
২৫। সুনীতিরঞ্জন রায়চৌধুরী, উনিশ শতকে নব্যহিন্দু আন্দোলনের কয়েকজন নায়ক, কলকাতা, ১৯৮৩, ২৮-৯।
২৬। ঐ, ২৩।
২৭। হিন্দু পত্রিকায় প্রেরিত পত্র, ১৮৯৩।
২৮। সুনীতি রায়চৌধুরী, পূর্বোল্লেখ, ৬১।
২৯। ঐ, ৫৪।
৩০। যোগীন্দ্রনাথ বসু, মডেল ভগিনী, ব্রাহ্মদের অনৈতিক জীবনের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ এই বইটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।
৩১। শশধর তর্কচূড়ামণি, ধর্মব্যাখ্যা।
৩২। ঐ।
৩৩। রাজনারায়ণ বসু, বৃদ্ধ হিন্দুর আশা, ২, ২০।
৩৪। হিন্দু পুনরভ্যুত্থান, ২০, ২১।
৩৫। ভূদেব চরিত, ২য় খণ্ড, ৩৯০-১।
৩৬। ঐ, ৪৪৫।
৩৭। ঐ, ৩৩৮-৯।
৩৮। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ, ১৭৭।
৩৯। ঐ, ২য় খণ্ড, ৯৫।
৪০। রাজনারায়ণ বসু, আত্মজীবনী, ৮৮।
৪১। বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ১৫২।
৪২। সামাজিক প্রবন্ধ, ৬৬।
৪৩। বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ব্রাহ্মধর্ম ও তন্ত্রশাস্ত্র, ১৫২।
৪৪। সামাজিক প্রবন্ধ, ভূমিকা, উদ্ধৃতি : ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ৮৩।
৪৫। ২২ এপ্রিল, ১৮৯৪, দিনপঞ্জী থেকে উদ্ধৃতি, ভূদেব চরিত, ৩য় খণ্ড, ৪৪৯।
৪৬। বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, সমাজ সংস্কার, ৪২।
৪৭। ঐ, পরধর্ম গ্রহণ, ৯৮-৯।
৪৮। ঐ, ৯৬।
৪৯। ঐ, ব্রাহ্মধর্ম ও তন্ত্রশাস্ত্র, ১৫৩।
৫০। ঐ, সামাজিক পরিবর্তন, ৮৪।
৫১। ভূদেব চরিত, ৩য় খণ্ড, ৪৫৪।
৫২। বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, পারিবারিক নীতি, ১০০-৫।
৫৩। ঐ, বঙ্গসমাজে ইংরাজ পূজা, ১০৯-১০।
৫৪। ঐ, হিন্দু সমাজে বহুপত্নিকতা, ১০৫-৭।
৫৫। ঐ, ১০৮-৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৬। ঐ, স্বাধীন চিন্তা, ১২৮-৯ ; ভূদেব চরিত, ২য় খণ্ড, ১৭৪-৬।
৫৭। বিবিধ প্রবন্ধ, ১২৯।
৫৮। ঐ, ১২৬-৯।
৫৯। ঐ, সমাজ সংস্কার, ১৪২।
৬০। পুষ্পাঞ্জলি, ৮৯।
৬১। বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, অধিকারভেদ ও স্বদেশানুরাগ, ২৪৭-৮।
৬২। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, উনবিংশ পুরাণ।
৬৩। ভূদেব চরিত, ২য় খণ্ড, ৮৫।
৬৪। ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১, দিনপঞ্জী থেকে উদ্ধৃতি, ঐ, ২৭১।
৬৫। ঐ, ২৬৮।
৬৬। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আচার প্রবন্ধ, উৎসর্গপত্র, ১।
৬৭। ঐ, ২-৩, ৫, ৯।
৬৮। ঐ, ২।
৬৯। হিন্দু সমাজে ধর্মনীতি, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ১০০।
৭০। ঈর্ষা প্রবণতা, ঐ, ১১৪-৫।
৭১। পুষ্পাঞ্জলি, ৪১৫।
৭২। ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ১৪৩।
৭৩। শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব, স্বয়ম্বরাভাব পর্ব, ৪।
৭৪। রাজনারায়ণ বসু, আত্মজীবনী, ৪২।
৭৫। শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্বোল্লেখ, ২, ৩৭-৩৮।
৭৬। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, ৩৫১-২।
৭৭। ঐ, ৪২২।
৭৮। রাজনারায়ণ বসু, আত্মজীবনী, ৪০-১ ; স্বামী বিবেকানন্দ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।
৭৯। সামাজিক প্রবন্ধ, ১৩।
৮০। বাংলার ইতিহাস, ২৫৪।
৮১। তৃতীয় পুত্রকে লেখা পত্র, ২ জানুয়ারি, ১৮৮৭, ভূদেব চরিত, ৩য় খণ্ড, ১২৩।
৮২। জাতিভেদ, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ৭৬।
৮৩। ভূদেব রচিত, ৩য় খণ্ড, [illegible]।
৮৪। ঐ, ১৮৯।
৮৫। ঐ।
৮৬। ঐ, ৩৭৯।
৮৭। ঐ, ৩৩৪।
৮৮। বাংলার ইতিহাস, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
৮৯। ৩১ জানুয়ারি, ১৮৭৯, দিনপঞ্জী থেকে উদ্ধৃতি, ভূদেব চরিত, ২য় খণ্ড, ১৮৬-৭।
৯০। ঐ, ১ম খণ্ড, ১৮৫।
৯১। ঐ, ১৮৫-৬।
৯২। পারিবারিক প্রবন্ধ, ১৩৬।
৯৩। ঐ, ১০২।
৯৪। ঐ, ১৭৩।
৯৫। বিপিনচন্দ্র পাল, চরিত কথা, ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ১৭৮-৯।
৯৬। ঐ, ২১৮।
৯৭। শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার থেকে উদ্ধৃতি, ঐ, ৩০০।
৯৮। সামাজিক প্রবন্ধ, ২৪৩।
৯৯। ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ৪১৯।
১০০। ঐ, ৩য় খণ্ড, ৫৮।
১০১। ঐ, ১ম খণ্ড, ১২৬-৭।
১০২। ঐ, ৩য় খণ্ড, ২৭০।
১০৩। শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব, ২২-৩।
১০৪। ভূদেব চরিত, ২য় খণ্ড, ৩৮৪।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০৫। তাঁর রচনার বিভিন্ন স্থানে এই মনোভাব সুস্পষ্ট।
১০৬। সামাজিক প্রবন্ধ, ২২৮।
১০৭। ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ১৮৭।
১০৮। ঐ, ৩১৫।
১০৯। ঐ, ৩১৬।
১১০। স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস, স্বয়ম্বরাভাষ পর্ব, অঙ্গুরীয় বিনিময় প্রভৃতি রচনা দ্রষ্টব্য।
১১১। ২৮ আগস্ট, ১৮৯২, দিনপঞ্জী থেকে উদ্ধৃতি, ভূদেব চরিত, ৩য় খণ্ড, ৩৪৮।
১১২। ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ৩১-৫।
১১৩। ঐ, ৩৮।
১১৪। ঐ, ৬০-১।
১১৫। ঐ, ৭২-৩।
১১৬। ঐ, ১১৪-৫।
১১৭। ঐ, ১০৮-৯।
১১৮। ঐ, ১৫৮-৬৮।
১১৯। ঐ, ৩৮৩-৫।
১২০। সামাজিক প্রবন্ধ, ৭০।
১২১। ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ২৩০।
১২২। ঐ, ২২২।
১২৩। ঐ, ২৩৪ ও পরবর্তী।
১২৪। পরধর্মগ্রহণ, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ৯৬।
১২৫। রাজনারায়ণ বসু, আত্মজীবনী, ২১৮।
১২৬। ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ২৪০ ও পরবর্তী।
১২৭। ঐ, ৩য় খণ্ড, ৬১।
১২৮। ঐ, ৩য় খণ্ড, ৯৬।
১২৯। হিন্দু সমাজে খাওয়া দাওয়া, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ৪২ ; দ্রষ্টব্য : স্বপ্নলব্ধ..., ৫৪।
১৩০। ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ২৬৩।
১৩১। ঐ, ২৬৪-৬।
১৩২। বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ৯৩।
১৩৩। ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ২৭০-১।
১৩৪। ঐ।
১৩৫। ঐ।
১৩৬। বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ৩১, ২৬৯।
১৩৭। ঐ, ২৬৮।
১৩৮। ঐ, ২৬৭।
১৩৯। ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ১০৩-৫।
১৪০। ঐ, ১৫৭।
১৪১। ঐ, ৩য় খণ্ড, ৮২।
১৪২। ঐ, ১ম খণ্ড, ১১৭।
১৪৩। ঐ, ১৬০।
১৪৪। ঐ, ১৪৮-৯।
১৪৫। ঐ, ২১৯-২০।
১৪৬। ঐ, ২য় খণ্ড, ২৪-৫।
১৪৭। ঐ, ২৬-৩১।
১৪৮। ঐ, ২, ১১৮-৯ ; ৩য় খণ্ড, ৩১১-১২।
১৪৯। ঐ, ৩১০-১২।
১৫০। ঐ, ২য় খণ্ড, ৫১।
১৫১। ঐ, ৩৭ ও পরবর্তী।
১৫২। বাংলার ইতিহাস, ৬২। ঐ আইনের উদ্দেশ্য ছিল মফঃস্বলের ইউরোপীয়দের স্থানীয় আদালতের এক্তিয়ারে আনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫৩। ভূদেব চরিত, ৩য় খণ্ড, ১২৪।
১৫৪। ঐ, ২য় খণ্ড, ১৯৭।
১৫৫। ঐ, ১৯৪।
১৫৬। ২৫ ডিসেম্বর, ১৮৭৬, দিনপঞ্জী থেকে উদ্ধৃতি : ঐ ১৩৭।
১৫৭। ঐ, ১৪০।
১৫৮। ঐ, ৩য় খণ্ড, ১৮৪।
১৫৯। ঐ, ২৭৮।
১৬০। ঐ, ১ম খণ্ড, ১৫৮-৯, ৩৩৯।
১৬১। ঐ, ১৪২।
১৬২। ঐ, ২২৮ পরবর্তী।
১৬৩। পারিবারিক প্রবন্ধ, নিয়মপত্যতা, ১২৪।
১৬৪। ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ৩১৭-১৮।
১৬৫। রাজসেবা, বিবিধ প্রবন্ধ।
১৬৬। ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ২৭০।
১৬৭। ঐ, ২৫৫।
১৬৮। পারিবারিক নীতি, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ১০৮।
১৬৯। ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৮, দিনপঞ্জী থেকে উদ্ধৃতি, ভূদেব চরিত, ২য় খণ্ড, ১৫৭।
১৭০। এশিয়াটিক সোসাইটির আলোচনাসভা, ১৮৯৩।
১৭১। এই গ্রন্থের মূল অংশে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাদটীকায় এইসব উপাদানের উল্লেখ আছে।
১৭২। আত্মজীবনী, ২০-২১, ২৫।
১৭৩। ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ১২৭।
১৭৪। ঐ, ৮৯।
১৭৫। ঐ, ৯৪, ১০৮।
১৭৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোল্লেখ, ২৬-৮।
১৭৭। ভূদেব চরিত, ২য় খণ্ড, ১০৮।
১৭৮। ঐ, ১৭৭।
১৭৯। ঐ, ১৮১-২।
১৮০। পুত্র মুকুন্দকে লেখা পত্র, ২৮, ৩, ১৮৮৬, ভূদেব চরিত, ৩য় খণ্ড, ২১৭-১৯।
১৮১। পুত্র মুকুন্দকে লেখা পত্র, ১৯, ১, ১৮৮৯, ঐ, ২৫৯-৬০।
১৮২। ঐ, ২১৮।
১৮৩। পুত্র মুকুন্দকে লেখা পত্র, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭, ঐ, ১৭৩।
১৮৪। ঐ, ২১৮।
১৮৫। ঐ, ৩৩৭-৮।
১৮৬। ঐ, ২য় খণ্ড, ১৯৫।
১৮৭। পণ্ডিত বীরেশ্বর পাণ্ডে, স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ১৩০১ বঙ্গাব্দ, ১৭৭-৮১ ; ভূদেব চরিত, ৩য় খণ্ড, ৪৫৬-৬৯।
১৮৮। সামাজিক প্রবন্ধ, ভূমিকা।
১৮৯। বাংলার ইতিহাস, ১৫৩।
১৯০। যোগেন্দ্রনাথ বসুকে লেখা পত্র, ১৭.৪.১৮৯৩, উদ্ধৃতি : যোগেন্দ্রনাথ বসু, The Life of Madhusudan Datta, ১৩০০ বঙ্গাব্দ (১৮৯৩), Appendix.
১৯১। সামাজিক প্রবন্ধ, ৬৮।
১৯২। লক্ষ্মীছাড়া দশা, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ১৩০-১।
১৯৩। সামাজিক প্রবন্ধ, ১৩২-৩।
১৯৪। ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ৩০৩।
১৯৫। পারিবারিক প্রবন্ধ, ১০৯।
১৯৬। হিন্দু সমাজ ও ধর্মনীতি, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ৯৭ পরবর্তী।
১৯৭। আচার প্রবন্ধ, ১৮।
১৯৮। বঙ্গসমাজে ইংরাজপূজা, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ১০৯ পরবর্তী।
১৯৯। সামাজিক প্রবন্ধ, ৬৪।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০০। পারিবারিক প্রবন্ধ, ২৬৪।
২০১। সামাজিক প্রবন্ধ, ২৫০।
২০২। ঐ।
২০৩। ঐ, ৬৪-৬।
২০৪। ঐ, ৬৫।
২০৫। ঐ, ১১০-৩।
২০৬। ঐ।
২০৭। ঐ, ১৯১-২।
২০৮। ঐ, ২-৩।
২০৯। ঐ, ১০৯-১০ ; বঙ্গসমাজে ইংরাজপূজা, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড।
২১০। সামাজিক প্রবন্ধ, ভূমিকা।
২১১। পুষ্পাঞ্জলি, ৪২২-৩।
২১২। স্বয়ম্বরাভাব পর্ব, উনবিংশ পুরাণ, ৩৬।
২১৩। ভূদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ৪০৫।
২১৪। সামাজিক প্রবন্ধ, ১৩২-৩।
২১৫। ঐ, ২৬৩।
২১৬। ঐ, ১৩৯।
২১৭। ঐ, ১৩০।
২১৮। ঐ, ১৩১।
২১৯। ঐ, ১৩০।
২২০। উনবিংশ পুরাণ, ২২।
২২১। ঐ, ১৩৫।
২২২। বাংলার ইতিহাস, ৩।
২২৩। বিভিন্ন প্রকারের ইংরাজ রাজপুরুষগণ, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ১১৮-৯।
২২৪। বাংলার ইতিহাস, ৭, ৯।
২২৫। নিম্নে দ্রষ্টব্য।
২২৬। বাংলার ইতিহাস, ৪৪।
২২৭। ঐ।
২২৮। সামাজিক প্রবন্ধ, ১৩৮।
২২৯। ঐ, ১৩৭।
২৩০। ঐ, ১৩৭-৯।
২৩১। ঐ, ১৩৯-৪০।
২৩২। ইংরাজাধিকার,—ইংরাজের রাজভাব, সামাজিক প্রবন্ধ, ১৩৫-৪৩।
২৩৩। বিভিন্ন প্রকারের ইংরাজ রাজপুরুষগণ, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ১১৯।
২৩৪। সামাজিক প্রবন্ধ, ১৪২-৩।
২৩৫। ঐ, ১৪৪।
২৩৬। ঐ, ১৪৭।
২৩৭। স্বপ্নলব্ধ...।
২৩৮। বাংলার ইতিহাস, ৯৯। উনবিংশ পুরাণ, ৭।
২৩৯। ইংরাজাধিকার—ইংরাজের বৈদেশিকভাব, সামাজিক প্রবন্ধ, ১৪২-৫২।
২৪০। ঐ, ৬৩।
২৪১। ঐ, ১৯২।
২৪২। পুষ্পাঞ্জলি, ৪২২-৩।
২৪৩। উনবিংশ পুরাণ, ৫-৬।
২৪৪। বাংলার ইতিহাস, ৪৫।
২৪৫। সামাজিক প্রবন্ধ ; ১৫১-২।
২৪৬। ঐ।
২৪৭। বাঙালি সমাজ, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড।
২৪৮। ভবিষ্য বিচার—ভারতবর্ষের কথা (আর্থিক অবস্থা বিষয়ক), সামাজিক প্রবন্ধ, ২০৩-২২ ; বাংলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস, ৪ পরবর্তী, ২৬, ৭৩ পরবর্তী ; ভূদেব চরিত, ২য় খণ্ড, ১২০-২২ ; উনবিংশ পুরাণ, ২৪ পরবর্তী, ২৯ পরবর্তী, ৩৪ ; বিভিন্ন প্রকারের ইংরাজ রাজপুরুষগণ, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ১২১ ।

২৪৯ । উনবিংশ পুরাণ, ৩০ পরবর্তী, ৩৫ ।

২৫০ । সামাজিক প্রবন্ধ, ৪৩ ।

২৫১ । বঙ্গসমাজে আত্মশাসন, হিন্দুসমাজ ও কূপমণ্ডূকতা, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ৬১-৭০, ১০৮ ; বাংলার ইতিহাস, ৬০-৪ ।

২৫২ । বঙ্গসমাজে ইংরাজপূজা, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ১১১-২ ।

২৫৩ । বিভিন্ন প্রকারের ইংরাজ রাজপুরুষগণ, ঐ, ৫০ ।

২৫৪ । সামাজিক প্রবন্ধ, ১৩ পরবর্তী ।

২৫৫ । বাংলার ইতিহাস, ২৩ ।

২৫৬ । ঐ, ২৯ ।

২৫৭ । এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে দ্রষ্টব্য ।

২৫৮ । সামাজিক প্রবন্ধ, ২৮ ।

২৫৯ । ইংলণ্ডের ইতিহাস, ১৫ ।

২৬০ । সামাজিক প্রবন্ধ, ৩২-৩ ।

২৬১ । ঐ, ৩৬-৭ ।

২৬২ । ঐ, ৩৭ ।

২৬৩ । আচার প্রবন্ধ, ১০৪ ।

২৬৪ । সামাজিক প্রবন্ধ, ৩৮ ।

২৬৫ । ঐ, ৩৭-৮ ।

২৬৬ । ঐ ।

২৬৭ । ঐ ।

২৬৮ । ইংলণ্ডের ইতিহাস, ১০ ।

২৬৯ । কৃত খ্রিস্টান, সামাজিক প্রবন্ধ, ১৬-১৯, ৩৯-৪০ ।

২৭০ । ঐ, ৬৩-৬৪ ।

২৭১ । ঐ, ৬৯-৭০ ।

২৭২ । ঐ, ৭১ ।

২৭৩ । ঐ, ৭৩ ।

২৭৪ । ঐ, ৬৮-৭৩ ।

২৭৫ । সামাজিক প্রবন্ধ, ১৬৫ ।

২৭৬ । পারিবারিক নীতি, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ১০৫ ।

২৭৭ । সামাজিক প্রবন্ধ, ৭৩-৫ ।

২৭৮ । ঐ, ১৬৭ ।

২৭৯ । ঐ, ৭৫-৭ ।

২৮০ । ইংলণ্ডের ইতিহাস, ৩৬২ ।

২৮১ । সামাজিক প্রবন্ধ, ৭৭, ১৬৩ ; ইংলণ্ডের ইতিহাস, ৩৬৯ ।

২৮২ । ঐ, ১৯৯ ।

২৮৩ । ঐ, ৭৮ ।

২৮৪ । ঐ, ৫০৯ ।

২৮৫ । ঐ, ৭৯ ।

২৮৬ । ঐ, ৮১-৬ ।

২৮৭ । ঐ, ৮২ ।

২৮৮ । ঐ, ৮৬-৭ ।

২৮৯ । ঐ, ৮২ ।

২৯০ । ঐ, ৮৩ ।

২৯১ । বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড ।

২৯২ । বঙ্গসমাজ আত্মশাসন, ঐ, ৬৫-৬ ।

২৯৩ । ঐ, ৬৭-৮ ।

২৯৪ । পারিবারিক প্রবন্ধ, ২৫৪-৫ ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৯৫। বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ৬৬-৭।
২৯৬। আচার প্রবন্ধ, ৪৫৩।
২৯৭। ধর্মবুদ্ধি, ভক্তিপ্রীতি ও আচার রক্ষা, বিবিধ প্রবন্ধ, ২৪৯।
২৯৮। সামাজিক প্রবন্ধ, ১৮০-১।
২৯৯। ঐ, ১৫৫-৬।
৩০০। ঐ, ১৫৬-৭।
৩০১। ঐ, ১৫৭-৮।
৩০২। ঐ, ১৭৫-৬।
৩০৩। সমাজ সংস্কার, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ১৪২-৩ ; শান্তি ও সুখ, ঐ, ১৪০।
৩০৪। ঐ, ১৪০-১।
৩০৫। ঐ, ১৪২-৩।
৩০৬। সামাজিক প্রবন্ধ, ১৬২-৩ ; ইংলণ্ডের ইতিহাস, ৩৬২-৩।
৩০৭। ঐ।
৩০৮। শাসনপ্রণালী, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ১৯-২২।
৩০৯। সামাজিক প্রবন্ধ, ১৬৪।
৩১০। ঐ, ১৬৫।
৩১১। পারিবারিক প্রবন্ধ, ৪৭৫-৬।
৩১২। ঐ, ৪৭৫।
৩১৩। ঐ, ৪৬৪।
৩১৪। সামাজিক প্রবন্ধ, ২৯৩।
৩১৫। ঐ, ১৬৪-৫।
৩১৬। ঐ, ১৬৬।
৩১৭। ঐ, ১৬৮-৯।
৩১৮। ঐ, ১৬৯-৭০।
৩১৯। বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ১০২-৪।
৩২০। সামাজিক প্রবন্ধ, ১৯৭-৮।
৩২১। ঐ, ১৬৯-৭০।

AMARBOI.COM

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১। বঙ্কিমের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়। আমি প্রধানত যেগুলি ব্যবহার করেছি, সেগুলি হল : শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম-জীবনী, কলকাতা, ১৯০১, ৩য় সংস্করণ, ১৯৩১ ; রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র (অসমাপ্ত), কথাসাহিত্য, ১৩৬৯-৭০ বঙ্গাব্দ (১৯৬৩) ; সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, কলকাতা ১৯২২, নতুন সংস্করণ, ১৯৮২ ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্কিমচন্দ্র, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ (১৯৪২), ৫ম সংস্করণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ (১৯৬২) ; এবং S.K. Das, The Artist in Chains. The Life of Bankim Chandra Chatterjee, New Delhi, 1984.

২। দ্রষ্টব্য, দাশগুপ্ত, কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, ১৪৩৬ পরবর্তী ; বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশ, পূর্বোল্লেখ, ৭।

৩। ঐ ; পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ২৩।

৪। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কমলাকান্তের 'এসে এসো বঁধু এসো', পূর্বোল্লেখ, ৩২।

৫। দাশগুপ্ত, পূর্বোল্লেখ, ১৩১৬, "বঙ্কিম ছিলেন ধর্মপ্রাণ পিতার ধর্মপ্রাণ পুত্র" ; পূর্ণচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মশিক্ষা, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ৫৬-৬০।

৬। S.K. Das, পূর্বোল্লেখ, ৩।

৭। দাশগুপ্ত, পূর্বোল্লেখ, ১৩১৭, ১৪৩৬ ; শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম জীবনী, ১২-১৭।

৮। দাশগুপ্ত, পূর্বোল্লেখ, ১৩১৮।

৯। ঐ।

১০। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১২০।

১১। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মশিক্ষা, ঐ, ৫৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২। বঙ্কিম জীবনী, ১৬১-৩।
১৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পূর্বোল্লেখ, ১১৯-২০।
১৪। গোপালচন্দ্র রায়, অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র, কলকাতা, ১৯৭৯, ৩৫-৮।
১৫। ঐ, ২, ৭-১০, ১১-১২, ১৯৭।
১৬। ঐ, ৯, ১৭, ৩০।
১৭। বঙ্কিম প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে লেখক দেখিয়েছেন যে ভাইরা তাঁদের অবসর কাটাতেন পরস্পরের সঙ্গে, এমনকি তাঁদের ঘনিষ্ঠতা এতদূর ছিল যে সাধারণত বাঙালি হিন্দু পরিবারে বড় ভাই ছোট ভাইয়ের সম্পর্কে যে সব বিধিনিষেধ মেনে চলা হত, তাঁরা তাও মানতেন না। দ্রষ্টব্য : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায়, বঙ্কিম প্রসঙ্গ ; ৯৩ ; বঙ্কিমচন্দ্র, ঐ, ১০০ ; গোপালচন্দ্র রায়, পূর্বোল্লেখ, ৪০, ৪২, ১৩৪ ; বঙ্কিম জীবনী, ১৩১-২।
১৮। গোপালচন্দ্র রায়, পূর্বোল্লেখ, ২০-৮।
১৯। ঐ, ৪৪-৫, ২২১।
২০। ঐ, ১৯৮-৯, ২২১।
২১। ঐ, ১৪-১৫, ২০৬।
২২। ঐ, ২৪।
২৩। ঐ।
২৪। বঙ্কিমের আত্মাভিমান প্রসঙ্গে আলোচনা দ্রষ্টব্য।
২৫। সুদীপ্ত কবিরাজ, A Taste for Transgression—Liminality in the Novels of Bankimchandra.
২৬। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১২০।
২৭। এক বন্ধুকে বঙ্কিম বলেছিলেন, "রাসের অর্থ আমি এইরকম বুঝি, তখন স্ত্রীজাতির বেদাদিতে অধিকার ছিল না, অথচ তাহাদের শিক্ষা চাই। শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন, কলাবিদ্যার দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন।" বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১২৫।
২৮। সীতারাম, বঙ্কিম রচনাবলী, (সমগ্র), কলকাতা, ১৩৮৬, বঙ্গাব্দ, ৪০২। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে এই সংস্করণটি ব্যবহার করেছি।
২৯। চন্দ্রশেখর, ঐ, ১৯৫।
৩০। পরে অনুশীলন প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।
৩১। একটি প্রহসনে তাঁকে 'বড়াই রাম' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। বড়াইরামের কোনো বন্ধু ছিল না, কেননা তিনি কাউকেই তাঁর বন্ধুত্বের উপযুক্ত মনে করতেন না। দ্রষ্টব্য : গোপালচন্দ্র রায়, পূর্বোল্লেখ, ১৫১।
৩২। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ৮২।
৩৩। সমসাময়িক বিচারক দ্বারকানাথ মিত্র একবার বলেছিলেন যে চার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের গর্বিত পদধ্বনি বহুদূর থেকে শোনা যায়। দ্রষ্টব্য : গোপাল চন্দ্র রায়, পূর্বোল্লেখ, ৮৭।
৩৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিনাথ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখের স্মৃতিচারণ দ্রষ্টব্য, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ৮৩, ৯৫, ১১১, ১৫১, ১৯১।
৩৫। গোপালচন্দ্র রায়, পূর্বোল্লেখ, ৮৮।
৩৬। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১২৯ ; রবীন্দ্রনাথও মন্তব্য করেছেন যে যৌবনে তিনি বঙ্কিমকে যেমন দেখেছিলেন তাতে তাঁর মনে হয়েছিল যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব নয় ; রায়, পূর্বোল্লেখ, ১৩৭-৮ ; শাস্ত্রী, পূর্বোল্লেখ, ১০৭।
৩৭। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, পূর্বোল্লেখ, ৭৫।
৩৮। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোল্লেখ, ১১৬।
৩৯। একটি পত্রে ভ্রাতুষ্পুত্র যতীশকে বঙ্কিম চাকুরী জীবনের সাতটি উপদেশ—Golden rule—লিখে পাঠিয়েছিলেন।
৪০। ছোটভাই পূর্ণচন্দ্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশ দুজনেই এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য : বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ২০-২১, বঙ্কিম জীবনী, ২৩-৪।
৪১। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ২৭-৮।
৪২। বঙ্কিম জীবনী, ১০০, ১০২ ; দাশগুপ্ত, পূর্বোল্লেখ, ৩৬১।
৪৩। বঙ্কিম জীবনী, ১৩৯ ; অমৃতবাজার পত্রিকা, ৮, ১৫ জানুয়ারি, ১৮৭৪, উদ্ধৃতি : বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাস, পূর্বোল্লেখ, ৯২-৩ ; কৈলাস মুখোপাধ্যায়।
৪৪। রায়, পূর্বোল্লেখ, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৮৭।
৪৫। রায়, পূর্বোল্লেখ, ৮৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৬। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, ৮২৭। বঙ্কিমের প্রবন্ধসমূহ এবং কমলাকান্তের দপ্তরের জন্য এই সংস্করণটি ব্যবহার করেছি।

৪৭। সাধারণভাবে "রায় বাহাদুর" দীনবন্ধু মিত্র না লিখে বঙ্কিম বেশ ঘটা করে "রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর" লিখেছিলেন।

৪৮। ১৪ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৪৯। বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাস, পূর্বোল্লেখ, ২৭-৩১।

৫০। বঙ্কিম জীবনী, ১০৮।

৫১। কৈলাস মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লেখ, ১৫-১৬।

৫২। বঙ্কিম জীবনী, ১১৯ পরবর্তী।

৫৩। ঐ, ১৪৯-৫৬, ১৭১-২, ১৮৩-৫, ১৯১।

৫৪। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও আনন্দমঠ, কলকাতা, ১৯৮৩, ৩০-৪ ; বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাস, পূর্বোল্লেখ, ৩০, ৯৭।

৫৫। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী, ৮২৭।

৫৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকা : সঞ্জীবনী-সুধা, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৮৬৮।

৫৭। বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ৯৮।

৫৮। ভূমিকা : সঞ্জীবনী-সুধা, পূর্বোল্লেখ, ৮৬৯।

৫৯। বঙ্কিম জীবনী, ১২৫।

৬০। বঙ্কিম জীবনী, ২০৪।

৬১। ঐ, ২৪ ; বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাস, পূর্বোল্লেখ ১১-১৭।

৬২। বঙ্কিম জীবনী, ১১৮-৯, ১৪৫-৬, ১৯৫-৭ ; বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাস, পূর্বোল্লেখ, ৯৫। রায়, পূর্বোল্লেখ, ১৮৬।

৬৩। রায়, পূর্বোল্লেখ, ২৩, ৫৯-৬০ ; বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১৩৯। বঙ্কিমের অসন্তোষের অন্যতম কারণ "তিনি বহুদিন হইতে অনেক সাহেবকে কাজ শিখাইয়া একপ্রকার মানুষ করিয়া আসিতেছেন...এখন যে সমস্ত তরুণবয়স্ক কার্য্যানভিজ্ঞ সাহেবরা তাঁহার উপর হাকিম হইয়া আসিতেছে তাহারা আবার উল্টে তাঁহাকে কাজ শিখাইতে ও সময়ে সময়ে তাঁহাকে অন্যায়রূপে ধমক দিতে চায়। এরূপ দুর্ব্যবহার এখন তাঁহার ক্রমে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।"

AMARBOI.COM

৬৪। বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বঙ্কিম তাঁর জীবনী লেখায় নিবৃত্ত করেছিলেন : "আমার জীবন অসার, তা লিখিয়া কি হইবে ?" বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১১[illegible]। সঞ্জীবচন্দ্রকে একটি চিঠিতে নিজের জীবনের অনেক দুঃখের কথা জানিয়ে লিখেছিলেন যে তিনি বেশিদিন বাঁচতে চান না, কারণ দীর্ঘজীবন নানা দুঃখের কারণ হয়। রায়, পূর্বোল্লেখ, ৩৭।

৬৫। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোল্লেখ, ৩২-৪, ৩৭-৪১।

৬৬। বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১২১।

৬৭। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোল্লেখ, ৩৫।

৬৮। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, উপাধি উৎপাত, সাহিত্য, শ্রাবণ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ (১৮৯২), উদ্ধৃতি, বঙ্কিম জীবনী, ২২৭। এই ঘটনায় বঙ্কিম যে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে উপাধির ব্যাপারে তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞতার কথা জানিয়ে সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদককে তাঁর নামবিহীন চিঠিতে।

৬৯। বঙ্কিম জীবনী, ১১৯-২০।

৭০। দাশগুপ্ত, কথাসাহিত্য, ৫৪৯।

৭১। স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হেস্টির পত্র, পরে English Enlightenment and Hindoo Idolatry নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত।

৭২। ঐ, ১২-১৩।

৭৩। ঐ, ৩০-৩১।

৭৪। ঐ, ৩২।

৭৫। ঐ, ৪৯, ৫২-৩।

৭৬। ঐ, ৫৩, ৫৪ ৬৮ ; বঙ্কিম জীবনী, ৪০৪।

৭৭। বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১৮৬।

৭৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী, অসম্পূর্ণ রচনা, রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ১০১৪।

৭৯। কালিনাথ দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১৫২-৩। পরে তিনি তাঁর ছুরি-কাঁটাগুলি এক ইংরেজ সহকর্মীকে দিয়ে দিয়েছিলেন। রায়, পূর্বোল্লেখ, ১২৩, ১৭৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮০। ঐ, ১৭৮ ; শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ, প্রথম প্রস্তাব, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১২০।
৮১। রায়, পূর্বোল্লেখ, ১৭৮।
৮২। বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১১৯-২০।
৮৩। দাশগুপ্ত, পূর্বোল্লেখ, ১৬৩৯ পরবর্তী।
৮৪। বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাস, পূর্বোল্লেখ, ১৪-২৩।
৮৫। কৈলাস মুখোপাধ্যায়, পূর্বোল্লেখ, ১৪-১৫।
৮৬। বঙ্কিম রচনাবলী (ইংরেজি), ১২৫ পরবর্তী।
৮৭। বঙ্কিম কাহিনী, ৬১-৩।
৮৮। লোকরহস্যের বিভিন্ন উপাখ্যানে তিনি এই বিষয়টি নিয়ে রহস্য করেছেন, যেমন, হনুমদবাবুসংবাদ।
৮৯। বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাস, পূর্বোল্লেখ, ১৯।
৯০। পূর্বোল্লেখ।
৯১। বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ৭৮, ১১৮।
৯২। বিবিধ, কৃষ্ণচরিত্র, রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৯০৫।
৯৩। ঐ।
৯৪। বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড, উত্তর চরিত, ঐ, ১৮৩।
৯৫। বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ২৩, ১১৯। আদিরসাত্মক সাহিত্যের প্রতি তাঁর অত্যন্ত ঘৃণা ছিল, এবং ঐ মনোভাব তাঁর সাহিত্য সমালোচনাকে প্রভাবিত করেছিল। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবকেও তিনি এই কারণে সমালোচনা করেছেন। বিবিধ, ৯০৫।
৯৬। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ—ভূমিকা, রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৮৫৫।
৯৭। ঐ, ৮৫২।
৯৮। ঐ।
৯৯। ঐ, ৮৫৩।
১০০। মোহিতলাল মজুমদার, বঙ্কিমবরণ, কলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ (১৯৪৯), ৬।
১০১। মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।
১০২। ধর্মতত্ত্ব, অষ্টম অধ্যায়, রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৬০৫।
১০৩। ঐ।
১০৪। বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১২৫।
১০৫। বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন : "ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশির যুদ্ধে জন দুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেনা সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাসমাত্র। পলাশিতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ্গ তামাসা হইয়াছিল।" রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৩৩৭।
১০৬। পলাশির যুদ্ধ, রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৯০৭, ৯০৮।
১০৭। কমলাকান্তের দপ্তর, চন্দ্রালোকে, রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৬৪।
১০৮। কমালকান্তের দপ্তর, পলিটিকস, ১৩ ; রজনী।
১০৯। কমলাকান্তের দপ্তর, চন্দ্রালোকে, ৬৩।
১১০। বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাস, ৯১-২।
১১১। বাহুবল ও বাক্যবল, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৩৬৭।
১১২। মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।
১১৩। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে আনন্দমঠের প্রেরণা এসেছিল মহারাষ্ট্রের বাসুদেব বলবন্ত ফাদকের বিদ্রোহ (১৮৭৯) এবং ম্যাৎসিনির জীবন-কাহিনী থেকে। ফাদকে নিজে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহ করে দেশের স্বাধীনতা আনবার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর অনুগামীদের তিনি যেরকম শৃঙ্খলা শিক্ষা দিয়েছিলেন, আনন্দমঠের সন্তানগণের জীবনধারাতে তার মিল লক্ষ্যণীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ভিত্তিতে বঙ্কিম এই উপন্যাস রচনা করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন, কিন্তু ঐ বিদ্রোহের সঙ্গে সন্তানদের কোনো মিল নেই। দ্রষ্টব্য, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোল্লেখ ; জীবন মুখোপাধ্যায়, আনন্দমঠ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, ৯ পরবর্তী।
১১৪। ভারত কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, ২৩৮।
১১৫। কৃষ্ণচরিত্র, বিবিধ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৯০৫।
১১৬। Three years in Europe—এর সমালোচনা, রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৮৭১ : "যে জাতি জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মনে করিতে না পারে, সে মনুষ্য মধ্যে হতভাগ্য।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১৭। বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ২৮২।
১১৮। ঐ, ২৮৩।
১১৯। বঙ্গদর্শনে মীর মশারফ হোসেনের বিষাদসিন্ধুর পর্যালোচনা দ্রষ্টব্য।
১২০। বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ২৮২।
১২১। বঙ্গদর্শনের কৃষক, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ৩১৪।
১২২। সত্যরঞ্জন দাস, বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন-সাধনা, কলকাতা, ১৯৭৪, ২৩০-৮ দ্রষ্টব্য।
১২৩। বাঙালির ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ৩৩৭।
১২৪। মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।
১২৫। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse? Delhi, 1986, 120-8
১২৬। বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১০৬, ১৮০।
১২৭। ঐ, ২৫।
১২৮। ঐ, ১১৯।
১২৯। Bankim Chandra Chatterjee, Buddhism and Samkhya Philosophy, 126, 129, 131-32; The Study of Hindu Philosophy, 144-8; Bankim Rachanabali, English works.
১৩০। The Study of Hindu Philosophy, 143-4.
১৩১। বঙ্গদেশের কৃষক, ৩০৩।
১৩২। ঐ।
১৩৩। ঐ, ২৯১।
১৩৪। ঐ, ২৯২।
১৩৫। সাম্য, রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৩৮৬-৮।
১৩৬। ঐ, ৪০৫।
১৩৭। ঐ, ৪০৬।
১৩৮। বঙ্গদেশের কৃষক, ৩১১-১২, ৩১৩।
১৩৯। ঐ, ৩১১।
১৪০। সাম্য, ৩৯৫।
১৪১। বঙ্গদেশের কৃষক, ২৮৭।
১৪২। বঙ্কিম-কৃত উপযোগিতাবাদের সমালোচনা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয়ার্ধে দ্রষ্টব্য।
১৪৩। নিম্নে দ্রষ্টব্য।
১৪৪। সংরক্ষণবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা, বঙ্গদেশের কৃষক, ৩১১এবং The Study of Hindu Philosophy, 147-48, মিলের উপর তাঁর বিশ্বাসের উদাহরণ।
১৪৫। জন স্টুয়ার্ট মিল, বিবিধ, রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৮৮০-২।
১৪৬। বঙ্গদেশের কৃষক, ৩১০।
১৪৭। কমলাকান্তের দপ্তর, আমার মন, ৬০।
১৪৮। দাশগুপ্ত, ১৪৬৪-৬৬, দাস, ১৬১ পরবর্তী।
১৪৯। বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১৮, ১৯, ১৪৭-৫০।
১৫০। Confessions of a Young Bengal, 139-40.
১৫১। মিল, ডারউইন ও হিন্দুধর্ম, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১২৮২ ; পরে ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে এই শিরোনামায় বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ২৮০।
১৫২। বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ২৪।
১৫৩। ঐ, ৯৬।
১৫৪। ১৮৮২-র পূর্বে বঙ্কিমের ধর্মীয় আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য সত্যরঞ্জন দাস, পূর্বোল্লেখ, ১৪৩-৫।
১৫৫। বঙ্কিম রচনাবলী (ইংরেজি), ২১০, ২১৬।
১৫৬। বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ১১৮।
১৫৭। ধর্মতত্ত্বের ইংরেজি অনুবাদ মনমোহন ঘোষ কৃত Essentials of Dharma, Calcutta, 1979.
১৫৮। নিম্নে দ্রষ্টব্য।
১৫৯। মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।
১৬০। দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৭৭৬-৯।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬১। Letters on Hinduism, 235.
১৬২। ঐ, ২৪৪।
১৬৩। কৃষ্ণচরিত্র, প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, ৪০৭।
১৬৪। কোন পথে যাইতেছি ? দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, ৭৯১-৩।
১৬৫। Letters on Hinduism, 235-7.
১৬৬। ঐ, ২৬৪-৫।
১৬৭। ঐ, ২৬৮-৯।
১৬৮। দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, ৭৮৬।
১৬৯। গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষের ঝুলি, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ২৬৫-২৬৯।
১৭০। বঙ্গে দেবপূজা, বিবিধ, ৮৯৫।
১৭১। ধর্ম এবং সাহিত্য, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ২৫৭। বহুবিবাহ, ঐ, ৩১৪ পরবর্তী।
১৭২। Letters on Hinduism, ২৬৪।
১৭৩। ধর্মতত্ত্ব, ক্রোড়পত্র 'ক', ৬৭২।
১৭৪। ঐ, ৩য় অধ্যায়, ৫৮৯।
১৭৫। ঐ, ১ম অধ্যায়, ৫৮৫।
১৭৬। ধর্ম এবং সাহিত্য, ২৫৮।
১৭৭। ধর্মতত্ত্ব, ৬৪৯। একবিংশতিতম অধ্যায়।
১৭৮। ঐ, ৬৫০।
১৭৯। ঐ, সপ্তম অধ্যায়, ৫৯৯ পরবর্তী।
১৮০। ঐ, ৬০৩-৪।
১৮১। চিত্তশুদ্ধি, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ২৫৯ পরবর্তী ; ধর্মতত্ত্ব, সপ্তম ও একাদশ অধ্যায়, ৬০০, ৬২০-১।
১৮২। Letters on Hinduism, ২৩৭।
১৮৩। ধর্মতত্ত্ব, দশম অধ্যায়, ৬১৫-২০।
১৮৪। ঐ, অষ্টম অধ্যায়, ক্রোড়পত্র গ।
১৮৫। ঐ, ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়, ৬৫৮।
১৮৬। কমলাকান্তের দপ্তর, আমার দুর্গোৎসব, ৭১-৮১।
১৮৭। কৃষ্ণচরিত্র, ৫৮২।
১৮৮। ধর্মতত্ত্ব, ত্রয়োদশ অধ্যায়, ৬২৬।
১৮৯। ঐ, পঞ্চম অধ্যায়, ৫৯৬।
১৯০। ঐ, দশম অধ্যায়, ৬১৮।
১৯১। ঐ, ত্রয়োদশ অধ্যায়, ৬২৬।
১৯২। ঐ, অষ্টাদশ অধ্যায়, ৬৪৭।
১৯৩। Three years in Europe গ্রন্থের সমালোচনা, ৮৭১।
১৯৪। সাম্য, ৩৮৫।
১৯৫। ঐ, ৩৯৯।
১৯৬। জাতিবৈর, বিবিধ, ৮৮৪।
১৯৭। The Study of Hindu Philosophy, 142
১৯৮। ঐ, ১৪৬ ; সাংখ্যদর্শন, বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, ২২৬।
১৯৯। The Study of Hindu Philosophy, 145.
২০০। বঙ্গদেশের কৃষক, ৩০২।
২০১। ঐ, ৩০৪।
২০২। The Study of Hindu Philosophy, 146-7.
২০৩। সাম্য, ১ম পরিচ্ছেদ, ৩৮৫।
২০৪। বাহুবল ও বাক্যবল, ৩৬৫।
২০৫। ঐ।
২০৬। সাম্য, ২য় পরিচ্ছেদ, ৩৮৭।
২০৭। বঙ্গদেশের কৃষক, ২৯৯-৩০০।
২০৮। ভারত কলঙ্ক—ভারতবর্ষ পরাধীন কেন, ২৩৮।
২০৯। সাম্য ৩৯৫-৬।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১০। ঐ, ৩৯৮।
২১১। বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, ৩৩৯।
২১২। বাঙ্গালির উৎপত্তি, ৩৪৭।
২১৩। কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের জোবানবন্দী ১০৮।
২১৪। ঐ, কাকাতূয়া, ১১১।
২১৫। Confessions of a Young Bengal, 139.
২১৬। কমলাকান্তের দপ্তর, আমার মন, ৬১।
২১৭। ঐ।
২১৮। মনুষ্যত্ব কি ? ৩৭৬।
২১৯। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল, লোকরহস্য, ৭।
২২০। ঐ।
২২১। আদি ব্রাহ্ম সমাজ, ৯১৭-৮।
২২২। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, ৮৫৩-৪।
২২৩। সাম্য, ৩৮৩।
২২৪। ঐ, ৩৯৯-৪০০, ৩৮৮-৯ ; জন স্টুয়ার্ট মিল, ৮৮১।
২২৫। বাহুবল ও বাক্যবল, ৩৬৬ ; প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, ২৪৭।
২২৬। জন স্টুয়ার্ট মিল, ৮৮২।
২২৭। বসন্তের কোকিল, কমলাকান্তের দপ্তর, ৬৮।
২২৮। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, ৫-৬।
২২৯। স্যার উইলিয়ম গ্রে ও স্যার জর্জ ক্যাম্বেল, ৮৯১-২।
২৩০। ভারত কলঙ্ক, ২৩৯।
২৩১। সাম্য, ৩৮৪-৫।
২৩২। ধর্মতত্ত্ব।
২৩৩। ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে, ২৭৯-৮০।
২৩৪। মনুষ্যত্ব কি ? ৩৭৪।
২৩৫। বঙ্গদেশের কৃষক, ৩১৩।
২৩৬। জন স্টুয়ার্ট মিল, ৮৮০।
২৩৭। J.S.Mill, Auguste Comte and Positivism, London, 1865, 67-200.
২৩৮। ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন, কমলাকান্তের দপ্তর, ৫৪।
২৩৯। আমার মন, ঐ, ৬১।
২৪০। ভালবাসার অত্যাচার, বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, ২১৫।
২৪১। শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা, ২০৭।
২৪২। উত্তরচরিত, ১৮৩।
২৪৩। গীতিকাব্য, ১৮৬।
২৪৪। উত্তরচরিত, ১৬৮।
২৪৫। শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা, ২০৪ পরবর্তী।
২৪৬। Confessions of a Young Bengal, 138.
২৪৭। ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লেখা পত্র, রচনাবলী (ইংরেজি), ১৮৪।
২৪৮। A Popular Literature for Bengal, 97.
২৪৯। দ্রৌপদী, বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৯৭।
২৫০। প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত, ১৮৯।
২৫১। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা, ৮২৩ পরবর্তী।
২৫২। কমলাকান্তের দপ্তর, মনুষ্যফল, ৫৩।
২৫৩। আর্য্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প, ১৯৩।
২৫৪। তিনি যে ফরাসীভাষা জানতেন, আমি আগেই তার প্রমাণ দেখিয়েছি। নিজের প্রবন্ধসমূহে তিনি ফরাসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের ফরাসী নামই ব্যবহার করেছেন। পরীক্ষার পাঠ্যসমূহের মধ্যে গ্রীক ও লাতিন থাকায়, এবং ঐ ভাষাগুলি থেকে ভাষান্তরকরণের উদাহরণ দেখে মনে হয় যে ঐসব প্রাচীন ভাষাও তিনি কিছুটা আয়ত্ত করেছিলেন।
২৫৫। কল্পতরু, ৮৯৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫৬। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, ৮৫১।
২৫৭। ঐ, ৮৫৪।
২৫৮। Bengali Literature, 124.
২৫৯। বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, ৩৩৬।
২৬০। বাংলার ইতিহাস, ৩৩০।
২৬১। ভারত কলঙ্ক, ২৩৫।
২৬২। পল্যাশির যুদ্ধ, ৯০৭ ; কমলাকান্তের দপ্তর।
২৬৩। বাংলার কলঙ্ক, ৩৩৪।
২৬৪। ধর্মতত্ত্ব, ত্রয়োদশ অধ্যায়, ৬২৬।
২৬৫। আর্য্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প, ১৯৪ ; Three years in Europe গ্রন্থের পর্যালোচনা, ৮৭২ ; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইত্যাদি, ৮৩৫।
২৬৬। ধর্মতত্ত্ব, নবম অধ্যায় ৬১৪।
২৬৭। লোকরহস্য, ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল, ৩-৪।
২৬৮। ঐ, কোনো 'স্পেশিয়ালের' পত্র, ৩১-৩২।
২৬৯। ঐ, রামায়ণের সমালোচনা, কোনো বিলাতী সমালোচক প্রণীত, ২৭-২৮।
২৭০। Letters on Hinduism, 263.
২৭১। ঐ, ২৪১।
২৭২। ঐ, ১৪৩।
২৭৩। কমলাকান্তের দপ্তর, বড় বাজার, ৭৮।
২৭৪। বঙ্কিম রচনাবলী, (ইংরোজি) ১৫৩, ১৫৯-৬১।
২৭৫। ঐ, ১৪৩, ২০৪-৬, ২০৯, ২১১।
২৭৬। ঐ, ১৫৩, ১৫৭-৯, ২৬১ ; বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড।
২৭৭। বঙ্কিম রচনাবলী, (ইংরোজি) ১১১, ১১৬-৯, ১৫৬, ২২৮-৯।
২৭৮। কৃষ্ণচরিত্র, ২, ৩৪, খণ্ড।
২৭৯। বঙ্কিম রচনাবলী (ইংরোজি), ১৬৫-৬, ২২৮, ২৩৯-৪০, ২৬২ ; বিবিধ প্রবন্ধ, ২য়।
২৮০। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা, বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, ২৪১ পরবর্তী।
২৮১। বঙ্গদেশের কৃষক, ২৮৮।
২৮২। ভারত কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ২৪০।
২৮৩। আনন্দমঠ : "ইংরেজ যে ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধন জন্য আসিয়াছিল, সন্তানেরা তাহা তখন বুঝে নাই। কি প্রকারে বুঝিবে? কাপ্তেন টমাসের সমসাময়িক ইংরেজরাও তাহা জানিতেন না। তখন কেবল বিধাতার মনে মনেই এ কথা ছিল।" সমগ্ররচনা, ৩২৩।
২৮৪। ঐ, ২২২।
২৮৫। চন্দ্রশেখর, সমগ্ররচনা, ১৬৩-৪।
২৮৬। ঐ, ১৯৪।
২৮৭। দেবী চৌধুরাণী, সমগ্ররচনা, ৩৫১-২।
২৮৮। আনন্দমঠ, ৩০৭।
২৮৯। ঐ, ৩১৩।
২৯০। দেবী চৌধুরাণী, ৩৭৫।
২৯১। আনন্দমঠ, ৩২৩।
২৯২। ঐ, ৩৩৬।
২৯৩। ঐ, ৩০৭।
২৯৪। বাংলার ইতিহাস, ৩৩২।
২৯৫। ঐ।
২৯৬। ঐ দুর্গেশনন্দিনী, সমগ্ররচনা, ৩।
২৯৭। A Popular Literature for Bengal, 98
২৯৮। চন্দ্রশেখর, ১৯০ ; আনন্দমঠ ৩২৩, ৩৩৩।
২৯৯। ঐ, ৩৬০, ৩৬১, ৩৭৮ ; ঐ, ৬০৬, ৬০৮।
৩০০। বঙ্গদেশের কৃষক, ২৮৯।
৩০১। ঐ, ৩১১-৩।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০২। ঐ, ২৮৮।
৩০৩। বঙ্কিমের অন্যতম উপন্যাস 'রজনী'র নায়িকা পুলিশ কর্তৃক নিগৃহীত, এবং ওই ধরনের ঘটনা যে প্রায়ই ঘটে, তাও বলা হয়েছে। রজনী, ২০২।
৩০৪। বঙ্গদেশের কৃষক, ২৯৬-৭।
৩০৫।ঐ, ৩০৭।
৩০৬। প্রাচীন ভারতের রাজনীতি প্রবন্ধে নারদের প্রশ্ন : "দুষ্ট অহিতকারী কদর্য্যস্বভাব দণ্ডার্হ তস্কর লোপত্রসহ গৃহীত হইয়াও ত ক্ষমা লাভ করিয়া থাকেন ?" লেখকের উত্তর : "যে দেশে জুরির বিচার আছে, সে দেশের রাজপুরুষদিগকে আমরাও এ কথা জিজ্ঞাসা করি," বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, ২৪৯ ; বঙ্গদেশের কৃষক, ৩০৯।
৩০৭। ঐ, ৩০৮।
৩০৮। দেবী চৌধুরাণী, ৭১৪।
৩০৯। কমলাকান্তের দপ্তর, বড়বাজার, ৭৯।
৩১০। ঐ, ঢেঁকি, ৯০।
৩১১। প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, ২৪৮।
৩১২। বাংলা শাসনের কল, ৩২৮ ; সর উইলিয়ম গ্রে ও সর জর্জ ক্যাম্বেল, রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৮৮৯-৯০।
৩১৩। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, ১১৩-২৮।
৩১৪। ব্র্যানসনিজম্, লোকরহস্য, ৩৩-৩৭।
৩১৫। জাতিবৈর, ৮৮৪-৫।
৩১৬। বাংলার কলঙ্ক, ৩৩৩।
৩১৭। A Popular Literature for Bengal, 98-103.
৩১৮। ঐ, ১২৪।
৩১৯। বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ২৮১।
৩২০। A Popular Literature for Bengal, 99.
৩২১। ধর্মতত্ত্ব, বিংশতি অধ্যায়, ৬৪৭।
৩২২। The Confessions of a young Bengal, ১৩৭ পরিবর্তী ; অধঃপতন সঙ্গীত, গদ্যকাব্য বা কবিতাপুস্তক, ৯৪৮-৪৯।
৩২৩। অনুকরণ, ২০৩।
৩২৪। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, ৯।
৩২৫। ইংরাজ-স্তোত্র, লোকরহস্য, ১০।
৩২৬। বাবু, ঐ, ১১।
৩২৭। বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা, ২৮২।
৩২৮। ধর্মতত্ত্ব, প্রথম অধ্যায়, ৫৮৫।
৩২৯। ঐ, চতুর্থ অধ্যায়, ৫৯৪।
৩৩০। ঐ, পঞ্চম অধ্যায়, ৫৯৬।
৩৩১। কৃষ্ণচরিত্র, ৩৮০।
৩৩২। ধর্মতত্ত্ব, সপ্তদশ অধ্যায়।
৩৩৩। ঐ, ঊনবিংশতিতম অধ্যায়, ৬৪২।
৩৩৪। Letters on Hinduism, 254.
৩৩৫। ধর্মতত্ত্ব, দশম অধ্যায়, ৬১৮।
৩৩৬। ঐ।
৩৩৭। Letters on Hinduism, 242.
৩৩৮। ঐ, ২৩৪, ২৬২।
৩৩৯। ঐ, ২৬৫ ; দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, ৮১৫।
৩৪০। ধর্ম ও সাহিত্য, ২৫৭।
৩৪১। দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, ৭৮২।
৩৪২। ধর্মতত্ত্ব, সপ্তম অধ্যায়, ৬০২।
৩৪৩। ঐ।
৩৪৪। দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, ৮১৪।
৩৪৫। Letters on Hinduism, 253.

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৪৬। কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের জোবানবন্দী, ১০৮।
৩৪৭। ধর্মতত্ত্ব, অষ্টম অধ্যায়, ৬০৯।
৩৪৮। ঐ, চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়, ৬৬১।
৩৪৯। ঐ, একবিংশতিতম অধ্যায়, ৬৪৮-৯।
৩৫০। ঐ, পঞ্চম অধ্যায়, ৫৯৬।
৩৫১। ঐ, পঞ্চম অধ্যায়, ৫৯৬।
৩৫২। ঐ, ক্রোড়পত্র খ, ৬৭৬।
৩৫৩। ঐ, ক্রোড়পত্র ঘ, পাদটীকা, ৬৭৮।
৩৫৪। ঐ, নবম অধ্যায়, ৬১৪।
৩৫৫। ঐ, অষ্টম এবং দশম অধ্যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ

১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, কলকাতা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (১৯৭৬), ৯১।
২। মহেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী, কলকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, (১৯৫৯), ৩-৪।
৩। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোল্লেখ, ৯৩-৪।
৪। ঐ, ৯৪ পরবর্তী, ১১৯ পরবর্তী।
৫। ঐ, ৯৮।
৬। ঐ।
৭। বাল্যজীবনী ৫১-২।
৮। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১০১ ; বাল্যজীবনী, ৪৯-৫০।
৯। ঐ।
১০। ঐ ; বাল্যজীবনী, ৫১ ; স্বামী সারদানন্দ, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ, কলকাতা, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ (১৯৮৩), ২য় খণ্ড, ৫ম অধ্যায়, ১৯৯-২০০ ; স্বামী গম্ভীরানন্দ, যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, ১৯-২০।
১১। মহেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান (অনুধ্যান), ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ (১৯৫৪), ১২, ১৪ ; শ্রীমদ্‌ বিবেকানন্দ স্বামীর জীবনের ঘটনাবলী (ঘটনাবলী), ৪র্থ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ৬৩-৬৪।
১২। বাল্যজীবনী, ৬-৮ ; ধর, ১, ৬, ১১।
১৩। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোল্লেখ, ৯৭, ১২৫।
১৪। বাল্যজীবন ৭৫৮।
১৫। S.N. Dhar, A Comprehensive Biography of Swami Vivekananda, Madras, 1975, 11.
১৬। গম্ভীরানন্দ, পূর্বোল্লেখ, ৫৫ ; ঘটনাবলী, ১০।
১৭। সিমলার যুবকদলের অসম্ভব সাহসিকতার কথা মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন। তাঁর বর্ণনার সঙ্গে বিবেকানন্দের পরিণত বয়সের খুবই সঙ্গতি দেখা যায়।
১৮। The Life of Swami Vivekananda by Eastern and Western Disciples, 5th edn, Calcutta, 1979, I, 44, (Life)
১৯। ঐ, ৪৮।
২০। ঘটনাবলী, ১০ ; ধর, ৪৪।
২১। Life, I, 45.
২২। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (সমকালীন), চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ (১৯৮১), ২০৩। বিবেকানন্দের প্রবল জ্ঞানলিপ্সা এবং বিস্তৃত পঠনের কথা তাঁর জীবনীকারেরা সকলেই আলোচনা করেছেন। তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এমন অনেকের স্মৃতিচারণের মধ্যেও তা উল্লিখিত আছে। দ্রষ্টব্য : Life, I, ৪১, ৪৫, পরবর্তী, ১০৬ পরবর্তী, ১০৭ পরবর্তী ; ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৩১-৪, ১৪২ ; অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং শঙ্কর সম্পাদিত বিশ্ববিবেক, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬৬-তে হরিপদ মিত্রর স্মৃতিচারণ, ৪৫-৮ ; বিমানবিহারী মজুমদার, স্বামী বিবেকানন্দর ইতিহাস চেতনা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ, ঐ, ২৬২ পরবর্তী ; লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, ৭২ ; গম্ভীরানন্দ, পূর্বোল্লেখ, ১ম খণ্ড ; ৬৫ ; প্রমথনাথ বসু, স্বামী বিবেকানন্দ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ (১৯৪৯), ৬০-৮০, ইত্যাদি।

২৩। ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, ১০১ ; সমকালীন, ৪র্থ খণ্ড, ২০৩ ; শঙ্করীপ্রসাদ বসু সম্পাদিত Letters of Sister Nivedita, I, Calcutta, 1982, 82.

২৪। Maire Lousie Burke, Swami Vivekananda in the West—New Discoveries (Burke), 3rd edn. Calcutta, 1983, I, 27.

২৫। ঐ, ৩য় খণ্ড, ৫৪-৯।

২৬। ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৬৪।

২৭। হরিপদ মিত্র, পরিব্রাজক, বিশ্ববিবেক, ৪৫।

২৮। মহেন্দ্রনাথ দত্ত, লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (লণ্ডনে), ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৫৮-৯, ১৭৬ ; ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৬৬।

২৯। ঐ।

৩০। বিবেকানন্দের সঙ্গীত বিষয়ে দক্ষতা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : সমকালীন, ১ম খণ্ড, ৭২-৬ ; ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, Swami Vivekananda—Patriot-Prophet, Calcutta, 1954, 86; 115; প্রিয়নাথ সিংহ, ছাত্রজীবন, বিশ্ববিবেক, ২৯ ৩৩ ; স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, সঙ্গীতসাধক স্বামী বিবেকানন্দ, ঐ, ২৩৭-৪৯ ; ভারতীয় ও ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে স্বামীজীর মত, ঐ, ২৪৯-৫১।

৩১। Life, ১ম খণ্ড, ১১৬-১৮ ; ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোল্লেখ, ১৪১ ; সমকালীন, ১ম খণ্ড, ১১৭-৮।

৩২। ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৬৬।

৩৩। ঐ, ১ম খণ্ড, ৯৮-১০১ ; ২য় খণ্ড, ১৬৩-৪ ; সমকালীন, ১ম খণ্ড, ৯৪ পরবর্তী।

৩৪। Burke, I, 27.

৩৫। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রবন্ধ, উদ্ধৃতি Life, I, 107-11; সমকালীন, ১ম খণ্ড, ৯৪-৬।

৩৬। ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৬৩-৪ ; সমকালীন, ১ম খণ্ড, ৯২।

৩৭। ঐ, ৯৫।

৩৮। Max Muller, Ramakrishna—His life and Sayings, 2nd edn, Calcutta, 1984, 25-9.

৩৯। Sumit Sarkar, The Kathamrita as a text; Towards an understanding of Ramakrishna Paramhansa (Mimiographed, Neheru Memorial Museum and Library, Occasional Papers on History and Society, No. XXII), New Delhi, 1985.

৪০। লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, ১ম অধ্যায়, এই অধ্যায়টির নাম যুগ-প্রয়োজন। ৩য় খণ্ডে সারদানন্দ লিখেছেন যে ঠাকুর নিজের জীবনের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্য-প্রভাবের জোয়ার ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিষ্যগণের লিখিত বিবেকানন্দের জীবনীগ্রন্থে তাঁকে অবতার বলে প্রমাণ করা হয়েছে। ১ম, ৬২, ১৮৩।

৪১। লণ্ডনে, ১ম খণ্ড, ৪১।

৪২। Ramakrishna-His Life and Sayings, প্রথম প্রকাশ ১৮৯৮।

৪৩। সময়ের নির্ঘণ্টের জন্য লীলাপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য, ১ম খণ্ড, ১৪৫-৬, ২য় খণ্ড, ৪১০-১৪।

৪৪। Life, ১ম খণ্ড, ১৮৩।

৪৫। উদ্ধৃতি, লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, ৮।

৪৬। Sister Nivedita, The Master as I saw Him. একাদশ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭২, ১৫৪-৬১।

৪৭। লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব-উত্তরার্ধ, ২৭৮ পরবর্তী।

৪৮। The Apostles of Sri Ramkrishna, Complied and edited by Swami Gambhirananda, Calcutta, 1967; The Disciples of Sri Ramkrishna, Mayavati, 1943.

স্বামী ব্রহ্মানন্দর (পূর্বনাম রাখাল চন্দ্র ঘোষ) মা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন এবং ছেলেবেলায় কালীপূজো করা তাঁর প্রিয় খেলা ছিল। রাখালেরও দেবদেবীগণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। সারদানন্দর (পূর্বনাম শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী) বাবা ও পিতামহ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং শরৎ বাল্যকালে অন্য খেলনার বদলে ঠাকুর-দেবতার মূর্তি পছন্দ করতেন। উপনয়নের পর যোগানন্দ পূজা ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। রামকৃষ্ণদেবের গৃহী বা সন্ন্যাসী, সব শিষ্যরাই (যাদের জীবন বৃত্তান্ত জানা যায়) হিন্দু ধর্মভাবাপন্ন পরিবারের সন্তান ছিলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাকে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদের সঙ্গে জড়িত করা একেবারেই ঠিক নয়। ঐ আন্দোলনের আনুষঙ্গিক আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার সঙ্গে এঁদের সন্ন্যাস গ্রহণের কোনো সম্পর্ক নেই।

৪৯। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোল্লেখ, ১৮৫-৬।

৫০। নিবেদিতা, পূর্বোল্লেখ, ১৬৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫১। রামকৃষ্ণদেব শশধরকে উপদেশ দেবার আগে কিছুটা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করার চেষ্টা করতে বলেছিলেন, শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত), শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, অখণ্ড সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৩, ১ম খণ্ড, ১১০। থিওসফিপন্থীরা যে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা অর্জন করেছে বলে দাবি করত, সে বিষয়ে তিনি বলতেন যে ঈশ্বরকে পাবার জন্য ঐ ক্ষমতার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। প্রতাপ মজুমদার প্রমুখ সমসাময়িকদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সমন্বয়ের প্রতিমূর্তি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৫৯, ১৯।

৫২। লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, উত্তরার্ধ, ২০১, ২০৬।

৫৩। বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাস, পূর্বোল্লেখ, ২৭।

৫৪। উনবিংশ শতকের ধর্মচিন্তার বিবর্তনের জন্য দ্রষ্টব্য বিপিনচন্দ্র পাল, Character-Sketches, Calcutta, 1959, প্রধানত রামমোহন, কেশব, অশ্বিনীকুমার এবং অরবিন্দ বিষয়ক অধ্যায়গুলি।

৫৫। অনুধ্যান, ১৩-২৮। অন্যত্র মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে ১৮৮৭-র আগে বাংলায় গীতা গ্রন্থটি সহজলভ্য ছিল না, ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, ১৩৪।

৫৬। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশের সারমর্ম ছিল সব ধর্মমতের মৌলিক ঐক্য, শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত তত্ত্বমঞ্জরী নামক পত্রিকায় ঐ তত্ত্ব প্রচার করতেন, ঐ, ৭২ পরবর্তী।

৫৭। এই গ্রন্থের ১ম ও দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫৮। ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, ২-৭, ১৫। বাল্যজীবনী, ৯-১১ ; ধর, ১ম খণ্ড, ১৪-১৭, ৩৯ ; সমকালীন, ১ম খণ্ড, ৩১৮ ; নিবেদিতা, ১৬৪।

৫৯। মদীয় আচার্য্যদেব, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬, নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে প্রদত্ত My Master শীর্ষক বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ, বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, ৫৮৪।

৬০। নিবেদিতা, ১০৯, ১১৩ ; Burke, ২য় খণ্ড, ১০৭।

৬১। লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৬৬-৯। মাঝে মাঝে গৃহীজীবন এবং পার্থিব সুখের জন্য তাঁর আশার জন্য দ্রষ্টব্য ইংরাজি রচনাবলী, ২য় খণ্ড, [illegible]৮।

৬২। অনুধ্যান, ২১, ২৩-৫ ; সমকালীন, ১ম খণ্ড, ৩০৭।

৬৩। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ৭ম সংস্করণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, ১৪৭ ; নিবেদিতা, পূর্বোল্লেখ, ১১৫-১৬ ; লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, ৯২।

৬৪। লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, ৫৯, ৬৫, ৯৬ ; অদ্বৈত সম্বন্ধে নরেনের অবিশ্বাস দূর হয়েছিল অনুরূপ সমাধির অভিজ্ঞতায়, ঐ, ১৪৯।

৬৫। ঐ, ৯৭ পরবর্তী, ১০০।

৬৬। ঐ, ২০৮ ; কথামৃত, ৩৭, ৫৮ পরবর্তী।

৬৭। লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, ৩য়-১২শ অধ্যায়, Life, ১ম খণ্ড, ৮ম, ১০-১২শ অধ্যায়, অনুধ্যান, ৮৫ ; কথামৃত, ৯৯৮।

৬৮। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ১৫৪, ১৮৯। বিবেকানন্দ লিখেছেন : "দেহত্যাগের ঠিক কদিন আগে তিনি আমাকে বললেন, 'যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই এই দেহে রামকৃষ্ণ। তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর মত, রচনা সমগ্র, ৫৯৪।

৬৯। ঐ, ৫৮, ১৯৮ ; Burke, ২য় খণ্ড, ৩৮০-১, ৩৯০।

৭০। মদীয় আচার্যদেব, ৫৯১।

৭১। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর মত, রচনাসমগ্র, ৫৯৪।

৭২। নিবেদিতা, পূর্বোল্লেখ, ৮৩।

৭৩। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ১৫৫।

৭৪। লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, ১০৩-৪।

৭৫। ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, ৭৮, ৭৯, ৮৪-৫।

৭৬। লণ্ডনে, ৩য় খণ্ড, ৭, ৪১।

৭৭। ঐ, ২য় খণ্ড, ৮৯-৯০, ৯৪-৯৫, ৯৬ ; নিবেদিতা, পূর্বোল্লেখ, ১৬৪ ; Life, ২য় খণ্ড, ৫১৭।

৭৮। ঐ, ৫২০।

৭৯। ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, ১২৪।

৮০। বেদান্ত সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলেছেনও অনেক, লিখেছেনও অনেক। বেদান্ত দর্শন ও বেদান্ত দর্শন এবং খ্রিস্টধর্ম (বঙ্গানুবাদ) শীর্ষক প্রবন্ধ এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের সারাংশ। রচনাসমগ্র, ৮১৩, ৮৩০। তাঁর বেদান্তের ব্যাখার জ্ঞানগর্ভ মূল্যায়নের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, বিবেকানন্দর বেদান্ত, বিশ্ববিবেক, ৩০৬-২১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮১। ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা, মাদ্রাজে দেওয়া তৃতীয় বক্তৃতা, রচনাসমগ্র, ৭৩০। সর্ববিষয়ব বেদান্তে, ঐ, ৭৫৬-৮।
৮২। নিবেদিতা, পূর্বোল্লেখ, ১৭।
৮৩। বেদান্ত দর্শন, ৮১৪।
৮৪। হিন্দুধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য সম্বন্ধে বিবেকানন্দর মতামত এই অধ্যায়ের দ্বিতীয়ার্ধে দেওয়া হল।
৮৫। স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে লিখিত একটি পত্রে তিনি ভারতের "শত শত শতাব্দীব্যাপী দাসত্বের" কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী বাক্যে লিখেছেন : "অবশ্য মুসলমানগণের অত্যাচারের সময় আমাদের উন্নতি বন্ধ হইয়াছিল ; তাহার কারণ তখন ছিল জীবন-মরণের সমস্যা, উন্নতির সময় ছিল না।" স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৬১ (উদ্বোধন, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ)।
৮৬। Life, ১ম খণ্ড, ২৬৫-৮, ২৭৯-৮০, ৩৭৪ পরবর্তী ; ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৩৬।
৮৭। Life, ১ম খণ্ড, ২৬৮ ; নিবেদিতা, পূর্বোল্লেখ, ৭৬।
৮৮। ঐ, ৪২।
৮৯। Life, ১ম খণ্ড, ৩৫৭।
৯০। নিবেদিতা, পূর্বোল্লেখ, ২০৪।
৯১। বিশ্বজনীন ধর্মলাভের উপায়, রচনাসমগ্র, ৩৫৬।
৯২। 'মহম্মদ' শিরোনামায় বক্তৃতা, সানফ্রান্সিস্কো বে এরিয়া, ২৫ মার্চ, ১৯০০, রচনাসমগ্র ৫৮০।
৯৩। ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, ২৭, ৩৬, ৪২, ১৫১।
৯৪। নিবেদিতা, পূর্বোল্লেখ। অষ্টাদশ অধ্যায়।
৯৫। ভগিনী ক্রিস্টাইনকে ভগিনী নিবেদিতা, ২৭ জানুয়ারি, ১৯০০, উদ্ধৃতি : Burke, ২য় খণ্ড, ২৭১ ; ১ম খণ্ড, ২৬৯ ; Life, ১ম খণ্ড, ১৭২, ৩৩৫, ৩৮৮, ৫২৭।
৯৬। বৌদ্ধ ভারত, রচনা সমগ্র, ৮০৬।
৯৭। India's Gift to the World বিষয়ক বক্তৃতা, ব্রুকলিন স্ট্যান্ডার্ড ইউনিয়ন পত্রিকায় উদ্ধৃত, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫ ; বৌদ্ধ ভারত, ৭৯৯, ৮০৫।
৯৮। বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্ত, রচনা সমগ্র, ৮২৯।
৯৯। বর্তমান ভারত, রচনাসমগ্র, ১০০।
১০০। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ঐ, ৮১।
১০১। ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, ২৮-৯, ৩৬, ৯৪, ১১১, ১৭১-২।
১০২। লণ্ডনে, ২য় খণ্ড, ১০৭-৯।
১০৩। Burke, ২য় খণ্ড, ১৫৫।
১০৪। বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১৪ পরবর্তী।
১০৫। ঐ।
১০৬। Divinity of Man বিষয়ক বক্তৃতা ডেট্রয়েট, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪, ১৮ ফেব্রুয়ারি Free Press পত্রিকায় উদ্ধৃত এই বক্তব্য ; এখানে বক্তব্য অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং বিবেকানন্দ বোধহয় বাস্তবিক যা বলেছিলেন, তা ঠিকমত উদ্ধার করা হয়নি।
১০৭। ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, ৮২-৩।
১০৮। বিশ্বজনীন ধর্মলাভের উপায়, রচনা সমগ্র, ৩৫২-৮।
১০৯। বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ, ঐ, ৩৪৩-৩৫১।
১১০। নিবেদিতা, পূর্বোল্লেখ, ১৬৮।
১১১। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ৭৯ ; ভাববার কথা, রচনা সমগ্র, ৫৩।
১১২। ঐ।
১১৩। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত পত্র, ১৮৯৫, বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৭৫।
১১৪। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।
১১৫। ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৭১ ; সমকালীন, ৩য় খণ্ড, ৮২-৫। থিওসফিপন্থীদের সঙ্গে আমেরিকা-প্রত্যাগত বিবেকানন্দর প্রকাশ্য বিরোধের জন্য দ্রষ্টব্য, সমকালীন, ৩য় খণ্ড, ৩৬, ৭০-১।
১১৬। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ৯৩ পরবর্তী।
১১৭। Life, ১ম খণ্ড, ২৮-৯।
১১৮। ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, ৭, ১১ ; ২য় খণ্ড, ১৬৮ ; সমকালীন, ১ম খণ্ড, ৭৬ পরবর্তী।
১১৯। সমকালীন, ৪র্থ খণ্ড, ২০১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২০। অনুধ্যান, ১২-১৩।
১২১। Burke, ২য় খণ্ড, ১৮২।
১২২। ঐ, ৩৪৬, ৪১৬ ; ১ম খণ্ড, ৪৭-৮, ১৯১, ১৯৭, ২০২, ২০৫, ৩৩৪-৫, ৩৩৯।
১২৩। নিবেদিতা, পূর্বোল্লেখ, ৪৪ ; শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং এস, এন, ঘোষ, (সম্পাদিত) Vivekananda in Indian Newspapers, 1893-1902, Calcutta, 1969, 180, 273. (VIN)
১২৪। বিশ্ববিবেক, ৪৯ ; VIN, 274.
১২৫। কৃষ্ণকায় ভারতীয়দের পশ্চিমী সাজপোশাক তাঁর কাছে অসহ্য ছিল।
১২৬। VIN, 107; ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, ১৮।
১২৭। পরিব্রাজক, রচনা সমগ্র, ৬২।
১২৮। এই গ্রন্থের ১ম ও ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১২৯। পরিব্রাজক, ৬২।
১৩০। ভ্রাতা মহেন্দ্র তাঁর জীবনের এই অধ্যায়টির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।
১৩১। রামকৃষ্ণদেবের চিন্তাভাবনা যে মোটেই সমাজ-সম্পর্কিত ছিল না, এ সম্ভাবনার কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।
১৩২। ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, ১৭, ২৩, ৬৩, ১৫৭ ; ২য় খণ্ড, ১৫৫, ১৭০ ; ৩য় খণ্ড, ১২৫ ; লণ্ডনে, ১ম খণ্ড, ১৬১-৩, ২য় খণ্ড, ১৬৭।
১৩৩। নিবেদিতা, পূর্বোল্লেখ, ৬০ পরবর্তী, বিবেকানন্দর দারিদ্র্য ও ক্ষুধা সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ; Life, ১ম খণ্ড, ৩৫৪, মেথর পরিবারে আশ্রয় গ্রহণের জন্য দ্রষ্টব্য।
১৩৪। Life, ১ম খণ্ড, ৩৪৩ পরবর্তী ; স্বামী শিবানন্দকে লেখা পত্র, আমেরিকা, ১৮৯৪, বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, ৪৩-৪ ; স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা পত্র, চিকাগো, ১৯ মার্চ, ১৮৯৪, ঐ ষষ্ঠ খণ্ড, ৪১৩।
১৩৫। Life' ১২০ পরবর্তী।
১৩৬। ১২৭ ও ১২৮ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
১৩৭। ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, ১২৪।
১৩৮। ঐ, ২য় খণ্ড, ২০ ;
১৩৯। বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৪১।
১৪০। নিবেদিতা দেখিয়েছেন যে রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসীরা প্রথম থেকেই আতুরের সেবা ও দরিদ্রকে অন্নদান তাঁদের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন, বিবেকানন্দর বিদেশ প্রত্যাগমনের পর থেকে ঐ কাজগুলিকে জাতির প্রতি কর্তব্য বলে মনে করা হতে থাকল। নিবেদিতা, পূর্বোল্লেখ, ৩৫। স্বামীজীর মতে "প্রথমে অন্নদান, তারপর বিদ্যাদান, সর্বোপরি জ্ঞানদান"। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ১৩৬।
১৪১। "দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে এক বুদ্ধি হয়ে একটা সাধারণ হিতকর কাজ করতে পার না—মোক্ষ নিতে দৌড়চ্ছ।" পরের অংশে আবেগের সঙ্গে বীরোচিত ব্যবহার করবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন : "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য্য প্রকাশ কর...পৃথিবী ভোগ কর।" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, রচনা সমগ্র, ৮১। ভারতের যুবকদের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল "গীতা ছেড়ে ফুটবল খেলে স্বর্গের পথ প্রস্তুত কর"।
১৪২। নিবেদিতা, পূর্বোল্লেখ, ১৮-১৯।
১৪৩। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে তিনি বলেছিলেন : "ধর্মকর্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হ।...দিশি কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাঁটা মাথায় করে আমেরিকা-ইউরোপে পথে পথে ফিরি করগে।" স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ১১৫।
১৪৪। ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, ২ ; সমকালীন, ২৪৩-৬, ২৫২-৬০।
১৪৫। তিনি চাইতেন যে ভারতীয় যুবকরা দলে দলে জাপানে গিয়ে দেখে আসুক।
১৪৬। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ বিবেকানন্দর চতুর্বর্গ কার্যক্রমের কথা বলেছেন—জনগণের সেবা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, ব্যায়ামাগার স্থাপন, পাঠাগার আন্দোলন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোল্লেখ, ৩০৫-৮।
১৪৭। Burke, ২য় খণ্ড, ১৬৭ পরবর্তী।
১৪৮। লণ্ডনে, ১ম খণ্ড, ১৯১।
১৪৯। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, দেশের মুক্তিপ্রয়াসী স্বামীজী, বিশ্ববিবেকে, ২৬০, ২৬১।
১৫০। "একান্ত স্বজাতিবাৎসল্য ও একান্ত ইরাণ-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরব জাতির, মূর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্মানির এবং ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির এক প্রধান কারণ নিশ্চিত। বর্তমান ভারত, রচনা সমগ্র, ১০৫।
১৫১। পৃথ্বীন্দ্র মুখার্জী, Bagha Jatin: Only Man M.N. Roy Blindly Obeyed, The Statesman, 25 March,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

1987, 6.
১৫২। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ৩।
১৫৩। পরিব্রাজক, ৬০।
১৫৪। ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, ১৯৪ ;
১৫৫। অধ্যাপক রাইটকে লেখা পত্র, ২৬ অক্টোবর, ১৮৯৩, বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৭৯।
১৫৬। Burke, ১৬২-৪, ৪৬৮, ৪৭০।
১৫৭। ঐ, ৫২।
১৫৮। Life, ২য় খণ্ড, ২৭৮।
১৫৯। হরিপদ মিত্রকে লেখা পত্র, ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৩, বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৮৯।
১৬০। রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা পত্র, ১৯ মার্চ, ১৮৯৪, বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১৩।
১৬১। ঐ।
১৬২। Burke, ২য় খণ্ড, ৩৪৬, ৩৫২-৩।
১৬৩। Life, ১ম খণ্ড, ৫১০ পরবর্তী।
১৬৪। Burke, ২য় খণ্ড, ৩৬৯।
১৬৫। ঐ, ২২৯।
১৬৬। ঐ, ১৭৬।
১৬৭। ঐ, ১ম খণ্ড, ৪৬৫-৮।
১৬৮। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ৩।
১৬৯। Burke, ১ম খণ্ড, ২১৯।
১৭০। ঐ, ১১০।
১৭১। ঐ, ২১৮।
১৭২। ঐ, ২য়, ২০৩, ২০৯।
১৭৩। ঐ, ২১৯।
১৭৪। ঐ, ২৭৩।
১৭৫। ঐ, ১ম, ৮৬-৭, ৩৬৬, ৩৭৩, ৩৮১।
১৭৬। ঐ, ৬০, ২৭৮-৮৪।
১৭৭। ঐ, ২১ পরবর্তী।
১৭৮। ঐ, ৯৯।
১৭৯। ঐ, ২৯০।
১৮০। ঐ, ১৫০ পরবর্তী, ৩৬৩, ৪২৭ ; ২য় ২৪।
১৮১। ঐ, ১ম ৪৮৩ পরবর্তী, ৪৮৭ পরবর্তী।
১৮২। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ১২-১৩।
১৮৩। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, রচনা সমগ্র, ৮১ ; ব্রহ্মানন্দকে লেখা পত্র, ১৮৯৫, বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৭৬।
১৮৪। Burke, ২য় খণ্ড, ২৫।
১৮৫। ঐ, ১ম, ৩৫ পরবর্তী, ৫২।
১৮৬। ঐ, ২য় ১৩০-১।
১৮৭। ঐ, ১ম, ৪৩, ১৫৭-৮, ১৫৯ পরবর্তী, ২য়, ১৩৮।
১৮৮। ঐ, ১ম, ৮৫, ৯৫, ১৬১, ১৯৭ পরবর্তী, ৩৪৩ পরবর্তী, ৩৪৬।
১৮৯। ঐ, ৩য়, ৫০৩ পরবর্তী ; সমকালীন, ২য়, ৫১।
১৯০। Burke, ১ম, ৫৮।
১৯১। ঐ, ২য়, ৩৬৮।
১৯২। Life, ২য় খণ্ড, ৪৮২ পরবর্তী।
১৯৩। ঐ, ২৬ অধ্যায়।
১৯৪। ঐ, ২য়, ৪৮২ পরবর্তী।
১৯৫। ভগিনী ক্রিস্টিনকে লেখা পত্র, জানুয়ারি, ১৯০০, Burke, ১ম খণ্ড।
১৯৬। Life, ৪১।
১৯৭। সমকালীন, ১ম খণ্ড, ৯৩ পরবর্তী, ১০৫ পরবর্তী।
১৯৮। ঐ, ৮৬।
১৯৯। লণ্ডনে, ১ম খণ্ড, ১২২ ; ২য় খণ্ড, ৮১, ৮৯, ১০৬।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০০। Life, ২য় খণ্ড, ৫৪৭-৮, ৫৫৫ ; পরিব্রাজক, ৭৩-৪।
২০১। Life, ১ম খণ্ড, ৪৫৬, ২য় খণ্ড, ১৬১ ; VIN ২০০ ; Burke, ২য় খণ্ড, ১১৫।
২০২। Burke, ২য় খণ্ড, ৭ম ও ৮ম অধ্যায় ; Life, ১ম খণ্ড, ৫১৮ পরবর্তী।
২০৩। রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা পত্র, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪, বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৮২ : "সকল কাজেই একদল বাহবা দেবে, আর একদল দুষমনাই করবে।" ঐ বছরই রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা আরেকটি পত্রে লিখেছেন, "ঈর্ষা...গোলামের জাতের nature...।" ঐ, ৭ম খণ্ড, ২৭।
২০৪। বিবেকানন্দর প্রতি শত্রুতার বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, ১১-১২, ৭৬ পরবর্তী ; সমকালীন, ১ম খণ্ড, ৪৫ পরবর্তী, ২৭৫ পরবর্তী ; ২য় খণ্ড, ১৫১ পরবর্তী ; VIN, ১৫৪-৮, ১৮২ পরবর্তী ; Burke, ২য় খণ্ড, ৪০, ৭৯, ৮২ পরবর্তী, ৩০০ পরবর্তী।
২০৫। ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনকে স্বামীজী বলেছিলেন : "আপনারা যদি মনে করেন—আমরা এদের সঙ্গে সংঘর্ষে ঐ স্থূল পাঞ্চভৌতিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াই একদিন স্বাধীন হইব, তবে আপনারা নেহাৎ ভুল বুঝিতেছেন।" স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ৩। অশ্বিনীকুমার দত্তকে তিনি বলেছিলেন যে কংগ্রেসের উপর তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই।
২০৬। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ১৮ : "We are Children of bliss—why should we look morose and sombre?"
২০৭। Life, ২য় খণ্ড, ৪৯৭।
২০৮। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, রচনা সমগ্র, ৮০।
২০৯। ঐ।
২১০। ঐ।
২১১। ঐ, ৯৩।
২১২। ঐ, ৮৩।
২১৩। ঐ।
২১৪। ঐ, ৮৫।
২১৫। ঐ, ৮৪।
২১৬। বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ৩৪।
২১৭। মিনিয়াপোলিস জার্নালে উদ্ধৃত, ২৭ নভেম্বর, ১৮৯৩।
২১৮। লণ্ডনে, ৩য় খণ্ড, ৪৭।
২১৯। ঐ, ২য় খণ্ড, ৫-৬।
২২০। নিবেদিতা, পূর্বোল্লেখ, ২১৯।
২২১। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ৯৫-৬।
২২২। ঐ।
২২৩। বর্তমান সমস্যা, রচনা সমগ্র, ৪৯।
২২৪। আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম, রচনা সমগ্র, ৭৯৭। আমার সমরনীতি, ঐ, ৭২৬।
২২৫। আমাদের উপস্থিত কর্তব্য, রচনা সমগ্র, ৭৪১।
২২৬। ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব, ঐ, ৭৯৩।
২২৭। বেদান্ত, ঐ, ৭৯২।
২২৮। বর্তমান সমস্যা, ঐ, ৫০।
২২৯। পরিব্রাজক, ঐ, ৬৯।
২৩০। ঐ, ৯৫-৬।
২৩১। ঐ, ৯৭।
২৩২। ঐ।
২৩৩। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ৩।
২৩৪। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, রচনা সমগ্র, ৯৭-৯৮।
২৩৫। ঐ, ৯২, ইউরোপের নবজন্ম।
২৩৬। ঐ।
২৩৭। ঐ, ৮২, ধর্ম ও মোক্ষ।
২৩৮। ঐ, ৯২, ইউরোপের নবজন্ম।
২৩৯। ঐ, ৯৪, প্যারি ও ফ্রান্স।
২৪০। ঐ, ৯৪-৫, পরিণামবাদ।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪১। পরিব্রাজক, ঐ, ৭৪-৫, ফ্রান্স ও জার্মানি।
২৪২। ঐ, ৭৫, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গারি।
২৪৩। ঐ, ৭৬।
২৪৪। ঐ।
২৪৫। ঐ, ৭৬।
২৪৬। ঐ, ৬৬, মনসুন : এডেন।
২৪৭। ঐ, বর্তমান ভারত, ঐ, ১০২।
২৪৮। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ৯৫-৬।
২৪৯। বর্তমান ভারত, ১০২, পুরোহিত-শক্তি।
২৫০। ঐ, ১০৩, ক্ষত্রিয়-শক্তি।
২৫১। ঐ, ১০৪, বৈশ্যশক্তি।
২৫২। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, স্বধর্ম ও জাতিধর্ম, ৮৩।
২৫৩। বর্তমান ভারত, ১০৫, শূদ্র-জাগরণ।
২৫৪। Sister Christine, Reminiscences of Swami Vivekananda, উদ্ধৃতি : Burke, ১ম খণ্ড, ৩৫ ; সমকালীন, ৩য় খণ্ড, ৪৫০-৬৮।
২৫৫। পরিব্রাজক, ৭২, ইউরোপী সভ্যতা।
২৫৬। ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, ১১১।
২৫৭। ডেট্রয়ট ফ্রি প্রেসে উদ্ধৃত বক্তৃতা, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪, রচনা সমগ্র, ৬৭৯-৮০।
২৫৮। বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ, ইংলণ্ডে প্রদত্ত বক্তৃতা, রচনা সমগ্র, ৩৪৩ পরবর্তী।
২৫৯। ঐ, ৩৪৪।
২৬০। Burke, ২য় খণ্ড, ৩০।
২৬১। ডেট্রয়েট বক্তৃতা—ভারতের রীতিনীতি, রচনাসমগ্র, ৬৮০।
২৬২। পরিব্রাজক, রেড সী, ৬৬।
২৬৩। ঐ, ৭২।
২৬৪। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ৯৭-৮।
২৬৫। পরিব্রাজক, ৯২।
২৬৬। ঐ, ৬৬।
২৬৭। ঐ, ৯৮-৯।
২৬৮। ভাববার কথা, ঈশা অনুসরণ, ৪৪-৫।
২৬৯। পরিব্রাজক, ৬৬।
২৭০। ভারতীয় নারী, ডেট্রয়ট ট্রিবিউন পত্রিকায় উদ্ধৃত, ১ এপ্রিল, ১৮৯৪, বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ৫৩ ; ভারত কি তমসাচ্ছন্ন দেশ ? রচনা সমগ্র, ৬৮২।
২৭১। ঐ।
২৭২। ঐ।
২৭৩। পারি প্রদর্শনী, রচনা সমগ্র, ৫৪।
২৭৪। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ৯৮।
২৭৫। পরিব্রাজক, ৯৯।
২৭৬। বাংলা ভাষা, রচনা সমগ্র, ৫১।
২৭৭। পরিব্রাজকের ডায়েরী, রচনা সমগ্র, ৭৯-৮০।
২৭৮। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ১৯১-৬।
২৭৯। স্যান ফ্রান্সিকোয় প্রদত্ত বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।
২৮০। জগতে ভারতের দান, বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১০৯।
২৮১। পরিব্রাজক, ৭০।
২৮২। ঐ।
২৮৩। ডক্টর পল ডয়সেন, রচনা সমগ্র, ৬২১।
২৮৪। ঐ।
২৮৫। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ৫৬ ; ডক্টর পল ডয়সেন, রচনা সমগ্র, ৬২২-৩।
২৮৬। পারি প্রদর্শনী, ৫৫।
২৮৭। ঐ, ৫৪।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৮৮। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ৯৮।
২৮৯। ঐ।
২৯০। ঐ, ৯২।
২৯১। ঐ, ৯৩।
২৯২। ঐ।
২৯৩। ভারতের নারী, রচনা সমগ্র, ৬৮৩।
২৯৪। স্বর্ণকুমারী দেবীকে লেখা পত্র, বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৩২৯।
২৯৫। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ৯২।
২৯৬। ঐ।
২৯৭। রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা পত্র, ১৯ মার্চ, ১৮৯৪, বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১০।
২৯৮। ঐ।
২৯৯। ঐ।
৩০০। শিবের ভূত, রচনা সমগ্র, ৫৫।
৩০১। লণ্ডনে, ৯২।
৩০২। VIN, ৬৯৯।
৩০৩। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ৯২।
৩০৪। পরিব্রাজক, ৬৫।
৩০৫। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ৮৫।
৩০৬। ঐ, ৮৪।
৩০৭। ঐ, ৮৭।
৩০৮। ঐ, ৮৯।
৩০৯। ঐ।
৩১০। ঐ, ৮৪।
৩১১। ঐ।
৩১২। পরিব্রাজক, ৬২।
৩১৩। ঐ, ৬০।
৩১৪। ঐ।
৩১৫। মিস মেরি হেলকে লেখা পত্র, ৩ জানুয়ারি, ১৮৯৭, বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৩১৫।
৩১৬। ঐ, ৭৮।
৩১৭। ঐ।
৩১৮। ঐ, ৭৬।
৩১৯। ঐ, ৭৭।
৩২০। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ৭২, ৯০।
৩২১। পরিব্রাজক, ৭৪।
৩২২। ঐ।
৩২৩। Burke, ১ম খণ্ড, ১৪৭।
৩২৪। ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, ২১-২, ২৫। স্বর্ণকুমারী দেবীকে লেখা পত্র।
৩২৫। ভারতী সম্পাদিকাকে (স্বর্ণকুমারী দেবী) লেখা পত্র, ২৪ এপ্রিল, ১৮৯৭, বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৩২৭।
৩২৬। লন্ডনে, ১ম খণ্ড, ১৯৮-৯ ; দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৮, ৩য় খণ্ড, ২১ ; রামকৃষ্ণানন্দকে পত্র, বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১৪।
৩২৭। VIN, ১০৬ ; পরিব্রাজক, ৬০ : "যা কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিল মার্কিন ঠাকুর। দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোকামাত্রই বললে, 'ও চেহারা এখানে চলবে না।' মনে করলুম, বুঝি পাগড়ি-মাথায় গেরুয়া রঙের বিচিত্র ধোকড়া-মত্র গায়, অপরূপ দেখে নাপিতের পছন্দ হল না, তা একটা ইংরেজী কোট আর টোপা কিনে আনি। ভাগ্যিস একটি ভদ্র, মার্কিনের সঙ্গে দেখা, সে বুঝিয়ে দিলে যে বরং ধোকড়া আছে ভাল। কিন্তু ইউরোপী পোশাক পরলেই সকলে তাড়া দেবে। তখন অনেকটা মার্কিন মুলুককে দেশের মতো ভাল লাগতে লাগল।"
৩২৮। রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা পত্র, বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১০ পরবর্তী।
৩২৯। ঐ, ৪৮৫।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৩০। ঐ, ৪০৯।
৩৩১। ঐ।
৩৩২। Burke, ২য় খণ্ড, ৩৭০।
৩৩৩। এলবার্টকে লিখিত পত্র, বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১৮১।
৩৩৪। বাল্যজীবনী, ৫৭-৮।
৩৩৫। ইতিহাসের প্রতিশোধ, রচনা সমগ্র, ৬৩৩-৪।
৩৩৬। লন্ডনে, ১ম খণ্ড, ১৭৬-৭, ১৮১, ১৮২, ১৮৫-৭।
৩৩৭। হেল ভগিনীদের লেখা পত্র, বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৩০৮।
৩৩৮। শ্রীমতী ওলি বুলকে লেখা পত্র, ঐ, ২৫৮।
৩৩৯। এলবার্টকে লিখিত পত্র, পূর্বোল্লেখ ১৮১।
৩৪০। কুমারী ওয়াল্ডোকে লিখিত পত্র, বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ২৯৩।
৩৪১। ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত পত্র, ঐ, ৩৮২।
৩৪২। আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১৫।
৩৪৩। বর্তমান ভারত, ৯৯ পরবর্তী।
৩৪৪। প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত পত্র, বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩২০।
৩৪৫। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ৮৫।
৩৪৬। বর্তমান ভারত, ১০৫-৬।
৩৪৭। ঐ, ১০৬।
৩৪৮। ঐ।
৩৪৯। পরিব্রাজক, ৬০।
৩৫০। জনার্দন, ৫২।
৩৫১। বর্তমান ভারত, ১০৬।
৩৫২। পরিব্রাজক, ৬০।
৩৫৩। বর্তমান ভারত, ১০৭।
৩৫৪। বর্তমান সমস্যা, ৪৯-৫০।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~